শিকড়

জিন, জীবন-ধারা ও ভাষার প্রবাহঃ আফ্রিকা থেকে চট্টগ্রাম

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

মানুষের জীবন-কালটি ছোট, কিন্তু মানব জাতির ধারাবাহিকতার দৈর্ঘ ও বৈচিত্র অনেক বড়। মানুষের মধ্যে নিজের শিকড় অনুসন্ধানের আকুতিটি হয়তো এই বৃহত্তর ধারাবাহিকতায় যুক্ত হবার আকুতি। এই বইয়ে সেই শিকড়কে আমরা চলে যেতে দিয়েছি অনেক গভীরে, আমাদের বহু আগের পূর্বপুরুষদের জগতে, এমনকি মানব জাতিরই শৈশবে। তারপর এ শিকড় নানা কাল ধরে নানা দেশ ঘুরে রস সিঞ্চন করেছে আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে। আসলে মানুষ নিজেই এই রস বহন করেছে– জিন, জীবন-ধারা আর ভাষার প্রবাহে। জিন প্রবাহিত হয়েছে বাবা-মা থেকে সন্তানে, জীবন-ধারা এক ভাবে শিক্ষক থেকে ছাত্রে, আর ভাষা মানুষে মানুষে কথোপকথনে। এই প্রক্রিয়াগুলো শুরু হয়েছিলো আফ্রিকাতে, আর তার গন্তব্য পৃথিবীর সব ক'টি মানব-বসতে– চট্টগ্রাম এখানে যার প্রতিনিধিত্ব করছে, একটি উদাহরণ হিসেবে। ওই মূল- ধারার প্রবাহ থেকে এই গন্তব্যের ঝলোমলো সব স্বকীয়তাগুলো কেমন করে এলো সে কাহিনী নিয়ে এই বই।

শিকড়

জিন, জীবন-ধারা ও ভাষার প্রবাহ ঃ
আফ্রিকা থেকে চট্টগ্রাম

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

উৎসর্গ

আমার মা'কে, যিনি আমার ছোট বোন ও আমি, এই দুই ছোট্ট শিশুকে দু'পাশে বসিয়ে, মানুষের সুদূর শিকড়ের কথা তাঁর মত করে বলতেন।

শিকড় সন্ধানে মানুষের ইতিহাস:
মুখবন্ধ

মুহাম্মদ ইউনূস*

মানুষের জন্ম আফ্রিকাতে তাকে 'জ্ঞানী আমরা' (হোমো সেপিয়েন্স) পর্যায়ে পৌঁছাতে সময় লেগেছে ৫০ লক্ষ বছরের মত। তারপর আরো ৭০ হাজার বছর পার হয়ে যাবার পর মানুষ আফ্রিকা ছেড়ে বাইরের পৃথিবীতে তার ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল। সেই যাত্রায় আরো বহু বছর পর কোনো এক সময় আমাদের দেশে এসে পৌঁছেছিল।

সবার এখন কৌতুহল আমাদের দেশে কখন আসলো। আমাদের জেলায় কখন আসলো? আমাদের গ্রামে কখন আসলো? কী ভাবে আসলো? কোন্ দিক থেকে আসলো? যে পথ অতিক্রম করে আসলো সে পথে আমাদের জন্য কী কী চিহ্ন রেখে আসলো, আমরা কাদের চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছি?

নানা প্রসঙ্গে এসব কথা এসে যায় বলে আলতো ভাবে অনেক কথা জানতাম বলে মনে করতাম। কিন্তু ডক্টর ইব্রাহীমের নতুন বই 'শিকড়' পড়ার পর প্রথম বুঝতে পারলাম কত কথাই আমার অজানা ছিল (শিকড়, মুহাম্মদ ইব্রাহীম, প্রকাশক অনন্যা)।

এরকম বইয়ে কী কী ধরণের খবর আশা করা যেতে পারে একটা ধারণা নিয়েই বইটি পড়া শুরু করেছিলাম। মোটেই বুঝতে পারিনি যে বইটি আমাকে একেবারে মাতিয়ে তুলবে। বইটি কিছুতেই হাত থেকে ছাড়তে পারছিলাম না। ছোটবেলায় রহস্য-উপন্যাস নিয়ে যেরকম মজে যেতাম শিকড় পড়তে গিয়ে আবার সেই আমেজ ফিরে পেলাম। আগ্রহের এমন উত্তেজনা নিয়ে কোনো বই পড়েছি এরকম কোনো ঘটনা গত বহু বছরের মধ্যে ঘটেছে বলে মনে আসছেনা।

শিকড় পড়ার সময় কোনো সময় মনে হয়নি আমি কোনো গবেষণামূলক বই পড়ছি। সব সময় মনে হচ্ছিলো আমি দীর্ঘ পথ ধরে আমার পারিবারিক পরিক্রমার কাহিনী পড়ছি। কাহিনী এমন ভাবে জমে উঠতে শুরু করলো যে এক পর্যায়ে উদ্বিগ্ন বোধ করতে আরম্ভ করলাম বইটির পাতা শেষ হয়ে আসছেনা তো। অবশ্যই বইটি এক সময় শেষ হয়েছে, কিন্তু আমি তাকে শেষ হতে দিইনি,

আবার পড়া শুরু করেছি। দ্বিতীয় বার পড়তে গিয়ে যেন আরো নতুন স্বাদ পেতে আরম্ভ করলাম।
মানুষের অভিবাসন নিয়ে লেখা বই পড়তে গিয়ে কারো চোখে পানি এসে যাবে এরকম কোনোদিন কল্পনা করিনি। কিন্তু এই বই পড়তে গিয়ে চোখের পানি ঠেকাতে পারিনি। লেখক কি শিকড় বইতে নতুন কোনো কথা বলেছেন? হয়তো বলেছেন, হয়তো বলেননি। কিন্তু আমার দিক থেকে নিশ্চিত করে বলতে পারি লেখক আমার ঔৎসুক্যের মাপে খাপে খাপে মিলিয়ে এমন ভাবে লিখেছেন যাতে এই বইতে গভীর ভাবে মগ্ন হয়ে যেতে পারি; এর কোন কথাই আমার কৌতুহলের গন্ডি ছাড়িয়ে যায়নি।

এটা একটা বিজ্ঞানভিত্তিক বই, এই বইতে যা আছে তত্ত্বগত ভাবে তার সবকিছুই নানা ভাষার নানা গবেষণামূলক নিবন্ধে নানা ভাষ্যে নিশ্চয়ই গভীর ভাবে আলোচিত হয়েছে। আপনার আমার অত ধৈর্য নেই যে এত সব নিবন্ধের নানা মত-মতান্তর ঘেঁটে আমাদের ঔৎসুক্য মেটাবো। অতসব গবেষণা পত্রে আমরা নিশ্চয়ই হারিয়ে যেতাম। আমাদের আসল ঔৎসুক্যের স্থলটি খুঁজে পেতামনা। 'শিকড়' বইয়ের বড় অবদান হলো লেখক সবটা কাজ করে, তার সব স্বাদ অক্ষুন্ন রেখে গল্পটি আমাদের সামনে তুলে দিয়েছেন। বইটি পড়ার সময় তাই বার বার ইচ্ছে করেছে লেখককে কী ভাবে ধন্যবাদ দিই, এই কাজটির জন্য।

অন্য পাঠকদের কী মনে হবে জানিনা, আমার ক্ষেত্রে প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় মনে হয়েছে নতুন কিছু শিখলাম। কিছু জিনিস আমার অজানা ছিল বলে নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছে, আবার কিছু জিনিস বিচ্ছিন্ন ভাবে যেন জানতাম, কিন্তু এই ভাবে তো নয়। সব কিছু যেন সারিবদ্ধ হয়ে চমৎকার কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বইটি একটি গবেষণা গ্রন্থ, এতে এমন কিছু নেই যাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়নি; তথ্যের দিক থেকে এ এক ঠাস্-বুনোট বই। অথচ লেখক একে পরিবেশন করেছেন ভ্রমণ কাহিনীর সাবলীলতা দিয়ে, যা তর তর করে পাঠককে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই বলে সহজবোধ্য করার জন্য কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা ইতিহাসের যুক্তি-তর্ককে মুচড়িয়ে বা এড়িয়ে গিয়ে লাফ দিয়ে দিয়ে চলে যাওয়ার কোন প্রবণতা এতে নেই। ইতিহাসের সর্বাধুনিক উপাদান হিসেবে ডিএনএ'র ব্যবহারও কি চমৎকার ভাবে করা হয়েছে তার তত্ত্বটিকে পর্যন্ত তিনি সহজ ভাষায় তুলে ধরতে কার্পণ্য করেননি।

বাংলাদেশ বরাবর একটি জঙ্গলে ভরা জলাভূমি ছিল। এই জঙ্গলেও লোক এসেছিলো। কখন কোন্ দিক থেকে তারা এসেছিল– পশ্চিম, না পূর্ব, না দক্ষিণ দিক থেকে, এসব প্রশ্ন আমাদের মনে। সুদূর আন্দামানের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা আছে জেনে খুব অবাক হলাম। আন্দামানকে কালাপানির দেশ হিসেবে জানতাম, যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তদের পাঠিয়ে দেবার জায়গা হিসেবে জানতাম। কিন্তু জানতাম না যে আন্দামান আমাদের পূর্বপুরুষের যাত্রাপথের সঙ্গী হয়ে আমাদেরকে আরেক বিশাল জগতের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিলো। তখন ইন্দোনেশিয়া হয়ে সুদূর অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত যারা গিয়েছিলো তাদের সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্পর্ক দেখিয়ে দেয়া মানুষগুলো এখনো আন্দামানে রয়েছে।

বিশ্বব্যাপী মহাপরিবর্তনের সূচনা করেছিল ভল্গা তীরের পশুপালকরা। তারা তাদের পালিত পশুর ও নিজেদের খাদ্যপ্রাপ্তি নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো চার হাজার বছর আগে। খাদ্যের সুরাহা করার জন্য পশুপাল আর ঘোড়ায় টানা ওয়াগন গাড়ি নিয়ে তারা অভিবাসী হয়েছিলো ইউরোপে, ইরানে, ভারতে। এক দিনে নয়, ক্রমাগত একের পর এক দলে। ভারতবর্ষে যারা এলো স্থানীয়দের সঙ্গে মিশে গিয়ে নতুন ভাষা, নতুন সাহিত্য, নতুন ধর্ম, নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করলো।

ছোটবেলায় স্কুলে ইতিহাসের বইতে দেখতাম অশোক স্তম্ভের ছবি। মোটেই আকর্ষণীয় মনে হয়নি ভাঙ্গা একটি স্তম্ভ, এতে দেখার কী আছে? অনেক দিন পর 'শিকড়' পড়ে বুঝলাম কত বড় মহান কাজ ছিল এটি। সম্রাট অশোক চেয়েছিলেন ধর্ম-সংঘের কথা নিয়ে তাঁর বাণী সকল প্রজার কাছে পৌঁছে দিতে, আর তাকে স্থায়ী করতে। কিন্তু ভারতে তখনো সব ভাষা শুধু মুখে মুখে, এমনকি পবিত্র ভাষা সংস্কৃতও। লিপি যদি থেকেও থাকতো খুব কম মানুষই তার কথা জানতো। অশোক এক অদ্ভুত প্রকল্পের মাধ্যমে কাজটি করবেন ঠিক করলেন। ভারতে তখন জনপ্রিয় যে মুখের ভাষাগুলো সেগুলোই তিনি পাথরে উৎকীর্ণ করলেন এক নতুন লিপিতে; সাম্রাজ্যের অসংখ্য জায়গাতে, একেবারে দূরের নানা সীমান্তে। এটিই বোধ হয় কোন সম্রাটের পক্ষে প্রথম একটি সর্বভারতীয় প্রকল্প। সেই নতুন লিপি ব্রাহ্মী এরপর বাংলাসহ সব ভারতীয় লিপিরই শুধু নয়, এশিয়ার আরো বহু লিপির প্রথম রূপ হলো। কত বড় প্রকল্প! আজকের দিনে এত বড় একটি প্রকল্প বাস্তবায়নে কতো কারিগর, লোকজন, আমলা এবং খরচ লাগবে তা ভাবতে মাথা ঘুরে যায়। আরো মজার ব্যাপার হলো এত কিছুর

মাধ্যমে সম্রাট কোন ফরমান জারী করছেন না, অত্যন্ত বিনীত ভাষায় ব্যক্তিগত ভাবে প্রজাদের কাছে সরাসরি বলছেন মনের শান্তির জন্য ধর্মের কাজ করতে– তিনি এতে শান্তি পেয়েছেন, সবাই যেন পায়। ভাবতে অবাক লাগে এটি তেইশ শত বছর আগের কথা।

এই বইয়ের কারণে চট্টগ্রামসহ সমগ্র স্থলভাগকে সমুদ্রের দিক থেকে দেখার সুযোগ হলো। পর্তুগীজ বণিকদের আনাগোনাকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম বন্দর সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠ্লো, তার সঙ্গে আকর্ষণীয় হলো কাছে মেঘনা মোহনার দ্বীপগুলোও। পর্তুগীজরা একদিকে বণিক, অন্য দিকে হার্মাদ জলদস্যু হিসেবে এই পুরো উপকূলীয় অঞ্চল থেকে মানুষ ধরে নিয়ে দূর দূর দেশে দাস-ব্যবসার কেন্দ্রগুলোতে বিক্রি করছে– সে এক কালো অধ্যায়।

চট্টগ্রামের ইতিহাস আবার নতুন আঙ্গিকে খুঁজে পেলাম। তাতে সন্দ্বীপ যে এতো বড় ভূমিকা রেখেছে জানতামনা। পর্তুগীজ আর আরাকানীদের মোকাবেলার জন্য মোগল সম্রাটকে নৌবহর গড়ে তুলতে হয়েছিলো, সন্দ্বীপ ছিল সংঘাতের একেবারে সামনের জায়গা। কিন্তু তার আগেই পর্তুগীজরা চট্টগ্রাম বন্দরে কায়েম হয়ে বসেছিলো ও ইউরোপ থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত তাদের 'ভারত যাত্রার' নিয়মিত বন্দর চট্টগ্রাম। প্রথমে পর্তুগীজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। তারপর বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। সবার জাহাজ ভেড়ে এখানে, চট্টগ্রামের মানুষের সঙ্গে এভাবেই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে জাহাজের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে নোয়াখালী আর সিলেটের মানুষেরাও। পৃথিবীব্যাপী সমুদ্রে তখন তাদের সগর্ব উপস্থিতি; জাহাজি অভিজ্ঞতা, জাহাজি সংস্কৃতি, জাহাজি ভাষা এ অঞ্চলের মানুষকে সমৃদ্ধ করলো।

এই বই থেকে জানলাম পালতোলা জাহাজের পরিচালনায় আমাদের এই নাবিকদের কি বিরাট ভূমিকা। তার সঙ্গে জানলাম শুধু বাতাসকে ভর করে জাহাজ কীভাবে দুনিয়ার এক মাথা থেকে অন্য মাথায় চলে যেতে পারে, সব রকম আবহাওয়ায় এমনকি প্রচন্ড সমুদ্র-ঝড়কে মাথায় নিয়ে। বরাবর কৌতুহল ছিল পালতোলা জাহাজ বাতাসের বিপরীতেও কেমন করে সমুদ্র পাড়ি দিত? এই বই বিস্তারিত ভাবে সে প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছে। এখন পালতোলা জাহাজের ছবি দেখলে খেয়াল করে দেখি জাহাজটি কী ধরণের পাল তুলেছে- এটি কি বাতাসের অনুকূলে যাচ্ছে, নাকি প্রতিকূলে। পালের যে রকমফের আছে তা এই বই পড়ার আগে জানিনি।

পৃথিবীর ভাষা-পরিবারের বহুতরো পরিমন্ডলে চট্টগ্রামের ভাষাকে ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষা পরিবারের একটি উল্লেখযোগ্য ভাষা হিসেবে দেখলাম। দুনিয়ার সব ভাষাই তো মানুষের কথোপকথনের মধ্য দিয়েই নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে। চট্টগ্রামের ভাষাও ওভাবেই সৃষ্ট একটি ভাষা। কোনোটি ভাষা, কোনোটি উপভাষা পর্যায়ে থেকে যায়। নানা কারণে কোনোটি গুরুত্ব পেয়ে প্রমিত হয়, লিখিত হয়, সেটি ভিন্ন বিষয়। তবে বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়না চট্টগ্রামের ভাষা বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে, সামনে কোন দিন এ ভাষায় আলাপ করার কোন লোকই হয়তো অবশিষ্ট থাকবেনা। শিশুর প্রথম কথা বলা শুরু করার সময় থেকে বাবা-মা'রা তার সঙ্গে সে ভাষায় কথা বলেন সেটিই প্রজন্মান্তরে যুগ যুগ ধরে বিস্তৃত হয়। চট্টগ্রামের অনেক পরিবার শিশুর সঙ্গে চট্টগ্রামের ভাষা ব্যবহার করেন না। ওভাবে এ ভাষা হারিয়ে যেতে দেরি হবেনা। চট্টগ্রামের ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মাঝে মাঝে কিছু প্রচেষ্টা দেখা গেছে, কিন্তু তা বড় উদ্যোগে পরিণত হয়নি। আরাকানের সঙ্গে বহুকাল একাকার থাকার কারণে চট্টগ্রামের ভাষার বিস্তৃতি আরাকান পর্যন্ত ছিল। তাই এটি ওখানকার রোহিঙ্গাদেরও ভাষা। চট্টগ্রামের ভাষার ভবিষ্যৎ তাদের উপরও বর্তায়।

উপরে খাপছাড়া ভাবে কয়েকটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করলাম। 'শিকড়ের' পাতায় পাতায় এরকম অনেক বিষয়ে নানা কথা এসেছে। বইটি পড়ার পর আমার মনে হচ্ছে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর এটা অবশ্যই পড়া দরকার। এই বইটা আমাদের অতীতকে সহজভাবে এবং সঠিক ভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। আমরা যারা এখন ছাত্র নই তাদেরও এই বই পড়া দরকার, আগে যা পড়েছি তা নতুন ভাবে আবার বোঝার জন্য।

ডক্টর ইব্রাহীমকে ধন্যবাদ এই বই লেখার জন্য, আমার মতো অনেককে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেয়ার জন্য। প্রত্যেকে নিজে পড়লে এবং ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনীদেরকে পড়তে উৎসাহিত করলে, এবং তাদের সঙ্গে বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করলে, সবাই উপকৃত হবেন এবং আনন্দ পাবেন বলে মনে করি।

* লেখক পরিচিতি: নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ২০০৬

ভূমিকা

মানুষের জীবন-কালটি ছোট, কিন্তু মানব জাতির অস্থিত্ব ও অগ্রযাত্রার কালটি অনেক দীর্ঘ। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ জীবনেও প্রজন্ম পরম্পরায়ের একটি দীর্ঘতর বৈচিত্রময় মাত্রা যোগ করতে পারি, যার ভেতরে একটি নতুন অর্থ, একটি নতুন ঝালোমলো অনুভূতি খুঁজে পেতে পারি। অনেক মানুষের একটি আকুতি থাকে তার শিকড়ের অনুসন্ধান করার, অন্তত ঠিক আগের যে সব পূর্বপুরুষদেরকে দেখা থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে তাদের সম্পর্কে আরো জানার আকুতি। বিশেষ করে সেই পূর্বপুরুষরা যদি ভিন্ন দেশ, ভিন্ন সমাজের মানুষ হয় তা হলে তাদের জীবন বেশ রহস্যময় মনে হবার কারণে আকুতিটি আরো বাড়ে। ওভাবে ভিন্ন দেশ, ভিন্ন সমাজের না হয়েও কিন্তু ওই কয়েক প্রজন্মের ব্যবধানে পূর্বপুরুষের কালের চেহারাটি এতটাই ভিন্ন হতে পারে যে, সেক্ষেত্রেও কৌতুহলের অভাব হয়না। যে সব জিনিস ইতোমধ্যে যথেষ্ট বদলে গেছে কৌতুহলগুলো তা নিয়ে হওয়াটি স্বাভাবিক, কিন্তু অবাক হবার বিষয় হলো যে সব জিনিস এতদিনেও মোটেই বদলায়নি তা জানতে পারলেও আমরা দারুণ পুলকিত হই– যেমন ওরাও আমাদের মত রাত জেগে আড্ডা দিতো, কিংবা বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খেতে পছন্দ করতো, তেমন কথা যদি জানতে পারি। এ যেন বদলে যাওয়া আর বদলে না যাওয়া সব কিছু মিলে এই শিকড় সম্পর্কে জানার মাধ্যমে তাদের জীবনের খানিকটাও আমরা আমাদের জীবনে টেনে নিচ্ছি– আমাদের কল্পনায়, আমাদের আত্মীয়তার অনুভবে।

কিন্তু সেই শিকড়কে যদি চলে যেতে দেয়া হয় আরো অনেক গভীরে, আমাদের বহু আগের পূর্বপুরুষদের জগতে, মানুষ যখন একেবারে হাঁটি হাঁটি পা পা করে মানুষ হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে একেবারে সেই কালে; সেটি কেমন হয়? এর জন্য শিকড়কে যেমন চলে যেতে হয় কালের নিরিখে অনেক দূরে তেমনি হয়তো স্থানের নিরিখেও আমাদের বর্তমান জায়গা থেকে অনেক দূরে আমাদের সেদিনের পূর্বপুরুষরা যখন যেখানে ছিল। আমাদের এই পূর্বসূরিদেরও নানা রকম সত্তা নানা প্রবাহে ভর করে আমাদের কাছে চলে এসেছে, আমাদের সত্তাকে তৈরি করেছে। নিকট পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে যা বল্‌ছিলাম তার সবই এখানেও খাটে– বরং এক্ষেত্রে আরো তীব্র, আরো বৈচিত্রময়, আরো ঝলমলো ভাবে ওই অনুভূতিগুলো আমাদের কাছে ধরা দিতে পারে; যা বদলে গেছে তার জন্যও, এবং যা বদলে যায়নি তার জন্য আরো বেশি করে। এই বইয়ে শিকড়ের

অনুসন্ধানকে আমরা ওই দিকেই বিস্তৃত করেছি। আজ যারা এই তল্লাটে আমার পিতৃকূল ও মাতৃকূল, তাদেরও পূর্বপুরুষরা কত কাল কাটিয়ে, কত দেশ ঘুরে এই তল্লাটে তাদের তরী ভিড়িয়েছিলো সে সম্পর্কে কিছু তত্ত্ব-তালাশ পেলে কার না ভাল লাগে। হয়তো এতে আমাদের সীমাবদ্ধ জীবনে বাড়তি কিছু আনন্দ ঝিলিক দিয়ে যাবে, এই আশায় বইটি লেখা।

ওই প্রবাহগুলোকে এখানে আমরা তিনটি আলাদা প্রবাহ রূপে দেখেছি– জিন, জীবন-ধারা, আর ভাষার প্রবাহ। এই তিনটি যে সব দিক থেকে একটি অন্যটির থেকে আলাদা তা নয়; যেমন মানুষের জীবন-ধারার আর ভাষার কিছু কিছু জিনিস ঠিক করে দেয় তার জিন, মানে বংশগত ভাবে পাওয়া তার ডিএনএ; আবার নানা গোষ্ঠি থেকে জিন-মিশ্রণ কাদের মধ্যে কতখানি হবে তা তাদের জীবন-ধারার ওপরও কিছুটা নির্ভর করে বৈকি। তবুও আমরা এই তিন প্রবাহের পৃথক স্রোতকেই গুরুত্ব দিয়েছি। প্রত্যেকটি যেন একটি নদীর স্রোতের মত– এঁকে বেঁকে বয়ে গেছে, তার মত অন্য একটি স্রোতের কাছে এলে সেটির সঙ্গে মিশেছে, সামনে বাঁধের বাধা পড়লে তা অতিক্রম করেছে, অবশেষে এক একটি গন্তব্যে গিয়ে সেখানকার স্থানীয় স্রোতকে একটি অদ্ভুত স্বকীয়তা দিয়েছে।

এই তিনটির মধ্যে জিনের প্রবাহটি খুবই সুনির্দিষ্ট– বাবা-মা থেকে সন্তানের মধ্যে, এমনি ভাবেই শুধু সেটি বইতে পারে। ওতেই অবশ্য প্রত্যেকে তার বাবা ও মায়ের দিকের অসংখ্য আত্মীয়ের সঙ্গে দেহ-মনের অনেক বিষয়ে একই বৈশিষ্ট লাভ করে। ওই এক-ধারার প্রবাহের মধ্যে কোন বাবা বা কোন মা যদি বাইরের কোন গোষ্ঠি থেকে আসে, যদি দূরদেশ থেকে আসে, তা হলে তার গোষ্ঠির ভাবগুলোও ওই ধারায় ঢুকে পড়ে– জিন-মিশ্রণ ঘটার ফলে। প্রবাহে তখন বৈচিত্র অনেক বাড়ে; এমনিতেও জিনের মিউট্যাশন বা পরিবর্তনে কালক্রমে কিছু বৈচিত্র সৃষ্টি তো হয়েই চলে। তবে সবার সব জিনের একটি অদ্ভুত রক্ষণশীলতাও আছে, যার ফলে হাজার হাজার বছরেও মানুষের দেহ আর মানুষের মন অনেকটা হুবহু একই থাকে। এখানেই বদলে গিয়েও বদলে না যাওয়ার রহস্য।

জীবন-ধারার প্রবাহ কিন্তু বাবা-মা থেকে সন্তানে সীমাবদ্ধ নয়, সমাজে যে কেউ অন্য যে কারো কাছ থেকে শিখে জীবনের অভ্যাসগুলো গড়ে তুলতে পারে– কোন্ খাবার খেতে ভালো, কোন্ গান গাইতে ভাল, কোন্ কাজ করতে ভাল এমনি সব ধারণা পেতে পারে। দূর থেকে আসা আগন্তক মানুষের কাছ থেকেও এমন অনেক কিছু শেখা যায়; সত্যি সত্যি যুগে যুগে এমনি আগন্তকদের অভ্যাস

আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, অথবা উভয়ের অভ্যাস মিলে অন্য রকম কিছু। এসবের মধ্যে আমরা একটি আলাদা প্রবাহ হিসেবে নিয়েছি ভাষাকে; কারণ ভাষার সঙ্গে আমাদের চিন্তার, আমাদের মস্তিষ্কের সম্পর্কটি খুবই ঘনিষ্ঠ। আমার ভাষার মধ্যে শত বছর, হাজার বছর, বহু হাজার বছর আগের যাদের ছোঁয়া দেখবো তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটি স্পষ্ট ভাবে রয়েছে। আজকের যাদের মুখের কথার সঙ্গে আমার মুখের কথা কিছুটাও মিলবে, নিশ্চিন্তে ধরে নিতে পারি তার পূর্বপুরুষ আর আমার পূর্বপুরুষ একদিন ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ করতো। কখনো কখনো সেই আলাপী সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ ছিল যে ওরা তাদের শিশুর সদ্য নতুন কথা বলার সময় ওই আগন্তুকের থেকে অভ্যস্ত হওয়া কথাগুলো ব্যবহার করেছে– যা ওই শিশুর মস্তিষ্কে চিরস্থায়ী হয়েছে, তার মাতৃভাষায় ঢুকে পড়েছে।

ভাষা মানুষের মুখে মুখে সৃষ্টি হয়েছে, কথোপকথনের মাধ্যমে ছড়িয়েছে, একটু একটু করে বদলিয়েছে– এখনো দুনিয়া জুড়ে ভাষাগুলো মুখে মুখেই আছে। হ্যাঁ সেগুলোর পোষাকী রূপও সৃষ্টি করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে, সে ভাষাকে লেখাও হয়েছে; কিন্তু মুখের ভাষার প্রবাহটিই শুধু স্বাভাবিক, যেই অর্থে জিনের প্রবাহ স্বাভাবিক, জীবন-ধারার প্রবাহ স্বাভাবিক। এই শেষের দুটির তুলনায় অবশ্য ভাষার প্রবাহটি দেখতে পারা সহজ– এর জন্য ল্যাবোরেটরিতে ডিএনএ বিশ্লেষণ করতে হয়না, প্রত্নতাত্ত্বিক খনন করতে হয়না, মুখের কথা শোনাটাই যথেষ্ট। দূর দেশে গিয়ে সেখানকার মফস্বলের মানুষের মুখে যদি নিজের ভাষার মত কিছু শব্দ শুনি, অথবা কাছেরই একেবারে অপরিচিত কোন মানুষদের মুখে আমাদের নিত্যকার ব্যবহৃত কিছু শব্দ একেবারে আটপৌরে ভাবে থাকতে দেখি, তখন চট্ করে টের পাই ওদের আর আমাদের পূর্বপুরুষ সুদূর অতীতে হলেও এক সময় অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। শুধু একই রকম শব্দ নয়, যদি দেখি সেই দূর দেশের ভাষার মধ্যে আমাদের ভাষার মত ধ্বনির তীক্ষ্ণতার ওঠানামায় শব্দের মানে বদলে যায়, যা আমাদের কাছের অনেক ভাষায় হয়না, তাহলে সেটিও অনেক খবর দেয়; অন্যান্য মিলগুলোও দেয়। এরপর জিনের বা জীবন-ধারার অনুসন্ধানে ওই মানুষগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার আরো বহু রূপ ধরা পড়তে পারে।

শিকড়কে এখানে আমরা যতটা গভীরে নেয়া সম্ভব ততটাই নিয়ে গেছি, অর্থাৎ কিনা মানুষের আবির্ভাব কাল পর্যন্ত- প্রবাহগুলোকে আমরা সেখান থেকেই অনুসরণ করেছি, একেবারে তার উৎসমুখ থেকে। প্রত্নতত্ত্ব ও ডিএনএ গবেষণা উভয়েই আমাদেরকে সেখানে নিয়ে গেছে, এবং তারপর থেকে ওই প্রবাহগুলোর

প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে নিয়ে গেছে, যেখানে মানুষের আদি ধারাটিতে বড় বড় উল্লম্ফন ঘটেছে। সকল প্রমাণে দেখা গেছে উৎসমুখটি ছিল আফ্রিকাতে– লাখ দুয়েক বছর আগে সেটি উৎসারিত হয়েছে সেখানে আধুনিক আমাদের মত মানুষের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। ওই আফ্রিকাতেই দেড় লাখ বছরের কাছাকাছি কাটিয়ে দেয়ার পর তাদের কেউ কেউ আফ্রিকার বাইরে এসে অন্যান্য মহাদেশে ছড়িয়েছে। তার আগে আগে আফ্রিকাতেই মানুষের ভাষা ও মস্তিষ্কের স্ফূরণ আজকের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো- যার ফলে প্রথম তাদের মধ্যে কল্পনা, পরিকল্পনা, নান্দনিকতা এসবের উন্মেষ হয়েছিলো– যাকে আমরা বলেছি মন-পাগলের বিপ্লব। ওই মন-পাগল মানুষগুলোর মাথায় যখন ক্রমাগত দেশান্তরী হবার ভূত চাপলো, তার ফলেই গত দশ বারো হাজার বছরের মধ্যে তারা পৃথিবীর নানা আনাচে কানাচে পৌঁছে গিয়েছিলো; সঙ্গে গিয়েছে ওই তিন প্রবাহ– জিন, জীবন-ধারা আর ভাষা। পথে পথে তাদের, অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষদের, অনেক অর্জন ছিলো রীতিমত রঙিন, উজ্জ্বল, যার অনুভূতি আমাদের জীবনকেও খানিকটা রাঙাতে পারে বৈ কি।

আফ্রিকা ছেড়ে যারা এসেছিলো নানান ঘাটে গিয়ে তারা নানা গোষ্ঠি ও সংস্কৃতির মানুষ হয়েছে বটে, কিন্তু মূলধারার অর্জনগুলো তাদের সবার মধ্যেই রয়েছে। ওই নানা ঘাট দিয়েছে সেই শিকড়ের প্রবাহকে নানা গন্তব্য; তার প্রত্যেকটিতে আবার বহুবার এই রকম অভিবাসনে নানা মিশ্রণ ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত এক এক গন্তব্যের মানুষের মধ্যে চমকপ্রদ নানা স্বকীয়তাও দেখা দিয়েছে যেগুলো একেবারেই স্থানীয়– জিনের মধ্যে, জীবন-ধারার মধ্যে, ভাষার মধ্যে। সেই স্থানীয় স্বকীয়তাগুলো অনেক চমকপ্রদ কথা, অনেক চমকপ্রদ ইতিহাস বল্‌তে পারে। এটি দুনিয়ার ছোট ছোট যে কোন গন্তব্যের জন্যই এটি সত্য। লেখকের সুবিধার বিবেচনায় এই বইয়ে সেই গন্তব্য হয়েছে চট্টগ্রাম; মুলধারা এখানে শেষ পর্যন্ত তাই এগিয়ে চট্টগ্রামের গত দু'তিন শত বছর আগের চিত্রে গিয়ে ঠেকেছে– চট্টগ্রামের মানুষ, চট্টগ্রামের স্থানীয় জীবন বৈশিষ্ট, চট্টগ্রামের ভাষায় গিয়ে। কিন্তু হঠাৎ করে তো প্রবাহ সেখানে উদয় হয়নি– তাকে আসতে হয়েছে ভারতবর্ষের ওপরের নানা স্রোতে ভেসে, বিশেষ করে তার পূর্বাঞ্চলের ওপরের; আবার খানিকটা আরাকান প্রভৃতি পূর্ব দেশীয় স্রোতেও। তাই শিকড় বেয়ে আসা প্রবাহের গন্তব্য চট্টগ্রাম হলেও সে প্রবাহ পুষ্ট হয়েছে আশপাশের শিকড়-গুচ্ছের দ্বারা। কিন্তু এই ছোট গড়পড়তা গন্তব্যের মধ্যেও, এখানকার সাধারণ মানুষের মধ্যেও, বড় বড় বিশ্বজনীন ঢেউগুলো যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ ও উপভোগের

বিষয় হতে পারে। এর একটি ঢেউয়ের ওপর আমরা বিশেষ একটু গুরুত্ব দিয়েছি সেটি হলো চট্টগ্রাম-নোয়াখালী-সিলেট অঞ্চলের মানুষের বিশ্ব-সমুদ্রে খালাসি জীবন, বিশেষ করে তারা যখন সারেং, টেন্ডল, হিসেবে দুনিয়া ব্যাপী পালতোলা জাহাজের অগ্রণী নাবিকের কাজ করেছে। আমাদের যে কারো শিকড়ের গল্পটি এমন, যে তা বহু কাল বহু দেশ হয়ে এসে আজকের মানুষের অনুভূতিতে একটু ছোঁয়ার হিল্লোল জাগাবার চেষ্টা করতেই পারে।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম
জানুয়ারী ২০২১

সূচি

যেসব স্রোতধারার ফলে এখানে আমরা ১৬

পথে পথে রেখে যাওয়া চিহ্ন ৪৬

কেন আফ্রিকা, কেন চট্টগ্রাম ৬৭

জ্ঞানীর জীবন ও যাত্রা ৯০

চিরন্তন পেশার পরিবর্তন ১১৭

এই গন্তব্যে মানুষ ১৩৮

বড় অভিবাসনে বড় মিশ্রণ ১৪৯

ধর্ম-নির্ধারিত সমাজ, সমাজ-নির্ধারিত ধর্ম ১৬৮

মুখের ভাষার ভাষা-পরিবার ১৮৯

পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন ২৩৪

কাছের জীবন ও দূরের বাণিজ্য ২৫৭

সংঘাতে সন্ধিতে চট্টগ্রাম ২৬৫

পালতোলা চিরায়ত প্রবাহে আমাদের খালাসিরা ২৮০

যার গুই খর্নফুলি ৩৩২

যেসব স্রোতধারার ফলে এখানে আমরা

শিকড়ে জীবন-রস

দূরের নাড়ীর স্পন্দনঃ

আমাদের এই বইটি নিজেদের শিকড় নিয়ে, যে শিকড় আমাদেরকে আজকের অবস্থায় দাঁড় করিয়েছে। এ সম্পর্কে জানার ইচ্ছে সবারই কমবেশি থাকে– কেউ কাছের শিকড়গুলো জেনে সন্তুষ্ট থাকে, কেউ আরো খুঁড়ে দেখতে চান এটি কতদূর বিস্তৃত। কোথা থেকে, কোন্ অবস্থা থেকে আমরা আজকের অবস্থায় এসেছি তা জানার জন্য ছোটবেলা থেকে নিজের দেখা পূর্বপুরুষদেরকে এবং তখনকার অবস্থাগুলোকে নিয়ে ভেবেই কৌতুহলটিকে শেষ করতে পারি; কিন্তু তাতে সবার তৃপ্তি হয়না। তারা আরো পেছনে যেতে চায়; যেখানে একের শিকড় অন্যের শিকড়ের সঙ্গে মিশে অনেকের সাধারণ স্রোত সৃষ্টি করেছে সেখান পর্যন্ত, এবং আরো দূরে। অদৃশ্য স্থান এবং অদৃশ্য কালে লুকিয়ে থাকা এসব নিয়ে জানাটি ইতিহাস আশ্রয়ী। তবে ইতিহাস অনেক সময় শুধু মোটা দাগে কথা বলে, রাজা-রাজড়াদের কথা বলেই কাজ সেরে ফেলে, কিংবা বড় ঘটনা-দুর্ঘটনার কথা বলে; আমাদের প্রত্যেকের একেবারে গোড়ায় স্রোতের কাছে এটি সব সময় নিয়ে যায়না। তাই শিকড় সন্ধানকে দেখতে চাই আরো একটু অন্তরঙ্গভাবে যেখানে তার ভেতরের প্রবাহগুলোকে আমরা অনুভব করতে পারি, যেমন ভাবে নিজের নাড়ীর প্রবাহটি অনুভব করি। প্রশ্ন হলো পূর্বসূরিদের ধারাবাহিকতায় দূরের নাড়ীর স্পন্দনটিও আমাদের কাছে ধরা পড়ে কিনা। শিকড় সন্ধানের আনন্দটি পেতে হলে সেই দূরের নাড়ীর স্পন্দনকেও খুঁজে নেয়া চাই, তাকেও অন্তরঙ্গ ভাবে অনুভব করা চাই।

আমাদের শিকড় আমাদেরকে জীবন-রস যুগিয়েছে, প্রবাহটি সেই রসের। এ রস এক রকমের নয়, একাধিক রকমের। তবে এ রস আহরণের জন্য আমরা গাছের মত শিকড় গজিয়ে নানা দিকে পাঠাইনি, শিকড় নিজেই নানা দিকে গিয়ে নানা জায়গা ঘুরে এক এক জায়গায় ফুঁড়ে ওঠেছে আমাদের নানা জনকে রস যোগাতে। এ যেন সে নিজের গরজেই করেছে, ওভাবে বিস্তৃত হওয়াটাই যেন তার ধর্ম। বিস্তৃতিটি তার এতই বেশি যে স্থানের দিক থেকে যদি বলি তাহলে এটি পুরো পৃথিবী জুড়ে, আর কালের দিক থেকে যদি বলি তা তা হলে এটি

মানুষের সমবয়সী। বড় কথা হলো এর ভেতরের প্রবাহগুলোকে অনুভব করা। আজ স্রোতের এক একটি জায়গায় এসে এটি আমাদেরকে রস সরবরাহ করছে বটে, কিন্তু একদিন তার স্রোতে নানা ধারা এসে যোগ হয়েছিলো। সেই নানা স্রোতকে অনুভব করতে হলে মনের চোখে সেখানে যেতে হবে– সেই অন্য কালে, অন্য দেশে। মনে হয় কবি জীবনানন্দ দাস এই স্রোতকেই অনুভব করেছিলেন যখন তিনি লিখেছেন

> হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
> সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
> অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
> সেখানে ছিলেম আমি; আরো দূর অন্ধকার বিদর্ভ নগরে।

তিন রকমের প্রবাহঃ

যাঁরা জীবন-রসের প্রবাহকে অনুভব করতে চান তাঁরা একে নানা রসের নানা প্রবাহে ভাগ করে প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা অনুভূতির স্বাদ নিতে পারেন– কে কতভাগে করবেন তাতে সীমা দেয়া যায়না। তিনি যদি কবি হন তা হলে এক ভাবে করবেন– হয়তো ওপরের পংক্তিগুলোর মতো তাতে তিনি দূর প্রকৃতির অনুভূতি, সময়ের ক্লান্তির অনুভূতি, ধূসরতা বা অন্ধকারের মধ্যে অবোধ্যতার অনুভূতি ইত্যাদি আলাদা আলাদা প্রবাহে আন্দোলিত হবেন; অন্য কেউ হয়তো ভাগগুলো অন্যভাবে করবেন। আমরা কিন্তু অন্তত এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীর মতো করবো, আর তাতে দেখবো যে তিন রকমের প্রবাহকে আগাগোড়া অনুসরণ করে গেলেই শিকড় আমাদের জন্য কী বয়ে নিয়ে আসছে তা বুঝতে সুবিধা হবে। এই তিনটি হলো জিন, জীবন-ধারা, এবং ভাষা।

জিন একেবারেই আমাদের শারীরিক জিনিস – শরীরের প্রত্যেকটি কোষে সবগুলো জিন রয়েছে দীর্ঘ ডিএনএ অণুর এক একটি অংশ হিসেবে। প্রত্যেকটি জিন একজন মানুষের নিজস্ব শারীর-বৃত্ত আর মানসিক বৃত্তের এক একটি দিককে কোডের সংকেতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে, যা আমরা বাবা-মা থেকে শুরু করে আগের সকল পূর্বসূরি থেকে পেয়েছি। সব জিন মিলে সামগ্রিক যেই জেনোম তাতেই রয়েছে আমাদের এক এক জনের সম্পূর্ণ জীবন-রহস্য। এখানে প্রবাহটি বাবা-মা থেকে সন্তানের মধ্যে প্রবাহ, বংশধারার প্রবাহ। একেবারে প্রথম জীবন থেকে সে প্রবাহ চলে আসছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আমাদের সকল জীবন-রহস্য সকল জীবন-বৈশিষ্ট বহন করে। পথে পথে ক্রমাগত শাখায়-প্রশাখায় ভাগ

হয়েছে। এর অদ্ভুত ধর্ম হলো একটি অত্যন্ত বিশ্বস্থতার সঙ্গে একেবারে আদি পূর্বসূরির অনেক কিছু বজায় রেখেছে – সব শাখার মধ্যেই। আবার একই সঙ্গে একটু একটু করে পরিবর্তিতও হয়েছে। এ প্রবাহকে অনুভব করতে হলে বজায় রাখা জিনিসগুলোকে যেমন বুঝতে হবে তেমনি পরিবর্তনগুলোকেও জানতে হবে। দুটিই আমাদের জন্য অত্যন্ত চমকপ্রদ – জিনের প্রবাহে কতটা আমরা বিম্বিসার অশোকের সমসাময়িক পূর্বপুরুষকে ধারণ করছি, অথবা এরো অনেক আগের; কতটা বদলে গেছি, কতটা তার সঙ্গে অন্য পূর্বপুরুষের স্রোতে আসা জিন মিশেছে।

জিনের প্রবাহে যা আমরা পেয়েছি আমাদের চেহারায়, শরীরে, স্বভাবে, তা অবশ্যম্ভাবী ভাবে প্রভাব রাখবে। মাঝপথে আমাদের পূর্বসূরিদের মধ্যে এই জিন কী ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তাদের শরীরে স্বভাবে কী প্রভাব রেখেছে – বিশেষ করে জিনের বড় পরিবর্তনগুলো, তা আমাদের শিকড় সন্ধানের একটি লক্ষ্য। কিন্তু জীবন নিয়ে আরো অন্য প্রবাহের ধারণাও আমরা পেতে চাই যা জিনের ওপর নির্ভর করেনা, অন্তত পুরোপুরি করেনা। একে আমরা বল্‌ছি জীবন-ধারার প্রবাহ। জীবন যাপনে আমাদের অনেক অভ্যাস, অনেক পদ্ধতি, অনেক আনন্দ-উৎসব, অনেক পছন্দ-অপছন্দ আমরা ধারাবাহিক প্রবাহে আগের মানুষ থেকে পেয়েছি। এখানেও অনেক কিছু বহুকাল আগে থেকে এসেও তা পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিতও হয়েছে। এক সময় মনে করা হতো যে এগুলোর সঙ্গে জিনের কোন সম্পর্ক নেই, সমাজের প্রভাবেই এগুলোতে আমরা অভ্যস্ত হই, আর সমাজ এটি যুগে যুগে পরস্পর থেকে দেখাদেখির মাধ্যমে বজায় রাখে। এখন কিন্তু বিজ্ঞান এরও অনেকখানির জন্য জিনের প্রবাহকে দায়ী করে, তবে একই সঙ্গে সমাজের ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবকেও গুরুত্ব দেয়– যাকে এক কথায় বলা যায় সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির অনেক কিছু আমরা বংশগত ভাবে বাবা মা থেকে পাইনা, অন্যদের উদাহরণ থেকে দেখাদেখির মাধ্যমে পাই; কাজেই এও ভিন্ন একটি প্রবাহ। এও যুগ যুগ ধরে মানুষের মাধ্যমেই আমাদের কাছে প্রবাহিত হয়েছে। এর যেটুকু বংশগত ভাবে জিনের মাধ্যমে পাই সেটি হলো স্বভাবজাত কিছু প্রবণতা, যেই প্রবণতা থাকলে বিশেষ কোন সংস্কৃতিতে একজন বেশি স্বচ্ছন্দ হতে পারে, না থাকলে কম স্বচ্ছন্দ হবে। সব মিলে জীবন-ধারাকে একটি স্বাধীন প্রবাহ বলে মনে করা যায় যা আমাদেরকে ভাবতে দেয় এই যে আমরা যে রকম ঘর সাজাই, যা খাই, যেভাবে সাজি, যেভাবে আনন্দ করি, এগুলো তো আমাদের ঐতিহ্য।

অন্য যে অন্তরঙ্গ জিনিসটি আমাদের রয়েছে সেটি আমাদের ভাষা। একে শুধু যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ভাবলে ভুল করা হবে– আমাদের নিজস্ব সত্তা, স্বকীয়তার সঙ্গে এর সম্পর্ক আরো অনেক বেশি নিগূঢ়। মানুষের অদ্ভুত ভাষার ক্ষমতাটি, এবং তার একটি সর্বজনীন ব্যাকরণ জিনের মাধ্যমে আমরা জন্মসূত্রে পেয়েছি, সব মানুষই পেয়েছে। কিন্তু নিজের ভাষার যে স্বকীয়তাটি সেটি আমরা পেয়েছি পৃথক অন্য একটি প্রবাহের মাধ্যমে – যে প্রবাহ চলে বাচন আর শ্রবণের মাধ্যমে। একের বলা অন্যের শোনা, আবার দ্বিতীয় জনের বলা প্রথম জনের শোনা– এই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ভাষা একজন থেকে অন্য জনের মধ্যে যায়; আর উভয়ের মস্তিষ্কের সঙ্গে এই প্রক্রিয়াটির খুব সূক্ষ্ম সম্পর্ক – অন্যের কথার আওয়াজটি মস্তিষ্কে কী হিল্লোল জাগায়, সেই হিল্লোল কী করে তার নিজের কথা বলার মধ্যে পরিবর্তন আনে, সেই প্রক্রিয়াটি। আর এটি যখন মা-বাবা বা তাদের মত ঘনিষ্ঠ কারো সঙ্গে কথোপকথনে শিশুর প্রথম কথার চেষ্টার মধ্যে আসে তখন মস্তিষ্কের সম্পর্কটি আরো সূক্ষ্ম ভাবে স্থায়ী হয়; বোঝার কথাগুলো, বলার কথাগুলো, তখন হয়ে পড়ে মাতৃভাষা। একে জিন প্রবাহের দলে ফেলা যায়না, আবার একেবারে সংস্কৃতির অন্য বিষয়গুলোর জীবন-ধারার যে প্রবাহ সেই দলেও ফেলা যায়না, যদিও উভয়ের সঙ্গে এর কিছুটা সম্পর্ক রয়েছে। জিন গড়েছে মস্তিষ্ক; সেই মস্তিষ্ক বাইরের অন্যের কথা শুনে সাড়া দিচ্ছে– যেই কথা সংস্কৃতির অংশ। এই সম্পর্ক সত্ত্বেও ভাষাকে এগুলোর মতই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবাহ মনে করা যায় যা মানুষ অন্য মানুষ থেকে পেয়েছে, বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে নানা ধারা সৃষ্টি করেছে, ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়েছে। এই একই থাকা আবার পরিবর্তিত হওয়ার দিক থেকেও তিনটি প্রবাহের মধ্যে মিল রয়েছে।

জিনের প্রবাহ

বংশ বংশ ধরে একই নকল, তাতে হঠাৎ পরিবর্তন

বংশধারা অনুযায়ী অনেক কিছুই যে পূর্বপুরুষ থেকে জন্মসূত্রে মানুষ পায় এটি বহুকাল ধরে জানা ছিল। কিন্তু কেমন করে পায় সেই আবিষ্কারটি সাম্প্রতিক-ডিএনএ নামক অণুর গঠন ও কাজের মধ্যেই সে রহস্য উদ্ঘাটিত রয়েছে। সহজ করে বলতে গেলে ডিএনএ অণুটির জিন নামের এক একটি অংশে A, T, C ও G এই নামে পরিচিত চারটি বেইসের মধ্যে কোনটির পর কোন্‌টি বসছে সেই ক্রমের ওপর নির্ভর করে ওই জিন কোন্ বৈশিষ্টটি বহন করবে। বেইস হলো

বিশেষ ধরনের কিছু অপেক্ষাকৃত ছোট অণু যা ডিএনএ গঠনের অংশ। বেইসের ওই ক্রমকে নানা অক্ষরকে একের পর এক সাজিয়ে বিশেষ বিশেষ অর্থপূর্ণ শব্দের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কয়েকটি অক্ষরের ক্রম দিয়ে তৈরি এক একটি শব্দ যে রকম একটি অর্থ প্রকাশ করে, তেমনি কয়েকটি বেইসের ক্রম দিয়ে তৈরি এক একটি জিন তেমনি জীবদেহের ও স্বভাবের এক একটি বৈশিষ্টকে প্রকাশ করে। অনেক লম্বা প্যাঁচানো সূতার আকারের ডিএনএ'র মধ্যে এরকম বহু বৈশিষ্টের কোড ধারণ করা বহু জিন থাকে – একটি বইয়ের মধ্যে যেমন বহু শব্দ থাকে সে রকম। জিন শুধু একটি বৈশিষ্টকে লিপিবদ্ধই (কোডিং) করেনা, সেটিকে বাস্তবায়িতও করে। চুল কালো হবার জিন সত্যি সত্যি চুলকে কালো করেও দেয়, অথবা খুব বন্ধুসুলভ হবার জিন মস্তিষ্কে এমন একটি সূক্ষ্ম গঠন সৃষ্টি করে যার ফলে সেই মানুষ খুব বন্ধুসুলভ হয়।

ডিএনএর এবং সেই সুবাদে তাতে থাকা সব জিনের আর একটি ক্ষমতা হলো যে এটি সাধারণত নির্ভুল ভাবে নকল হতে পারে। জীবের দেহের সব কোষে এবং নতুন নতুন গজানো কোষেও তাই হুবহু একই জিনের নকল যেতে পারে। সন্তানের কাছেও বাবার জিনগুলোর হুবহু নকল এবং মায়ের জিনগুলোরও হুবহু নকল চলে যায় এবং তাই সন্তানের জিনের গড়পড়তা অর্ধেক জিন বাবারগুলোই প্রকাশিত হয় এবং বাকি অর্ধেক মায়ের মত করেই প্রকাশিত হয় বলে সন্তান উভয়ের প্রায় অর্ধেক বৈশিষ্ট লাভ করে। এই সন্তান আবার তার সন্তানকে এই জিনগুলো দিয়ে যায়– কাজেই এমনি ধারা বৈশিষ্টগুলো বংশ পরম্পরায় চলতেই থাকে। এদিক থেকে জিন জিনিসটি বেশ স্থায়ী। সাধারণত এত সুন্দর ভাবে নকল হয় যে বহু প্রজন্ম পরও শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্টগুলো একই থাকতে পারে। জীবনানন্দ দাস যখন বলেন বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে তিনি ছিলেন, সেটি বৈজ্ঞানিক ভাবেও ভুল নয়। তাঁর সকল জীবন-বৈশিষ্ট নিয়ে যে সব জিনে তিনি গঠিত, তার মত হুবহু জিন হয়তো বিম্বিসারের ভারতবর্ষে তাঁর পূর্বসূরিদের মধ্যে ছিল, যেগুলো বংশ পরম্পরায় নকল হয়ে তাঁর কাছে এসেছে। এই অর্থে তিনি ওখানে একভাবে ছিলেন বৈকি। এই অর্থেই ব্যক্তি মানুষ চলে যায়, কিন্তু তাঁর জিন প্রবাহ নানা শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত হয়ে হাজার বছরে নানা গন্তব্যে পৌঁছে যায়।

আমরা বলেছি জিন হুবহু নকল হয়ে, একেবারে অবিকল থেকে, বহু প্রজন্মান্তরের পরের মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। অধিকাংশ জিনের জন্য এটি সত্য হলেও সব জিনের জন্য সত্য না হবারই কথা, বিশেষ করে সেই কালটি যদি হাজার বছর,

লক্ষ বছরের মত দীর্ঘ কাল হয়। এর কারণ অনেকটা দৈবক্রমে হঠাৎ হঠাৎ কোন একটি জিন সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে– এমন পরিবর্তনকে বলা হয় মিউট্যাশন। এমনটি হবার নানা কারণ থাকলেও একটি কারণ হলো নকল হবার সময় দৈবাৎ একটি ভুল ঢুকে পড়া। এমন ভুল ঢুকে পড়া তো খুব কঠিন ব্যাপার নয়, জিনের মধ্যে A, T, C, G এই চারটি বেইস যেই ক্রমে থাকে তাতে কোথাও ধরা যাক্ Tএর জায়গায় C ঢুকে গেলে, কিংবা একটি বেইস বাদ পড়ে গেলে বা বাড়তি হলেই, তো জিনটির পুরো অর্থ বদলে যাবে; ফলে যেই বৈশিষ্টের কোডিং হবার কথা তা না হয়ে অন্য বৈশিষ্ট দেখা দিতে পারে। কাজেই জিন অবিকৃত ভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রবাহিত হয় একথা যেমন ঠিক, তেমনি দৈবক্রমে তাতে মিউট্যাশন ঘটাতে পরবর্তী বংশে বৈশিষ্টে পরিবর্তন ঘট্‌তে পারে এটিও ঠিক। তবে পরবর্তী বংশগুলোতে সঞ্চার হতে গেলে ওই মিউট্যাশনটিকে টিকে থাকতে হবে– সেটি খুব বেশি ক্ষেত্রে ঘটেনা, তাই পরিবর্তনগুলো প্রায়শ হারিয়ে যায়, পরবর্তীদের মধ্যে যায়না। কিন্তু যেগুলো পরিবেশের টানাপোড়েনের মধ্যে টিকে থাকে সেই পরিবর্তনগুলো পরবর্তী প্রবাহের মধ্যে দেখা দেয়।

দেখা গেছে, এই টিকে থাকা মিউট্যাশনের সংখ্যা মানুষের বিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রথম দিকে যত বেশি ছিল, পরবর্তী কালে টানাপোড়েন কমে যাওয়াতে সে রকম দৈবাৎ পরিবর্তন কমই ঘটেছে। কাজেই আমরা গত দশ পনরো হাজার বছরের মধ্যে অন্তত দৈবাৎ জিন পরিবর্তনের ফলে খুব বেশি বদলাইনি– পূর্বপুরুষদের মতই আছি। তবে জিন পরিবর্তনে না বদ্‌লালেও জিন মিশ্রণে আমরা ঠিকই বদলিয়েছি– আগেও, পরেও।

অভিবাসনে জিনের মিশ্রণঃ

সন্তান বাবার প্রায় অর্ধেক জিন পায় আর মায়েরও অর্ধেক জিন পায়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন টানাপোড়েনে সেখানে দৈবক্রমে যে সব মিউট্যাশন বা পরিবর্তিত বৈশিষ্ট সেখানকার সব মানুষের সামগ্রিক জিন ভান্ডারের মধ্যে ধীরে ধীরে জমতে থাকে, তা এক এক দেশে অন্য দেশের থেকে ক্রমে আলাদা হয়ে যায়। এ জন্য এক এক অঞ্চলে জিনের কিছু কিছু বৈশিষ্টের কারণে কিছুটা পরস্পর ভিন্ন মানুষের গোষ্ঠি সৃষ্টি হয়। তখন ঐ দেশগুলোর একটি থেকে বেশ কিছু মানুষ যদি অন্যটিতে অভিবাসী হয় এবং তাদের সঙ্গে মিলে সন্তানের জন্ম দেয়, তাহলে সেই সন্তানের মধ্যে দুই গোষ্ঠির মানুষের জিনের মিশ্রণ ঘটে। এমন মিশ্রণ অনেকের মধ্যে ঘটলে ওই দেশের মানুষের

সার্বিক জিন প্রবাহে নতুন সব বৈশিষ্ট যোগ হবে। যেমন খুব সাধারণ একটি উদাহরণ নিলে, সব মানুষের কালো চোখ এমন দেশে যদি অল্প কিছু নীল চোখের মানুষ অভিবাসী হয় এবং সেখানে স্বামী বা স্ত্রী গ্রহণ করে, তাহলে কয়েক প্রজন্ম পর ওখানে বহু নীল চক্ষু মানুষ দেখা যাবে এবং এক সময় তাদের সংখ্যা অনেক হয়ে যেতে পারে। শুধু চেহারার নয় বরং যে কোন শারীরিক ও মানসিক জিন বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে এমন জিন-মিশ্রণ ঘটতে পারে।

মানুষের ইতিহাসে একেবারে গোড়া থেকেই দেখা গেছে প্রায়শ দেশান্তরী হওয়াটি মানুষের স্বভাব। অভিবাসন তাই একটি অতি প্রাচীন প্রক্রিয়া, নানা গোষ্ঠির মানুষের মধ্যে হরদম ঘটেছে। আর সেটি সৃষ্টি করে দিয়েছে জিন প্রবাহে মিশ্রণের সুযোগ। এভাবে একই জিন ধারা অন্য ধারার সঙ্গে মিশে প্রায়শ প্রবাহের নতুন শাখা প্রশাখা সৃষ্টি করেছে। দেখা গেছে মানুষের প্রবণতা শুধু নিজ গোষ্ঠির মধ্যে মেলামেশা বিয়েশাদী সীমাবদ্ধ রাখা নয়, বরং যখনই সুযোগ ঘটেছে সম্পূর্ণ ভিনদেশী ভিনজাতির মানুষকেও সংসারে আপন করে নেয়ার। তা যেভাবেই যাক দেশে দেশে নানা অভিবাসীরা বিচিত্র রকম জিন-মিশ্রণের কারণ হয়েছে। এমনকি একেবারে প্রাচীন কালেও একই অঞ্চল থেকে দুনিয়ার নানা অঞ্চলে চলে যাওয়ার মাধ্যমে একই জিন বৈশিষ্ট নানা দিকে চলে যাবার সুযোগ পেয়েছে। মানব জতির দীর্ঘ ইতিহাসে অভিবাসনও সব ক্ষেত্রে এক ভাবে ঘটেনি– কখনো অভিযাত্রীর মত কৌতুহল নিয়ে মানুষ অন্য দেশে গেছে, কখনো দেশ দখল করে বিজয়ীর বেশে, কখনো বাণিজ্য করতে, আবার কখনো বাধ্য হয়ে– যখন বন্দী দাস হিসেবে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই জিন-মিশ্রণই আসলে শুরুতেই নানা গুরুত্বপূর্ণ বিভাজন থাকা সত্ত্বেও সকল মানুষকে একই মানব প্রজাতির অন্তর্ভূক্ত করেছে।

যেখানে স্বাভাবিক ভাবে জিন-মিশ্রণ ঘটার কথা নয় সেখানেও যে তা ঘটেছে– সুদূর অতীত থেকে তার একটি উদাহরণ দেয়া যাক। এটি হলো সম্পূর্ণ অন্য প্রজাতির মানুষ নিয়ানডার্থালদের সঙ্গে জিনের মিশ্রণ। এক সময় মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপে আমাদের মত মানুষের পাশাপাশি অন্য রকম মানুষ নিয়ানডার্থালরা কাছাকাছি বাস করতো। ওসব অঞ্চলের বেশ কিছু মানব বসতের খোঁজ পাওয়া গেছে যেখানে আমাদের মত মানুষের ও নিয়ানডার্থালদের ফসিল কঙ্কাল পাশাপাশি জায়গায় আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব কঙ্কালের বয়স ৫০-৬০ হাজার বছরের মত। নিয়ানডার্থালরা আমাদের মত মানুষের খুব কাছাকাছি প্রজাতি হলেও, আসলে যথেষ্ট ভিন্ন ছিল মাথার খুলির আকৃতি, দেহের আকার, মুখাবয়ব

ইত্যাদির দিক থেকে। যা বোঝা গেছে ভাষা ক্ষমতা, হাতিয়ার তৈরি, শিকার পদ্ধতি, শীতের থেকে আত্মরক্ষা ইত্যাদির দিক থেকে তারা আমাদের মত মানুষের থেকে পিছিয়ে ছিল; হয়তো যে কারণে হাজার তিরিশেক বছর আগে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা তাদের চেহারা ও সক্ষমতা সম্পর্কে এমন একটি ধারণা দিয়েছিলেন যে তখন থেকেই আজ পর্যন্ত জনমনে তাদের সম্পর্কে বন্য চেহারার ও স্বভাবের অত্যন্ত বিজাতীয় একটি ধারণাই বলবৎ ছিল, পরবর্তী গবেষণায় তা ভুল প্রমাণিত হলেও ধারণাটির পরিবর্তন হয়নি।

সাম্প্রতিক কালে ডিএনএ বিজ্ঞান এতই উন্নত হয়েছে যে দীর্ঘকাল আগের কঙ্কাল থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করে তা পরীক্ষা করা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ডিএনএ যেহেতু A, T, C, G এই চার রকমে বেইসের ক্রমের মাধ্যমেই সব কথা বলে, জীব মরে গেলেও তার হাড়ের কোষে ওই ক্রমটি অবিকৃত থেকে যেতে পারে– আর সেখান থেকে তার বার্তাও উদ্ধার করা যেতে পারে। আমাদের মত মানুষের কঙ্কাল আর নিয়ানডার্থালদের কঙ্কাল যেখানে কাছাকাছি ছিল, তার উভয়ের ডিএনএ বার্তার তুলনা করে এবং তার সঙ্গে আজকের মানুষের ডিএনএ'র বার্তার তুলনা করে অত্যন্ত অবাক করা কিছু ফলাফল পাওয়া গেছে যা সবাই যে পছন্দ করেছে তা বলা যাবেনা। দেখা গেছে যে ওখানে পাওয়া আমাদের মত মানুষের হাড়ের ডিএনএ'র মধ্যেই এমন কিছু চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে যা শুধু তখন অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক নিয়ানডার্থালদের বৈশিষ্ট ধারণ করে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে অপেক্ষাকৃত সম্প্রতি নিয়ানডার্থালদের জিন মিশ্রণের মাধ্যমে এগুলো এসেছে, অর্থাৎ আগের কোন প্রজন্মে নিয়ানডার্থালের সঙ্গে আমাদের মত মানুষের যৌন সম্পর্ক ঘটেছে। এ ধরনের আরো গবেষণা থেকে স্পষ্ট হয়েছে– বর্তমান মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে ইউরোপীয় মানুষের মধ্যে কিছু নিয়ানডার্থাল জিন রয়েছে, একেবারে বিশুদ্ধ উন্নত প্রজাতির মানুষ হিসেবে যে কৌলীন্য সাধারণভাবে আমাদের মত মানুষরা দাবী করে আসছিলো, সেটি সে রকম বিশুদ্ধ ভাবে নয়– নিয়ানডার্থাল মিশ্রণের মধ্য দিয়েই আমরা উন্নত হয়েছি। একই ভাবে কোন গোষ্ঠিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মধ্যে বাইরের কোন বৈশিষ্ট দেখে যুগে যুগে হয়তো সবাই এক রকম মেকি আত্মতৃপ্তি বোধ করেছি যে আমরা ওই বৈশিষ্টের একটি অনন্য জাতি। কিন্তু এখন ডিএনএ পরীক্ষা দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমরা সবাই প্রায় নানা ভাবে মিশ্র জাতি। ডিএনএ'র মধ্যে ওই মিশ্রণের পরিচয়

পাওয়ার আগে পর্যন্ত তা সহজে বোঝা যায়নি, বা কেউ কেউ বুঝতে চায়নি। অবিমিশ্র গোষ্ঠি বা জাতি বলে কিছুর অস্থিত্ব মানব সমাজে খুব একটা নাই।

মানব জেনোম এখন খোলা বইঃ

গত কয়েক দশকে ডিএনএ বিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত বড় সাফল্য হলো এখন মানুষের আগাগোড়া ডিএনএ পড়ে নেয়া সম্ভব হয়েছে, এবং তাতে সবগুলো জিন চিহ্নিত করা গিয়েছে। কোন্ জিন কোন্ বৈশিষ্টের বার্তা দেয় এবং তার মিউট্যাশনগুলোতে কী কী হয় তার উদ্ঘাটনের কাজটি অবশ্য শেষ হয়নি। যে কোন জীবের জিন-সমগ্রকে বলা হয় জেনোম। গড়পড়তা মানুষের জেনোম তাই এখন আমাদের সামনেই রয়েছে। সব মানুষের মূল জেনোম মোটা দাগে একই, একের সঙ্গে অন্যের অমিল খুবই কম; যেটুকু অমিল তা খুব সূক্ষ্ম পর্যায়ে। এটি প্রমাণিত হয়েছে মানব জেনোমের প্রথম উদ্ঘাটনের পর এ পর্যন্ত নানা দেশের, নানান জাতি গোষ্ঠির, নানা পরিবেশের, অনেক মানুষের জেনোম আলাদা ভাবে পড়ে গিয়ে সেগুলোর পরস্পরের তুলনা করে। এর থেকে একটি জিনিস বোঝা গেছে যে বিশেষ বৈশিষ্ট সমূহের প্রকাশকারী জিনের দিক থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠির মানুষের মধ্যে যেটুকু সাধারণ অমিল, তার চেয়ে অনেক বেশি অমিল রয়েছে একই গোষ্ঠির ভেতরেই নানা মানুষের মধ্যে। বৈশিষ্ট সৃষ্টিতে খুব বেশি গুরুত্ব না থাকলেও অবশ্য ওই সব জিনের কোন কোনটাতে বিশেষ গোষ্ঠির এমন কিছু মার্কার বা চিহ্ন থাকে যার থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে তার জিন প্রবাহে কোন বিশেষ জাতি-গোষ্ঠির জিন ঢুকেছে কিনা, ঢুকলে কত বেশি পরিমাণে ঢুকেছে। তার বংশধারায় ওই গোষ্ঠির মানুষের উপস্থিতির সংখ্যা থেকেই সেই পরিমাণটি নির্ভর করে– অর্থাৎ তার পূর্বসূরিদের মধ্যে বাবা, মা, তাদের বাবা, মা তাদের বাবা, মা এই ভাবে কতবার কতজন ওই গোষ্ঠির ছিল তার ওপর।

একটি চমকপ্রদ ব্যাপার হলো অনেক ক্ষেত্রে ওই পূর্বসূরিদের মধ্যে বাবা হিসেবে থাকা এবং মা হিসেবে থাকা এই দুয়ের ক্ষেত্রে মার্কারে সামান্য প্রভেদ থাকে। এর ফলে বোঝা যায় বংশগতিতে বিভিন্ন প্রজন্মে ওই গোষ্ঠি থেকে স্ত্রী নেবার ফলে বেশি মার্কার এসেছে, না স্বামী নেবার ফলে বেশি মার্কার এসেছে। যেমন একটি গোষ্ঠির শুধু পুরুষরাই যদি অধিক সংখ্যায় অভিবাসী হয় তা হলে অভিবাসনের দেশের মানুষের জিন প্রবাহে এই নতুন গোষ্ঠির মার্কার স্বামীদের থেকেই বেশি আসবে। এর থেকে গত কয়েক বছরে কিছু হৃদয় বিদারক তথ্যও বের হয়ে এসেছে। আমেরিকায়, বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবীয়

অঞ্চলে, ইউরোপীয় বংশোদ্ভুত সাদা মানুষের অনেকের জিন প্রবাহে আফ্রিকান জাতিগোষ্ঠির প্রচুর জিন মিশ্রণ রয়েছে এবং তা যতটা না পুরুষ জিন তার ১০-১৫ গুণ বেশি নারী জিন। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে অন্তত ওই অঞ্চলের দাস প্রথায় আফ্রিকা থেকে ধরে আনা স্ত্রী দাসদের গর্ভে জন্ম নেয়া সাদা মানুষের সংখ্যা বিপুল ছিল; কিন্তু তার উল্টোটি হবার সম্ভবনা ছিলনা বল্‌লেই চলে।

এই মার্কার একেবারে বড় দাগের জাতিসত্ত্বা যেমন মোঙ্গলীয়, অস্ট্রেলীয়, ককেশীয়, আফ্রিকান, এমন বড় বড় বিভাজনের ক্ষেত্রে হতে পারে, তেমনি তার কোন একটিতে আরো ছোট বিভাজনের ক্ষেত্রেও হতে পারে। আবার এই গোষ্ঠিগুলো যেহেতু সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ হিসেবে আদিতে এক একটি অঞ্চলে বহু বহু প্রজন্ম কাটিয়েছে এবং ওখানেই ওই মার্কারগুলো মূলত গড়ে ওঠেছে, তাই সেই মার্কার থেকে মানুষের আদি অঞ্চলটিও বোঝা যায় অর্থাৎ তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে ওই অঞ্চল থেকে আসা মানুষের সংখ্যা কী রকম তা বোঝা যায়। এভাবে জিন মার্কার থেকে অতীত অভিবাসনের ইতিহাস স্পষ্ট করা সম্ভব হয়। কোন একজনের ডিএনএ পরীক্ষা করে তার মধ্যে কোন্ গোষ্ঠির জিনের উপস্থিতি কত ভাগ তা বল্‌তে গেলে সব কিছু খুব সুনির্দিষ্ট করা অনেক সময় যায়না। কিন্তু বহু মানুষের ডিএনএ পরীক্ষায় এর গড়পড়তা নির্ণয়টি যথেষ্ট নির্ভুল হয়ে থাকে। অতীত অভিবাসন সম্পর্কে অনেক বিতর্কের সমাধান এভাবেই হতে পেরেছে। উদাহরণ স্বরূপ এক সময় মনে করা হতো যে প্রশান্ত মহাসগরের মাঝখানে অনেক দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা দ্বীপপুঞ্জগুলোর আদি মানুষরা অপেক্ষাকৃত নিকট অতীতে এসেছে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। সমুদ্র স্রোতে ভেলায় বা নৌকায় ভেসে আসার সুযোগ ওদিক থেকেই বেশি বলে এমনটি মনে করা হতো। কিন্তু পরে ওই দ্বীপুঞ্জগুলোর বর্তমান মানুষদের মধ্যে, এবং কাছাকাছি অন্যান্য দ্বীপের এবং মহাদেশের মানুষদের ডিএনএতে, মার্কারগুলোর তুলনা করে দেখা গেছে চীনের উপকূলের কাছে তাইওয়ান অঞ্চলের মানুষের মার্কারগুলোই ওদিকের দ্বীপগুলো– ফিলিপাইন, নিউগিনি ইত্যাদির মানুষের মধ্যে এবং শেষ পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোর মানুষের মধ্যে রয়েছে। এতে বোঝা গেছে যে ওখানকার মুল অধিবাসীরা তাইওয়ান অঞ্চল থেকে এসেছে। আবার যে ভাবে মার্কারগুলো ওদিকে ক্রমে ক্রমে কমে গিয়েছে তা দেখে অভিবাসনের পথটিও ঠিক বোঝা গেছে।

ওপরের বর্ণনায় মনে হতে পারে যে এরকম জিন মিশ্রণ বা অভিবাসন বোঝার জন্য মার্কার পেতে ডিএনএ এর মধ্যে সব সময় জিনের সূক্ষ্ম অমিলের ওপর

নির্ভর করতে হয়। তা কিন্তু নয়। কারণ ডিএনএতে জিনগুলো যতখানি জায়গা দখল করে আছে তার চেয়ে অনেক বেশি জায়গা দখল করে আছে কোন বৈশিষ্ট ইত্যাদির বার্তা বহন না করা দীর্ঘ সব অকেজো ডিএনএ; অকেজো বলে যাকে জাংক ডিএনএ অর্থাৎ ফেলনাও বলা হয়। ডিএনএ'র মধ্যে এগুলো আদৌ কেন আছে তা স্পষ্ট নয়। তবে এর কোন কোন অংশ কিন্তু বিশেষ গোষ্ঠিকে চিহ্নিত করার মার্কার হিসেবে বেশ কাজে লেগে যায়। কাজেই মার্কার দিয়ে চিনতে হলে জিনের মধ্যে অর্থাৎ জীবন-বৈশিষ্টের মধ্যে সূক্ষ্ম কোন পরিবর্তন থাকতে হবে এমনো কোন কথা নেই। এরকম বার্তাবিহীন ডিএনএ সব চেয়ে যেগুলো চিহ্নিত করতে কাজে লাগে তা আদৌ মূল ডিএনএ'র সঙ্গে কোষের নিউক্লিয়াসে (কোষ কেন্দ্রে) থাকেনা, এটি থাকে কোষের ভেতর মাইটোকোন্ড্রিয়া নামের খুব ছোট ছোট অংশে। এজন্য এদের বলা হয় মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ। চিহ্নিত করার কাজে এর দুটি বড় সুবিধা আছে। এক, এতে প্রায় সুনির্দিষ্ট কয়েক প্রজন্ম পর পর দু'একটি মিউট্যাশন সৃষ্টি হয়, ফলে আজকের দু'জন মানুষের এই মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএতে একই মিউট্যাশন দেখে, এবং কতটি ভিন্ন মিউট্যাশন আছে তা গুণে, এই দু'জনের মা কত প্রজন্ম আগের একই অভিন্ন নারীর বংশধর তা জানা যায়। এভাবে শুধু গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে বংশগত সম্পর্ক আছে কিনা তাই বোঝা যায়না, এই সম্পর্কটি কতদিন আগের তাও বোঝা যায়। দুই, শুধু মায়ের দিকের সম্পর্কের কথা বলা হলো যে কারণে তা হলো এই মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ শুধু মায়ের থেকেই সন্তানের মধ্যে যেতে পারে, বাবার থেকে পারেনা। এতে বিরাট সুবিধা হলো বাবা-মায়ের ডিএনএ কার থেকে কোন্‌টি পাওয়া তা না জানার ফলে সেগুলোর ধারাবাহিকতায় যে অনিশ্চয়তা থাকে, এখানে শুধু মাতৃধারায় প্রবাহ চলে বলে সেই অনিশ্চয়তাও থাকেনা। কাজেই অভিবাসন ইত্যাদির খবর পেতে খুব সুবিধা হয়। সাধারণত একটি জায়গায় আজকের প্রায় সব মানুষের মধ্যে একই মিউট্যাশন দেখলে বোঝা যায় যে ওই জায়গার সব মানুষ কাছাকাছি সময়ের মধ্যে বংশগত ভাবে সম্পর্কিত। এই একই মিউট্যাশন যদি দূরের অন্য একটি জায়গায় যথেষ্ট দেখা যায় তা হলে বুঝতে হবে প্রথম জায়গা থেকে কেউ কেউ দ্বিতীয় জায়গায় অভিবাসী হয়েছিলো, তাই তাদের বংশধরদের মধ্যে আজ ওগুলো দেখা যাচ্ছে। যদি দেখা যায় এক হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় জায়গার ওই মানুষদের বেশির ভাগের মধ্যে তিনটি নতুন মিউট্যাশন দেখা যাচ্ছে, আর মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএতে মিউট্যাশন জমার নির্ণিত হার অনুযায়ী এক হাজার বছরে তিনটি নতুন মিউট্যাশন হবার কথা,

তাহলে আরো বোঝা যায় যে প্রায় এক হাজার বছর আগে ওই অভিবাসন ঘটছিলো। এভাবেই মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএর মিল-অমিলগুলো লক্ষ্য করে বোঝা গেছে যে তাইওয়ানের কিছু মানুষ ফিলিপাইন, নিউগিনি, মারিয়ানা এসব হয়ে প্রশান্ত মহাশাগরীয় দ্বীপ ফিজি, ভানুয়াতু, সামোয়া, তাহিতি, টঙ্গা, হাওয়াই ইত্যাদিতে এসেছে। এও জানা গেছে তাইওয়ান থেকে ৪ হাজার বছর আগে রওয়ানা হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতে এ মানুষ গেছে গত তিন হাজার বছরের মধ্যে, কোথাও কোথাও মাত্র ৫-৭ শত বছর আগে। কয়েকটি মিউট্যাশনের দিক থেকে এ মানুষদের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার মানুষের মিল আছে। কিন্তু দেখা যায় সেক্ষেত্রে দক্ষিণ আমেরিকার মানুষ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এ মানুষদের যে সাধারণ পূর্বসূরি তারা অনেক প্রাচীন– অন্তত ১০ হাজার বছর আগের। এটি স্বাভাবিক, কারণ তাইওয়ান প্রভৃতি থেকে যাওয়া উত্তর পূর্ব এশিয়ার কিছু মানুষ তখন সংযুক্ত বেরিং অঞ্চল ও আলাস্কা হয়ে ১২-১৪ হাজার বছর আগে আমেরিকা গিয়ে পরে দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছেছিল। সেই হিসেবে ওরাও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোর মানুষের অনেক প্রাচীনতর পূর্বপুরুষ।

জীবন-ধারার প্রবাহ

শিক্ষকের কাছ থেকে ছাত্রেঃ

জিনের প্রবাহ ঘটে মা-বাবার থেকে সন্তানে; জীবন-বৈশিষ্টের এবং আমাদের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার অনেকখানি সেই প্রবাহই বহন করে আনে। কিন্তু তার বাইরে যে কোন মানুষ থেকে অন্য যে কোন মানুষে আরেকটি প্রবাহ চলে আসছে– সেটিকে বলা যায় শিক্ষক থেকে ছাত্রের কাছে প্রবাহ; অনুকরণের মাধ্যমে, শেখার মাধ্যমে যেটি আমরা লাভ করি। যেহেতু এটি জিনের প্রবাহ নয় তাই শিক্ষককে পূর্বপুরুষ হতে হয়না, বা বংশগত ভাবে সম্পর্কিতও হতে হয়না। এটি প্রবাহিত হয় বাইরের তথ্যের মাধ্যমে– এক মস্তিষ্ক থেকে গিয়ে যা অন্য মস্তিষ্কে ভর করে। শিক্ষক-ছাত্র বলতে মনে হতে পারে যে উভয়ে সামনা সামনি বসে একজন আরেকজনকে শিক্ষা দিলেই ব্যাপারটি ঘটে। কিন্তু সেটি মোটেই নয়। মনে করি আমি এরিস্টোটলের এইসথেটিক্স (নন্দন তত্ত্ব) নামের বইটি পড়ে তাঁর কাছে সৌন্দর্যের কী অর্থ, দৈর্ঘ-প্রস্থ কী অনুপাতে থাকলে একটি ছবি মনোমুগ্ধকর হয় ইত্যাদি জানার চেষ্টা করছি। এখানে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কালের ব্যবধান প্রায় আড়াই হাজার বছর এবং স্থানের ব্যবধান প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কিলোমিটার (এথেন্স থেকে ঢাকার দূরত্ব); তারপরও নন্দন তাত্ত্বিক

জীবন-ধারার প্রবাহে বিঘ্ন ঘট্‌ছেনা। এ প্রবাহের মাধ্যম হয়েছে লিপি, বই। এমনি ভাবে তথ্য প্রবাহের নানা মাধ্যম আদিতেও ছিল, ক্রমে ক্রমে তাদের সংখ্যা আর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জিনের প্রবাহের মিশ্রণের মত এখানেও স্রোতের মিশ্রণ আছে। এরিস্টোটলের নন্দন তত্ত্ব পড়ার পর আমি যদি চীনের মধ্য যুগের কোন লেখকের বা আধুনিক ভারতীয় কোন লেখকের নন্দন তত্ত্ব সম্পর্কে বই পড়ি, তা হলে এ সম্পর্কে আমার জ্ঞানের মধ্যে নানা স্রোতের মিশ্রণ ঘট্‌বে।

সুদূর অতীত থেকে জীবন-জীবিকার অনেক কিছু এভাবে মানুষ অন্যের কাছে শেখার মাধ্যমে নিজের জীবনে আনতে পেরেছে। হয়তো সব থেকে বেশি যা ঘটেছে তা হলো পরিবারের বা সমাজের অন্যদের থেকে দেখে দেখে তা অনুকরণ করেছে; এই প্রক্রিয়াতেই একটু একটু করে তা পরিবর্তিতও হয়েছে– কারো কারো সৃজনশীলতার কারণে। এভাবে একজন কোথাও পরীক্ষা নিরিক্ষার মধ্য দিয়ে বা ভাগ্যক্রমে আগুন জ্বালাতে শিখেছিলো সেখান থেকে গুহাবাসী অন্যরাও শিখেছে– এক সময় এটি সব মানুষের জীবনযাত্রাকে একেবারে বদলে দিয়েছে। তবে একজন থেকেই পর পর অনেক জন শিখেছে তা নাও হতে পারে। বিভিন্ন জায়গায় হয়তো পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন জনই এই বিদ্যাটি নিজে অর্জন করতে পেরেছিলো, তাদের প্রত্যেকের থেকে অনেক শিখেছে।

এমনটি ঘটেছিলো কৃষি প্রচলনের ক্ষেত্রে। হাজার দশেক আগে পৃথিবীর প্রথম কৃষি ও পশুপালন আয়ত্ত্ব করেছিলো মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ– বিশেষ করে ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, জর্দান, তুরস্কের পরস্পর সংলগ্ন একটু একটু অংশ মিলিয়ে মানচিত্রে ধনুকের মত বাঁকানো কিছু জায়গা জুড়ে। এজন্য এই জায়গাটিকে বলা হয় উর্বর বাঁকা চাঁদ। এখানকার মানুষ বহু সময় ধরে নিজেদের শিকার আর সংগ্রহের জীবিকার মধ্যে একটু একটু করে পরিবর্তন এনেছিলো বন্য ফসল আর বন্য পশুর মধ্য থেকে সুবিধামতগুলো বাছাই করে, নিজের তত্ত্বাবধানে এনে পোষ মানানোর মধ্য দিয়ে। সেটিই ছিল প্রথম কৃষি। উর্বর বাঁকা চাঁদের এই জায়গাতে গম আর বার্লিকে কৃষিতে আনা সম্ভব হয়েছিলো, আর গৃহপালিত করা গিয়েছিল কুকুর, ছাগল আর গরুকে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য জায়গায় ইরান, আফগানিস্তানের কাছেও কৃষি চলে এসেছিলো; কিন্তু সব জায়গায় যায়নি, অন্যত্র আগের মতই শিকার আর সংগ্রহ করেই দিন চলেছে মানুষের। এর পর বিভিন্ন সময়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কৃষি উদ্ভাবন করেছিলো অন্য কয়েকটি জায়গার মানুষ। পূর্ব চীনে ধান এবং শূকর; নিউগিণিতে কচু, কলা, আখ আর ইয়াম; মেক্সিকোতে ভুট্টা, শিম, কুমড়া, উত্তর

আমেরিকাতে মিষ্টি কুমড়া; পেরুতে আলু এবং ছোট উট লামা: ব্যাস এই ক'টাই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এদের দেখাদেখি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ কৃষি শিখেছিলো এবং সম্ভব মত সেখানে যে সব বন্য শস্যকে ও সব্জীকে পারা গেছে সেগুলোকে কৃষিতে আর যেখানে যে সব বন্য পশু ও পাখিকে পারা গেছে সেগুলোকে গৃহ পালিত প্রাণীতে পরিণত করেছে।

জীবনযাত্রার এরকম বহু কৌশল, বহু অভ্যাস, এমনকি বহু ফ্যাশন মানুষ এক এক জায়গায় শুরু করেছে আর তাদের দেখাদেখি অন্যরা শিখে এটি অন্যত্রও ছড়িয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনটি পরিবর্তিত হয়েছে, আবার কোনটি বহুকাল অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। এক জায়গার মানুষ অন্য জায়গায় গিয়ে তা শিখেছে; অভিবাসন তাই জীবন-ধারাকে ছড়াতে সাহায্য করেছে; অনেক সময় অভিবাসী না হয়েও শুধু পর্যটন অথবা বাণিজ্যের মাধ্যমেও তা প্রবাহিত হয়েছে। ইউরোপীয়রা যখন আমেরিকা আবিষ্কার করে তখন সেখানকার মানুষকে পাইপের মাধ্যমে ধূমপান করতে দেখে, এবং নিজেরাও ধুমপান করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ওখান থেকে তামাক ইউরোপে নিয়ে যায়। আর সেখানকার মানুষকেও ধূমপানে অভ্যস্ত করে তোলে। পরে এটি পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে বিভিন্ন সময়ে ধূমপানের নানা ভঙ্গি পৃথিবীর এক একটি অঞ্চলে এক এক ভাবে অভ্যাস ও ফ্যাশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে– কোথাও পাইপ, কোথাও চুরুট, কোথাও সিগারেট, কোথাও হুক্কার মাধ্যমে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে এসে এ সম্পর্কে তথ্য বিস্তারের বিষয়ে যদি আসি এক সময় দেখতে পাই একে এর ফ্যাশন বিস্তৃত হবার পেছনে কাজ করছে সাহিত্য, নাটক, সিনেমা, বিজ্ঞাপনে এর নানা গরিমাকে তুলে ধরার মাধ্যমে। ওর মধ্যেই আবার ধূমপানের বৈচিত্রের মাধ্যমে কখনো বার্তা এসেছে শ্রেণী বিভাজনের, কখনো নারী স্বাধীনতা ইত্যাদির। তারপর এক সময় স্বাস্থ্যগত কারণে পুরো ব্যাপারটিই উল্টো হয়ে গেলো; আগের বার্তাগুলো উধাও হয়ে গিয়ে নতুন বার্তা এলো এমনকি তার নিজের প্যাকেটেও লিখে দিতে হলো যে ধূমপান বিপজ্জনক। বিজ্ঞানের ল্যাবোরেটরিতে যা আবিষ্কার হলো তার সবকটি সারা দুনিয়ার মানুষকে আস্তে আস্তে নূতন করে শিখতে হলো, অভ্যাস পাল্টাতে হলো।

কাজেই জীবন-ধারার প্রবাহও একই স্রোতে সব সময় চলেনা, কখনো আঁকাবাঁকা পথে চল্‌তে হয়, কখনো উল্‌টো পথেও চলতে হয়। এই স্রোত ওই জিন প্রবাহের মত নানা শখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়। জীবনের সবকিছুকে ঘিরেই এগুলো সৃষ্টি

হয়– বাসস্থান, খাবারদাবার, কাপড়চোপড়, অলঙ্কার, ব্যবহার্য আসবাব, হাতিয়ার ও কলাকৌশল, বিনোদন, উৎসব সবই। বাঁচার মত বাঁচার জন্য যে আয়োজন- যাকে আমরা এক কথায় সংস্কৃতি বলি তার সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের শিকড় আমাদের জন্য এই সংস্কৃতির রসও আহরণ করে গেছে এবং যাচ্ছে।

জিনের সঙ্গে মিমের তুলনাঃ

আধুনিক ডিএনএ বিজ্ঞান, যার পোষাকী নাম হলো অণু-জীববিজ্ঞান, এতই উন্নত হয়েছে যে এখন জিন, জিনের প্রবাহ, জিনের মিউট্যাশন ইত্যাদি একেবারে সূক্ষ্ম ভাবে জানার এবং ব্যাখ্যা করার নিখুঁত বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। সে তুলনায় অন্য যে প্রবাহটির কথা আমরা বল্‌লাম সেই জীবন ধারাকে এখনো পুরাপুরি বিজ্ঞানের মত করে ব্যাখ্যা করার মত অবস্থা আসেনি; এটি এখনো অনেকের কাছে সমাজ বিজ্ঞানের অন্তর্গত হয়ে রয়েছে – ইতিহাস, সংস্কৃতি ইত্যাদির বিশ্লেষণ করার সমাজবিজ্ঞান। সেখানে বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তত্ত্ব দাঁড় করানো যায় বটে, কিন্তু তাকে সূক্ষ্ম বস্তুনিষ্ঠ পরিমাপের মাধ্যমে প্রমাণ করা, বা সেই ভাবে তত্ত্বের নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। তবে ক্রমাগত এই ধারারও কিছু কিছু মৌলিক জিনিস জীব বিবর্তনের নিয়মে জীবন সংগ্রামে বাঁচার ক্ষেত্রে কোন না কোন সুবিধা পেয়েছিলো বলেই সমগ্র মানব প্রজাতিতে বিস্তৃত হয়েছে– এ কথা স্বীকৃত হচ্ছে। যেমন সঙ্গীত, ছন্দ, ভাষার কারুকার্য, নাচ, নান্দনিকতা ইত্যাদি সংস্কৃতির অনেক বিষয় সম্পর্কে একথা মানা হয়, যেহেতু এর সবই সব দেশের সব সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত ভাবে রয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে, যার মানে জিন বৈশিষ্টই একে ঠিক করে দিচ্ছে। সেই হিসেবে জিন প্রবাহের মূলধারার সঙ্গেই এগুলো এসেছে ধরে নেয়া যায়। এখানে জিন প্রবাহ এবং জীবন-ধারার প্রবাহ উভয়েই পরস্পরের সঙ্গে মাখামাখি করে আছে বলা যায়।

কিন্তু তা হলেও এর সব কিছুতে বৈচিত্র আছে– নানা সংস্কৃতিতে নানা রকম, সবার সঙ্গীত, শিল্প, নান্দনিকতা এক রকম নয়; জীবন যাপনে অন্যান্য ভাল লাগাগুলোও এক রকম নয়। জীবন-ধারার প্রবাহে আমরা সেই বৈচিত্রগুলোকেই খুঁজি। বিখ্যাত অণু-জীববিজ্ঞানী এবং সুলেখক রিচার্ড ডকিন্স নানা সংস্কৃতির প্রবাহকে অনেকটা জিন প্রবাহের আদলে আনার চেষ্টাতে একে একটু ভিন্নভাবে দেখার একটি প্রস্তাব করেছেন– যা পরে অনেকের মনোযোগ ও চর্চার বিষয় হয়েছে। জেনেটিক্স বা জিন বিজ্ঞানের অনুসরণে তিনি এ চর্চার নাম দিয়েছেন

মেমেটিক্স বা মিম বিজ্ঞান। এর কারণ জিন যে রকম এক একটি মানব-বৈশিষ্টের কোড বা বার্তা বহন করে তেমনি তিনি জীবন-ধারার এক একটি ছোট বৈশিষ্টকে বহন করছে, এমন একটি বার্তার কথা ভেবে তার নাম দিয়েছিলেন মিম– সবই ওই জিনের অনুকরণে। উদাহরণ স্বরূপ একটি জনপ্রিয় পুরো গান যেমন একটি মিম হতে পারে, আসলে বেশি জনপ্রিয় তার দুটি লাইনও একটি মিম হতে পারে, অথবা তার মূল সুরটি। এমনি ভাবে কোন কবিতা, কবিতার লাইন, কোন ভিডিও, নাটকের কোন সংলাপ, কোন বিশেষ খাবার, কোন ফ্যাশন ইত্যাদির যে কোনটি একটি মিমের দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে। মিম কথাটি তিনি নিয়েছিলেন গ্রীক শব্দ মিমেমা থেকে যার মানে হলো অনুকরণ করা জিনিস। জিন বাবা-মা থেকে সন্তানের মধ্যে যায় প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। মিম এক মানুষ থেকে অন্য মানুষের কাছে যায় অনুকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। আসলে এটি একজনের মস্তিষ্ক থেকে অন্য জনের মস্তিষ্কে যায়। জনপ্রিয় গানের কলিটি একজন মানুষের মস্তিষ্কে যেভাবে হিল্লোল জাগায় তার আনন্দ-উচ্ছাস দেখে এবং অনুকরণ করেই এটি অন্য জনের মস্তিষ্কেও একই রকম হিল্লোল জাগাতে পারে। প্রথম জন এটি গেয়ে যেরকম আনন্দ পায়, দ্বিতীয় জনও পায়। এভাবেই জনে জনে এই মিমটির একটি প্রবাহ সৃষ্টি হয়– অর্থাৎ গানটি জনপ্রিয় হয়। জিন যে রকম প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে যেতে পারে, মিমও তা পারে নানা প্রজন্মের, নানা কালের মানুষের মধ্যে চলে গিয়ে। অভিবাসীরা যেমন নতুন দেশে গিয়ে সেখানে জিন-মিশ্রণ ঘটাতে পারে তারা সেভাবে মিম-মিশ্রণও ঘাটাতে পারে। তবে জেনেটিক্সের সঙ্গে মেমেটিক্সের মিলটি এখানেই শেষ নয়।

জিনের মধ্যে যেমন দৈবাৎ পরিবর্তন ঘটে এবং এই মিউট্যাশনের ফলে জিনের প্রকাশিত বৈশিষ্টে পরিবর্তন দেখা দেয়, মিমের ক্ষেত্রেও তা ঘটতে পারে। যেমন কোন পর্যায়ে কারো কাছে গিয়ে গানটি একটি ভিন্ন সুরেও গাওয়া হতে পারে। তখন জিনের দুটি ভিন্ন রূপ থাকার মত মিমটিরও দুটি বা ততোধিক ভিন্ন রূপ থাকবে। জীব বিবর্তনে কোন বিশেষ সুবিধা পাওয়ার কারণে যেমন জিনের একাধিক রূপের মধ্যে একটি অগ্রাধিকার পেয়ে পরবর্তী বংশধরদের কাছে বেশি যেতে পারে, তেমনি মিমের একটি রূপ কোন সুবিধার কারণে বেশি জনপ্রিয় হয়ে বেশি মানুষের মধ্যে অনুকৃত হতে পারে। একের মস্তিষ্কে বেশি হিল্লোল জাগিয়ে অন্যের মস্তিষ্কেও তা বেশি যাওয়ার ফলে এটি ঘটে। জনসংখ্যায় বেশি ছড়িয়ে পড়ার ফলে জিনের কোন রূপ যেমন সেই জনসংখ্যায় স্বাভাবিক রূপ হয়ে দাঁড়ায় – যেমন নীল চোখ হওয়া, তেমনি বেশি জনপ্রিয় মিমটিই শেষ পর্যন্ত টিকে

থাকতে পারে– যেমন গানটি গাওয়ার সেই বেশি অনুকৃত সুরটি। এভাবেই সংস্কৃতির এক একটি দিক কোন জনগোষ্ঠির মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, মিমের প্রবাহের মাধ্যমে। অনেকেই মনে করেন জীবন-ধারার প্রবাহকে এভাবে মিমের প্রবাহ হিসেবে দেখলে একে বুঝতে সুবিধা হয়; এবং এর আলোচনায় একটি বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা আসে। তবে মনে রাখতে হবে জিনের প্রবাহের বিষয়টি একেবারেই প্রতিষ্ঠিত একটি বিজ্ঞান; মিমের প্রবাহটি একটি ধারণা মাত্র , জীবন-ধারার প্রবাহকে দেখার একটি নতুন ভঙ্গি মাত্র।

সংস্কৃতির মার্কার:

যখন জিন প্রযুক্তি ব্যবহারের কোন সুযোগ ছিলনা, তখন অতীতের জীবন-ধারা সম্পর্কে সব খবরের জন্য শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ওপর নির্ভর করতে হতো। অতীতের মানুষদের জীবনযাত্রা থেকেই সে রকম অনেক নিদর্শন সৃষ্টি হতো। ডিএনএর মধ্যে যে রকম বিশেষ মার্কার বা চিহ্ন বা প্যাটার্ন থেকে বিশেষ কোন গোষ্ঠির সঙ্গে কোন মানুষের সম্পর্ক বোঝা যায়, তেমনি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ওপরও এক একটি গোষ্ঠির তার সংস্কৃতির কোন না কোন ছাপ থাকে, যার থেকে ওখানে ওই গোষ্ঠির মানুষের এক সময়ের উপস্থিতি বোঝা যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বিভিন্ন পর্যায়ের পোষাক, আসবাব, প্রযুক্তি- সামগ্রী, ব্যবহার্য তৈজস ইত্যাদি দেখে আমরা বুঝতে পারি এগুলো কোন্ দশকের, কোন্ শতকের, কোন্ গোষ্ঠির ইত্যাদি। যেমন একটি ছবিতে টেলিফোনের চেহারা দেখলেই বুঝতে পারি ছবিটা কখন তোলা, এই টেলিফোনে কি কোন ডায়াল করার অংশ আছে, ঘুরিয়ে করার ডায়াল, নাকি বোতাম টিপে ডায়াল, ইত্যাদি । এটি সুদূর অতীতের জন্যও প্রযোজ্য, যেমন আমাদের মত মানুষের অনেক আগেই উদ্ভব হয়ে এক সময় উভয়ে একই জায়গায় বসেও করেছে এমন অন্য প্রজাতির মানুষ নিয়ানডার্থালদের বিষয়ে আমরা জেনেছি। তাদেরও আগে প্রায় বিশ লক্ষ বছর ধরে বাস করেছে ইরেকটাস নামের অন্য এক প্রজাতির মানুষ। তখন থেকে শুরু করে আমাদের মত মানুষের দীর্ঘ আদিকালে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছিল পাথরের নানা হাতিয়ার– পাথরের ওপর পাথর ঠুকে ঠুকে একে ধারালো, মসৃণ, সূঁচালো, হাতে ধরার উপযুক্ত ইত্যাদির করার মাধ্যমে ব্যবহরোপযোগী করেই তৈরি হতো এসব হাতিয়ার। পাথরের তৈরি হওয়াতে আজ অবধি এত লক্ষ লক্ষ বছর পরেও সেগুলো অবিকৃত পাওয়া যায়।

সাধারণ ভাবে এক নজর দেখলে হয়তো নানা কালের নানা রকম মানুষের এসব হাতিয়ারের অনেকগুলোকে নেহাৎ মামুলি ও স্থূল মনে হতে পারে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা ভাল করে দেখলে বুঝতেই পারেন এগুলো ঠিক কাদের তৈরি– কারণ এই মামুলি হাতিয়ারের মধ্যেই এমন কিছু ভঙ্গি আছে, বৈশিষ্ট আছে যাতে ওই প্রজাতির ওই গোষ্ঠির একটি ছাপ তাতে পড়ে। তাই অন্যভাবে এদের বয়স জানার আগেই এর নির্মাতাদের সম্পর্কে অন্য কিছু যদি জানা নাও থাকে, তবুও মোটা দাগে বোঝা যায় এগুলো কখন কারা তৈরি করছে। বিশেষজ্ঞরা এ সম্পর্কে এতই নিশ্চিত যে তাঁরা এক এক রকম এই বৈশিষ্টপূর্ণ হাতিয়ারকে এক একটি নামও দিয়েছেন। যেমন বহু ইরেকটাসের হাতিয়ারের সমাবেশ যেখানে দেখেছেন তাকে বলেছেন 'আচুলিয়ান শিল্প', নিয়ানডার্থালদের হাতিয়ার দেখলে তাকে বলেছেন 'মাউস্টেরিয়ান শিল্প', আর ইউরোপে তখন আমাদের মত যে মানুষ থাকতো তাদের হাতিয়ারকে বলেছেন 'অরিনিয়াসিন শিল্প'। প্রত্যেকটির মধ্যে এমন কিছু বিশেষত্ব রয়েছে এতকাল পর এদেরকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় কারা এগুলো তৈরি করেছিলো এরা কোন্ শিল্পের মধ্যে পড়ে। ওই বিশেষত্বকেই আমরা ডিএনএ'র ভাষা ব্যবহার করে মার্কার বলেছি।

এক সময়ের পাথরের হাতিয়ারের বৈশিষ্টকে যে ভাবে ওগুলোর নির্মাণকারীদের সনাক্ত করতে ব্যবহার করা হয়েছে বহুকাল পরের পটারি বা পোড়ামাটির হাঁড়িকুড়ি দেখে একই কাজ করা হয়েছে। পাথরের মত পটারিও বহুদিন টিকে থাকে। প্রয়োজন মত হাঁড়ির মত একটি পাত্র বানিয়ে নিলে কাজ চলে যায় বটে, তবে নির্মাণ কৌশল, ওই সমাজের পছন্দ এবং নান্দনিকতার বোধ, আগে থেকে চলে আসা ঐতিহ্যপ্রীতি সব কিছু মিলে এক এক জায়গায় থাকা এক এক গোষ্ঠির পটারির মধ্যে বিশেষ আকৃতি, ডিজাইন, চিত্রণ ইত্যাদির প্রচলন ছিল– যা শত শত বছর ধরে অব্যাহত ছিল। এই পটারি বৈশিষ্টও অভিবাসীদের সঙ্গে নতুন দেশে গেছে; অথবা অন্য মানুষরাও হুবহু এরকম অথবা কিছুটা পরিবর্তিত রূপে এই ডিজাইনটি শিখে নিয়েছে। অনেক বিশেষজ্ঞ এই পটারি চেনাতে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন ইতিহাসের অনেক তথ্য হাঁড়িকুড়ির কয়েকটি ভাঙ্গা টুকরা থেকেই তাঁরা উদ্ধার করতে পারেন। এভাবে পুরো এক একটি সভ্যতা, এক একটি সংস্কৃতিকে তার পটারির ডিজাইন দিয়ে নামকরণ করা হয়েছে, সেই সংস্কৃতির বিস্তারকে ওভাবে চেনা গেছে।

দীর্ঘ মানব ইতিহাসের তুলনায় পটারির উদ্ভাবন অবশ্য বেশিদিন আগে ঘটেনি। প্রায় ১৪ হাজার বছর আগে জাপানেই প্রথম পটারির প্রচলন হয়েছিলো এমন

প্রমাণ রয়েছে। সেই সময় থেকে শুরু করে আড়াই হাজার বছর আগের সময় পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় জাপানের পটারির ডিজাইন, তার নির্মাণ কৌশল, ও তার গায়ে চিত্রণ একই ধারা অনুসরণ করে এসেছে যাকে জামোন ধারা বলা হয়। এ সময়ের জাপানের পুরো সংস্কৃতিটাকেই বলা হয় জামোন সংস্কৃতি– প্রধানত সমুদ্র-নির্ভর শিকারি-সংগ্রাহক জীবনকে ঘিরেই সেই সংস্কৃতি; পটারি ছিল, কিন্তু কৃষি ছিলনা, যা কিনা একটি ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি। আবার কৃষি না থাকলেও ওরা বেশির ভাগ সময় স্থায়ী বসতে বাস করেছে– সমুদ্র সম্পদ ও বন সম্পদ কাছাকাছি ছিল বলে এবং পুরো জীবন-সংস্কৃতিটি তার ওপর নির্ভর করেছে বলেই সেটি সম্ভব হয়েছে। পটারিটি ছিল তার কেন্দ্রবিন্দুতে। যেই রীতিতে তারা পটারি তৈরি করতে তাকে এখনো বলা হয় জামোন রীতি; নরোম কাদাকে হাত দিয়ে বেলে লম্বা কাদার দড়ি বানিয়ে সেটিকে গোল রিং এর মত একটির ওপর একটি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হাঁড়ির আকার দেয়া হয়, পরবর্তীকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেভাবে কুমোরের চাকা দিয়ে পটারি তৈরি হয়েছে সেভাবে নয়। ওটি পোড়ার আগে কাঁচা থাকতেই তার গায়ে উদ্ভিজ আঁশের দড়ির ছাপ দিয়ে বিশেষ জামোন-চিত্রণ ফুটিয়ে তোলা হতো। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা থাকতো একে যেন উদ্ভিজ বেত, আঁশের দড়ি ইত্যাদির ঝুড়ির মত মনে হয়, পোড়ামাটির মত নয়। এটি জামোনের বৈশিষ্ট।

চীনের জিয়াহু অঞ্চলে আট হাজার বছর আগের পটারির প্রাপ্তির ব্যাপকতা লক্ষ্য করার মত। এগুলো জামোন সংস্কৃতিকে অনুসরণ করেছে কিন্তু আবার নিজস্ব বিখ্যাত জিয়াহু সংস্কৃতির ছাপও এর ওপর পড়েছে। মূল জামোনের থেকে এর ওপর চিত্রণের বৈচিত্র অনেক বেশি, এমন কিছু আঁকিবুকি যা ওখানে কচ্ছপের খোলের ওপর আঁকতে দেখা গেছে, আবার পটারির ওপর দেখা গেছে- যার দু একটি চিহ্নের সঙ্গে আজকের চীনা লিপির কিছু চিহ্ন মিলে যায়। তাদের পটারির একটি বৈশিষ্ট হলো কূজোর মত সরু গলা, কূজোর নিচে তিনটি বেঁটে পায়ার ওপর একে দাঁড় করানো, এবং গলার একটু নিচে দু পাশে দুটি ছোট হাতল।

আমরা এর আগে অভিবাসনের পথের দেশগুলোর বর্তমান মানুষের ডিএনএ পরীক্ষা করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোর আদি মানুষ যে তাইওয়ান অঞ্চল থেকে এসেছিলো সেই সিদ্ধান্তের কথা জেনেছি। কিন্তু একই সিদ্ধান্তটি আরো এক ভাবে নেয়া হয়েছিলো। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে ৪ হাজার বছর আগে তাইওয়ানে যে লাপিটা পটারি সংস্কৃতি উদ্ভূত হয়েছে তা এর শ'দুয়েক বছর পর থেকে ফিলিপাইনে, তার ৩০০ বছর পর মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জে, আরো ১৫০

বছর পর বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জ ও নিউগিণিতে, এবং তারো ৩৫০ বছরের মত পর একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে ফিজি, ভানুয়াতু এবং পরপর সামোয়াতে দেখা গেছে। এখানে স্পষ্ট বোঝা গেছে যে ৪ হাজার বছর আগে থেকে শুরু হয়ে তাইওয়ান অঞ্চলের মানুষের অভিবাসন ধীরে ধীরে দক্ষিণ ও পূর্বের নানা দ্বীপ হয়ে তাদেরকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোতে নিয়ে গিয়েছিলো। তারা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলো লাপিটা পটারি সংস্কৃতি। এভাবেই বোঝা গেছে যে আজকের প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপের মানুষরা গত ৩ হাজার বছরের মধ্যে বা কোন কোন ক্ষেত্রে আরো পরে প্রথম এখানে এসে পৌঁছেছিল। তাদের পূর্বপুরুষের আদি বাসস্থান তাইওয়ানে, তবে তারা এসেছিলো অপেক্ষাকৃত কাছে নিউগিণি, বিসমার্ক দ্বীপগুলো হয়ে।

এর সবই জানা গেছে পটারির ধরণ দেখে। লাপিটা পটারির বেশ কিছু স্পষ্ট বৈশিষ্ট আছে যা কাকতালীয় ভাবে নতুন জায়গাতে উদ্ভাবিত হবার কথা নয়। এর মধ্যে রয়েছে পোড়ার আগে হাঁড়ির ওপর একটি লাল রঙ লাগানো যা পোড়ার পর একেবারে এর অঙ্গীভূত হয়ে যায়। তা ছাড়া বাটি ও বয়োম আকৃতিতে লাপিটা পটারির একটি বৈশিষ্ট আছে। মূল লাপিটাতে তলায় বেশ উঁচু সিলিন্ডারের মত বসানোর জায়গা থাকে যা ফিলিপাইনে ও মারিয়ানায় এসে শুধু তলায় একটি বেঁটে রিং আকৃতির বসানোর জায়গায় পরিণত হয়েছে। পশুর দাঁতের বা শিল্পীর নিজের আঙ্গুলের নখের সীল দিয়ে দিয়ে এক রকম চিত্রণ এতে সৃষ্টি করা হতো – তা ছাড়া চিত্রণের জন্য চিরুণি আকারের, দাঁতের আকারের, অথবা ছোট ছোট বরফি আকারের সীল বা হাতিয়ার ব্যবহার করা হতো। এগুলোর সমন্বিত যে চিত্রণ এবং পটারির যেই যেই অংশ বেশি চোখে পড়ে সেখানে তাদের স্থাপন, লাপিটা পটারিকে অনন্য এবং সহজে সনাক্তযোগ্য করে তুলেছে।

ভাষার প্রবাহ

ভাষা প্রবাহের আলাদা বিবেচনা কেনঃ

আমরা ভাষার প্রবাহটিকে একটি আলাদা প্রবাহ হিসেবে বিবেচনা করছি কেন? জীবন-ধারার অন্যান্য দশটা জিনিস যেমন করে এক মানুষ থেকে অন্য মানুষের কাছে শিক্ষা ও অনুকরণের মাধ্যমে প্রবাহিত হয় ভাষাও সে ভাবেই হয়, তা হলে কেন তার এই পৃথক বিবেচনা? এর প্রধান কারণ হলো মানুষের আপন সত্তার সঙ্গে ভাষার যোগটি অত্যন্ত গভীর। আসলে যতকিছু মানুষকে মানুষ করে

তুলেছে তার মধ্যে ভাষার স্থানটি অতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি শুধু তার যোগাযোগের বাহন নয় বরং আপন মননেরও আধার। মানুষের চিন্তা এবং তার অন্তর্বাচনের জন্যও ভাষার প্রয়োজন। অন্য প্রাণীতে ভাষার মত যা আছে তা নেহাতই যোগাযোগের মাধ্যম, কিন্তু মানুষের মধ্যে এটি তার চেয়ে অনেক বেশি। অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে ভাষা যতখানি ঘনিষ্ঠতা এনে দিতে পারে, কোন গোষ্ঠির মধ্যে তার অন্তর্ভূক্তিকে সে একই ভাষার কারণে যতটা মর্মে অনুভব করতে পারে, অন্য কিছুতে তা নয়। এ জন্যই ভাষার প্রবাহটি আলাদা গুরুত্বের দাবীদার।

মনে করি চীনা ভাষা না জানা কোন বাংলাদেশী একা চীনের কোন গ্রামে গিয়েছেন এবং সেখানকার মানুষজন, ঘরবাড়ি, কাজকর্ম দেখে নিজের দেশের গ্রামের সঙ্গে বেশ মিল খুঁজে পাচ্ছেন, সেদিক থেকে একেবারে অদ্ভূত জায়গায় আছেন বলে মনে হচ্ছেনা। কিন্তু কারো সঙ্গে কথা না বলতে পারায় তিনি সাংঘাতিক একাকীত্বে ভুগছেন। ওসময় ধরা যাক তাঁর মতই চীনা ভাষা না জানা এক আমেরিকান পর্যটকের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। তক্ষুণি মনে হলো তাঁর সব একাকীত্ব ঘুচে গেলো, এমন ভাবে ওই পর্যটকের সঙ্গে ইংরেজীতে গল্পে মজে গেলেন এবং দু'জনে মিলে চীনা গ্রাম দেখলেন যেন উভয়ে উভয়ের কতদিনের চেনা। অথচ তিনি কোনদিন আমেরিকা যাননি, কোন আমেরিকানের সঙ্গে ওভাবে পরিচয়, বন্ধুত্ব হবার কোন সুযোগও হয়নি। কিন্তু ইংরেজীতে স্বচ্ছন্দ হবার কারণেই এই ম্যাজিকটি ঘটেছে। গবেষণার জন্য চীনে তিন বছর কাটিয়ে ওদের ভাষা ভালভাবে বলার ক্ষমতা অর্জনের পর একই ম্যাজিক সেখানেও ঘটেছে। ওখানকার সব বিষয় বোঝার এবং যে কোন আসর মাত করার ক্ষমতা তিনি পেয়ে গেছেন ওই ভাষার মধ্য দিয়েই। 'দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই' রবীন্দ্রনাথের এই কথাটি ভাষার উদ্দেশ্যে বলা যায়, কারণ ভাষার ওই ক্ষমতা আছে। আবার ভাষার বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এর উল্টোটাও করা যায়।

বৃটিশরা যখন প্রথম বাংলায় এসেছে তখন তাদের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তাতে দরকার ছিল এখানকার কেউকেটা ব্যক্তিদেরকে আপন করে নেয়া, তাই তারা বেশ কষ্ট করে ফারসি শিখেছিলো। কারণ এখানকার কেউকেটারা তখন ফারসি বল্‌তো। পরে উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হবার পর তাদের দরকার হয়েছে নিজের শাসন মজবুত করার জন্য নতুন কেউকেটা সৃষ্টি করা যাদেরকে তারা নিজেদের মত আপন করে নিতে পারবে, সেজন্য ইংরেজী শিক্ষিত একটি গোষ্ঠি তারা সৃষ্টি করে নিয়েছে। পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় ফরাসীরা এবং মধ্য ও দক্ষিণ

আমেরিকায় স্প্যানিশরা এ কাজ আরো ভাল ভাবে করেছে। তারা একটি গোষ্ঠিকে নয়, বলতে গেলে পুরো মহাদেশের বিশাল একটি অংশের পুরো জনগোষ্ঠিকে যে ভাবেই পারে আফ্রিকায় ফরাসী আর আমেরিকায় স্প্যানিশ ভাষা অন্তত বলতে রপ্ত করিয়ে দিয়েছে। ফলে উপনিবেশের দিন শেষ হয়ে যাওয়ার বহুকাল পরেও দখলকারী দেশের সঙ্গে এক রকম সাংস্কৃতিক টান রয়েই গেছে।

অন্য কিছু দেশের দিকে তাকালে বিভাজন সৃষ্টির জন্য ভাষাকে ব্যবহারের উদাহরণও দেখি। প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়ার ভেতরের দেশগুলো এখন পরস্পর ভাগ হয়ে গেছে; এটি হতে পেরেছ যুগোশ্লাভিয়া দেশটি সৃষ্টি হওয়ার বহু আগে নানা শক্তিশাালী সাম্রাজ্য ও ধর্মের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কারণে। অথচ যুগোশ্লাভিয়া ভাঙ্গা এই সব ক'টি দেশের ভাষা এক– সার্বোক্রোয়াট। কিন্তু ওর মধ্যে সার্বিয়া যেহেতু রাশিয়ার আজ্ঞাবহ ছিল, রাশিয়ার মত অর্থোডোক্স খৃষ্ঠান ধর্মেই দীক্ষিত ছিল, ওরা ভাষাটি লিখতো রাশিয়ার মতো সিরিলিক লিপিতে। ক্রোয়াশিয়া যেহেতু অস্ট্রোহাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল ও সেখানকার মানুষের মত ক্যাথোলিক ছিল, ওরা তাদের মত রোমান হরফে লিখতো। আর বসনিয়া যেহেতু অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল, খোদ তুরস্কে তখন তুর্কী ভাষাও আরবীতে লেখা হতো তাই বসনিয়ায় ওই সার্বোক্রোয়াটও আরবী ভাষায় লেখা হতো। একই কারণে তারা মুসলিমও ছিলো। একই ভাষা হয়েও লিপির কারণে ওই তিন দেশের ভাষার মধ্যে দেয়াল তুলে দেয়া সম্ভব হয়েছিলো, ওই সাম্রাজ্যগুলোর ভেদনীতির বাস্তবায়নে। ধর্মের ভিন্নতাটি কাজ করেছে, কিন্তু ভাষার বিভাজনটিও কম কাজ করেনি ওর মধ্যে।

বিশ্ব-মানুষের মৌলিক ঐক্য সত্ত্বেও এখানে সব সময় বিভিন্ন জাতিসত্তাগুলোর মধ্য পার্থক্য করা হয়েছে; এই জাতিসত্তার মোটা দাগে ভাগগুলো কখনোই মুছে ফেলা যায়নি– মোঙ্গলীয় অস্ট্রেলীয়, আফ্রিকান, ককেশীয় ইত্যাদি। এখন বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উত্থানের ফলে ভাগগুলো নেহাতই একমাত্র ইতিহাসের আলোচনায় স্থান পাওয়ার সময় এসেছে। এই ভাগগুলো এখন মূলত জিনের ভিত্তিতে। আমরা দেখবো ইতিহাসের আলোচনায় জিন ভিত্তিক ভাগে যেই যেই রকমের মূলধারা এবং শাখা-প্রশাখা ইত্যাদি রয়েছে, ঠিক তার পাশাপাশিই দাঁড় করানো যায় ভাষা ভিত্তিক মূলধারা, শাখা-প্রশাখা ইত্যাদিকে– একটি যেন অন্যটিকে একেবারে একই ভঙ্গিতে অনুকরণ করে গেছে। এতেও বোঝা যায় ভাষা প্রবাহের একটি আলাদা স্বকীয়তা আছে, যা জিন প্রবাহের কাছাকাছি গুরুত্ব রাখে।

কথোপকথনেই প্রবাহঃ

আধুনিক ভাষা তত্ত্ব অনুযায়ী ভাষার একটি অংশ সব মানুষের মস্তিষ্কে গাঁথা আছে, সেটি হলো সর্বজনীন ভাষা ব্যাকরণ যা দুনিয়ার সব ভাষার জন্য প্রযোজ্য– প্রধানত কর্তা, কর্ম, ক্রিয়ার যৌক্তিক প্রকাশ। আদি মানুষ যখন ভাষার ক্ষমতা পেয়েছে এইটুকু তখনই আমাদের জিনের বার্তায় এসে গেছে এবং তারপর বংশানুক্রমে সবার মস্তিষ্কে চলে গেছে। এই মৌলিক ব্যাকরণটুকু অক্ষুণ্ন রেখে এর পর নানা গোষ্ঠির মানুষ নিজেদের জন্য নানা ভাষা সৃষ্টি করেছে তাতে শব্দ আলাদা, বাক্য গঠনে কোন্ শব্দ আগে হবে বা পরে হবে তা আলাদা, ও ব্যাকরণের বাকি অংশ আলাদা। গোষ্ঠির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার মাধ্যমে এ সবের একই ধরণে সবাই অভ্যস্ত হয়েছে– ওটিই একটি ভাষা হয়েছে। মস্তিষ্ক শুধু বলে দিচ্ছে কোথাও একটি কর্তা থাকতে হবে, ক্রিয়া থাকতে হবে, কর্মও থাকতে পারে। কিন্তু কোন্ ধ্বনি (শব্দ) দিয়ে কোন্‌টি বোঝাবো, কী ভাবে সেগুলোকে সাজাবো তার পার্থক্য নিয়েই নানা ভাষা। সেগুলো ধীরে ধীরে বদ্‌লাতেও পারে ভাষার ওই প্রবাহের মধ্যে। বাংলার তিনটি নিজস্ব শব্দের সমন্বয়ে ওই কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া হতে পারে আমি ভাত খাই। ইংরেজিতে অন্য তিনটি শব্দ দিয়ে একই কথাকে আমি খাই ভাত। ওই তিনটি সাজানো আরো চার রকমে হতে পারে। তবে অধিকাংশ ভাষায় ওপরের দুই রকমই হয়। ভাষার মধ্যে এই সব কিছু ধীরে ধীরে বদলাতে পারে– শব্দ বদলায়, নতুন শব্দ আসে, শব্দের অর্থ বদলায়, শব্দের সাজানোর ক্রম বদলায়, আরো সূক্ষ্ম কিছু কিছু ভঙ্গি বদলায়, সবই কিন্তু একজনের সঙ্গে অন্য জনের কথোপকথনের মধ্যেই বদলায়। ভাষার প্রবাহ এভাবে একজন থেকে অন্যজনে যায়, বদলানোটাও ওখানেই।

শব্দকে কেউ কেউ জিনের সঙ্গে তুলনা করতে ভালবাসেন, আর ভাষা বিবর্তনকে জীব বিবর্তনের সঙ্গে। অধিকাংশ জিন যেমন বহু যুগের ওপার থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্মের ভেতর দিয়ে আমাদের কাছে এসেছে, বহু শব্দও সে রকম প্রাচীন কাল থেকে মানুষের মুখে মুখে হুবহু এক থেকে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু জিনের যেমন হঠাৎ হঠাৎ মিউট্যাশন হয়, শব্দেরও পরিবর্তন হয়, তাছাড়া নতুন শব্দও ঢুকে পড়ে প্রবাহের মধ্যে। মিউট্যাশন হওয়া জিন টিকতে পারে জীব বিবর্তনের নিয়মে বেঁচে থাকার সংগ্রামে তার কোন সুবিধা থাকলে। নইলে মিউট্যাশন স্থায়ী হয়না– অধিকাংশ মিউট্যাশনের সেটিই পরিণতি। বদলে যাওয়া শব্দও কথাবার্তার মধ্যে কিছু দিন থাকার পর আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়না;

তার মধ্যে সেগুলোই শুধু টিকে যায় যে সব শব্দের মধ্যে মানুষের মনে ধরার মত কোন না কোন গুণ থাকে। সেই ক্ষেত্রে সে কথোপকথনে এই বদলে যাওয়া শব্দ বার বার ব্যবহার করে; অনেকে যত বেশি ব্যবহার করবে ততই এটি ছড়াবে, টিকে থাকার সম্ভাবনা তত বাড়বে।

যদিও যে কোন দু'জন মানুষের কথোপকথনই ভাষা প্রবাহের মাধ্যম, এ প্রবাহ কিন্তু দু রকম হয়ে থাক– আর এ রকম দুটির গুরুত্ব খুবই আলাদা। এর মধ্যে একটিকে বলা যায় খাড়া প্রবাহ– সেটি প্রধানত বাবা মা'র সঙ্গে শিশুর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ঘটে, শিশুর একেবারে প্রথম একটু আধটু কথা বলার সময় থেকে আরম্ভ করে। শিশু প্রথম ভাষা শেখে এর মাধ্যমেই, এভাবে ভাষা এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে যায়। এভাবে ওপর থেকে নিচে যায় বলে একে খাড়া প্রবাহ বলা হয়। ওই শৈশবে শিশু যদি বাবা-মার সান্নিধ্যের থেকে বাবা-মা স্থানীয় অন্য কোন যত্নকারীর সান্নিধ্যে বেশি থাকে, যেমন অন্য কোন আত্মীয় অথবা আয়া, তা হলে একই রকম খাড়া প্রবাহ ওই শেষোক্ত মানুষটির সঙ্গেই শিশুর কথোপকথনে ঘটে। এই পার্থক্যটুকু ছাড়া একে প্রজন্মের পর প্রজন্মে জিনের প্রবাহের সমতুল্য বলা যায়।

ভাষার আর একটি প্রবাহ আছে যাকে বলা যায় পার্শ্ব-প্রবাহ, যেকোন দুজন মানুষের মধ্যে কথোপকথন (প্রায়শ একই প্রজন্মের) বাবা-মার সঙ্গে শিশুর যেটি বলা হলো তাকে বাদ দিয়ে বাকি সবার কথোপকথন। এরকম দু'জনের যে একই ভাষা হতে হবে এমনো নয়, পরস্পরের বোঝার স্বার্থে মিশ্র ভাষায় কথা বলার সময়ও এই পার্শ্ব-প্রবাহ ঘটে তাকে। খাড়া প্রবাহে প্রবাহটি একমুখি– আগের প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে; পার্শ্ব-প্রবাহ দুদিকেই চলতে পারে, একে অপরের থেকে শোনার ফলে পরস্পরের ভাষার ওপর প্রভাব পড়তে পারে। খাড়া প্রবাহের গুরুত্ব পার্শ্ব-প্রবাহের থেকে অনেক বেশি– কারণ শিশু যখন প্রথম ভাষা শেখে সেই ভাষা তার মস্তিষ্কে খুবই স্থায়ী একটি ছাপ রাখে। এই ছাপ শুধু শৈশবেই পড়তে পারে– তারপর আর নয়। এর মাধ্যমে ওই শোনা ভাষাটির বৈশিষ্টগুলো শিশুর মস্তিষ্কে অঙ্গীভূত হয়– ওই শব্দগুলো, সেগুলোর অর্থ, সেগুলো ব্যবহারে ভঙ্গি ইত্যাদি। আরো বড় কথা হলো ওইগুলোর মাধ্যমেই তার চিন্তা ও অনুধাবন ক্ষমতাটি কিছুটা স্বয়ংক্রিয় ভাবেই সম্পন্ন হতে পারে। বাবা-মা বা যার সঙ্গে কথাবর্তাতেই এটি ঘটে তার থেকে এসব শিশু যেন অনেক সহজে স্পঞ্জের মত শোষণ করে নিতে পারে। সে জন্য তার ভাষাটি, এমনকি তার ভাষার সকল ভঙ্গি, উচ্চারণের টান, খুঁটিনাটি সহজে তার কথায় এসে যায়। এটি যদি শৈশবের

একটি পর্যায় পর্যন্ত (সেটি ক্ষেত্রবিশেষে ৮ থেকে ১৩ বছর হতে পারে) একটানা চলে তা হলে এটিই হয় তার মাতৃভাষা, যা পরে শেখা অন্য যে কোন ভাষার দ্বারা কখনো সহজে আর মুছে যেতে পারেনা।

ভাষার খাড়া প্রবাহের এই বর্ণনা থেকে বোঝা গেল মাতৃভাষাকে মা-বাবার ভাষা হতে হয়না, শৈশবে যার সঙ্গে অধিকাংশ সময় কথা বলা শুরু হয় এবং চলতে থাকে তার ভাষাই মাতৃভাষা হয়ে ওঠে। তবে ছোট থাকতেই যদি সেই ভাষায় কথা বলাতে ছেদ পড়ে তা হলে ওটি ছেড়ে এর পরে যেটি একটানা চলে সেটিই মাতৃভাষা হয়ে ওঠার চেষ্টা করে ওভাবে কৈশোর পর্যন্ত। এভাবে প্রথম যত্নকারী ও সারক্ষণ আলাপকারী ব্যক্তির ভাষাটি যে ভাবে শোনা হবে সেটিই পরবর্তী প্রজন্মের মানুষটির মধ্যে ভিত্তি পাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবশ্য মা-বাবাই এই ভূমিকা পালন করেন। এভাবে যে ভাষা যে রূপে এরকম অনেক শিশুর মধ্যে দানা বাঁধবে সেই ভাষা সেই রূপে ওই পুরো গোষ্ঠির পরের প্রজন্মে ভিত্তি লাভ করবে। এজন্যই ভাষার খাড়া প্রবাহটি এত গুরুত্বপূর্ণ– শিশুর মধ্যে এসে এটি শুরু না হলে ভাষার এক একটি দিক প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রতিষ্ঠাই পায়না।

আমাদের কাছে খুব অপরিচিত মনে হবেনা এমন একটি পরিস্থিতি কল্পনা করি। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ফিলিপাইনের ম্যানিলায় বহুজাতিক কোম্পানীতে কাজ করেন। দীর্ঘ অফিস সময়ের বাইরেও অফিসের কাজে ভ্রমণের কারণে তাঁদের এক বছর বয়সী একমাত্র শিশুকন্যার সঙ্গে সময় কাটাবার সুযোগ খুবই কম, তাই সে সম্পূর্ণ রূপে ফিলিপিনা আয়ার হাতে বড় হচ্ছে। দেড় দুই বছর বয়স থেকে মেয়ের মুখে শোনা যাচ্ছে ওখানকার ভাষা তাগালোগের একটু একটু বুলি– কারণ আয়া সারাক্ষণ তার সঙ্গে এ ভাষাতেই কথা বলে। একে শুধু মুখের বুলি ভাবলে ভুল করা হবে, শিশুর মস্তিষ্ক কিন্তু স্পঞ্জের মত এই ভাষার বিশেষ দিকগুলো শোষণ করে নিচ্ছে। অন্য সময়ও আয়া আর রাঁধুনি মহিলার মধ্যে এ ভাষার আলাপই সে শোনে। চার বছর বয়সে দেখা গেলো তাগালোগই এই বাঙালী শিশুটির 'মাতৃভাষা' হয়ে ওঠেছে। এরপর অবশ্য তাকে আন্তর্জাতিক ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করা হলে দিনের অধিকাংশ সময় স্কুলেই কাটতো, বাসায় বাবা-মাও এখন তার সঙ্গে ইংরেজিতে যতটা পারেন আলাপের চেষ্টা করেন। দ্রুত এই শিশুর 'মাতৃভাষা' তাগালোগ থেকে ইংরেজিতে পরিণত হলো, এবং কৈশোরে তা সব অর্থেই পরিপূর্ণ হলো। এর মধ্যে দেশে আসলে বাড়ির সবার সঙ্গে ছিটেফোটা বাংলা বলার চেষ্টা যে করেনা তা নয়, কিন্তু বাংলা কখনোই তার প্রথম ভাষা বা মাতৃভাষা হয়নি। তাগালোগ যখন তার ভাষা ছিল তখন কিন্তু সেটি

একেবারে আয়ার আঞ্চলিক কথ্য ভাষা ছিল, তাও প্রশিক্ষিত আয়াদের মুখে বহু ইংরেজি শব্দ মেশানো মিশ্র যে ভঙ্গি চল্‌তি ছিল ঠিক তা। এভাবেই মুখের ভাষা বদলায় এবং শিশুদের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠা পায়, যদি না তখনকার সময়ে যে প্রমিত ভাষা তাও পরে স্কুলের কারণে শিশুর ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে সাধারণ মানুষের ভাষার ইতিহাস দেখতে গেলে মা-বাবা বা তাদের মত অন্তরঙ্গ অন্যরা শিশুর কাছে যখনই নতুন শব্দ, নতুন ভঙ্গি নিয়ে ভাষার নতুন রূপ নিয়ে গেছে তখন সমাজে সেটিই প্রতিষ্ঠিত হয়ছে ধীরে ধীরে। বাবা-মা নিজেরা সেই পরিবর্তিত রূপটি কোথায় পায়? অবশ্যই পার্শ্ব-প্রবাহের মাধ্যমে। কেউ না কেউ তাঁদের সঙ্গে কথোপকথনে এই পরিবর্তিত রূপে তাঁদেরকে অভ্যস্ত করেছে কাজের জায়গায়, বিদেশি আত্মীয়দের কারণে, ভ্রমণের জায়গায়, নিজের অভিবাসনের ফলে অথবা নিজেদের দেশে আসা অভিবাসীদের ফলে, ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে, বিদেশি বড় কর্তাদের কারণে, ইত্যাদি যে কারণেই হোক। কাজেই খাড়া প্রবাহটি শেষ পর্যন্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও পার্শ্ব-প্রবাহের ভূমিকাটি কম নয়।

খাড়া প্রবাহই হোক আর পার্শ্ব-প্রবাহই হোক শব্দের প্রবাহ সম্পর্কে খুবই সম্প্রতি বেশ আশ্চর্যজনক কিছু নিয়ম আবিষ্কার হয়েছে। দেখা গেছে যে বিকল্প শব্দগুলোর মধ্যে বক্তা যে শব্দটি বেশি ঘন ঘন ব্যবহার করে শ্রোতা সেটিই মনে রাখে বেশি, নিজেও ব্যবহার করে বেশি। এটি শিশুদের সঙ্গে আলাপে যেমন সত্য (খাড়া প্রবাহে), তেমনি বয়স্কদের মধ্যে আলাপেও সত্যি (পার্শ্ব-প্রবাহ)। সম্প্রতি এই ব্যাপারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে খুব বড় আকারের বেশ কিছু এক্সপেরিমেন্টে। এর মধ্যে একটিতে ইন্টারনেটে এক একটি আলাদা আলাপকে একটি কথোপকথন হিসেবে ধরে নিয়ে লক্ষ লক্ষ ইন্টারনেট আলাপ পরীক্ষা করা হয়েছে। সফ্‌টওয়্যারের মাধ্যমে কম্পিউটারে এরকম লক্ষ লক্ষ আলাপ পরীক্ষা করা কঠিন নয়। তাতে দেখা গেছে বক্তা কোন্ শব্দ ব্যবহার করছে তা নয়, সেটি কত ঘন ঘন করছে সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। সেটিই শ্রোতার মাথায় বেশি যায়, শ্রোতাও বেশি ব্যবহার করে। এভাবে ওই সমাজে নানা কথোপকথনে যে শব্দগুলি সব চেয়ে বেশি ঘন ঘন ব্যবহৃত হচ্ছে সমাজে তার প্রচলন বাড়ছে। যখনই দেখা যাচ্ছে একটি শব্দের কোন বিকল্প, কোন ধ্বনি পরিবর্তন, কোন অর্থ পরিবর্তন কেউ কেউ ব্যবহার করছে, একই কথোপকথনে বার বার ঘন ঘন করছে, তখনই দেখা যায় বেশি মানুষ তা করছে- এভাবে ভাষায় পরিবর্তন আসছে।

ভাষা পরিবর্তনকে ঢেউ বিস্তারের মত দেখাঃ

খাড়া প্রবাহ আর পার্শ্ব-প্রবাহ মিলে ভাষাকে একটি বৃক্ষের মত দেখাটাই বহুদিন ধরে প্রচলিত রয়েছে– যাকে বলা যায় ভাষা-বৃক্ষ। প্রজন্মান্তরে ভাষার খাড়া প্রবাহের রূপে ওর খাড়া কাণ্ড ওঠে যায় আর নানা কারণে বিভিন্ন দিকে পার্শ্ব-প্রবাহে বদলে গিয়ে পৃথক শাখায় চলে যায়, সেগুলোর প্রত্যেকটি থেকে আবার পৃথক প্রশাখা। দুটি শাখা বা প্রশাখা কাছাকাছি এলে পার্শ্ব-প্রবাহে তারাও পরস্পরকে বদলায়; তারা আবার তাদেরও খাড়া প্রবাহকে প্রজন্মান্তরে বদলাতে থাকে। এমনকি দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা-বৃক্ষের শাখাগুলোর মধ্যেও পার্শ্ব-প্রবাহ ঘটতে পারে। সাম্প্রতিক কালে কোন কোন ভাষাবিদ ভাষার পরিবর্তন ও প্রবাহের একটি বিকল্প চিত্রও দিয়ে থাকেন– একে ঢেউয়ের বিস্তারের মত ধরে নিয়ে।

এতে মনে করা হয় যে প্রত্যেকটি অঞ্চলের ওপর দিয়ে নানা দিক থেকে ভাষাগত পরিবর্তনের ঢেউ বয়ে যায়– একের পর এক নতুন ঢেউ। এ ঢেউ বয়ে নিয়ে যায় শব্দের পরিবর্তন, নতুন শব্দ, ধ্বনির পরিবর্তন, বাক্যে শব্দ সাজাবার নতুন ফ্যাশন ইত্যাদি। নানা ঢেউ নানা দিক থেকে আসতে পারে। একটি ঢেউ যে জায়গার ওপর দিয়ে যায় পরেরটি ঠিক সেখান দিয়ে না গিয়ে পাশের অন্য জায়গা দিয়েও যেতে পারে। কাছাকাছি দুই রকমের ভাষার মানুষের কথোপকথনেই এই ঢেউ সৃষ্টি হয় ও চলে। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর দিয়ে বিভিন্ন ঢেউ চলে যাবার ফলে সেখানে ঢেউ-রেখার সৃষ্টি হয় যা স্থায়ী ভাষা পরিবর্তনের প্রতীক। পুরো একটি বড় অঞ্চলের ভাষা মানচিত্র আসলে এসব রেখায় গড়া একটি জালের মত; মনে করা যায় যে জালের ছোট ছোট এক একটি অনিয়মিত খোপের মধ্যে ভাষা মোটামুটি একই রকম , কিন্তু তার বাইরে নয়। এখন একজন ভ্রমণকারী যদি ওই অঞ্চলে যে কোন দিকে সোজা পথে ভ্রমণ করতে করতে স্থানীয় ভাষা লক্ষ্য করেন, এক একটি খোপের ভেতরে তিনি মোটের ওপর মুখের ভাষা একই রকম শুনবেন, কিন্তু যে কোন দিক থেকে যেই মাত্র খোপটির সীমান্ত অতিক্রম করে আর একটি খোপে ঢুকবেন তখনই সেই খোপের মধ্যে ভাষা কিছুটা বদলে গেছে লক্ষ্য করবেন– এমনি করে সেদিকে পর পর খোপে একটু একটু বদলাবে। ভ্রমণে সোজা রেখাটি অন্য কোন দিকে হলে সেখানে হয়তো অন্য খোপ আর অন্য পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন। এভাবে বহু গবেষণায় দেখা গেছে গড়পড়তা যে কোন দিকে ২৫-৩০ কিলোমিটার ভ্রমণ

করলেই মুখের ভাষার পরিবর্তন বোঝে ওঠার মত হয়। যে আঁকাবাঁকা সীমানা রেখা দিয়ে ওই খোপগুলো তৈরি সেগুলো কিন্তু এক একটি ঢেউয়ের রেখে যাওয়া রেখা, কাজেই ওই ঢেউয়ে ভাষা পরিবর্তনের যে বিষয়গুলো ছিল সেগুলো এরকম এক একটা রেখায় একই থাকার কথা– তা সেটি যত দীর্ঘই হোক। আবহাওয়া মানচিত্রে যে রকম দীর্ঘ সমচাপ রেখার ওপর সব জায়গায় বায়ুচাপ সমান থাকে, সমউত্তাপ রেখার ওপর উত্তাপ সমান থাকে, এই ভাষা-মানচিত্রে তেমনি যেন সমশব্দ রেখা, সমধ্বনি রেখা ইত্যাদি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইতালী, দক্ষিণ ফ্রান্স হয়ে স্পেন পর্যন্ত যে এরকম একটি রেখাকে অনুসরণ করে গেলে দেখা যায় যে ওখানকার উচ্চারিত শব্দগুলো প্রায় একই– আমরা বলি এগুলো ল্যাটিন দেশের শব্দ।

ঢেউ বিস্তারের মত করে ভাষা পরিবর্তনের যে চিত্র পেলাম তাতে পরিবর্তন-গুলো সর্বত্র একটু একটু করেই হবার কথা, ২০-৩০ কিলোমিটার গেলে একটু বোঝা যায়, আরো গেলে পরিবর্তনটি আরো একটু প্রকট হয়। ব্যাপারটি মসৃণভাবে ঘটে, হঠাৎ করে বড় কোন পরিবর্তন হবার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে কিন্তু আমরা তেমনটি মাঝে মাঝে দেখি– যেমন কখনো দেখি রাষ্ট্র সীমানা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা একেবারে বদলে যাচ্ছে, তার সমস্ত খোল্‌নলচে সহ।

স্বাভাবিক পরিবর্তন বনাম আরোপিত পরিবর্তনঃ

হঠাৎ একটি জায়গায় গিয়ে ভাষায় এক লাফে বড় পরিবর্তন স্বাভাবিক ভাবে হবার উপায় নেই– একমাত্র কৃত্রিম ভাবে আরোপের মাধ্যমেই এটি সম্ভব। হতে পারে ওই সীমানায় গিয়ে অন্য রাজ্য বা সাম্রাজ্যের শুরু হয়েছে যার কর্তৃপক্ষ কড়াকড়ি ভাবে ওখানে নিজেদের ভাষা বাধ্যতামূলক করেছে, হয়তো ওখানে কোন বিদেশী বিশেষ অঞ্চল বা অধিকৃত অঞ্চল শুরু হচ্ছে। ফলে সীমানাটি পার হলেই অন্য ভাষাভাষী মানুষের দেখা মেলে যাদের সঙ্গে সীমানার এপারের মানুষের নিয়মিত আলাপ-সংযোগ হয়না। এভাবে কোন না কোন কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করেই– ভাষা পরিবর্তন বিস্তারের স্বাভাবিক ঢেউকে বাধাগ্রস্ত করা যায়- যার ফলে ওই ঢেউয়ের স্থায়ী প্রভাবগুলো আর এই বাধার অপর দিকে যেতে পারেনা। সেখানে অবশ্য তার নিজের ঢেউ যথারীতি সৃষ্টি হতে পারে, এবং বিস্তার লাভ করতে পারে, যা সীমানার এই পারে আসার সুযোগ কম থাকে।

আরো এক ভাবে ওই মসৃণ ভাবে একটু একটু করে ভাষা বদলে যাওয়াটি ব্যাহত হতে পারে– সেটি হলো মৌখিক ভাষার সব বৈচিত্রের মধ্যে একটি প্রমিত ভাষা

কৃত্রিম ভাবে সৃষ্টি করে সবার মধ্যে, অথবা অন্তত জনসংখ্যার একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে, তার ব্যবহার প্রায় বাধ্যতামুলক করে তোলা। এর ফলে সমাজের এই অংশের মানুষের অনেকে পেশাগত বা আনুষ্ঠানিক কাজে তো বটেই, এমনকি মৌখিক কথোপকথনেও ওই প্রমিত ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করে। এর ফলেও মৌখিক ভাষার মসৃণ পরিবর্তনটি কোন সীমানায় এসে হঠাৎ করে অনেক বদলে যেতে পারে যেমন একটি কেন্দ্রীয় নগরে এসে, যেখানে প্রমিত ভাষা ব্যবহারকারী হঠাৎ বেড়ে যাচ্ছে।

প্রমিত ভাষা সাধারণত কোন কর্তৃপক্ষ ঠিক করে দেয়। পণ্ডিতদের মাধ্যমে এর জন্য ব্যাকরণের ও ভাষা ব্যবহারের কড়াকড়ি নিয়মনীতিও বেঁধে দেয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৪৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার আগে ঔপনিবেশিক শক্তি হল্যান্ডের ডাচ ভাষাই আনুষ্ঠানিক সরকারী ভাষা ছিল; কিন্তু সব থেকে বেশি ব্যবহৃত সাধারণ মালয় ভাষা, জাভা দ্বীপে জাভানিজ ভাষা, বালি দ্বীপে বালিনিজ ভাষা ইত্যাদি বেশ কিছু পৃথক গুরুত্বপূর্ণ ভাষার ব্যাপক ব্যবহার ছিল, এখনো আছে। স্বাধীনতার পর পণ্ডিতরা মিলে প্রধানত মালয় ভাষা কিন্তু জাভানিজ ইত্যাদি অন্যান্য প্রধান সব ভাষার সংমিশ্রণে ও ডাচ ভাষার অনেক শব্দ নিয়ে বাহাসা ইন্দোনেশিয়া প্রমিত ভাষাটি নতুন ভাবে সৃষ্টি করেন (বাহাসা মানে ভাষা)। অনেক সময় সাহিত্যের মাধ্যমেও প্রমিত ভাষা গড়ে ওঠে; সাধারণ সাহিত্যরসিক জনগণের মধ্যে বড় প্রভাব রাখেন এমন সাহিত্যিকরা এটি করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ সর্বশেষ প্রমিত বাংলা ভাষা রবীন্দ্র সাহিত্য ও চল্‌তি ভাষাকে গুরুত্ব দিয়ে সমসাময়িক অন্য জনপ্রিয় সাহিত্যেরই সৃষ্টি। কর্তৃপক্ষই ঠিক করুক আর সাহিত্যই ঠিক করুক প্রমিত ভাষা সাধারণত একটি নির্বাচিত মৌখিক ভাষাকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে– তুলনামূলক ভাবে বেশি মানুষের মুখে আছে বলে, অথবা রাজধানী ও সংস্কৃতি-কেন্দ্রের ভেতরের ও কাছাকাছি জায়গার মানুষের মুখে রয়েছে বলে, বা অন্য কোন কারণে ওই বিশেষ মৌখিক ভাষাটিই নির্বাচিত হতে পারে। বাংলা চলতি প্রমিত ভাষার জন্য এভাবে কলকাতার এবং কলকাতার কাছে নদীয়া-শান্তিপুর এলাকার মৌখিক ভাষাকে বেছে নেয়া হয়েছে– প্রথমে সাহিত্যে, তারপর ঘরোয়া ও কম আনুষ্ঠানিক কাজে কর্মে, এবং শেষ পর্যন্ত একেবারে আনুষ্ঠানিক প্রমিত ভাষা হিসেবে। প্রমিত ভাষাকে মৌখিক ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় ভাবে পরিবর্তন ঘটাতে চাইলেও নিয়মের কড়া শাসনে তা খুব বেশি হতে পারেনা। প্রমিত ভাষা যেহেতু কর্তৃপক্ষীয় আনুকূল্য পায় কাজেই সীমানার দুই দিকে দুই ভিন্ন প্রবল কর্তৃপক্ষ থাকলে ওখানে এসে হঠাৎ

ভাষা একেবারে বদলে যায়। যেমন পুরো দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের অধিকাংশ দেশের আনুষ্ঠানিক ভাষা প্রমিত স্প্যানিশ হলেও যেই ব্রাজিল দেশটির সীমানায় এসে গেলো ম্যাজিকের মত সেই আনুষ্ঠানিক ভাষা পর্তুগীজ হয়ে গেলো। শুধু ওই দেশটির ঔপনেবেশিক প্রভুরা স্প্যানিশ না হয়ে পর্তুগীজ হবার কারণে এটি ঘটেছে। এই ক্ষেত্রে এসব কোন দেশের প্রমিত ভাষাই পণ্ডিতরা সৃষ্টি করেননি, বরং ঔপনিবেশিক প্রভুরা দেশের ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে তাদের নিজেদের ভাষাটিই গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে, যা তাদের মুখের ভাষাই হয়ে গিয়েছে স্থানীয় পরিবর্তনসহ, এবং আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে সর্বত্র একই প্রমিত ভাষা হিসেবে। তারপরও সীমান্তের গ্রামগুলোতে যদি আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা বেশি না হয়, কর্তৃপক্ষীয় কড়াকড়ি কম থাকে, তা হলে দেখা যায় যে সীমান্তের এপার ওপারে মসৃণ ভাবে ভাষা ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে– স্প্যানিশ শব্দের প্রাধান্য থেকে পর্তুগীজ শব্দের প্রাধান্য ক্রমে বাড়ছে। এমনকি স্থানীয় আদিবাসীদের ভাষার অনেক শব্দ এবং এক সময় দাস হিসেবে আনা বিশাল আফ্রিকান জনসংখ্যার নিজস্ব শব্দও এতে স্থান পাচ্ছে। সেটি যদি না হয় তাহলে বুঝতে হবে ওই বিভিন্ন মানুষদের মধ্যে সত্যিকার সংযোগ কম, অথবা অতীতে কম ছিল।

চট্টগ্রামের উত্তর অংশে মীরসরাই অঞ্চলে যুগযুগ ধরে পাশাপাশি দুরকম মৌখিক ভাষা ভাষী পরিবারগুলো বাস করেছে– একদলকে বলা হতো চট্টগ্রামী, অন্যদেরকে বলা হতো দাদইরগা। প্রথম দলের পরিবারগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিশুদ্ধ চাটগেঁয়ে ভাষায় কথা বলে এসেছে, অন্য পরিবারগুলো একই ভাবে নোয়াখাইল্যা ঘেঁষা ভাষায়। একেবারে একই জায়গায় থেকেও উভয়ের মধ্যে ভাষা প্রবাহ সে সময় লক্ষণীয় ভাবে ঘটেনি। স্পষ্ট বোঝা যায় যে উভয় দলের মধ্যে সামাজিক সংযোগটি অতীতে কম ছিল। এখন অবশ্য তা হবার সম্ভাবনা খুব কম। ওই আরোপিত ব্যতিক্রমগুলোর কড়াকড়িটি বাদ দিলে ভাষার পরিবর্তনের ওই দুটি চিত্রই স্বাভাবিক ভাবে কাজ করে ভাষা-বৃক্ষের চিত্র আর ভাষার ঢেউয়ের চিত্র। সার্বিক ভাবে ভাষা প্রতিষ্ঠিত হবার ক্ষেত্রে ভাষা-বৃক্ষের চিত্রটি বেশি কাজে আসে, কারণ এতে খাড়া প্রবাহ এবং পার্শ্ব-প্রবাহ উভয়েই থাকে। পার্শ্ব-প্রবাহটি যা নানা আলাপীদের মধ্যে দেয়া-নেয়া করে তা শিশুদের মাধ্যমে খাড়া প্রবাহে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে ঢেউ-চিত্রে পুরোটাতেই পার্শ্ব-প্রবাহটাকেই দেখা যায়। যে কোন দিকে স্থান বদল করলে ধীরে ধীরে মসৃণভাবে কেমন করে ভাষা বদলায় তা সেখানে ভাল ধরা পরে।

পথে পথে রেখে যাওয়া চিহ্ন

চিহ্নের রকমফেরঃ

যত রকম প্রবাহের কথা বলেছি তার প্রত্যেকটিতে স্রোত এগিয়ে গেলেও সর্বত্র তার চিহ্ন রেখে গেছে। আজকের যে কোন মানব বসতে গেলে এবং ভাল করে খোঁজ করলে সে চিহ্নের কিছু কিছু আমরা ঠিকই দেখতে পাব। এভাবে জিনের প্রবাহ এবং তাতে অন্য জিন-প্রবাহের সংমিশ্রণ এক এক জায়গার মানুষের চেহারায় ও দেহাবয়বে তো বটেই, তা ছাড়া তাদের কিছু কিছু বাহ্যিক আচরণে এবং জীবন-যাপন সংস্কৃতিতে স্পষ্ট ছাপ রেখে গেছে। জিন এমন অক্ষয় জিনিস যে বহু হাজার বছরেও তার সব ছাপ একেবারে বদলে ফেলেনা। এতে মূল বিশ্ব-মানবগোষ্ঠির সার্বিক দেহ-মনের ঐক্যে তেমন কোন ইতর বিশেষ যে হয়নি তা আমরা আধুনিক জেনোম গবেষণায় দেখতে পেয়েছি। কিন্তু এটি বিশ্ব-জোড়া মানব বৈচিত্র সৃষ্টি করেছে– বিশেষ করে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র, যা বিশ্ব মানবতাকে সমৃদ্ধ করেছে। জিন প্রবাহের এই রেখে যাওয়া চিহ্নগুলো স্পষ্ট বৈচিত্র রূপে সবার কাছে উন্মুক্ত রয়েছে। এর আগে আমরা ডিএনএ'র মধ্যে জিনকে পড়ার কথা বলেছি, তা দেখে অতীত অভিবাসন ইত্যাদি নির্ণয়ের কথা বলেছি। সেগুলো অণু-জীববিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের কাজ। কিন্তু জিনের রেখে যাওয়া চিহ্ন সাদা চোখেই দেখা যায়– দেহকোষে আণবিক পর্যায়ের অনুসন্ধানের আগেই।

জিনের রেখে যাওয়া এমন চিহ্ন আজকের মানুষের জীবনের কলকাকলির মধ্যেই শুধু খুঁজে পাবনা, তাদের পূর্বপুরুষের কবর দেয়া কঙ্কালেও তা খুঁজে পাব। এই ফসিল কঙ্কাল বিশ্লেষণ করেও জানা যায় তার সেদিনের জীবন সম্পর্কে অনেক কথা। এ কঙ্কাল থেকে আবিষ্কার করা যায় তার দেহের গঠন, গড়ন, চেহারা, সামর্থ্য; বোঝা যায় হাঁটার, দৌড়ানোর, শিকার করার, দেহ ভারসাম্য রাখার ভঙ্গিগুলো তার কেমন ছিল; কী ছিল তার খাদ্য, কী রকম রোগ-বালাইয়ে সে ভুগেছে, শেষ পর্যন্ত মারাও গিয়েছিলো কী ভাবে। অনেকের ক্ষেত্রে সে শেষ জীবনে কী রকম শারীরিক-মানসিক অবস্থায় কাটিয়েছিল তারও ছাপ এতে মেলে। এর কিছু কিছু জীবন যাপন প্রক্রিয়া থেকে এসেছে, কিন্তু আবার অনেক কিছু জিনের থেকে এসেছে অর্থাৎ কিনা তার পূর্বপুরুষের ধারাবাহিকতায় এসেছে, যার চিহ্ন সে নিজেও যাবার সময় রেখে গেছে। যেমন ইথিওপিয়া,

কেনিয়া, সোমালিয়া অঞ্চলের মানুষ যে পাতলা, দীর্ঘকায় হয় এবং লম্বা পথে দৌড়াতে ও হাঁটতে বেশি সক্ষম তা প্রাচীন কাল থেকেই তাদের জিনের বৈশিষ্ট; তখনো যে এমন সক্ষম ছিল তা তাদের প্রাচীন কঙ্কালের পায়ের গঠন দেখে বোঝা যায়। আজও অলিম্পিকে দীর্ঘ দূরত্বের দৌড়ের ও মারাথনের পদকগুলো তাদের প্রায় একচেটিয়া; একেবারে প্রাচীন কালে শিকারে ও যাযাবর জীবন যাপনে তাদের এই বৈশিষ্ট যে কাজে লাগতো তার প্রমাণ রয়েছে।

হাড়ের মধ্যে জিনের প্রভাব ছাড়াও জীবন যাপনের চিহ্নও যে থাকে তাতো স্পষ্ট– খাবার অনুযায়ী দাঁতের ক্ষয়, চোয়ালের অবস্থা, হাঁটা-দৌড়ানো ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে পায়ের হাড়ে ক্ষয়ের অবস্থা, মেরুদণ্ডের কশেরুকা হাড়গুলো ইত্যাদি থেকে। জীবন যাপনের বাকি বহু চিহ্ন অবশ্য তার বসতের পারিপার্শ্বিক জিনিস থেকে আসে – সেগুলোর সঙ্গে জিনের সম্পর্ক তেমন নেই। বসত নির্মাণের চিহ্ন থেকে শুরু করে তার চুলা ও হেঁশেলের আশপাশে আধখাওয়া, আধপোড়া হাড়, ঘটিবাটি, এমনকি ঘটিবাটির যা দিয়ে তৈরি সেই পোড়া মাটির ভেতরটা, চুলার বা পোড়া আসবাবের অঙ্গার; পাথর, হাড়, শিং এরকম কিছু স্থায়ী জিনিসের তৈরি হাতিয়ার বা তৈজস ইত্যাদি সবই চিহ্ন হতে পারে। সেদিনের শস্য, বীজ, পরাগরেণু যা কোন ভাবে সংরক্ষিত হয়ে গেছে ইত্যাদি বহু জিনিসও চিহ্ন হতে পারে যার কিছুটা বিস্তারিত একটু পর দেখবো। এমনকি বাইরে নানা বাসা থেকে আসা পাড়ার যে আবর্জনা স্তুপ যুগের পর যুগ জমেছে তাও ওই জীবন যাপনের চিহ্নের একটি বড় আকর হতে পারে। এভাবে জিনের চিহ্ন ও জীবন যাপনের চিহ্ন কখনো পরস্পর মেশানো, কখনো আলাদা ভাবে পাওয়া যায়।

ভাষার প্রবাহও তার নিজস্ব চিহ্ন রেখে যায়। এভাবে বহুকাল আগের ভাষার চিহ্ন আজকের মানুষ তার ভাষায় ধারণ করে– সেই ভাষা থেকে আসা শব্দে, উচ্চারণে, ভঙ্গিতে। এক কালে পর্তুগীজদের আনাগোনা আমাদের দেশে ছিল। আজ পর্তুগীজরা নেই, কিন্তু আমাদের ভাষায় তারা তাদের চিহ্ন রেখে গেছে। ভাষার প্রবাহ ও চিহ্নগুলো মানব ইতিহাসের কিছুটা পরের দিকের বিষয় বলে এর প্রকৃতিগুলো আমরা পরের আর একটি অধ্যায়ে নিয়ে যাবো। কিন্তু একটি বিষয় এখানে আনতে চাই তা হলো ভাষার চিহ্নের সঙ্গেও জিনের সম্পর্ক থাকার ব্যাপারটি।

আমরা আগেই দেখেছি খুব ছোট বেলায় যার সঙ্গে কথোপকথনে শিশু কথা বল্‌তে শেখে সেই ভাষার বৈশিষ্টগুলো মস্তিষ্কে স্থায়ী ছাপ রেখে যায়- ওই

ভাষাটিই শিশুর নিজের ভাষা হয়ে ওঠে। পরে বড় হয়ে অন্য ভাষা শিখলেও ওই ছাপ রাখা ভাষাটির প্রভাব ও অগ্রগণ্যতা সহজে চলে যায়না। সেই ভাষাটি একটি বাইরের জিনিস, মানুষই নিজেদের মধ্যে তা গড়ে তুলেছে, তা জিনের ব্যাপার নয়। কিন্তু মস্তিষ্কে তার ছাপ পড়াটি কিন্তু জিনের ব্যাপার। জিনই মস্তিষ্ককে ওই ছাপ পড়ার উপযুক্ত করে তুলেছে। কাজেই বংশানুক্রমে নানা মানুষের মধ্যে শৈশবের ভাষাটি যে চিহ্ন রেখে যাচ্ছে সেই ব্যাপারটি জেনেটিক– জিনঘটিত ব্যাপার, সর্বজনীনভাবে সব মানুষের মধ্যে এই ব্যাপারটি রয়েছে, যদিও এক এক জনের জন্য সেই ভাষাটি নিজে এক এক রকম ভাবে মা-বাবার থেকে অথবা শৈশবে সান্নিধ্যে থাকা অন্য কারো থেকে এসেছে। অবশ্য তাই বলে ভাষায় জেনেটিক সব প্রভাব সর্বজনীন ভাবে সব মানুষের মধ্যে নেই। উদাহরণ স্বরূপ চীনা, জাপানী এরকম কয়েকটি জাতিসত্তার বংশোদ্ভূত মানুষ ল ও র এই দুটি ধ্বনিকে আলাদা করতে পারেনা, তাই নিজেদের উচ্চারণেও এই দুইকে গুলিয়ে ফেলে। এ জন্য তাদের নিজেদের ভাষায় এই দুইকে পৃথক করার কোন ব্যবস্থা নেই, কাজেই সেখানে সমস্যা হয়না। সমস্যা হয় যখন সে অন্য কোন নতুন ভাষা শিখতে যায় তখন। এই সমস্যাটি শুধু তাদেরই জিন-বৈশিষ্টের বিষয়, সর্বজনীন নয়। তবে অন্য কোন কোন জাতিসত্তার মানুষের মধ্যে এমনি অন্য ধ্বনির উচ্চারণে একই রকম সমস্যা আছে।

আগের একটি উদাহরণে যেমন দেখেছিলাম শিশুর কোন্ বয়সের কথোপকথনের ভাষাটি তার নিজের ভাষা (মাতৃভাষা) হয়ে উঠবে তার একটি বয়োসীমা আছে, তারপর এটি আর হয়না। এই বয়োসীমাটাও জিনের বার্তার মধ্যে সুনির্দিষ্ট করা আছে। ওই ল আর র উচ্চারণ সমস্যাটিতেও বয়সের একটি ব্যাপার আছে। কয়েক মাস বয়সী চীনা শিশুদের ওপর সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে ৬ মাস থেকে ১ বছর বয়সী চীনা শিশুদের মধ্যে ল ও র ধ্বনিকে পৃথক করার ক্ষমতাটি একেবারেই স্বাভাবিক থাকে। এটি তারা হারিয়ে ফেলে এক বছর বয়সের পর। এরপর বড় হয়ে অন্য ভাষায় কথা বলতে ও শুনে লক্ষ্য করতে এটি নিয়ে সমস্যায় পড়ে, যা দূর করতে যথেষ্ট চর্চা করতে হয়। এখানেও ওই জেনেটিক বৈশিষ্টের মধ্যেই সমস্যা শুরুর বয়সটি নির্ধারিত করে দেয়া আছে। এটি জেনে সুবিধা হয়েছে যে এর সমাধানের একটি উপায় খুঁজে পাওয়া গেছে– ৬ মাস বয়স থেকেই সেই শিশুকে ল ও র পৃথক হবার আবহের মধ্যে যদি একটানা রাখা যায় তা হলে বড় হয়ে সমস্যাটি কমে আসতে পারে।

সর্বজনীন ভাবে সবার ক্ষেত্রে আছে ভাষার ওপর জিনের আর একটি প্রভাব যা আমাদের পরিচিতির মধ্যেই সব সময় ঘটে। দুনিয়ার প্রায় সর্বত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মাতৃভাষা হিসেবে শৈশবে তাদের স্থানীয় কথ্য ভাষাটিই শেখে, কারণ প্রমিত আনুষ্ঠানিক ভাষায় বাসায় নিজেদের মধ্যে এবং শিশু সন্তানের সঙ্গে কথা বলার অভ্যাস মানুষের কম। পরে স্কুলে গিয়ে শিশুরা প্রমিত ভাষা শেখে। এর ফলে দুনিয়ার সর্বত্রই প্রমিত ভাষা বলার সময় অনেকেরই স্পষ্ট স্থানীয় কথ্য ভাষার টান থাকে। উদাহরণ স্বরূপ ইংরেজি ভাষার কথা বলতে পারি। বৃটেনে সহকর্মীদের বক্তৃতা শুনে অনেকে আগেই বলে দিতে পারেন ইংল্যাণ্ডের কোন্ জায়গা থেকে তাঁদের পরিবার এসেছেন, অথবা ইংল্যাণ্ডের বাইরের ওয়েলস, কিংবা স্কটল্যান্ড, কিংবা উত্তর আয়ারল্যাণ্ড থেকে এসেছেন কিনা। আবার সারা দুনিয়ার অনেক মানুষ এখন ইংরেজি ভাষায় কথা বলেন। তাঁরা খুব চমৎকার ও অত্যন্ত শুদ্ধ ইংরেজি বল্‌লেও প্রায় ক্ষেত্রেই চেহারা না দেখে শুধু তাঁদের ইংরেজি কথা শুনে বলে দেয়া যায় তাঁরা কে কোন্ দেশ বা অঞ্চল থেকে এসেছেন। নিজেদের মুখের ভাষার টানের কারণেই এটি বোঝা যায়। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে টানের ব্যাপারটি ওই শৈশবে শোনা ভাষাটির সঙ্গে যুক্ত, তার ছাপ মস্তিষ্কে স্থায়ী ভাবে পড়ে বলে এটি জেনেটিক। তবে এই টান থেকে যাওয়ার ব্যাপারটি তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যার ১২-১৩ বছর বয়সের আগে ওই ভাষার মূল ভাষীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ পায়নি। তার আগেই যদি সে সুযোগ তারা পায় তা হলে নিজের ভাষার উচ্চারণের টান্‌টি মস্তিষ্কে স্থায়ী হয়ে যাওয়ার আগেই সে রকম টানহীন বিদেশি ভাষা তারা কথ্য হিসেবে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই শিখতে পারে। এর যত আগের বয়সে শিখবে ততই তার উচ্চারণ ওখানকার স্থানীয়দের মতই হবে। এজন্য দেখা যায় একটি বাংলাদেশি পরিবার আমেরিকায় অভিবাসী হয়ে পরিবারের ৬ বছরের শিশু সন্তান ও ১৬ বছরের কিশোর সন্তান উভয়ে সেখানকার স্কুলে গেলেও ছোট জনের পরবর্তী ইংরেজি কথায় আমেরিকার স্থানীয় টান থাকবে, কিন্তু বড় জনের ইংরেজি কথায় যথারীতি বাঙালীর ইংরেজি বলার টান থাকবে। মস্তিষ্কে ছাপ পড়ার যে বয়োসীমা জিন ঠিক করে দিয়েছে তার ফলেই এমনটি ঘটে।

বিষয়গুলো এতই স্থায়ী যে ওই পরিবারের ওই দুই সন্তান তাদের বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত হয়তো এই দুই রকমের পৃথক টানেই ইংরেজি বল্‌বে। শৈশবের জেনেটিক বিষয়টি তাদের ভাষার ওপর সারা জীবন এ চিহ্নটি রেখে দেবে। অন্য যে কেউ তদের সঙ্গে কথা বলেই বুঝতে পারবে ছোট ভাই কী রকম বয়সে বাংলাদেশ

থেকে আমেরিকায় গিয়েছিলো, আর বড় ভাই কী রকম বয়সে গিয়েছিলো। একটি দীর্ঘ জীবনেও এই চিহ্ন তাদের মধ্যে থেকে যেতে পারে। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে এমন চিহ্ন শুধু এক জীবন বা এক প্রজন্ম নয় যুগের পর যুগ ইতিহাসের উপাদান হয়ে থাকতে পারে, তাতে জিনের প্রভাব থাকুক বা না থাকুক। যেমন বাংলা ভাষায় মানুষ যতদিন কথা বল্‌বে ততদিনই কিছু শব্দ থেকে হয়তো ধরে ফেল্‌তে পারবো যে এক সময় পর্তুগীজরা এদেশে এসেছিলো।

বাছাই হয়ে হয়ে জিনের চিহ্ন

প্রকৃতির বাছাই:

আগে আমরা দেখেছি জিনের মধ্যে দৈবক্রমে মিউট্যাশন বা পরিবর্তন ঘটে; এভাবে জিন বদলে গেলে সেই জিন যে দৈহিক বা মানসিক বৈশিষ্ট সৃষ্টি করে তাতেও পরিবর্তন আসে। যেহেতু সব সময় কিছু কিছু মিউট্যাশন ঘটছেই– তাই প্রত্যেকটি বৈশিষ্টের নানা রকম পরিবর্তিত রূপ জনসংখ্যার মধ্যে সব সময় থাকবে– কোন কোনটি হয়তো বেশি সংখ্যকের মধ্যে থাকবে, কিন্তু বাকিগুলোও কিছু থাকবে। যেমন একটি জনসংখ্যায় বেশির ভাগ মানুষ পাঁচ ফুটের মত লম্বা হতে পারে। কিন্তু এই একই জনসংখ্যার মধ্যেই নানা রকম লম্বা-বেঁটে মানুষও থাকবে কেউ কেউ তো রীতিমত ৬ ফুট কয়েক ইঞ্চি, আবার কেউ কেউ পাঁচ ফুটের কম। ওই লম্বা হবার জিনের মধ্যে নানা মিউট্যাশন থাকাতে এমনটি ঘটবে। কোন কোন মিউট্যাশন অবশ্য এর থেকে বড় চরম ধরণের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে– যেমন তিন হাত নিয়ে কোন বাচ্চার জন্ম। এমন ক্ষেত্রে ওই বাচ্চার বাঁচার সম্ভাবনা কম, কারণ এমন চরম একটি পরিবর্তন শরীরের বাকি অংশের সঙ্গে এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনা, টিকতেও পারেনা। যেহেতু বড় পরিবর্তন হওয়া শিশু বেশিদিন বাঁচার সম্ভাবনা কম, কাজেই ওই জিন আর বংশানুক্রমে তার সন্তানের কাছে গিয়ে বাড়তেও পারেনা। কাজেই মানুষের মধ্যে টিকে থাকা জিনের বৈশিষ্টগুলোই শুধু দেখা যায়।

কিন্তু বড় পরিবর্তন না হলে, সেগুলো না টিকলে মানব ইতিহাসে এত বড় বড় পরিবর্তন আসতে পারতোনা– দুই পায়ে হেঁটে হাতের ব্যবহার, উন্নত মস্তিষ্ক, ভাষা অর্জন, বিমূর্ত কল্পনার সক্ষমতা ইত্যাদি এক এক পর্যায়ে এক এক অর্জন। প্রত্যেকটি ধাপে ধাপে দৈবক্রমে হঠাৎ হঠাৎ এসেছে, স্বাভাবিক অবস্থায় এত বড় ধরনের পরিবর্তন টেকার কথা নয়। কিন্তু সে রকম পরিবর্তনও শুধু টিকে যায়না বরং অন্যগুলোর তুলনায় প্রাধান্য লাভ করে। সেটি হতে পারে যখন ওই

পরিবর্তনটি অন্যগুলোর তুলনায় পরিবেশের সঙ্গে বেশি খাপ খেয়ে চলতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় এমনটি হবার কথা নয়। কিন্তু পরিবেশের কোন সংকটের সময় যখন সংকটে বেঁচে থাকতে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের প্রতিযোগিতা বেড়ে যায় তখন ঠিক ওই পরিবর্তনটিই টিকে থাকার কাজে আসে। যেমন মানব ইতিহাসে পূর্ব আফ্রিকার জলবায়ু পরিবর্তন বন ভূমিতে থাকা অসম্ভব করে তুললে দুই পায়ে হেঁটে খাড়া হয়ে চলাটি নিরাপদ থাকা ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য অধিকতর উপযোগী হয়েছিলো। তখন এমন অদ্ভুত পরিবর্তিত বৈশিষ্ট যাদের মধ্যে ছিল তারাই বেঁচে থাকতে পেরেছে বেশি। কাজেই তারাই অধিক সন্তানের জন্ম দেবার সুযোগ পেয়েছে– যে সন্তানের মধ্যে ওই একই পরিবর্তিত বৈশিষ্ট ছিল। এভাবেই এই বৈশিষ্ট অন্যগুলোর তুলনায় অধিক বিস্তৃত হয়েছে, এক্ষেত্রে দু পায়ে খাড়া হবার বৈশিষ্ট। পরবর্তী প্রজন্মে এই আধিক্য আরো বেড়েছে, এভাবে পুরো জনসংখ্যাটি কালক্রমে এমনি হয়ে গেছে।

বৈচিত্রের মধ্যে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট পরিবেশে সংকটে বিশেষ সুবিধা পেয়ে যাওয়া, ফলে সেটির অধিকারীরা বেশি বেঁচে থাকা, বেশি সন্তান দেয়া– এই সব কিছুকে দেখা যেতে পারে প্রকৃতিই যেন ওই বৈশিষ্টটিকে বাছাই করেছে– এ ভাবে। পরিবর্তিত এই বৈশিষ্টটি জনসংখ্যার মধ্যে কিছু কিছু আগে থেকেই ছিল, এর থেকে ভিন্ন অন্য বহু রূপেও এটি ছিল, এর সবই নেহাৎ দৈবক্রমে সৃষ্টি হয়েছিলো মিউট্যাশনের ফলে। কিন্তু এই বৈশিষ্টটাই বাছাই হয়েছে। এই বাছাই হবার মধ্যে অবশ্য দৈবক্রমে হবার ব্যাপারটি নেই। ওই সংকট, ওই সুবিধা বা খাপ খেয়ে নিতে পারা, বেশি বেঁচে থাকা– এগুলো প্রাকৃতিক ভাবে অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় ভাবে হয়েছে। এভাবে জিনের প্রবাহ যত ঘটেছে ওই বৈশিষ্টের ওপর আরো সূক্ষ্মভাবে একের পর এক প্রকৃতির বাছাই চলেছে, এসব বাছাইয়ের মাধ্যমেই শেষ পর্যন্ত জিনের এক একটি ফলাফল ঘটেছে। ওই যে একটি বিশেষ জায়গার মানুষ হালকা পাতলা দীর্ঘদেহী হলো, তাদের পা দীর্ঘ পথে দৌড়ে যাওয়া বা হেঁটে যাওয়ার জন্য বেশি উপযুক্ত হলো, তার কারণ নিশ্চয়ই সুদূর অতীতে ওখানকার কোন সংকটে এই মিউট্যাশনগুলো বেশি কাজে লেগেছিলো। সংকটটি হয়তো ছিল খাদ্য সংকট– সময় মত দীর্ঘ পথ হেঁটে গিয়ে খাদ্যের উৎসে পৌছতে না পারলে মারা পড়তে হতো। যারা তা পেরেছে তারাই বেঁচেছে, অর্থাৎ তারাই নির্বাচিত হয়ে টিকে থেকেছে। তাই পরে দেখা গেছে তাদেরই বংশধররা সেই দীর্ঘ দেহ, সেই হাঁটার অধিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে আছে

আজও। সংকটের দিনে এই বাছাই প্রক্রিয়া কাজ করেছিলো, কিন্তু তার চিহ্ন ওরা এখনো ধারণ করছে।

এভাবে প্রকৃতির দ্বারা বাছাই হয়ে হয়েই জিনের প্রবাহ হাজার হাজার বছরের যাত্রায় এক এক সময়ে এক একটি নতুন বৈশিষ্ট মানুষকে এনে দিয়েছে। সাধারণত এ প্রবাহ তরঙ্গহীন একই গতিতে চলেছে কিন্তু সংকটের কালে নতুন নতুন পরিবর্তন বাছাই হয়ে এর মধ্যে তরঙ্গ তুলেছে, বড় বড় চিহ্ন রেখেছে; মানুষের মধ্যে এসেছে নতুন রূপ, নতুন দক্ষতা, নতুন মানসিক ক্ষমতা। মানব ইতিহাসে দীর্ঘ সময় এরকম সংকটের কাল গেছে, বিশেষ করে তার উৎস ভূমিতে জলবায়ু পরিবর্তন, বিপদ সংকুল পরিস্থিতি, টিকে থাকার তীব্র প্রতিযোগিতা, ইত্যাদির কারণে। এক এক সময় এমন সংকট চলেছে যে বিশাল অঞ্চল জুড়ে মাত্র কয়েক হাজার মানুষ বেঁচে থাকতে পেরেছে– যা মানুষকে বিলুপ্ত হয়ে যাবার কাছাকাছি নিয়ে গেছে। ও সময়েই বাছাই হবার প্রক্রিয়াটি দ্রুত কাজ করেছে যার ফলে মানুষের পরিবর্তিত হবার হারটিও দ্রুততর হয়েছে। এটি সব চেয়ে বেশি কাজ করেছে মানুষের মস্তিষ্ক দ্রুত বাড়া ও জটিল ক্ষমতার অধিকারী হবার মধ্যে। কিন্তু পরে মানুষ যখন তার পারিপার্শ্বিকতাকে অনেকখানি আয়ত্তে এনেছে, পরিবেশের চরম সংকট যখন কেটে গেছে, বিশেষ করে তার প্রযুক্তি, তার কৃষি ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ বড় এবং স্থিত জনসংখ্যায় এসেছে, তখন জেনেটিক পরিবর্তনের ওই দ্রুত গতিটিও কমে গেছে। কিন্তু তারপরও ওই প্রক্রিয়া সব সময় চালু রয়েছে। প্রকৃতির দ্বারা বাছাই হয়ে হয়ে নতুন নতুন জেনেটিক বৈশিষ্ট সৃষ্টি মানব ইতিহাসের পথে পথে তার চিহ্ন সব সময় রেখে গেছে।

পৃথিবীর কোন প্রান্তের মানুষের মধ্যে এভাবে যে বৈশিষ্ট সৃষ্টি হয় অন্য প্রান্তের মানুষের কাছে তা সম্পূর্ণ অপরিচিত হতে পারে– এমন কিছু উদাহরণ দেয়া যাক। ইউরোপে মধ্য যুগে বসন্ত রোগ নিত্যকার বিষয় ছিল, আর এই রোগে মৃত্যুহার ছিল অত্যন্ত বেশি। মানুষের মধ্যে এ ধরণের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের যে ক্ষমতা তার মধ্যেও জেনেটিক মিউট্যাশনে নানা বৈচিত্র থাকে। তবে অধিকাংশ মানুষের তা মামুলি ধরণের হওয়াতে তারা বসন্ত রোগে মারা পড়েছিলো। কিছু যাদের মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি তারা এ রোগ হলেও বেঁচে গেছে। কাজেই বলা যায় বসন্ত রোগ জনিত সংকটে ওরাই প্রকৃতির দ্বারা বাছাই হয়ে টিকেছে। তাদের সন্তানরাই পরবর্তী প্রজন্মে সংখ্যায় বেশি হয়েছে এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা বংশগত ভাবে বেশি থাকায় এই সন্তানরাও বসন্ত

রোগে বেঁচে গেছে। এভাবে ইউরোপীয়দের মধ্যে বসন্ত প্রতিরোধ ক্ষমতাটি যথেষ্ট ছড়িয়েছিলো, এবং এ রোগে তাদের মৃত্যুহার কমে গিয়েছিলো। ওদের মধ্যে অল্প কিছু মানুষ যারা নতুন আবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশে উপনিবেশ করতে গেছে তারা স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে এই রোগ নিয়ে গিয়েছিলো। আমেরিকার এই আদিবাসীরা প্রায় ১২ হাজার বছর আগে প্রথম আমেরিকা মহাদেশে আসার পর থেকে অন্য কোন মহাদেশের মানুষের সঙ্গে সংস্পর্শ বর্জিত ছিল, কারণ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এর পর বাকি দুনিয়ার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলো। ইউরোপীয়রা যাওয়ার পর এই প্রথম তার ব্যতিক্রম ঘটলো।

যে আমেরিকান আদিবাসীরা কখনো বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়নি এবার তারা আক্রান্ত হলো। অতীতে এ রোগ না থাকার কারণে এর বিরুদ্ধে কোন রকম প্রতিরোধই তাদের গড়ে ওঠেনি। ফলে এই নতুন সংকটে তারা দলে দলে মারা পড়লো। বসন্ত থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষের মধ্যে কিছু প্রতিরোধ সৃষ্টির মাধ্যমে ইউরোপীয়দের মত এতে প্রতিরোধ ক্ষমতা লাভ করতে তাদের বহু প্রজন্মের সময় দরকার, তার আগেই বসন্ত এবং ইউরোপীয়দের আনা অন্যান্য মহামারীতে তাদের বংশ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো, অন্তত আমেরিকার অনেক জায়গায়। জিন প্রবাহ তাদের ক্ষেত্রে একই চিহ্ন রেখে যায়নি, কারণ প্রকৃতি তাদের কাউকে এই শেষ সংকটে বাছাই করতে পারেনি।

কোলের শিশুর পুষ্টি দুধের ওপর নির্ভরশীল। তাই দুধ হজম করার প্রক্রিয়ার যে জিন সেটি শিশুদের দেহে ঠিকই বাছাই হয়েছে। কিন্তু বয়স্ক হবার পর মানুষকে আর দুধের ওপর নির্ভর করতে হয়না। সে জন্য প্রকৃতির বাছাই করার সময় বয়স্ক মানুষের পরিপাক ব্যবস্থায় দুধ হজমের জিনটি আর বাছাই হয়নি। তাই স্বাভাবিক ভাবে বয়স্ক মানুষ দুধ হজম করতে পারেনা, দুধ খেলে তার পেটের অসুখ হয়। মানব দেহে দুধ হজমের জিনটি ওভাবেই গড়ে ওঠেছিল যাতে শৈশবের পর এর কর্ম ক্ষমতা আর থাকেনা। কিন্তু প্রাচীন মধ্যএশিয়ায় তৃণভূমি অঞ্চলে পরিবেশের কারণে মানুষকে জীবিকা হিসেবে পশুচারণকে গ্রহণ করতে হয়েছিলো– শিকার অথবা কৃষি কোনটিই সেখানকার উপযুক্ত না হওয়াতে। তখন ওই পশুর দুধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্যের ওপরই তাদেরকে দৈনন্দিন নির্ভর করতে হয়েছে। সেখানে বয়স্ক অবস্থায় দুধ হজমের জিন যাদের মধ্যে সক্রিয় ছিল তারাই ওই সংকটে সুবিধা পেয়েছে, ওরাই বেশি টিকেছে এবং সন্তান বেশি রেখে গেছে। সেই সন্তানদের মধ্যেও বয়স্ক হয়েও দুধ হজম করার জিন ছিল। এভাবে ওই অঞ্চলের প্রায় সবারই ওই ক্ষমতা দেখা দেয়, প্রকৃতি কর্তৃক ওরকম জিনই

বাছাই হবার ফলে। পরবর্তী কালে ওই সংকট এবং ওরকম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও জিনটি থেকে গেছে। ওই জিন বহনকারী গোষ্ঠির মানুষ পৃথিবীর যেখানে যেখানে গিয়ে ওখানকার জনসংখ্যায় কিছুটা প্রাধান্য বিস্তার করেছে শুধু সেখানেই অধিকাংশ বয়স্ক মানুষ স্বাভাবিক দুধ হজম করতে পারছে; যদিও সেখানেও অনেক মানুষ তা পারছেনা, বা কম পারছে। এই জিন বহনকারীরা যায়নি এমন জনগোষ্ঠির মধ্যে দুধ হজম করা মানুষের সংখ্যা কম। এর মধ্যে আফ্রিকান বংশোদ্ভূতরা এবং চীনারা খুবই উল্লেখযোগ্য, যাদের অধিকাংশ বয়স্করা দুধ হজমে অক্ষম। আমাদের দেশেও অপেক্ষাকৃত কম হলেও অনেক মানুষের এই সমস্যা আছে, বা বেশি বয়সের দিকে নতুন করে দেখা দেয়। অন্যদিকে ইউরোপে বিশেষ করে উত্তর ইউরোপে দুধ হজম হয়না এমন মানুষের সংখ্যা কম। প্রকৃতির বাছাই কী ভাবে এক একটি জেনেটিক বৈশিষ্ট সৃষ্টি করেছে এবং তাকে জিন প্রবাহে নিয়ে গেছে, এসব উদাহরণ থেকে তা সুন্দর বোঝা যায়।

সঙ্গিনীর বাছাই:

আরেকটি ব্যাপার বিভিন্ন পশু-পাখির মধ্যে খুব স্পষ্ট দেখা যায়- জিনের কোন বৈশিষ্ট যে বংশানুক্রমে টিকে থাকা বা ব্যাপকতা লাভ করা সেটি প্রকৃতির বাছাইয়ের মাধ্যমে যেমন ঘটে; তেমনি অনেক ক্ষেত্রে যৌন সঙ্গিনীর বাছাইয়ের মাধ্যমেও ঘটে। এখন দেখা যাচ্ছে যে সেভাবে স্পষ্ট না হলেও মানুষের বিকাশের মধ্যেও এই শেষের ব্যাপারটি দারুণ অবদান রেখেছে, কিছুটা ভিন্ন ভাবে। আমরা দেখেছি প্রকৃতি যখন কোন জিনকে বাছাই করে অর্থাৎ ওই জিনটি যখন প্রকৃতির সঙ্গে বেশি খাপ খাওয়াতে পারে তখন এই কারণে জিনটি যার আছে সে অপেক্ষাকৃত বেশিদিন বাঁচতে পারে, এবং এর ফলে বেশি সন্তান রেখে যেতে পারে। এই কারণে জিনটি পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে বেশি ছড়িয়ে পড়ে। যদি এমন অন্য কোন ব্যাপার ঘটে যাতে বেশি বাঁচার বিষয়টি গুরুত্ব না পেলেও সন্তানের সংখ্যা ঠিকই বেশি হয়, তাহলেও কিন্তু ফলাফল একই হয়– জিনটি পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে বেশি ছড়িয়ে পড়ে। জিন প্রবাহের ফলে তার চিহ্ন দেখা যাবার এটিও একটি পথ। প্রজনন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর বেশি প্রাপ্তি সন্তান বেশি হওয়া সম্ভব করতে পারে। পশু-পাখির মধ্যে যা স্পষ্ট দেখা যায় বলেছি তা হলো এদের ক্ষেত্রে সঙ্গিনী সব সময় তার প্রজনন সঙ্গী বাছাইয়ের ব্যাপারে খুব নাক উঁচু, কড়াকড়ি ভাবে তাকে বাছাই করতে চায়। বাছাইয়ের একটি পদ্ধতি তারা

নেয় যে পুরুষগুলো নিজেদের মধ্যে লড়াই করে সব চেয়ে শক্তিশালী বলে যারা নিজেদেরকে প্রমাণ করতে পারে তাদেরকেই শুধু প্রজননের সুযোগ দেয়া। এটি পশুদের মধ্যে হরদম দেখা যায়– হরিণ, সিংহ, হাতি, জিরাফ ইত্যাদি বহু রকম পশুর পুরুষদের মধ্যে প্রাণপণ যুদ্ধ, কোন কোন গুলো প্রজনন মৌসুমে, আবার কোন কোন গুলো সব সময়েই। ফলে পরের প্রজন্মে ব্যাপক ভাবে বলশালী পুরুষরাই বিস্তার লাভ করে সঙ্গিনীর ওরকম বাছাইয়ের ফলে।

কিন্তু তার থেকেও বেশি ব্যাপক আরেকটি পদ্ধতি স্ত্রী প্রাণীরা অবলম্বন করে থাকে যা শুধু অহিংস নয় অনেক সময় বেশ নয়নাভিরাম কিংবা শ্রুতি মধুর। কোন কোন প্রাণীতে স্ত্রীদেরকে এক একটি বিশেষ দেহ-সৌকর্য অথবা আচরণের পুরুষদের প্রতি দারুণ পক্ষপাতিত্ব করতে দেখা যায়। দৈবক্রমে তারা এমন পছন্দের স্বভাবটি একটি মিউট্যাশনের মতই লাভ করে এবং বেছে বেছে শুধু তাদের সঙ্গেই প্রজনন করে। যেমন ময়ূরী সব সময় বাহারি লম্বা লেজ, সুন্দর চিত্রিত ডানার পেখমধারী এবং মাথায় সুন্দর ঝুঁটিধারী ময়ূরকে পছন্দ করে এসেছে বলে ওরকম ময়ূরেরই প্রজননের সুযোগ বেশি ঘটে, এবং পুরুষ সন্তানদের মধ্যে ওই বৈশিষ্টগুলোর বিস্তার ঘটে। এভাবে সঙ্গিনীর পছন্দের ফলে এমন বাহারি পুরুষ ময়ূররাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিস্তৃত হতে পেরেছে। এখানে বাছাইটা প্রকৃতি করছেনা, করছে সঙ্গিনী। প্রকৃতির বাছাইয়ে যেভাবে টিকে থাকাটি বেড়ে যায় এক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়না; বরং লম্বা লেজ, ঝকমকে রঙ ইত্যাদির কারণে শিকারির হাতে মারা পড়ার সম্ভাবনাটিই বেড়ে যায়। তারপরও অধিক প্রজননের কারণে সন্তান বেশি হওয়াতে এই বৈশিষ্টটি প্রাধান্য পায়।

একই ভাবে বহু রকম পশু-পাখিদের পুরুষদের মধ্যে এমন বাহারি হওয়াটি লক্ষ্য করা– যায় যেমন মোরগের ক্ষেত্রে, রঙচঙে আরো অনেক পুরুষ পাখির মধ্যে, ষাঁড়ের ও হরিণের খুবই জমকালো শিঙের মধ্যে, সিংহের কেশরের মধ্যে, ইত্যাদি। এরকম বাহারি হওয়াটি শুধু চেহারার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা– পুরুষ প্রাণীর আয়তনে বড় ও জমকালো হওয়াটিও ওই সঙ্গিনীর পছন্দের কারণেই ঘটে থাকে– অধিকাংশ প্রাণীর মধ্যেই তাই পুরুষদেরকে স্ত্রীর থেকে অনেক বড় পাওয়া যায়। সঙ্গিনীর পছন্দ পুরুষের কণ্ঠের আওয়াজেও হয়ে থাকে- সেভাবে স্ত্রীর পছন্দেই সৃষ্টি হয়েছে পুরুষ কোকিলের গান, পুরুষ ব্যাঙের প্রজননকালীন ভারী আওয়াজ, অন্যান্য বহু গান গাওয়া পুরুষ পাখির মধুর সুর। পাখিদের ক্ষেত্রে শুধু গান নয় তার সঙ্গে পুরুষ পাখির নয়নাভিরাম নাচও একই কারণে একই ভাবে বিস্তৃত হয়েছে; আরো আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে যে কোন কোন পুরুষ

পাখির খুবই সৌকর্যময় বাসা তৈরিটিও এর মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত, স্ত্রী পাখি এরকম বাসাই পছন্দ করে বলে। সঙ্গিনী স্ত্রীর মধ্যে পছন্দের অদ্ভুত মিউট্যাশনে প্রাণী জগতে এমনি সব ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে বাছাই করাটি শুধু স্ত্রীরই একচেটিয়া হলো কেন। এর উত্তর হলো প্রজননে স্ত্রীর ত্যাগ স্বীকারটি বেশি, সন্তান বা ডিম ধারণের জন্য তাকে অনেক সময়, শক্তি, স্বাস্থ্য ক্ষয় করতে হয়, ফলে এর যে অন্য সহযোগী সেই পুরুষটি যেন বড়, সবল, এবং স্বাস্থ্যের অধিকারী হয় তা জিনের প্রবাহের স্বার্থে স্ত্রীকেই দেখতে হয়েছে। এ সবের সঙ্গে সঙ্গে আরো অন্যান্য কিছু খেয়ালি পছন্দও স্ত্রীর মধ্যে একই পদ্ধতিতে চলে এসেছে। অবশ্য এর কিছুই সজ্ঞানে চিন্তা করে হয়নি, বরং মিউট্যাশন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনে স্বয়ংক্রিয় ভাবে হয়েছে। অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে যেমনটি হয়েছে সঙ্গিনীর বাছাইয়ের বিষয়টি মানুষের মধ্যেও বিবর্তনের অংশ হয়েছে। তবে মানুষের সন্তান পালনের কিছু বৈশিষ্টের কারণে বাছাইটি শুধু স্ত্রীর হাতে না থেকে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের হাতে চলে এসেছে। তাছাড়া অন্য কিছু প্রাণীর মত এই বাছাই পুরুষকে যেভাবে পরিবর্তিত করে স্ত্রী নিজেকেও একই ভাবে পরিবর্তিত করে– পছন্দ করার জিন এবং পছন্দের বৈশিষ্টের জিনের নৈকট্য ও পরস্পর ক্রিয়ার ফলে। মানুষের ক্ষেত্রে সঙ্গিনীর একটি বাছাই ছিল সেই সব সঙ্গীর প্রতি যারা বয়স্ক হয়েও শৈশবের কোমল মুখাবয়ব বজায় রাখে। এর ফলে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই বয়স্ক নরবানরের মুখের রুক্ষতা হারিয়ে শিশু নরবানরের কোমল মুখটাকেই বয়স্ক অবস্থাতেও বজায় রেখেছে। এখনকার বয়স্ক শিম্পাঞ্জি বা ওরাং ওটাঙের চেহারা সামনে মুখ বের করা ও রুক্ষ হলেও তাদের বাচ্চারা মানুষের বাচ্চার মত অনেকটা চাপা মুখ কোমল মুখশ্রীর। যৌন সঙ্গী ও সঙ্গিনীর মধ্যে বাচ্চাদের মুখাবয়ব বাছাই করার ফলেই মানুষ দীর্ঘ বিবর্তন কালে ধীরে ধীরে নরবানরের সামনের দিকে চোয়াল বের করে থাকা রুক্ষ চেহারার বদলে বর্তমান কোমল ও চাপা মুখাবয়ব লাভ করেছে।

কিন্তু সঙ্গিনী ও সঙ্গীর বাছাইয়ের ফলে মানুষের আরো বিরাট পরিবর্তন এসেছে তার বুদ্ধিমত্তায় ও উচ্চতর মানবিক গুণাবলীগুলো সৃষ্টি হওয়ার মধ্যে। এখন অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন মানুষের কল্পনা শক্তি, ভাষার সৌকর্য, রসবোধ, ছন্দ ও সুরের বোধ, সুকুমার কলা সৃষ্টির ক্ষমতা ইত্যাদির পেছনে বড় অবদানটি ছিল সঙ্গিনী ও সঙ্গীর পছন্দ। ওভাবে বাছাই হবার ফলে এই গুণগুলোর অধিকারীরাই প্রজননের সুযোগ পেয়েছে বেশি, ফলে ওই মানবিক গুণগুলো

পরবর্তী সব মানুষের মস্তিষ্কে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। নানা রকম সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞানীরা এরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছেন। উদাহরণ স্বরূপ দুনিয়ার সব রকম ভাষা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে প্রায় সব ভাষাতেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক শব্দ সৃষ্টি হয়েছে, একই শব্দের অনেকগুলো প্রতিশব্দ সৃষ্টি হয়েছে শুধু সঙ্গী-সঙ্গিনীর সঙ্গে সেগুলোর প্রয়োগের জন্য– যেখানে উচ্চতর চিন্তা, কল্পনা, রসবোধের স্থানটি স্পষ্ট। সব রকম মানুষের পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে জরিপ চালিয়েও দেখা গেছে নিজের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর মধ্যে এই গুণাবলীই সব দেশের সব গোষ্ঠির নারী পুরুষের কাম্য– হাজার হাজার বছর ধরে বংশানুক্রমে এই কাম্যতাগুলোই যে চলে এসেছে এমনিতরো তার স্পষ্ট নানা প্রমাণ খুঁজে পাওয়া গেছে।

এভাবে বিজ্ঞান বলে দিচ্ছে যে জিন প্রবাহ শুধু একটানা প্রবাহিত হয়েই যায়নি এর ওপর কাজ করেছে প্রকৃতির বাছাই অথবা সঙ্গিনীর বাছাই; বাছাই হতে হতে সেই জিন পরিবর্তিত হয়েছে; আমরা বলি জিন উন্নত হয়েছে, অবশ্য জিন নিজে শুধু তার ছড়িয়ে পড়ার স্বার্থে যা করার তা করেছে। তাতেই তার মানবিক চিহ্নগুলো ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে। এসব ঘটেছে অবশ্য মানব ইতিহাসের গোড়ার দিকেই বেশি। তারপর অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক অন্তত দশ বারো হাজার বছর ধরেই এই সব পরিবর্তিত চিহ্নকে মূলত অবিকৃত ভাবে তার মধ্যে ধারণ করেই জিনের প্রবাহ এগিয়ে গেছে। ওই দশ বারো হাজার বছর আগের মানুষ জেনেটিক কোন দিক থেকে যে আমাদের থেকে খুব ভিন্ন ছিল তা বলা যাবেনা। তবে তারপরও জিন প্রবাহে ওদেরই নানা মিশ্রণে ছোট ছোট বৈচিত্র ঘটে চলেছে, যা সবাইকে সমৃদ্ধ করেছে।

জীবন যাপনের সব চিহ্ন

কাজের জিনিস থেকে চিহ্নঃ

মানুষ জীবন যাপন করে যায়, সেই সঙ্গে নিজের অজান্তেই রেখে যায় সেই যাপনের নানা চিহ্ন। অনেক চিহ্ন কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়, কিন্তু কোন কোনটি টিকেও যায়। পাথর, পটারি, পোড়ামাটির ফলক ইত্যাদি জিনিস সহজে নষ্ট হয়না- কাজেই তার টিকে থাকাটি বোধগম্য। কিন্তু আরো অনেক চিহ্ন টিকে যায় কতকটা কাকতালীয় ভাবে, এমন ভাবে সেগুলো টিকে থাকে যে সাধারণ দৃষ্টিতে তার অস্থিত্ব বোঝার কোন উপায় থাকেনা। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ তাঁর অদ্ভুত সব কৌশল প্রয়োগ করে এ্ চিহ্ন ঠিকই বের করে আনেন, এবং তার থেকে হাজার বছরের ইতিহাসকে জাজ্বল্যমান করে তোলেন।

যেমন গুহার মধ্যেই হোক, কিংবা কোন রকমে তৈরি ঘরের কোন নিদর্শনের মধ্যেই হোক, যেখানেই মানুষের বসবাস হয়েছে সেখানেই চুলার একটি ব্যবস্থা থাকছেই– কোন রকমে আগুন জ্বালাবার মত হলেও। ওইখানটায় প্রাচীন জীবন যাপনের কোন না কোন চিহ্ন আশা করা যায়। চুলার আশপাশে পোড়া অঙ্গার, পোড়া হাড়, পোড়া শস্য ইত্যাদি পাওয়া যেতে পারে ওই আগুনে পুড়ে পুড়ে বিবর্ণ হওয়া পাথরের মধ্যে। বিজ্ঞানীর ল্যাবোরেটরিতে এই জিনিসগুলোই সেদিন ওখানে বাস করা মানুষগুলোর জীবন সম্পর্কে অনেক খবর দিতে পারে। যেমন ওই আধখাওয়া, আধপোড়া হাড়গুলো কোন্ কোন্টি কোন্ পশু বা পাখি থেকে এসেছে, সেগুলোর বয়স কত ছিলো, এমনকি সেগুলো পুরুষ না স্ত্রী পশু ছিল, বন্য না পোষা ছিল ইত্যাদিও। এরকম বেশ কিছু বসতের হাড়ের খবর পাওয়া গেলে সেখান থেকে মানুষগুলোর সার্বিক জীবনযাত্রাও অনেকটা আন্দাজ করা যায়। যেমন যদি দেখা যায় যে কোন বিশেষ পশুর হাড় সবই তরুণ বয়সের এবং পুরুষ পশুর, তা হলে বোঝা যায় যে সেখানে আয়োজন করা একটি পশুপালন ব্যবস্থা ছিল। একটি যুৎসই বয়সে এসে হৃষ্টপুষ্ট হলে পুরুষ পশুর অধিকাংশকে খাবারের জন্য ব্যবহার করা হতো, স্ত্রী পশুদেরকে প্রজননের জন্য রেখে দেয়া হতো।

উদ্ভিদ খাদ্যের যে সব চিহ্ন ওরা রেখে গেছে সেগুলোকে উদ্ঘাটন করা আরো বেশি কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। প্রসঙ্গত পুড়ে যাওয়া শস্য ইত্যাদি সংরক্ষিত হয়ে যায়, যার থেকে তার উদ্ভিদ পরিচয় ইত্যাদি জানা সম্ভব। এক সময় যুৎসই হাঁড়ির অভাবে উদ্ভিজ খাবারকেও কাঠ কয়লার আগুনে ঝলসে খেতে হতো। পরে যখন পোড়া মাটির হাঁড়ি উদ্ভাবিত হয়েছে তখন খাবারগুলো সম্পর্কে জানার আরো সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণ হলো মাটির হাঁড়িকুড়ির গায়ে রয়েছে অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র সরু নলের মত ভেতরে ঢুকে গেছে। যা কিছু বিভিন্ন সময় ওই হাঁড়িতে রান্না করা হয়েছে তার কিছু কিছু অতি ক্ষুদ্র অংশ ওই ছিদ্রগুলোতে ঢুকে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। এখন খুব সাবধানী রাসায়নিক বিশ্লেষণে জানা সম্ভব হচ্ছে খাবারগুলোর উপাদান কী কী ছিল এবং সেখান থেকে খাবারগুলোই বা কী ছিলো। এরকম অনেক হাঁড়ি রান্নার কাজ ছাড়াও নানা রকম খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হতো যেমন ফল, রস, মদ ইত্যাদি। এগুলোরও কিছু কিছু অংশ ওভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। চুলার বা হেঁশেলের আশপাশে তৈজসগুলোও অনেক খবর দেয়– পাথরের, হাড়ের কিছু কিছু তৈজস দ্রব্য ও হাতিয়ার বেশ সংরক্ষিত হয়ে যায়। যেহেতু অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা খুব বিরল ছিলনা অনেক সময় আগুনে অঙ্গার

হয়ে কাঠের, বেতের তৈরি জিনিসও অন্তত আংশিক সংরক্ষিত হয়ে গেছে; একই কারণে কাঠের বা গাছের গুড়ির তৈরি বাড়ির খুঁটি, কাঠামো ইত্যাদিও আংশিক সংরক্ষিত হয়ে যেতে পারে।

ওই বসতের যে কোন কিছুর বয়স নির্ণয় করতে পারলে ওই মানুষগুলোর জীবন কাল পাওয়া যায়। সহজে যথেষ্ট সুনির্দিষ্ট করে বয়স নির্ণয় করার একটি উপায় হলো কার্বন ডেইটিং– যেখানে সাধারণ কার্বন ও তেজস্ক্রিয় কার্বনের অনুপাত নির্ণয় থেকে বয়স হিসেব করা যায়। এই কার্বন কোন জৈব জিনিস থেকে আসা চাই– যা এক সময় কোন জীবিত জিনিস উদ্ভিদ বা প্রাণীর অংশ ছিল। তা হলে এই পদ্ধতিতে ওই জীবিত জিনিসটির মৃত্যু কালটি নির্ণয় করা যায়– যেমন হাড়টি যে পশুর বা খুঁটিটি যে উদ্ভিদের তার মৃত্যুকাল। তাতেই কবেকার মানুষের ওই জীবন তা মোটামুটি বেশ বোঝা যায়। অবশ্য বয়স নির্ণয়ের আরো অন্য উপায়ও আছে, ৫০ হাজার বছরের থেকে বেশি পুরানো জিনিসের ক্ষেত্রে, অথবা জৈব কোন জিনিস না থাকলে, ওই অন্য পদ্ধতিগুলোর আশ্রয় নিতে হয়।

বসতের আশেপাশেই বর্জ্য ফেলতে ফেলতে আবর্জনার যে স্তূপ জমে ওঠে বসতকারীরা ওটি হয়তো খুব একটা খেয়াল করেনা। কিন্তু ওখানে বসত যদি প্রজন্মের পর প্রজন্ম চল্‌তে থাকে তা হলে কালক্রমে ওপরের আবর্জনার চাপে নিচেরগুলো বসে গিয়ে জমাট বাঁধা এক রকম আবর্জনা স্তূপ ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত হয়ে যায়। যেমন সমুদ্র তীরের কোন বসতে এমনি স্তূপে শামুক-ঝিনুকের খোলসগুলো আলাদা করে বেশ চেনা যায়। তা ছাড়া নানা বিশ্লেষণে অন্যান্য বর্জ্যগুলোও ধরা পড়ে। ওই জমাট বাঁধা বর্জ্য স্তূপ গড়ে ওঠে এক রকম স্তরে স্তরে; প্রত্যেক সূক্ষ্ম স্তর হয়তো একটি বছরের বিভিন্ন মৌসুমের খবর দেয় পুরো এলাকার জন্য। এভাবে ওখানকার মানুষের মৌসুমি খাদ্য, জনসংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদিরও আন্দাজ পাওয়া যায়।

খুব পরোক্ষ চিহ্নও অনেক সময় কথা বল্‌তে পারে– যেমন একটি বাড়ির অথবা পাড়ার বাড়িগুলোর কিছুই অবশিষ্ট নেই, কিন্তু বিভিন্ন বাড়ির খুঁটির গর্তগুলো মাটির মধ্যে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এতে বাড়িগুলোর নির্মাণ বিন্যাসটি বেশ বোঝা যায়। অনেক সময় ঘটনাক্রমে কোন কোন জিনিস আশাতীত ভাবে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। কোন কোন পুরো এলাকা পরবর্তী কালে হ্রদের পানিতে তলিয়ে গিয়ে সেখানে কাদার মধ্যে সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছে– যে সব জিনিস সাধারণত পাওয়া যায়না সে রকম বীজ, শস্য, পোষাক, মাদুর, কাঠ বেতের আসবাব ইত্যাদি সহ। এভাবে অনেক জায়গায় কাদার মধ্যে সংরক্ষিত হয়ে গেছে পুরো

একটি কালের ওই স্থানের নানা উদ্ভিদের পরাগ রেণু। বাতাসে ভাসে বলে ওই পরাগ রেণু মাটিতে জমতে পারে। এভাবে কাদার বিভিন্ন স্তরে থাকে এক এক সময়ের এসব পরাগ রেণু। আজ এত বছর পরে নলের মত আকৃতিতে এই কাদা খুঁড়ে তুলে আনলে ওই কাদার নলের বিভিন্ন স্তর এক একটি সময় নির্দেশ করবে। শক্তিশালী অণুবীক্ষণে সেই স্তরের পরাগ রেণু উদ্ঘাটন থেকে ওই সময়ের উদ্ভিদ-পরিবেশটি ধরা পড়ে যার থেকে তখনকার মানুষের পারিপার্শিকতা এবং তাদের জীবনে প্রভাব রাখার মত উদ্ভিদগুলোকে খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া উদ্ভিদের কোষের মধ্যে এক রকম অতি ক্ষুদ্র পাথুরে অংশ থাকে– যা এক এক উদ্ভিদে এক এক রকম। অনেক সময় মাটিতে অথবা কৃষিতে ব্যবহৃত প্রাচীন হাতিয়ারের গায়ে এই পাথুরে অংশগুলো খুঁজে পাওয়া যায় যার থেকে কৃষির শস্য অথবা অন্য উদ্ভিদের ব্যবহারের খবর আমরা পেতে পারি।

এভাবে অনেক নির্দশন থেকে আমরা সুদূর অতীতের মানুষের জীবন যাপন সম্পর্কে একটি ছবি খাড়া করতে পারি। কিন্তু এই ছবিতে যেটি খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যায়না তা হলো ওই মানুষদের সামাজিক জীবন। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে এই নিদর্শনগুলো খুব বেশি জানাতে পারেনা। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদরা অনেক সময় সুকৌশলে সে সম্পর্কেও কিছু তথ্য যোগাড় করে ফেলেন। ফ্রান্সের প্যারিসের কাছে ১২ হাজার বছর আগের এক দল শিকারি সংগ্রাহকদের অস্থায়ী বসতের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে যেটি এমনি একটি উদাহরণ হতে পারে। ওই বসতে পাঁচটি পৃথক পরিবার আলাদা আলাদা ভাবে কাছাকাছি বাস করেছে, যেখানে তাদের প্রত্যেকের আলাদা চুলাগুলোর চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সে সঙ্গে আধখাওয়া হাড়। কিছু হাড়ের বিশ্লেষণে দেখা গেছে পাঁচটি চুলার কাছেই একই বড় হরিণের আধখাওয়া হাড় রয়েছে। বোঝা গেছে শিকার করা একটি হরিণের মাংস পাঁচটি পরিবারের কাছে বন্টন করা হয়েছিলো। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আলাদা আলাদা পরিবারের মানুষ দলবদ্ধ হয়ে শিকার করেছে, এক সঙ্গে শিকারের স্থানে বসত করেছে এবং শিকারের পশু নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে। সামান্য হাড়ের নিদর্শন থেকে ১২ হাজার আগের মানুষের এই পরস্পর সম্পর্কগুলো আন্দাজ করা কম কথা নয়।

জিনের প্রবাহে নিরবিচ্ছিন্নতা থাকতেই হয়, কারণ আমরা জানি মানুষ বিচ্ছিন্ন ভাবে নানা জায়গায় উদ্ভূত হয়নি; আগের মানুষ এসেই পরের মানুষ সৃষ্টি করেছে। জীবন যাপনের যে ধারা তার মধ্যেও অনেকটা নিরবিচ্ছিন্নতা আছে,

কারণ এক মানুষ থেকে এসব অন্য মানুষ শিখেছে, এক জায়গার মানুষের থেকে অন্য জায়গার মানুষ শিখেছে। কিন্তু এটি সবক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। এক জায়গায় নতুন কোন পদ্ধতি বা হাতিয়ার উদ্ভাবন উদ্ভাবন হলে অনেকে এটি শিখে নিয়েছে বটে কিন্তু সব জায়গার মানুষের পক্ষে তা করা সম্ভব ছিলনা। দূরের তাদের মধ্যে একই রকম জিনিস দেখা গেলে বুঝতে হবে এটি ওরা স্বাধীন ভাবে নিজেরা উদ্ভাবন করেছে। যেমন শিকারি-সংগ্রাহক সব মানুষের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের একাংশে প্রথম কৃষির প্রচলন হয়েছিলো– জীবিকায় একটি বিশাল পরিবর্তন এনে। ওখান থেকে ধীরে ধীরে মানুষের আসা যাওয়ার মাধ্যমে এটি ক্রমে আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে; কিন্তু সেভাবে সব জায়গায় যেতে পারেনি, অন্তত কৃষি আবিষ্কারের পর কাছাকাছি সময়ে নয়। তাই পূর্ব এশিয়ায়, নিউগিনিতে বা মেক্সিকোতে নতুন শস্য নিয়ে নতুন ভাবে কৃষি উদ্ভাবিত হয়েছিলো আগের কোথাও প্রচলিত কৃষি সম্পর্কে কিছু না জেনেই। কাজেই জীবন-ধারার নতুন পদ্ধতি বিচ্ছিন্ন ভাবে নানা জায়গায় নানা সময়ে সৃষ্টি হতেই পারে– একে জিনের প্রবাহের মত একে নিরবিচ্ছিন্ন একটিই প্রবাহ হতে হয়না। এটি যে বিচ্ছিন্ন হতে পারে তাও জিনের কারণেই। জিনের সেই নিরবিচ্ছিন্নতা, সব জায়গার মানুষই একই জিন প্রবাহে এসেছে বলে এমনি উদ্ভাবনের ক্ষমতা তাদের সবার মস্তিষ্কে সুপ্ত রয়েছে। তাই সব চেয়ে গুরুত্বপর্ণ হচ্ছে সবার ওই জিন সম্ভার, যা পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার আগেই মানুষের মস্তিষ্ক সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। এর উত্তরাধিকার সর্বত্র সবাই সমান ভাবে পেয়েছে বলে জীবন যাপনের কৌশলগুলো সবাই যার যার মত করে উদ্ভাবনও করতে পেরেছে, আবার কখনো একজনের থেকে অন্য জন শিখতেও পেরেছে।

শিল্পী-মনের চিহ্নঃ

মানুষ শুধু কাজের জিনিসের চিহ্নই রেখে গেছে তা নয়, অকাজের জিনিসের চিহ্নও রেখে গেছে– যে সব জিনিস টিকে থাকার জন্য জরুরি নয়, কিন্তু মনের খোরাকের জন্য জরুরি। কাজের চিহ্নগুলো যে রকম মানব ইতিহাসের একবারে গোড়া থেকেই খুঁজে পাওয়া যায়, এগুলো সে রকম নয়। এর জন্য উপযুক্ত মন সৃষ্টি হতে মানুষের সময় লেগেছে। তবে একবার শুরু হবার পর ওই সৃষ্টিশীল নান্দনিক মন প্রায় সর্বত্র সব সময় কোন না কোন রূপে এসব চিহ্ন সৃষ্টি করেছে যার কিছু কিছু আজকের মানুষ খুঁজে পাচ্ছে।

মানুষের নান্দনিক সৃষ্টিগুলোর মধ্যে রয়েছে অলঙ্করণ ও চিত্রণ। বোঝা গেছে মানুষ নিজের শরীরকে রাঙাতো, শামুক-ঝিনুকের মালা থেকে শুরু করে নানা অলঙ্কারে সাজতো। একটি সময় এসে বসতের মধ্যে হাতিয়ার, হাড় ইত্যাদির সঙ্গে এসব অলঙ্কারের নিদর্শনও ওরা রেখে গেছে যার কিছু কিছু আমরা খুঁজে পেয়েছি। শুধু নিজকে সাজানোর মধ্যেই তাদের শিল্পী মন সীমাবদ্ধ থাকেনি, কাজের জিনিসগুলোকে তারা নানা ভাবে নান্দনিক রূপ দিয়েছে, চিত্রিত করেছে– শুধু কাজে লাগানোর জন্য যার দরকার ছিলনা। সর্বশেষ বরফ যুগের পর ১৩ হাজার বছরের মত আগে ইউরোপের শিকারি-সংগ্রাহক মানুষদের মধ্যে এভাবে চিত্রণ এবং খোদাই করে ভাস্কর্য গড়ার প্রবণতাটি খুব বেশি দেখা দেয়। যেমন জোরের সঙ্গে বর্শা ছুঁড়ে দেবার জন্য যে 'নিক্ষেপকারী' ব্যবহৃত হতো, ম্যামথের (হাতির বিশাল পূর্বসূরি) দাঁত, বল্গা হরিণের শিং ইত্যাদিকে খোদাই করা, সুন্দর চিত্রিত আকারে সেগুলোর বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। অনেক সময় বর্শার সরু লাঠিটিকে সোজা রাখার জন্য তাকে সঠিক আয়তনের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে টেনে সোজা করা হতো, সাধারণত ম্যামথের দাঁতের চওড়া পাতে বিভিন্ন আয়তনের ছিদ্র এজন্য করতে হতো। এও ছিল নানা ভাস্কর্যের আকৃতিতে খোদাই করার একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। তা ছাড়া পাথরের ছুরির হাড়ের হাতল ইত্যাদির খোদাই কাজও লক্ষ্যণীয়। একই ভাবে ১২ হাজার বছর আগে যখন পটারির প্রচলন এসেছে তখন পৃথিবীর নানা অঞ্চলে নানা আকর্ষণীয় আকৃতি ও নান্দনিক চেহারার পোড়া মাটির পাত্র তৈরি হয়েছে; এই আকৃতি ও তাদের ওপরে করা চিত্রণের বৈশিষ্ট রীতিমত এক একটি সভ্যতাকে চিহ্নিত করেছে। অথচ ওই পাত্রগুলোকে ব্যবহারের জন্য এ সবের দরকার ছিলনা– কিন্তু কাজের জিনিসকে নান্দনিক শিল্পের জিনিসে পরিণত করাটাই ছিল মানুষের মনের তাগিদ। তাই ওরা যুগে যুগে সে মনের চিহ্নকে রেখে গেছে নানা হাঁড়িকুড়ির ভাঙ্গা টুকরায়, যে সব টুকরাকে অতি সাবধানে জোড়া দিয়ে আজকের প্রত্নতত্ত্ববিদ সেই মনকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেন।

ওই কাজের জিনিসগুলোর খোদাই ওরা কী ভাবে করতো, ওগুলোর ওপর কী তারা আঁকতো? পটারি হাঁড়িকুড়ির ক্ষেত্রে এগুলো শুধুই নক্শা, একই মোটিফ বার বার পুনরাবৃত্তি করে এক এক বিশেষ বৈশিষ্টের নক্শা ফুটিয়ে তোলা হতো। এর কোনটি করা হতো দড়ির ছাপ দিয়ে, কোনটি নানা রকম সীল মোহরের ছাপ দিয়ে, কোনটা নেহাতই হাতের নখ বা পশু-দাঁতের ছাপ পর পর দিয়ে গিয়ে। বরফ যুগ শেষের ইউরোপে ম্যামথের দাঁত, হরিণের দাঁতকে অদ্ভুত সৌকর্যে

আকৃতি দিয়ে এবং খোদাই করে যে ভাস্কর্য আর চিত্রণ, তার কথা অবশ্য আলাদা। যদিও এখানেও নক্‌শার কাজ দেখা যায়, এমন কি রাতের আকাশের ছবি, পরপর চাঁদের কলা ইত্যাদিকেও ফুটিয়ে তুলতে দেখা গেছে; অধিকাংশ খোদাইয়ের বিষয়বস্তু কিন্তু সত্যিকারের শিকারের পশু। এরকম অনেক ক্ষেত্রে মনে হয়েছে ওই প্রাচীন শিল্পী একেবারেই নিভৃতচারী, কোন কাজের জিনিসের ওপর নয়, তার শিল্প সবার দেখার জন্যও নয়, বরং যাকে আঁকছে তার সঙ্গে শিল্পীর আত্মিক সম্পর্কের কারণেই এমন নিখুঁত ভাবে তাকে ফুটিয়ে তোলা– একেবারেই শিল্পের খাতিরে শিল্প!

ওই ১৩ হাজার বছর আগের এক শিল্পীর এরকম অদ্ভুত একটি কাজ খুঁজে পাওয়া গেছে ফ্রান্সের মন্‌ট্রাস্ট্রুক নাম জায়গায়। ম্যামথের দাঁতের আগার দিকের ফুট খানেক কেটে তার থেকে খোদাই করা হয়েছে একের পেছনে আরেকটি দুটি বল্গা হরিণ– সামনেরটি স্ত্রী, পেছনেরটি পুরুষ– উভয়ে পানিতে সাঁতার-রত। এক ফুট ম্যামথ-দাঁতের সংক্ষিপ্ত পরিসরে বল্গা হরিণের এমন কোন খুঁটিনাটি নেই যা শিল্পী ফুটিয়ে তোলেননি, স্ত্রী-পুরুষ আলাদা করতে পারা, সাঁতার কাটার ভঙ্গি বুঝতে পারা, পাঁজরের হাড় দেখা যাওয়া, এমনকি সময়টি যে শরৎকাল সেটিও বুঝতে পারা। একমাত্র শরৎ কালেই স্ত্রী-পুরুষ উভয় হরিণেরই শিং থাকে, অন্য সময় শুধু পুরুষের থাকে। এ যেন হরিণকে একেবারে জাজ্বল্যমান করে তার সঙ্গে নির্ভূতে কথা বলা। প্রায় একই সময়ে স্পেনের আলতামিরা গুহার অন্ধকার দেয়ালে আঁকা বাইসনের, বন্য ঘোড়ার বিশাল সব ছবি একই রকম বাস্তবানুগ শক্তির ভাব সৃষ্টি করেছে। রঙীন মাটির গুড়া দিয়ে রঙ তৈরি করে মোটা তুলির বড় টানে এমন ছবি আকাঁকে পশুর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা ছাড়া আর কি বলা যায়? তবে হয়তো শিকারকে কেন্দ্র করে দলের সব সদস্যদের মধ্যে একটি মানসিক ম্যাজিক সৃষ্টির প্রচেষ্টা সেখানে ছিল– মানুষে প্রাণীতে যোগাযোগ থাকতো যার মূলে।

আমরা যদি একেবারেই অন্য যুগের এবং অন্য জায়গার মানুষের কাছে চলে যাই তা হলে ২ হাজার বছর আগের আমেরিকার ওহাইয়ো অঙ্গ রাজ্যের মাউন্ড সিটিতে পাওয়া কিছু নিদর্শনে যাই মানুষে-প্রাণীতে আরেক রকম সংযোগ দেখি যেটি আরো কাছাকাছি। এখানে মাটির ডিবির নিচে যা স্থানীয়দেরকে কবরখানা হিসেবে দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হয়ে এসেছে তাতে পাওয়া গেছে ২০০টি ধূমপানের পাইপ। এগুলোর প্রত্যেকটি পাইপ-স্টোন নামের বিশেষ পাথরকে চমৎকার ভাবে খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে– এক একটি প্রাণীর আদলে। পানির মাছ

শিকারি প্রাণী উদের আদলে তৈরি পাইপটিকে দেখা যাক। অনেকটা আয়তাকার একটি লম্বা বিস্কুটের আকৃতিতে তৈরি অংশ হলো পাইপটির তলদেশ যার ভেতর দিয়ে একটি নলের মত ছিদ্রের এক প্রান্ত বিস্কুটের প্রান্তের সঙ্গে থাকে ধূমপায়ীর ঠোঁটে, আর যার অন্য প্রান্ত বিস্কুটের মাঝামাঝি জায়গায় ওপরে দিকে উঠে গেছে পাইপের বাটিতে। জ্বলতে থাকা তামাক থাকা এই বাটিটি হুবহু উদের মুখের আদলে খোদাই করা। এত চমৎকার ভাবে আসল উদকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যেন তার পানিতে ভিজে জব জব করা পশম থেকে এখনো পানি ঝরছে। উদের মুখটি ধূমপায়ীর দিকে মুখ করা। তিনি যখন পাইপে সুখটান দিতেন তখন তাঁর চোখ আর উদের চোখ যেন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকতো, উভয়ের চোখের দূরত্ব কয়েক ইঞ্চি মাত্র। উদের সঙ্গে এই নিভৃত যোগাযোগ সৃষ্টিটিই হয়তো ছিল শিল্পীর উদ্দেশ্য।

আনুষ্ঠানিক চিহ্নঃ

মানুষের ইতিহাসে যখন এগিয়ে গিয়ে বড় আকারের সামাজিক রূপ ধারণ করেছে ধর্ম, রাষ্ট্র, রাজবংশ ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে– তখন থেকে তার জীবন ধারার মধ্যে অনেক কিছু ঢুকেছে যাকে আনুষ্ঠানিক আখ্যা দেয়া যায়। এর আগে মানুষের জীবন-চিহ্নগুলো মূলত ব্যক্তিগত, পারিবারিক, বা ছোট দলের প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু এই পর্যায়ে গিয়ে বৃহত্তর আনুষ্ঠানিকতাগুলো এর সঙ্গে যোগ হয়েছে, যা প্রকাশ পেয়েছে নানা স্থাপত্যে– প্রাসাদ, মন্দিরে, সমাধিতে; সেই সঙ্গে ধর্ম, রাজ্য, রাজশক্তি ইত্যাদিকে গৌরবান্বিত করার জন্য নানা স্থাপনা, ফলক, স্তম্ভ, মূর্তি এবং চিত্রণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এর সঙ্গে মানুষের ভ্রমণ, আনাগোনা ইত্যাদিও জড়িত থাকে। রাষ্ট্রীয় কারণে এসব স্থাপনায় বহু মানুষকে নানা দিক থেকে ওখানে যেতে হয়েছে, থাকতে হয়েছে; ধর্মীয় কারণে তীর্থযাত্রার মত ভ্রমণেও অনেককে যেতে হয়েছে; এর সবই দূরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের পথ প্রশস্ত করেছে। এই সব যোগাযোগ উদ্ঘাটনে আনুষ্ঠানিক চিহ্নগুলো খুব কাছে এসেছে।

মানুষের এই পর্যায় শুরু হবার একেবারে গোড়ার দিকের একটি উদাহরণ দেয়া যাক। সিরিয়ার মুরাবেট নামক জায়গায় দুটি প্রত্নতাত্ত্বিক খননে দেখা গেছে যে ১০ হাজার বছর আগে এ অঞ্চলে কৃষি উদ্ভাবিত হবারও আগের সময়ে এটি বন্য গম ও রাই শস্যের একটি উৎপাদন ও বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে উঠেছিলো। এ শস্যগুলোর যে নিদর্শন ওখান থেকে পাওয়া গেছে সেগুলো তখন পুরাপুরি বন্য

নেই। বাছাই হতে হতে অনেকখানি কৃষি-উপযোগী হয়ে ওঠেছে, আলাদা জায়গায় এক সঙ্গে লাগিয়ে এর সুফল পাওয়া যায়, যদিও তখনো এটি ঠিক কৃষি-শস্য হয়ে ওঠেনি অর্থাৎ মানুষের একেবারে পোষ মানা উদ্ভিদ হয়নি। মুরাবেট থেকে শ'দেড়েক মাইল দূরে জেরফ আল আহমার আর গোবেকলি নামক দুটি জায়গার সঙ্গে এর একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বোঝা যায়- তাও ওই দুই জায়গার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে। এই তিনটি জায়গাতেই বড় বড় শস্যাগারের নিদর্শন রয়েছে, আর শেষের দুটিতে স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি সাময়িক অতিরিক্ত জন-সমাগমের স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। গোবেকলিতে উদ্ঘাটিত হয়েছে কতগুলো বড় বড় স্তম্ভ যার সামনে জন-সমাগমের চত্বর। চূণাপাথরে গড়া এ স্তম্ভগুলো একেবারে নিয়ম মত সাজানো; কয়েকটি বাড়ির প্রত্যেকটির সামনে পাশাপাশি দুটি স্তম্ভ – ৮ ফুট উঁচু দুদিকে দুটি বাহু প্রসারিত T অক্ষরটির মত। এদের সামনে বসতে পারার মত পাথরের বেঞ্চ। প্রত্যেকটি স্তম্ভের ওপর সাপ, বাজপাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি নানা অদ্ভুত সমন্বয়ে প্রাণীর ছবি, ঘন জটলায় খোদাই করে আঁকা। সব কিছুই বেশ রহস্যজনক– কারণ ঠিক এরকম চিত্রণের কিছু নিদর্শন জেরফ আল্ আহমারেও পাওয়া গেছে এবং কিছুটা ছোট সংস্করণে মুরাবেটেও। মুরাবেট থেকে গোবেকলি যাবার পথে জেরফ আল আহমার একটি মধ্যবর্তী স্থান ছিল এবং গোবেকলি ছিল একটি তীর্থযাত্রার প্রধান গন্তব্য। ওই চিত্রণগুলোই ছিল তাদের বিশ্বাসের একটি রহস্যময় প্রতীক। হয়তো এই তীর্থযাত্রার সঙ্গেই কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল নতুন বীজের একটি বাণিজ্য কেন্দ্র– এখানকার শস্যাগারগুলো দেখে সেরকমই মনে হয়। তীর্থ যাত্রার সময়মটিতে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এখানে আসতো এবং নিজেদের বাছাই করে করে তৈরি করা নতুন শস্য বীজের বিনিময় করতো।

এরকম নানা উপাদানের সমন্বয়ে একদিন মানুষ যে আনুষ্ঠানিক সংগঠন, আনুষ্ঠানিক স্থাপনা, বড় আকারে নিয়ম নীতি, বিধি-বিধান গড়ে তুলেছিলো তারো চিহ্ন তারা রেখে গেছে। শুরুতে গোবেকলির মত সরল স্তম্ভের রহস্যময় চিত্রণের চিহ্নই পাওয়া গিয়েছে– যা খুব জমকালো কিছু না হলেও এর মধ্যে আয়োজনের ছাপ আছে, আনুষ্ঠানিকতার ছাপ আছে। এই ছাপগুলোই পরে আরো স্পষ্ট চিহ্ন হিসেবে এসেছে মহানগরী, পিরামিড, কিংবা ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান হিসেবে। কিন্তু সব সময় আনুষ্ঠানিক চিহ্নকে এরকম জমকালো কিছু হতে হয়নি। মেসোপোটেমিয়ার (বর্তমান ইরাক) মানুষরা যখন ইউফ্রেটিস নদীর সৃষ্ট নরম কাদাকে ছোট ছোট চেপটা পিঠার মত করে তার গায়ে নানা আকৃতির সীল

দিতো। এরপর পিঠাগুলোকে রোদে শুকিয়ে নিলে সেগুলো নানা কাজে এক ধরনের টোকেন হিসেবে কাজ করতো। এই টোকেনের যে সব নমুনা তখন পাওয়া গেছে তাতে ধারণা করা যায় ব্যাবিলন বা উরুকের মত মহানগরীতে শিল্প বাণিজ্যের কী রকম বড় আয়োজন ছিল। যেমন ওই টোকেন দিয়ে ওখানে শ্রমিকের বেতন দেয়া হতো। কোন কোন টোকেনে লেখা থাকতো এর মূল্য (ধরা যাক) দশ পাত্র বিয়ার মদ। কৃষিজ বার্লি শস্য থেকে তৈরি বিয়ার ওখানে বেতন হিসেবে বেশ জনপ্রিয় ছিল। এতে অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই, কারণ তারও কয়েক হাজার বছর পর রোমান সাম্রাজ্যের কোথাও কোথাও সৈন্যদেরকে লবন দিয়ে বেতন দেয়া হতো– লবনের চাহিদা খুব বেশি ছিল বলে। সে কারণেই বেতনকে এখনো ল্যাটিন উদ্ভুত ভাষা ইংরেজিতে স্যালারি বলা হয় (লবনের ল্যাটিন হলো স্যালিস)।

শুধু বেতনের টোকেন কেন, বাণিজ্যের বিনিময় হিসেবে শেষ পর্যন্ত যেই মুদ্রা চালু হয়েছে সেটিও অর্থনীতির আনুষ্ঠানিক আয়োজনকে বহু যুগ পরেও বুঝতে সাহায্য করেছে– বিশেষ করে দূর বাণিজ্যের আয়োজনকে। বাণিজ্যে বিনিময়ের অন্য ব্যবস্থা বহুকাল ধরেই চালু ছিল কোন জায়গার শস্য দিয়ে, কোন জায়গায় কড়ি, আবার কোন জায়গায় অন্য কিছু। কিন্তু এগুলোর ওপর কোন সীল মোহর ছিলনা, কোন রাজার ছবি ছিলনা, আর কোন লিপিতে কারো নাম বা কোন সন তারিখ তো ছিলইনা। মুদ্রাতে এসব ছিল, তাই ওই বিরাট আনুষ্ঠানিক জগতের চিহ্ন হিসেবে এই ছোট মুদ্রাটিও অনেক কাজে এসেছে। মুদ্রার এই কাজে আসাটি শুধু বাণিজ্যের আয়োজন বোঝার জন্য নয়, তা রাজ্যের রাজার গুরুত্ব, নানা দেশে তাঁর প্রভাব ইত্যাদি বোঝার জন্যও বটে– মুদ্রাটি কোথায় কোথায় পাওয়া গেছে তা দেখে।

লিপি উদ্ভাবনের পর পর আনুষ্ঠানিক জগতের এই চিহ্নগুলো পাওয়া আরো অনেক সহজ হয়ে গেছে। লিপি যেখানে পাওয়া গেছে, সে লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হলে তার পেছনের অনেক আয়োজনের খবর এক সঙ্গে পাওয়া সম্ভব হয়েছে– সেটি হতে পারে স্তম্ভের ওপর উৎকীর্ণ কোন ধর্মীয় বাণী (যেমন ভারতের অশোক স্তম্ভ), হতে পারে রাজার বিধিবিধান (মেসোপোটেমিয়ার রাজা হামুরাব্বির বিধান), তামার পাতে খোদাই করা কোন অনুদানের দলিল (ভারতের ব্রাহ্মণদেরকে রাজার জমি দানের দলিল) ইত্যাদি। হাজার হাজার বছর ধরে জিনের এবং জীবন-ধারার প্রবাহ এমনি ভাবে পথে পথে তার চিহ্ন রেখে গেছে, সেগুলো খুঁজে খুঁজে আমরা শিকড় অনুসরণ করতে পারি।

কেন আফ্রিকা, কেন চট্টগ্রাম

‘জ্ঞানী আমাদের’ উৎস

আফ্রিকার এখানে ওখানেঃ

এ বইয়ে যে শিকড়ের কথা বলা হচ্ছে তার সব প্রবাহগুলোর উৎস আফ্রিকায়। কাজেই আফ্রিকার কথা কেন আসছে তার উত্তরটি খুব সহজ। আফ্রিকাই প্রবাহের উৎস হবার কারণ হলো আমাদের প্রজাতির মানুষের সৃষ্টি এবং অনেকটা বিকাশ আফ্রিকাতেই, তারপর সেখান থেকেই আমরা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়েছি। আমাদের আগের অন্য যে সব মানব প্রজাতি তাদেরও সৃষ্টি ওখানেই। কাজেই মানুষের সঙ্গে সঙ্গে যায় জিন, জীবন-ধারা আর ভাষার যে প্রবাহ, তার কাহিনী আফ্রিকা থেকে শুরু আমাদের করতেই হয়।

কিন্তু সেই প্রবাহের গন্তব্য হিসেবে তো পৃথিবীর সর্বত্র, প্রত্যেকটি আনাচে কানাচে যেখানেই মানুষ পৌঁছে গিয়েছে তার যে কোন জায়গার কথাই আনা যায়। এই প্রবাহের এ রকম অসংখ্য গন্তব্য; এর মধ্যে যে কোন একটি গন্তব্যের মানব-ইতিহাস তুলে ধরতে পারলে আমাদের কাহিনীটি শেষ করা যায়। এই বইয়ে সেই গন্তব্যটি পুরো একটি দেশ হতে পারতো, আফ্রিকার মত অন্য একটি মহাদেশ হতেই বা আপত্তি কী? কিন্তু তাতে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হতোনা। গন্তব্যটির বর্ণনা হওয়া চাই ওই সাধারণ মানুষেরই সরাসরি নিজেদের অভিজ্ঞতার যত ঘনিষ্ঠ পরিসরে হওয়া যায় ততটায়– বিশেষ করে তাদের বেড়ে ওঠা, ভাষা লাভ, কাছের মানুষদের থেকে অতীত গল্প শোনার ও শেখার মধ্যেই। এই বইয়ের লেখকের দিক থেকে এ শর্ত যেখানে বেশি পূরণ হয় সেটি চট্টগ্রাম। একে এক ধরণের পক্ষপাত বলা যায়, অবশ্য লেখকের কাজের জন্য সুবিধাজনক পক্ষপাত। সেভাবেই প্রবাহের গন্তব্য হিসেবে চট্টগ্রাম এসেছে, দুনিয়ার অন্য যে কোন গন্তব্যই আসতে পারতো। আমাদের আলোচনায় শুরুতে অবশ্য আসে উৎসের কথাটাই।

একটি দৃশ্য কল্পনা করা যাক; সেটি নেহাত কল্পনা হবেনা কারণ অনেক বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য-প্রমাণে এরকম একটি দৃশ্যের সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। স্থান: পূর্ব আফ্রিকার সাভানা তৃণভূমি, সময়: এক লক্ষ বছরের কিছু আগের। দূরে দূরে ছাড়া ছাড়া কিছু বড় গাছ আছে বটে কিন্তু বাকি খোলা জায়গায় শুধু লম্বা ঘাস

আর অনুচ্চ ঝোপ। খোলা ওই জায়গায় চরছে বেশ কিছু ওয়াইল্ডি বীস্ট, আর জিরাফ– এখানকার বড় বড় পশুদের কয়েকটি। বেশ দূর থেকে চিতা, সিংহ এসব হিংস্র প্রাণীর গর্জনের আওয়াজ ভেসে আসছে। ওই গাছগুলোর ওপর রয়েছে বেশ কিছু বড় বড় বানর, আর আছে শিম্পাঞ্জির একটি গোষ্ঠি– গাছের ডাল থেকে ঝোলাঝুলি করে, আবার মাটিতে নেমে কিছুক্ষণ দাপদাপি করে চলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, চেঁচামেচি। এর মধ্যে একেবারেই সবার দৃষ্টি আর শ্রবণের আড়ালে রয়ে গেছে অল্প কয়েকটি অন্য রকম প্রাণী, হালকা পাতলা পাঁচ ফুট মত লম্বা একটি কাঠি বল্‌লেই চলে; ঝোপের আড়ালে, ঝোপের সঙ্গে যেন প্রায় লেপ্‌টে আছে। খুব কাছে যদি কেউ যেতো শুন্‌তে পেতো তাদের নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিস শব্দ– ঠিক কথার মত নয়, কিন্তু এও যে শলা পরামর্শ, একে অন্যকে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করছে তা বেশ বোঝা যায়। সেই ফিসফিসের পর তাদের দু'একজনকে দেখা গেলো মাথা নিচু করে কয়েকটি ঝোপ পার হয়ে অন্যদিকে চলে গেলো। এদের শরীরে চোখে পড়ার মত একটা জায়গাই আছে তা তাদের দেহের তুলনায় বেঢক এক বড় মাথা। ওই মাথা নিয়ে বেচারারা বিপদেই আছে বল্‌তে হয়। আমাদের কালের বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন এই মাথার কাজটিই এমন যে তার শক্তির খাই খুব বেশি– দেহের শতকরা ২৫ ভাগ শক্তি মাথাতেই শেষ হয়ে যায়; এর পরের যেই প্রাণীর একটু বড় মাথা সেই শিম্পাঞ্জির যায় শতকরা মাত্র ৮ ভাগ। ফলে ওই প্রাণীটির বাকি দেহে পেশি শক্তি খুব বেশি থাকেনা; আশপাশে কারো সঙ্গে না পারে দৌড়ে, না পারে লড়াইয়ে। তাই ওই ফিসফিসানি গলায় পরামর্শ করে ঠিক করেছে কী ভাবে একটি বিশাল জিরাফকে কাবু করে শিকার করবে। এটি তাদের খুব দরকার। শুধু শিকার হলে চল্‌বেনা, বন থেকে ফল-মূল এসবও চাই, সব এক সঙ্গে না খেলে যে তার মাথার শক্তির খাই মেটেনা। জিরাফকে সে ঠিকই মারবে, হাতে যে পাথরের মোক্ষম অস্ত্রটি রয়েছে সেটিই তাকে সাহায্য করবে। মাথার বুদ্ধিতেই এই অস্ত্র সে বানাতে পেরেছে।

এক লাখ বছরেরও পরের আমাদের কালের বিজ্ঞানীরা সাভানায় ফিসফিস করা, প্রায় দেখা না যাওয়া ওই প্রাণীগুলোর নাম দিয়েছেন 'জ্ঞানী আমরা' (হোমো সেপিয়েন্স)। জ্ঞানী কথাটি বোঝাই যাচ্ছে তার বড় মস্তিষ্কের বুদ্ধিমত্তার কারণে দেয়া। 'আমরা' কথাটি বলার কারণ হলো দেখা যাচ্ছে যে ওদের সঙ্গে আমাদের মত আজকের মানুষের তেমন কোন পার্থক্য জীবতাত্ত্বিক দিক থেকে নেই, তারা ঠিক আমাদের মতই মানুষ। সেই হিসেবে আমরা নিজেদেরকেই নিজেরা জ্ঞানী

নাম দিয়েছি; দেয়া যখন হয়েছে এই জ্ঞানী নামেই আমরা এখন থেকে ওদেরকে ডাকবো। ওই যে দৃশ্যের কথা বললাম সেটি পূর্ব আফ্রিকায় লক্ষ বছর আগের হলেও এখন দেখা যাচ্ছে এই জ্ঞানী মানুষদের চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে অন্তত লাখ দুয়েক বছর আগে থেকে; পূর্ব আফ্রিকা সহ আফ্রিকার নানা জায়গায় তাদের উৎপত্তি হয়েছে। স্পষ্টত অতীতের জ্ঞানী-সদৃশ অন্য প্রজাতির মানুষদের থেকে বিবর্তনের মাধ্যমেই এই উৎপত্তি। এটি বোঝা গেছে পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েকটি জায়গায় এরকম মানুষের ফসিল পাওয়ার মাধ্যমে– এগুলো সব দেড় থেকে দুই লক্ষ বছর আগের। ইথিওপিয়ায় ২ লক্ষ বছর আগের জ্ঞানী মানুষের প্রাচীনতম ফসিল পাওয়া গেছে মাথার খুলি ও চোয়ালের কয়েকটি টুকরা হিসেবে। কিন্তু খুব সম্প্রতি মরক্কোর জেবেল ইরহুদ নামক স্থানে ৫ জন জ্ঞানী মানুষের মাথার খুলি, চোয়াল, এবং হাত পায়ের আঙ্গুলের অংশ পাওয়া গেছে যার বয়স ৩ লক্ষ বছর পর্যন্ত হতে পারে। আসলে জ্ঞানী মানুষ আফ্রিকার এখানে ওখানে বেশ দীর্ঘ একটি সময় ধরে ধীরে ধীরে বিবর্তিত হচ্ছিলো, তারও আগের অন্য প্রজাতির মানুষের থেকে; এবং নানা গবেষণা থেকে বোঝা যাচ্ছিলো পুরাপুরি আমাদের প্রজাতির এই মানুষ দেড় থেকে দুই লাখ বছর আগের সময়ে আফ্রিকাতে কয়েক জায়গায় দিব্যি বাস করছিলো। প্রায় সব দিক থেকে আমাদের মত 'জ্ঞানী' মানুষ হলেও তখনো কিন্তু কিছু কিছু জিনিসের পূর্ণ বিকাশ ঘটেনি, যেমন সত্যিকার ভাষার অধিকারী তারা ছিলনা, সেটি পরে এসেছে।

যে সব গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে ওরাই আমাদের সাক্ষাত পূর্বসূরি তার মধ্যে খুবই চমকপ্রদ হলো ডিএনএ'র মাধ্যমে একটি অনুসন্ধান। ইতোপূর্বে আমরা মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ'র যে ব্যবহার অতীত অনুসন্ধানে দেখেছিলাম এও অনেকটা সে রকম। আজকের দিনের নানা দেশের নানা জাতিসত্তার সব রকম স্ত্রী পুরুষ মানুষের ইতস্তত নমুনা থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করে তার মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ অংশটুকু বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এতে মিউট্যাশনের সংখ্যা তুলনা করে বোঝা যায় নারী ধারায় তাদের সবার সাক্ষাত পূর্বসূরি গড়পড়তা কত প্রজন্ম আগে একই নারী ছিল। উদাহরণ স্বরূপ এশিয়া-ইউরোপ অঞ্চলের মানুষদের ডিএনএতে দেখা গেছে এখানকার সব মানুষের পূর্বসূরি নারী খুব বেশি আগের প্রজন্মের নয়। অর্থাৎ এ দুই মহাদেশের মানুষরা সবাই অপেক্ষাকৃত কম সময় আগের একই নারীদের বংশধর– যাদের অল্প কয়েকজন আফ্রিকা থেকে এখানে এসেছিলো। কিন্তু আফ্রিকার মানুষদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি অন্য রকম। তাদের একের সঙ্গে অন্যের মিউট্যাশন সংখ্যায়

বিরাট পার্থক্য, এশিয়া-ইউরোপের মানুষের সঙ্গেও। এই বড় পার্থক্য দেখিয়ে দিচ্ছে তারা সবাই নারী ধারায় যে মানুষটির সাক্ষাত বংশধর, সে অতি প্রাচীন। দেখা যাচ্ছে যে সেই নারী প্রায় দেড় থেকে দুই লাখ বছর আগে আফ্রিকাতে বাস করতো। এভাবে ডিএনএ পরীক্ষায় পাওয়া ওই গড়পড়তা হিসেবের আদি নারীকে বলা হলো 'আফ্রিকান মা'। প্রাচীন ফসিল পরীক্ষায় যা বোঝা যাচ্ছিলো, আজকের সব রকম মানুষের ডিএনএ থেকে তা আরো ভাল ভাবে প্রমাণিত হলো। সব দিক থেকে দেখা গেলো 'আমরা জ্ঞানীদের' উৎপত্তি উৎস ওই আফ্রিকাতেই। পরে ডিএনএ'র প্রধান নিউক্লিয়ার (কোষ-কেন্দ্রে থাকা) অংশ থেকে পুরুষ সূচক জিনকে নিয়ে একই রকম তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে পুরুষ ধারায়ও আদি পূর্বপুরুষের স্থান সেই আফ্রিকা, সেই আদি পূর্ব পুরুষের কাল ওই একই দেড় থেকে দুই লক্ষ বছর আগে।

জ্ঞানীদের আগের মানুষঃ

আফ্রিকার নানা জায়গায় জ্ঞানীরা যাদের মধ্য থেকে বিবর্তিত হচ্ছিলো তারাও মানুষ, অনেক দিক থেকে জ্ঞানীদের মত হয়েও মস্তিষ্কের গঠনে কিছুটা পিছিয়ে ছিলো বলে তাদেরকে বলা হয় প্রায়-জ্ঞানী। তাদের প্রজাতি ভিন্ন, এরকম ভিন্ন প্রজাতির মানুষ বেশ কয়েক রকমেরই ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর ধরে ওই আফ্রিকাতেই– প্রজাতির দিক থেকে ওরা আমাদের সাক্ষাত পূর্বসূরি নয়, কিন্তু এক মানব ধারা থেকে অন্য মানব ধারায় যে আরো পেছনের ইতিহাস সেখানে তাদের ও আমাদের পূর্বসূরি একই বটে। এই প্রায়-জ্ঞানীদের একটি দল আফ্রিকা ছেড়ে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছিলো এবং সেখানে আরো বিবর্তিত হয়ে নিয়ানডার্থাল মানুষে পরিণত হয়েছিলো, যাদের সাক্ষাত আমরা ইতোমধ্যে পেয়েছি; এক সময় মধ্যপ্রাচ্যে এবং ইউরোপে জ্ঞানীদের পাশাপাশি থেকেছে এবং তাদের সঙ্গে যৌন সম্পর্কও গড়েছে। জ্ঞানীদের সঙ্গে খুব কাছাকাছি প্রজাতি হওয়াতেই এটি সম্ভব হয়েছে। একটু আগে দেখেছি যে কিছু সংখ্যক জ্ঞানীরাও এক সময় আফ্রিকা ছেড়ে এশিয়া-ইউরোপে গিয়েছিলো, সে অনেক পরের কথা, যা আমরা বিস্তারিত দেখার সুযোগ পাব পরবর্তী একটি অধ্যায়ে। আফ্রিকার ভেতরে ও বাইরে ফসিল পরীক্ষায় ৫ লক্ষ বছর আগে প্রায়-জ্ঞানীদের, এবং ৭০-৮০ হাজার বছর আগে জ্ঞানীদের অনেকের, আফ্রিকা ছেড়ে অভিবাসী হবার প্রমাণ বেশ কিছু দিন ধরে আমাদের কাছে ছিলো।

অতি সম্প্রতি মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ বিশ্লেষণ ঠিক এই তথ্যটিকেই চমৎকার ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আফ্রিকার ভেতরের ও বাইরের আজকের বিভিন্ন মানুষের মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ'র মিউট্যাশনগুলো খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে এই আধুনিক জ্ঞানী মানুষের মাতৃধারায় তাদেরও পেছনে অন্য রকম মানুষের ধারার যে চিহ্ন এই মিউট্যাশনে রয়েছে, তাতে বিভিন্ন প্রাচীন কালে আফ্রিকা থেকে বেশ কয়েকবার অভিবাসনের কথা বোঝা যায়। আমরা আগেই দেখেছি কেমন করে আজকের মানুষের মাইটোকোনড্রিয়াল ডিএনএ থেকে অতীত অভিবাসন বোঝা যায়, তার কালও বোঝা যায়। সে ভাবেই তো বোঝা গেছে কেমন করে গত দু'হাজার বছরে ধাপে ধাপে মানুষ তাইওয়ান থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতে গিয়ে পৌঁছেছিল। ওই ঠিক একই ভাবে আজকের নানা মানুষের ডিএনএ থেকে বোঝা গেছে যে জ্ঞানী মানুষ ও তারও আগের মানুষের ধারায় আফ্রিকা থেকে বাইরে সর্ব শেষ দুটি অভিবাসন হয়েছে– একটি ৫ লক্ষ বছর আগে প্রায়-জ্ঞানীদের ক্ষেত্রে, এবং আরেকটি ৮০ হাজার বছর আগে জ্ঞানীদের ক্ষেত্রে। এই উভয় অভিবাসন ফসিল সাক্ষ্য থেকে আগেই বোঝা গিয়েছিলো।

আফ্রিকা ছিলো পুরো মানব-ধারার লীলা ক্ষেত্র

লুসিঃ

জ্ঞানীর ইতিহাস মাত্র দেড়-দুই লক্ষ বছর হলেও, পুরো মানব-ধারার ইতিহাস কিন্তু অনেক প্রাচীন; আর বরাবর আফ্রিকাই ছিল তার লালন ক্ষেত্রে। এটি আমরা বুঝতে পারছি ১৯৬০ এর দশকে কেনিয়ার আফার নামক স্থানে একজন নারী আধা-মানুষ আধা-নর-বানরের প্রায় পুরো কঙ্কাল আবিষ্কারের মাধ্যমে – যে বাস করতো প্রায় ৪৫ লক্ষ বছর আগে। ওই ১৯৬০ এর দশকে পপ গানের জগতে বীটলদের খ্যাতি তুঙ্গে। তাদের একটি গান 'লুসি ইন দি স্কাই লাইক এ্যা ডায়মণ্ড' থেকে ওই লুসি নামটি সেই প্রাচীন নারীকে দেয়া হয়েছিলো। লুসির আবিষ্কার কিন্তু মানব-ধারার সূত্রপাত বোঝার চেষ্টায় একটি বিরাট ঘটনা। এই কঙ্কাল থেকে বোঝা গিয়েছিলো লুসি দু'পায়ে খাড়া হয়ে হাঁটতো যা তার সমসাময়িক অন্য নর-বানররা করতোনা, এখনো ওই নর-বানরের বংশধর শিম্পাঞ্জি ইত্যাদিরা করেনা। লুসির পায়ের পাতা নর-বানরের মত ছিলনা, মানুষের মত ছিল– লুসির কাছাকাছি জায়গার ও সময়ের কিছু পায়ের চিহ্নের ফসিল আবিষ্কৃত হয়ে ব্যাপারটি পরিস্কার হয়ে গেছে। নর-বানরের পায়ের পাতা

হাতের পাতার মত বুড়ো আঙ্গুল ও অন্যান্য আঙ্গুল তালুর একই কেন্দ্র থেকে ছড়ানো। কিন্তু লুসির এবং তার মত অন্যান্যদের পায়ের পাতা লম্বাটে, যার সামনের থেকে একই দিকে ছোট ছোট আঙ্গুল। এটি মানুষের পায়ের বৈশিষ্ট। সব কিছু মিলে বোঝা গেছে যে লুসির যে প্রজাতি সেটিই ছিল নর-বানর থেকে আলাদা হয়ে মানুষ হবার পথে প্রথম যাত্রা। আমরা লুসি নামে ডাকলেও তার প্রজাতিটির পোষাকি নাম ছিল আফারানসিস– আফার নামে কেনিয়ার যে গ্রামে লুসির কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিলো তার নাম অনুসারে।

মানবমুখী সেই যাত্রায় দুই পায়ে দাঁড়ানো এবং দুই পায়ে হাঁটাটিই ছিল সব থেকে বৈপ্লবিক ঘটনা। আর বিবর্তনের ইতিহাসে জিন-মিউট্যাশনে সৃষ্ট এই ব্যাপারটি টিকে যাওয়ার কারণ ছিল তখনকার একটি বড় জলবায়ু পরিবর্তন– সেই ৪৫ লক্ষ বছর আগে। গাছে খাবারের অভাবের কারণে লুসির মত নর-বানরদেরকে মাটিতে তৃণভূমিতে নেমে আসতে হয়েছিলো, এবং সেখানে যাদের মধ্যে ওই দুই পায়ে হাঁটার মিউট্যাশন ছিল তারাই শুধু টিকে থাকতে পেরেছিলো! কারণ তারাই দূরে হিংস্র প্রাণী দেখার, খাদ্য উৎস দেখার, এবং হাতে পাথর, লাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করার সুবিধাগুলো পেয়ে বেশি টিকে ছিল, এবং ফলে একই আফারানসিসের বংশ বৃদ্ধি করতে পেরেছিলো। প্রায় একই সময় পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এমনি রকম আরো কিছু নর-বানরের মাথার খুলির ও চোয়ালের ফসিলের অংশ পাওয়া গিয়েছে যারা লুসির মত ঠিক আফারানসিস প্রজাতি না হলেও তার সঙ্গে অনেক দিক থেকে মিল ছিল নর-বানরের মানব-মুখী যাত্রার ব্যাপারে। সব কিছুর সমন্বয়ে এটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে ওই প্রায় ৫০ লক্ষ বছর আগে থেকেই মানুষের ইতিহাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। ওরা আমাদের মত মানুষ ছিলনা, তাদের থেকে শুরু করে জ্ঞানী মানুষের উৎপত্তির পর্যায়ে আসতে প্রায় ৪৮ লক্ষ বছর কেটে গেছে; এর মধ্যে আরো বহু প্রজাতির মানুষের উদ্ভব হয়েছে – সবই আফ্রিকাতেই।

আমাদের অন্যান্য সব মানব পূর্বসূরিঃ

ওই যে মানব ধারার যাত্রা ৫০ লক্ষ বছর আগে শুরু হয়েছিলো আরো প্রায় ৩০ লক্ষ বছর ধরে তার নানা বিবর্তন হয়েছে বটে, সে মানুষ তখনো নর-বানর ও আজকের মানুষের মাঝামাঝি নানা অবস্থায় থেকে গিয়েছিলো। তারপর প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে ওই আফ্রিকাতেই এমন মানব প্রজাতি ওদের মধ্য থেকেই এসেছে, যাদেরকে এখনকার বিজ্ঞানীরা নাম দেবার সময় 'আমরা' (হোমো)

কথাটি ব্যবহার করতে পারছেন। প্রথম যাদেরকে এই কিছুটা নিজেদের মত ভাবা গেলো তাদের পুরো নাম 'আমরা মিস্ত্রি' (হোমো হাবিলিস)। মিস্ত্রি বলার কারণ হলো এই প্রথম প্রাচীন মানুষের তৈরি ভাল হাতিয়ার পাওয়া গেছে– সেগুলো দেখে মনে হচ্ছে কাটাছেরা, ছিদ্র করা ইত্যাদি কাজের জন্য ওরা ভেবেচিন্তে পাথরের ওপর পাথর ঠুকে কার্যকর হাতিয়ার তৈরি করতে পারতো। এভাবে নানা হাতিয়ার তৈরি করতে পারতো বলেই ওরা মিস্ত্রি। যে সব ফসিল ওদের পাওয়া গেছে তার মধ্যে মাথার খুলির নানা টুক্‌রাও রয়েছে। সে সব জুড়ে জুড়ে প্রাপ্ত বয়স্ক একজন মিস্ত্রি মানুষের মস্তিষ্কের আকার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এই প্রথম মনে হলো শুধু দুপায়ে চলা আর হাতের ব্যবহার নয়, বড় ও উন্নত মস্তিষ্কের দিক থেকেও এরা ওই আধা নর-বানর গোছের মানুষদের থেকে অনেক এগিয়ে গিয়েছে– সে কারণেই তো ওরা 'আমরার' দলে চলে এসেছে। ২০ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত এই মিস্ত্রিরাই ছিল সব চেয়ে উন্নত মানুষ।

আর একটি মানব প্রজাতি ওই ১৫-২০ লক্ষ বছর আগে থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে এবং দীর্ঘকাল টিকে ছিল; তার নাম দেয়া হযেছে 'আমরা খাড়া' (হোমো ইরেক্‌টাস)। এ নামের কারণটি হলো তাদের লম্বা, খাড়া, সুঠাম দেহ। ফসিলের সাক্ষ্য যা পাওয়া যাচ্ছে এই গুরুত্বপূর্ণ মানব প্রজাতিটি প্রথম দেখা দিয়েছিলো পূর্ব আফ্রিকায়। ওখানে কেনিয়ার নারিকোটোমে এমন একটি কিশোর বয়সী খাড়া মানুষের প্রায় পূর্ণাঙ্গ ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে যাকে 'নারিকোটোমের বালক' বলা হয়। প্রায় ১৫ লক্ষ ৩০ হাজার বছর আগের এই ফসিল প্রাপ্তি খাড়াদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ করে দিয়েছে– বিশেষ করে তার প্রথম দিক্‌কার অবস্থা সম্পর্কে। ওই ১৩ বছরের বালকেরই দেহের দৈর্ঘ ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি, আরো বড় হবার সুযোগ পেলে তা দৈর্ঘ ৬ ফুটের মত হতে পারতো। এর আগের মানুষের গায়ের পশম লম্বা ছিল নর-বানরদের মত – কিন্তু খাড়ারা ইতোমধ্যে সেই পশম হারিয়ে ফেলেছে পরবর্তী মানুষদের মত। তাছাড়া আরেকটি ব্যাপার খুব স্পষ্ট হয়েছে খাড়ারা দৌড়ের ওপর লাঠির আগায় তীক্ষ্ণ করা পাথরের টুকরা বাঁধা বর্শা ছুঁড়তে পারতো শিকারের দিকে। তার মানে দ্রুত দৌড়ের সময়ও তারা তাদের শরীরের ভারসাম্য রাখতে পারতো। ফসিলের মধ্যেই তাদের কানের ভেতর U অক্ষরের মত ছোট ছোট নল দেখা গেছে। আমাদের সবার মধ্যে এরকম নল ও তার ভেতরে এক রকম তরল থাকে যার কারণে আমরাও ভারসাম্য রাখতে পারি– যেই ভারসাম্য ক্ষমতা আজকের মানুষকে এর কিছু চরম ব্যবহার সমুদ্রের ঢেউয়ের চূড়ায় উঠে সার্ফিং করার

সুযোগ দেয়, মহাশূন্যযানের ধকল সহ্যের ক্ষমতা দেয়, সেটি তখনই সৃষ্টি হয়েছে– শিকার করার ক্ষেত্রে কাজে লেগেছে বলেই। এমনি অনেক বিষয়ে তারা 'মানুষ' হয়ে ওঠেছিলো। কিন্তু একটি দিক থেকে কিন্তু খাড়াদের মানুষ হতে যথেষ্ট বাকি ছিল– তা হলো মস্তিষ্কের আয়তন। মিস্ত্রিদের ও খাড়াদের মস্তিস্ক লুসির থেকে বড় হলেও আমাদের থেকে অনেকটা ছোট ছিল– নারিকোটোমের বালকের ক্ষেত্রে ছিল মাত্র ৮০০ সি সি (কিউবিক সেন্টিমিটার) প্রায় ১৫ লক্ষ বছর ধরে যতদিন খাড়ারা টিকে ছিলো এটি একটু একটু বেড়েছে বটে তবে শেষ পর্যন্ত ১০০০ সিসির বেশি নয়। তাই মনে হয় খাড়াদের চিন্তাশক্তি বা আবেগের সক্ষমতা জ্ঞানীদের থেকে অনেক কম ছিল। সত্যিকার অর্থে মানুষের মস্তিষ্ক বড় হয়েছে প্রায়-জ্ঞানী ও জ্ঞানীদের মধ্যে এসে– তখন বেশ দ্রুতই বড় হয়েছে; আমাদের মস্তিষ্ক গড়পড়তা ১৪০০ সিসির মত।

খাড়া মানুষ আফ্রিকায় লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিকশিত হয়েছে। তবে এর মধ্যেই এশিয়ার নানা জায়গায় এই প্রজাতির মানুষের ফসিল পাওয়া গেছে। প্রাপ্তি স্থল হিসেবে তাদের কয়েকটি পিকিং মানুষ (বর্তমান বেইজিং), জাভা মানুষ (ইন্দোনেশিয়ায়), জর্জিয়া মানুষ (ইউরোপ-এশিয়ার মাঝামাঝি দেশ) ইত্যাদি নামে বিখ্যাত হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মাথার খুলি ও চোয়াল থেকে এদেরকে খাড়া মানুষ বলে চেনা গেছে। এদের এক একটি এক এক কালের– ১৭ লক্ষ বছর থেকে মাত্র ৬০ হাজার বছর আগের পর্যন্ত সময়ে আফ্রিকার বাইরে খাড়াদের চিহ্ন পাওয়া গেছে। মনে হচ্ছে এশিয়ার কোথাও কোথাও ওরা ওই শেষের দিকে জ্ঞানীদের সঙ্গে কাছাকাছি জায়গায় বাস করেছে। কারণ জ্ঞানীরাও ইতোমধ্যে এশিয়ার কোথাও কোথাও পৌছে গিয়েছিলো আফ্রিকা থেকে বের হয়ে। বোঝা যাচ্ছে বহু লক্ষ বছর আগেই আফ্রিকা থেকে বাইরে মানুষের প্রথম অভিবাসন ঘটেছে, এবং তা খাড়া মানুষের অভিবাসন। এর কোন কোন জায়গায় খাড়াদের বিশেষ রকমের পাথরের হাতিয়ারও পাওয়া গেছে। আচুলিয়ান শিল্প নামে কথিত এর কথা আমরা আগেই জেনেছি।

মানব ইতিহাসে খাড়াদের পরের মানুষদেরকে আমরা ইতোমধ্যে জেনে ফেলেছি। ওরা ছিল নানা রকমের প্রায়-জ্ঞানী, যাদের একটির মধ্য থেকে আফ্রিকায় উদ্ভুত হয়েছে জ্ঞানীরা। আর মধ্যপ্রাচ্যে ও ইউরোপে আফ্রিকা থেকে অভিবাসী হয়ে যাওয়া প্রায়-জ্ঞানীদের মধ্য থেকে এসেছে নিয়ানডার্থালিসরা। সেই অতীতেই এদের সবার মধ্যেই কিছু কিছু মানবোচিত গুণ ভাল ভাবেই দেখা গেছে মস্তিষ্কের দিক থেকে তারা সবাই এক পর্যায়ে না থাকলেও। যেমন পাথরের ও অন্যান্য

প্রাকৃতিক জিনিসের ব্যবহার করে হাতিয়ার তৈরিতে তারা সবাই দক্ষ ছিল, শিকারের ক্ষেত্রেও। আরেকটি সক্ষমতার কথা উল্লেখযোগ্য– তাহলো আগুন জ্বালাবার ক্ষমতা। বোঝা যাচ্ছে যে প্রায় ৩ লক্ষ বছর আগের সময়ের মধ্যে আফ্রিকার ভেতরে ও বাইরে সব জায়গায় খাড়া, প্রায়-জ্ঞানী, নিয়ানডার্থালিস সবাই আগুনের ব্যবহার আর আগুন জ্বালানো আয়ত্ব করে ফেলেছিলো। এক এক জায়গায় এক এক সময়ে এই অতি জরুরী ব্যাপারটি ঘটছিলো। এটিও প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে মানুষকে অনন্য করে তুলেছে– শীতের থেকে ও হিংস্র পশুর থেকে বাঁচতে এবং দাঁত-মুখের অতিরিক্ত পরিশ্রম ছাড়াই রসনা তৃপ্ত করে খাবারকে সহজপাচ্য করতে। সেভাবে এটি তার চোয়াল, দাঁত, মুখকে বর্তমান কমনীয় অবস্থায় আনতে সাহায্য করেছে। এই বইয়ে আমাদের বাকি কথার প্রায় সবই অবশ্য জ্ঞানীদের নিয়ে, কারণ আমরাও জ্ঞানী, ওদের সাক্ষাত বংশধর। ওরাই আমাদের শিকড়ে সব প্রবাহের উৎস– আফ্রিকা থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। অবশ্য সেই হিসেবে আফারানসিস, মিস্ত্রি, খাড়া, প্রায়-জ্ঞানীদের মধ্য দিয়েও এই প্রবাহগুলো এসেছে। উৎসকে আমরা তাই যত ইচ্ছে পেছনে নিয়ে যেতে পারি– তাও সেই আফ্রিকাতেই।

চট্টগ্রাম-একটি গন্তব্যের নাম

মানুষ আসার কালঃ

আমাদের শিকড়ের উৎসটিকে গোটা একটি মহাদেশ হতে হয়েছে, কারণ জ্ঞানীরা উদ্ভুত হয়েছে মহাদেশটির এখানে-ওখানে ছিটানো বেশ কিছু স্থানে। জ্ঞানীদের আগের প্রজাতিগুলোর মানুষরাও ওখানে ওভাবেই নানা জায়গায় বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু গন্তব্য আমরা সুনির্দিষ্ট ভাবে বেছে নেয়া উচিত– তা পৃথিবীর যে কোন জায়গাই হোক, নিজেদের অন্তরঙ্গ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যতটা ভেতরে হয় তত ভাল। সে হিসেবেই এই বইয়ে চট্টগ্রামকে শিকড়ের গন্তব্য হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে।

উৎস থেকে গন্তব্যে প্রবাহের পুরো কাহিনীকে বলতে গেলে সর্ব প্রথম মানুষকে সেই গন্তব্যে পৌঁছতে হবে– মানুষের সঙ্গে জিন, জীবন ও ভাষার যে ধারা সেখানে পৌঁছবে তাকে অবশ্যই একটি নিরবিচ্ছিন্ন ধারা হতে হবে। তবে নানা রকম আগু-পিছু করে অনেক ঘোরাপথেও এর কোন কোনটি গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। কিন্তু সেই ধারা যখন আফ্রিকার সীমা অতিক্রম করেনি, বা তারো বহু আগে লুসি যখন সদ্য কেনিয়ার আফারে তার প্রথম মানব পদযাত্রা মাত্র শুরু

করছিলো, তখনো তো চট্টগ্রাম ছিল। স্থানীয় ভূতত্ত্বে যদি কর্ণফুলি-হালদার স্রোত তখনো থেকে থাকতো, আর তার দুপাশে ঘন বনের অদূরে পাহাড় যদি তখনো আস্তে সমুদ্রে নেমে আসতো, তা হলে সেগুলো দেখে মুগ্ধ হবার মত কেউ তখন সেখানে ছিলনা। আরো অনেক পর মাত্র দেড় লক্ষ বছর আগে জ্ঞানীরা যখন পূর্ব আফ্রিকার সাভানা তৃণভূমির সঙ্গে নিজেদের আত্মিক বন্ধন গড়ে তুলেছে, তখনো কর্ণফুলির ঢেউয়ে উদ্বেলিত হবার মত কোন মন সেখানে ছিলনা। ওটি শুধু ঘটতে পেরেছে মানুষের সঙ্গে ওই প্রবাহগুলো এই গন্তব্যে এসে পৌঁছতে পারার পর।

আমরা শুধু কিছু সম্ভাবনার কথা বলতে পারি। প্রমাণ আছে আজ থেকে ৭০ হাজার বছর আগে প্রথম জ্ঞানীর দল আফ্রিকা ছেড়ে সমুদ্রের পারে পারে পূর্ব দিকে আসছিলো, সেখান থেকে ভারতের পূর্ব উপকূলে তাদের পা পড়তে খুব বেশি দেরি হয়নি। তার দু'এক হাজার বছরের মধ্যেই সেই একই উপকূলীয় যাত্রা তাদের কাউকে কাউকে চট্টগ্রামে নিয়ে আসাও বিচিত্র নয়। তাই ৬৫ থেকে ৭০ হাজার বছরের মধ্যে হয়তো ওই পুরো অঞ্চল জ্ঞানী নামের অদ্ভুত, একাধারে ভাবুক ও বেপরোয়া, প্রাণীটির আনাগোনায় চঞ্চল হয়েছিলো। সঠিক ভাবে বলার মত কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। যদি সেই দক্ষিণ আফ্রিকা বা মরোক্কোর মত, অথবা মধ্যপ্রাচ্যের নানা জায়গার মত এক টুকরা মাথার খুলি, এক পাটি চোয়াল, কয়েকটি দাঁতও অন্তত পাওয়া যেতো, এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যেতো। কিন্তু শুধু চট্টগ্রাম নয় ওই কালে জ্ঞানীর ভারতে আসার এরকম কোন প্রত্যক্ষ ফসিল চিহ্ন ভারতের কোথাও পাওয়া যায়নি। কিন্তু তখনই যে জ্ঞানীরা ভারতে এসেছে তা জিন প্রবাহের চিহ্নে না হলেও জীবন-ধারার চিহ্নে তার প্রমাণ মিলেছে কোন কোন জায়গায়। সেরকম কিছু অবশ্য চট্টগ্রামে পাওয়া যায়নি। তবে মানুষের স্বভাব চিরকালই ছিল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া, বিশেষ করে তখনকার শিকারি-সংগ্রাহক মানুষকে নতুন নতুন জায়গায় গিয়ে জীবন ধারণের চেষ্টা করতে হতো। কাজেই এর পর পর চট্টগ্রামেও মানুষের উপস্থিতি আন্দাজ করা যায়।

তবে জ্ঞানীদের আগের ওই অন্য রকম মানুষের সম্পর্কে কী বলা যায়? এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ ফসিল হিসেবে পাওয়া যে কোন জায়গার জন্য অত্যন্ত বিরল ব্যাপার। তবে তার ভেতরেও এই পূর্ব দেশেই তো পিকিং মানুষের (৫ লক্ষ বছর আগের), জাভা মানুষের (১৭ লক্ষ বছর আগের) মাথার খুলি, চোয়াল ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে। এদের সব ক'টি নানা যুগের খাড়া মানুষের নমুনা বলে প্রমাণিত হয়েছে। আর সর্বশেষ তত্ত্ব অনুযায়ী এরা আফ্রিকা থেকে সেই যুগে অভিবাসী

হয়েই ওরা এখানে এসেছে। কিন্তু ওই পিকিং মানুষতো একাকী হঠাৎ করে চীনের বেইজিং এর কাছে দেখা দেয়নি, বা জাভা মানুষ ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তার কাছে দেখা দেয়নি। ওই লক্ষ লক্ষ বছর আগের সে রকম মানুষরা হয়তো পূর্ব দেশের আরো নানা জায়গায় বিচরণ করেছে– কিন্তু চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। চট্টগ্রাম সে সব জায়গার একটি হতে দোষ কী?

মনে রাখতে হবে সেই বহু লক্ষ বছর আগের সময়টি ছিল যেমন আফ্রিকায় তেমনি বিভিন্ন মহাদেশে বিভিন্ন অতিকায় স্তন্যপায়ীদের সময়। আমাদের পূর্ব দেশে তাই যেমন একদিকে ছিল অতিকায় তৃণভোজী হরিণ, গরু, মোষ, হাতি; অতিকায় বানর ও উল্লুক (যা কিনা একটি নর-বানর); অন্যদিকে হিংস্র অতিকায় ভালুক আর তলোয়ার-দেঁতো বাঘ (যার দুটি তলোয়ার সাইজের দাঁত বের করা থাকতো) এগুলো থাকার কথা– এমনকি চট্টগ্রামের বনভূমিতেও। কাজেই শিকারি-সংগ্রাহক খাড়া মানুষ যদি এখানে থেকেও থাকতো তবুও তাদের সীমিত বুদ্ধি দিয়ে এগুলোর সঙ্গে লড়াই করে তাদেরকে বাঁচতে হয়েছে।

তবে মাত্র ৬০ হাজার বছর আগের জ্ঞানীদের ক্ষেত্রে অবশ্য ভিন্ন কথা। যদি তারা ভারতের পূর্ব উপকূল ধরে চট্টগ্রামে তখনই এসে থাকতো তাহলে খুব সম্ভব কর্ণফুলি পারের বনে কিংবা অদূরে পাহাড়ি বনে তাদের জীবন ততটা কঠিন হতোনা। কারণ ইতোমধ্যে তারা আফ্রিকায় থাকতেই অর্জন করে ফেলেছিলো একটি মস্ত বড় অনন্য সম্পদ, অত্যন্ত উন্নত ও বড় একটি মস্তিষ্ক– জ্ঞানীদের মস্তিষ্ক, এবং তারই কল্যাণে পূর্ণাঙ্গ মানুষের ভাষা, যা তাকে দিয়েছে কল্পনা শক্তি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও সৃজনশীলতা। কী ভাবে তা অর্জিত হয়েছে তা জানতে আমাদেরকে আবার আফ্রিকার কথায় ফিরে যেতে হবে। কাজেই সেই ৬০ হাজার বছর আগের জ্ঞানীদেরকে যদি চট্টগ্রাম সমুদ্র সৈকতে ঝিনুক-শামুক, মাছ মেরে; কিংবা হালদা-কর্ণফুলির মাছের মেলার সুযোগ নিয়ে; অথবা ওই বনে হরিণ, গয়াল শিকার করে সন্তুষ্ট ও উপভোগ্য জীবন যাপন করতে দেখি অবাক হবোনা। কিন্তু হায়, সেই তখনকার জীবন যাপনের কোন চিহ্ন আমরা খুঁজে পাইনি।

সবদিক থেকে সংস্কৃতির ঢেউঃ

বহু হাজার বছর আগের মানুষের জীবন যাপনের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে; সেগুলো কোথাও বেশি পাওয়া গেছে, কোথাও কম। চট্টগ্রাম সেই কমের দলে, বলতে গেলে খুবই কম। কিন্তু ওই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকেই আমরা ঠিকই বুঝতে পেরেছি এর কাছাকাছি জায়গাগুলোতে বিভিন্ন সময় কেমন মানুষ বাস করেছে, কেমন ছিল তাদের জীবন। নিদর্শনের সব যে খুব

কাছাকাছি পাওয়া গেছে তাও নয়; কিন্তু মানুষ এক জায়গায় আবদ্ধ থাকার নয়, তাই ধরে নেয়া যায় যে তাদের আনাগোনার মাধ্যমে সংস্কৃতির ঢেউ তার কিছুটা দূরের জায়গাতেও গিয়ে পৌঁছে। কাজেই মৌলিক জীবন যাপনের প্রশ্নে কিছু দূরের প্রত্নতত্ত্বলব্ধ জ্ঞানের ওপরও খানিকটা নির্ভর করা যায়। ওভাবে আমরা জানি বর্তমান ভারতে ঝাড়খণ্ডে শিলা পাহাড়ের গুহায় শিকারি-সংগ্রাহক মানুষ বহু হাজার বছর আগে কেমন করে থাকতো। আমাদের থেকে আরো কিছুটা দূরে উত্তর প্রদেশের কিছু মানুষ শিকারি-সংগ্রাহক হয়েও গ্রাম রচনা করে বাস করেছে, দূর দক্ষিণে বিন্ধ্য অঞ্চল থেকে প্রতি বছর নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে এনেছে। আরো দক্ষিণে মধ্য প্রদেশে মানুষের শিলা আশ্রয়ে সেই ৭-৮ হাজার বছর আগের মানুষ তাদের জীবনের এবং কল্পনার অনেক কিছু সাধারণ কিছু রেখার দাগে অসংখ্য ছবি শিলার ওপর এঁকে গেছে– প্রধানত শিকারের ছবি, শিকার করতো এমন সব পশুর ছবি। এরা সবাই শিকারি মানুষ, সংগ্রাহক মানুষ। পশ্চিম দিকে ভারতের একেবারে সীমান্তে এক সময় কৃষির কিছু নমুনা আবিষ্কৃত হয়েছিলো এটি ঠিক, তবে তখন আর কোথাও নয়। কাজেই কাছাকাছি জায়গাগুলো থেকে শিকারি-সংগ্রাহক মানুষের জীবনের ঢেউ চট্টগ্রামের কাছেও এসে পড়ছিলো তা আন্দাজ করাই যায়। অন্তত ৪-৫ হাজার বছর আগে পর্যন্ত চারিদিকের চিহ্নগুলো এমন কথাই বলছিলো।

তারপর এসেছে নতুন সংস্কৃতির নতুন ঢেউ, যা প্রধানত কৃষি-নির্ভর। এরও চিহ্ন সরাসরি চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে তা নয়, কিন্তু আশ-পাশের নমুনা থেকে বোঝা গেছে। চাষ-বাসের অভ্যাস দেখা গেছে পশ্চিমে গমের, বজরার। আর পূর্বের থেকে ঢেউ এসেছে ধান চাষের সংস্কৃতির। এসব ঢেউয়ের পাশাপাশি আরো এক রকমের ঢেউয়ের চিহ্ন কিন্তু খোদ চট্টগ্রামেই এখনো রয়েছে– সে চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে এখানকার আজকের ভাষার মধ্যে, আশপাশের অন্যান্য জায়গার ভাষার মধ্যেও। এমন অনেক শব্দ ওখানে আছে যার উৎস অনেক প্রাচীন, ভারতের এই অঞ্চলের আদিবাসীদের ভাষায় সেগুলো আছে– সেগুলোকে মুন্ডারি ভাষা বলা হয়। দেখা গেছে এই ভাষাগুলো আসলে একটি ভাষা-গোষ্ঠির যা অস্ট্রালোএশিয়াটিক নামে পরিচিত, দক্ষিণ চীন ও বার্মার ভাষাও যার অন্তর্গত। ঠিক তেমনি আরো বেশ কিছু শব্দ আছে যাও যথেষ্ট প্রাচীন কিন্তু অন্য ভাষা গোষ্ঠি থেকে উত্তর পূর্ব দিক থেকে আসা, সিনোটিবেটান নামে পরিচিত। আবার এমনো কিছু শব্দ পাওয়া যাচ্ছে যা দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত– বোঝা যাচ্ছে একসময় দ্রাবিড় ভাষা শুধু দক্ষিণ ভারতে নয়, সারা

ভারতেই ছিল। চট্টগ্রামের ভাষায় তা থাকা সেই সময়ের চিহ্ন। এরপরের যে ভাষা ঢেউ, তার শব্দই এখানে বেশি– সেগুলো সংস্কৃত ভাষা থেকে আসা, যা সম্পূর্ণ অন্য একটি ভাষা গোষ্ঠির সদস্য– ইন্দোইউরোপীয়।

ফসিল বেশি পাইনি, বহু হাজার বছর আগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও তেমন নয়। কিন্তু মানব সংস্কৃতির ঢেউ চারিদিক থেকে আসতে কার্পণ্য করেনা, সেই সুবাদে আমরা আন্দাজ করে নিতে পেরেছি বিশ্ব প্রবাহের ওই জিন, জীবন, ভাষার ধারাগুলো কীভাবে বহু হাজার বছর আগে চট্টগ্রামেও এসে পড়েছিলো। একটি সময় থেকে আন্দাজগুলো কিছুটা নিশ্চিত হয়েছে, যখন বড় বড় রাজ্য-সাম্রাজ্যগুলো চট্টগ্রাম অবধি সম্প্রসারিত হয়েছে– কখনো ভারতের বিশাল জায়গা জোড়া গুপ্ত সাম্রাজ্য, বা পাল শাসন, কখনো স্থানীয় সমতট বা হরিকেল রাজ্য। ওদের রাজকার্যের চিহ্ন, নানা দানের দানপত্র তামার পাতে লেখা অবস্থায় আশপাশেই পাওয়া গেছে। তিন হাজার বছর আগের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, আড়াই হাজার বছর আগে থেকে শুরু হওয়া যে বৌদ্ধ ধর্ম, তাদের ধর্মীয় সাহিত্য ও স্থাপত্য, তাদের পরবর্তী অনুসারীদের সংস্কৃতির মাধ্যমে আরো কিছু চিহ্ন রেখে গেছে, তাও চট্টগ্রাম থেকে খুব বেশি দূরে নয়, কিছু কিছু চট্টগ্রামের মধ্যেই। এরকম প্রভাব শুধু পশ্চিম দিক থেকে বঙ্গ, সমতট হয়ে আসেনি, বরং পূর্বদিক থেকে বার্মা, আরাকান হয়েও এসেছে। এই পূর্বের প্রবাহটিও চট্টগ্রামে খুবই দৃশ্যমান হয়েছে। হয়তো সে কারণেই সারা ভারতের মধ্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি চট্টগ্রামেই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। চট্টগ্রামের বিশেষ সম্পদ তার বন্দর অন্তত দু'হাজার বছর ধরে দেশে বিদেশে কিছুটা হলেও পরিচিত, আর তেরশত বছর ধরে রীতিমত ব্যস্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র। তখন থেকে মানব সংস্কৃতির নানা দিক থেকে আসা নানা ঢেউ সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গেই চট্টগ্রামের ওপরে আছড়ে পড়েছে, বিশ্বে নানা সমুদ্র-তীরের মত। এখানে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সংস্কৃতির প্রবেশও ওভাবেই। এখানকার মানুষও নাবিক হিসেবে পালতোলা জাহাজে বিশ্ব-সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে এবং দূর দেশে ছড়িয়ে সেই আগত ঢেউয়ের প্রত্যুত্তর দিয়েছে। শিকড়ের নানা প্রবাহের মধ্যে আমরা চট্টগ্রামের বাইরে ও ভেতরে আরো বিস্তারিত ভাবে এই চিহ্নগুলোর খোঁজ করবো।

আরো গন্তব্যের নমুনা

চট্টগ্রামের মত প্রত্যেক গন্তব্য নিজস্ব বৈশিষ্ট, নিজস্ব ইতিহাস ও প্রবাহকে নিজের মত করে রাঙিয়ে তোলে। চট্টগ্রামে সেটি কীভাবে হয়েছিলো সেটি আমরা বইয়ের

প্রাসঙ্গিক অংশে দেখবো। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আফ্রিকা থেকে আসা প্রবাহগুলো নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে দুনিয়ার নানা গন্তব্যে নানা সময় গিয়েছে। নতুন নতুন প্রবাহ এক একটি গন্তব্যে যেমন পৌঁছেছে তেমনি সেখান থেকে যাত্রা করে চলে গিয়েছে অন্য গন্তব্যে– মানুষের অভিবাসনে কিংবা শুধু ভাষা বা সংস্কৃতিকে ভর করে। কাজেই আমাদের বাছাই করা গন্তব্যটি অন্য অনেক গন্তব্যের থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।

এরকম এক একটা মানব বসত যে তার বিশেষ ইতিহাসে রাঙানো এবং তার কিয়দংশ দিয়ে যে এটি অন্য মানব বসতকেও রাঙাতে পারে সেই বিষয়টি তুলে ধরার জন্য আমরা ইতস্তত আরো কয়েকটি গন্তব্যকে নমুনা হিসেবে এখানে সামান্য উল্লেখ করতে চাই– আপাতত প্রতি মহাদেশ থেকে যে কোন একটিকে; এশিয়াতে তো চট্টগ্রাম আছেই, অন্য মহাদেশগুলো থেকে একটি করে। প্রত্যেকটি গন্তব্যকে চট্ করে শুধু একবার দেখবো– যে সময়টায় সেটি নিজস্ব বৈশিষ্টে তুঙ্গে আছে সেই সময়টায়। এর আগে যেমন তার ইতিহাস আছে তেমনি এর পরেও তার অনেক অগ্রগতি হয়তো হয়েছে, কিন্তু তখন তা আশপাশের বৃহত্তর সত্তার মধ্যে অনেকটা বিলীন হয়ে গেছে। এখানে নমুনা হিসেবে এক ঝলক দেখা গন্তব্যগুলোর ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি এ বইতে চট্টগ্রামের ক্ষেত্রেও, আমাদের দৃষ্টি এই গন্তব্যের নিজস্ব বৈশিষ্টে ঝলোমলো দিনগুলোতেই নিবদ্ধ করবো, এবং সেখানেই শেষ করবো।

আফ্রিকায় একটি গন্তব্য– এল্ আম্‌রাঃ

এল্ আম্‌রা মিশরে নীল নদীর পারে, কিন্তু মিশরের দক্ষিণ প্রান্তে যাকে উচ্চতর মিশর বলে সেখানে। সব মিশরীয়দের মত তারা আরবীতে কথা বলে, অধিকাংশই ধর্মে মুসলিম, উত্তরের নীল নদীর খাঁড়ি অঞ্চলে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মিশরীয়রা বাস করে তাদের সঙ্গে নানা ভাবে তাদের ভাগ্য এক সূত্রে গাঁথা। কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় হাজার হাজার বছরের মাখামাখির পরও উভয়ের মধ্যে জিন প্রবাহের পার্থক্য আছে। এল্ আম্‌রা অঞ্চলের মানুষ যাদেরকে নুবিয়ানও বলা হয় তাদের আফ্রিকান চরিত্রটি বেশি- গায়ের রঙের ঘনত্ব, চুলের কোকড়ানো বেশি হওয়া ইত্যাদিতে তা ধরা পড়ে। জিন প্রবাহের সামান্য তারতম্য এটি সৃষ্টি করেছে। মূল আফ্রিকান প্রবাহ এখানে যথেষ্ট আছে, কিন্তু তারপর আফ্রিকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার পর আবার ফেরৎ এসেছে আরব বিজয়ীদের সঙ্গে। তারও আগে দীর্ঘ পাঁচ হাজার বছর এর ইতিহাস ফেরাউনদের রাজ্যের অংশ হিসেবে,

যাতে কিনা পুরো সাম্রাজ্যে একটি এক-কেন্দ্রিক শাসন প্রবর্তিত ছিল, একটি নগর সভ্যতায় ছিল যার নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু আরো একটু পিছিয়ে সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগের এল্ আম্‌রা ও মিশরের অন্যান্য অঞ্চল যদি দেখি সেখানে না ছিল কোন সাম্রাজ্য, না ছিল কোন রকমের নগর কিংবা মন্দির-পিরামিড।

এল্ আম্‌রা ছিল নীল নদীর একটি ছোট দান, তার কল্যাণে কৃষি সমৃদ্ধ, কিন্তু কিন্তু তারপরেই সবই ছিল ধূ ধূ মরুভূমি। কৃষির বিদ্যাটি এখানে আরো কিছুদিন আগে এসেছিলো আফ্রিকা থেকে নয়, বরং উলটো দিকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। ওখানেই বন্য বার্লি ও গমকে পোষ মানিয়ে শিকারি-সংগ্রাহক মানুষ প্রথম কৃষিজীবী হয়েছিলো। একই সঙ্গে বন্য পশুকেও ওরা পোষ মানিয়েছিলো। এই বিদ্যা রপ্ত করে এল্ আম্‌রার মানুষ এটি প্রয়োগ করেছেন দক্ষিণে তার কাছাকাছি আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলের গরুর ওপর। গরুর পোষ মানানো এখানে প্রথম। আমাদের কালে এসে এল্ আম্‌রা একটি খুব ভাল প্রত্ন-তাত্ত্বিক জায়গা হয়েছে। এখান থেকে সেই প্রাচীন কৃষি ও পশু পালনের অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে– যেমন সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে তৈরি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঘাস খাচ্ছে এমন চারটি গরুর পুতুলের মত ছোট মূর্তি। গরুগুলো দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সেগুলো সাহেল অঞ্চলের সোজা সামনের দিকে বিস্তৃত শিংওয়ালা বিশেষ জাতের গরু। এই কৃষি সমৃদ্ধি এল্ আম্‌রায় সৃষ্টি করেছিলো শিল্পের বিকাশ। পটারি ও বস্ত্র প্রচুর উৎপাদিত হয়ে নীল নদী বেয়ে বড় নৌকায় চলে যেতো উত্তর মিশর ও তারপর মধ্যপ্রাচ্যে। এই শিল্প শহরের চারিদিকে ছিল পাথরের ওপর পাথর গেঁথে তৈরি দেয়াল। এই দেয়াল আর শহরের ঘর-বাড়িগুলো প্রত্নতাত্ত্বিকরা উদ্ঘাটন করেছেন। বলতে গেলে এরপর মিশরে যা হয়েছে তা এল্ আম্‌রা সংস্কৃতির বিস্তৃতিতেই হয়েছে। ওরা অবশ্য তখন জানতোনা আর মাত্র কয়েক শ' বছরের মধ্যে তাদের সাফল্যের অনুকরণে মিশরজোড়া সাম্রাজ্য তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে, ফেরাউনদের প্রথম রাজবংশ নীল নদীর মোহনাতে তাদের বিশাল নগরী গড়বে, আর এল্ আম্‌রা তার একটি নগণ্য কিনারায় পরিণত হবে।

ইউরোপের একটি গন্তব্য- ইউনিটিস:

চেক রিপাবলিকের রাজধানী প্রাগ নগরের সামান্য উত্তর পশ্চিমে গেলে একটি এলাকার নাম ইউনিটিস। আজ এটি প্রাগের শহরতলীতে পরিণত হয়েছে, কিন্তু একদিন এটি একাই একশ' ছিল। প্রায় চার হাজার বছর আগেও ইউরোপের বেশির ভাগ জায়গায় শিকারি-সংগ্রাহক মানুষরা বাস করতো। কিন্তু ইউনিটিস

অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে পূর্ব ইউরোপের প্রথম কৃষিজীবী গোষ্ঠির মানুষের যোগাযোগ তখন থেকেই। সে কারণে ইউনিটিসে একটি কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি তখনই গড়ে ওঠতে পেরেছিলো। ১০ হাজার বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম শুরু হওয়া কৃষি ইতোমধ্যে পশ্চিমে ইউক্রেন ও পূর্ব ইউরোপের কিছু কিছু জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলো। সেটিই তাদেরকে একটি অনন্য শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলো– ধাতু শিল্প। সেই যুগে খুব মূল্যবান অলঙ্কার হিসেবে সোনা ছাড়া ব্যবহার্য ধাতু হিসেবে ছিল শুধু তামা আর ব্রোঞ্জ। এই ধাতুবিদ্যাটি এসেছিলো অনেক দূরের মধ্যপ্রাচ্য থেকে, সেখানে মেসোপোটেমিয়া সভ্যতায় ইতোমধ্যে ব্রোঞ্জ তৈরির বিদ্যাটি উদ্ভাবিত হয়েছিলো। সেখান থেকে এটি মিশরে, ভারতের সিন্ধু সভ্যতায় এবং অন্যান্য দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইউনিটিসের মানুষ বিশেষায়িত হয়ে ওঠেছিলো ব্রোঞ্জের ভারী জড়োয়া গহনা তৈরিতে– বিশেষ করে গলায় পরার হাঁসুলিতে। শুধু এই হাঁসুলির শিল্পটি এতো জনপ্রিয় হয়েছিলো যে এর ওপর ভিত্তি করে একটি পৃথক সংস্কৃতি ইউনিটিসকে কেন্দ্র মধ্য ইউরোপে গড়ে ওঠেছিলো। ব্রোঞ্জ তৈরি করতে টিন দরকার হয়- তা অনেক দূরের ইংল্যাণ্ডের খনি থেকে ইউনিটিসে আমদানী করতে হতো। প্রত্নতত্ত্ববিদরা ইউনিটিসে অনেক রকম ভারী হাঁসুলির যে সব বড় বড় সংগ্রহ আবিষ্কার করেছেন তাতে মনে হচ্ছে ওই জনপ্রিয়তাটি শুধু অলঙ্কার হিসেবে ছিলনা, একই সঙ্গে সম্পদ হিসেবে যথেষ্ট পরিমাণ ব্রোঞ্জ জমিয়ে রাখাটিও এর একটি উদ্দেশ্য ছিল।

এই ধাতুবিদ্যায় নাম করার আগে, কৃষিজীবী হবারও আগে, ইউনিটিস ইউরোপের ওই অঞ্চলের বিশেষ ধরণের শিকারি-সংগ্রাহক গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বড় বড় পশুর মৌসুমি দলবদ্ধ শিকারই তাদের সবার প্রধান অবলম্বন ছিল। এখন থেকে ১৫ হাজার বছর আগে সর্বশেষ শৈত্য যুগের অবসান এই সুযোগ করে দিয়েছিলো। বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরতে– ম্যামথ, বল্গা হরিণ, গুহা-ভালুক আর বন্য গরু শীতের জড়তা ভেঙ্গে দলে দলে বেরিয়ে আসলে এই শিকার যজ্ঞ চল্‌তো। মানুষের জীবনও আবদ্ধ হয়েছিলো এই শিকার মৌসুম ও দীর্ঘ শীত মৌসুমের আবর্তনের চক্রে। শীতের নিষ্ক্রিয়তা এদেরকে এক রকম শিল্পী হিসেবে গড়ে তুলেছিলো– যার কারণে ওই কালের অনেক বিখ্যাত গুহা চিত্র, গুহা ভাস্কর্য বিখ্যাত হয়েছে– ম্যামথের দাঁত, বল্গা হরিণের শিং এগুলোর ওপর সূক্ষ্ম ভাস্কর্য কর্ম যা পাওয়া গিয়েছে তা অবাক হবার মত। সব চেয়ে অবাক করার মত ব্যাপার হলো এতে এই পশুগুলোর চেহারা এ স্বভাবের খুঁটিনাটি কেমন করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এমনি একটি জীবন থেকে কৃষি ও ধাতুবিদ্যার সম্পূর্ণ

ভিন্ন জীবনে আসা ইউনিটিসের মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো পূর্ব দিকের শ্লাভ মানুষের অঞ্চল থেকে জিন ও জীবন-ধারা উভয়ের প্রবাহের কারণে। ওই শ্লাভরা ইতোমধ্যে কৃষি জীবিকাকে শিখে নিয়েছিলো মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা কৃষি প্রভাব থেকে। ইউনিটিস এই প্রবাহের সর্বোত্তম ব্যবহার করেছিলো। সাড়ে চার হাজার বছর আগে সম্পূর্ণ অভিনব ইউনিটিস সংস্কৃতি সৃষ্টি করার সময়টিই ছিল তার স্বর্ণালী দিন। এরপর পুরো মধ্য ইউরোপ এই ধারায় চলে আসলে, এবং তা পশ্চিম ইউরোপেও বিস্তৃত হলে, ইউনিটিস তার মধ্যে একাকার হয়ে যায়।

অস্ট্রেলিয়ার একটি গন্তব্য– বোটানি বেঃ

এখন এটি অস্ট্রেলিয়ার বড় নগরী সিডনির ভেতরেই একটি ন্যাশনাল পার্ক, এর সুন্দর পরিবেশে মানুষ বেড়াতে যায়। প্রায় সবদিকে স্থল পরিবেষ্টিত সামুদ্রিক জাহাজ ভেড়ার একটি নিরাপদ জায়গা, সরু প্রবেশ মুখটা শুধু উন্মুক্ত মহাসাগরের দিকে খোলা। সেখানকার যে সব মানুষের কথা বল্‌ছি তাদের বংশধররা এখনো এদেশে আছে, কিন্তু ওদের দেখা ওই বোটানি বে অঞ্চলে আজ খুব একটা মেলেনা। অথচ মাত্র শ'দুয়েক বছর আগেও এই শান্ত জলরাশির পারে পারে তাদের কাজেকর্মে উৎসবে মুখরিত থাকতো এবং তারো ৪৫ হাজার বছর আগে থেকে প্রায় নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে। এখন যাদেরকে এখানে বেড়াতে আসতে দেখা যায় তারা সবাই সম্প্রতি এদেশে এসেছে, অথবা এদের পূর্বপুরুষরা বড়জোর গত দু'শ বছরের মধ্যে এসেছে– ইউরোপ, এশিয়া ও অন্যান্য মহাদেশ থেকে। ওদের আসা শুরু করা সম্ভব করেছিলেন যেই বৃটিশ অভিযাত্রী নাবিক ক্যাপ্টেন কুক তিনি এখানে, এই বোটানি বে'র ভেতরেই, পালতোলা জাহাজ ভিড়িয়ে প্রথম অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের ওই উপকূলের অস্থিত্ব বুঝতে পেরেছিলেন।

ক্যাপটেন কুক্ আসার পর তাঁর দেশ থেকে আরো লোকজন যারা আসা শুরু করেছিলো তখনো এখানকার জমজমাট সমাজটি তারা দেখতে পেয়েছিলো। ওখানকার ওই মানুষরা কিছুটা যাযাবর ছিল বটে, কিন্তু ঘুরে ফিরে তাদের রুটিরুজি বেশি ছিল এই বোটানি বে'র পানিতে– যেখানে মাছ, কচ্ছপ, চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক সব কিছু সহজে পাওয়া যেতো। তবে ওখানে ওরা এমন কিছুও পেতো যা আর কোন দেশে, মহাদেশে দেখা যায়নি। তার একটি পানি ইঁদুর– ইঁদুর বটে কিন্তু বেশির ভাগ সময় পানিতে থাকে। আরো অদ্ভুত প্রাণী প্লাটিপ্লাস– সজারুর কত গায়ে কাঁটা, ভোঁদড়ের মত লেজ, ঠোঁট হাঁসের মত, ডিম পাড়ে আবার সে ডিমের বাচ্চাকে দুধও খাওয়ায়, যেন সব কিছুর একটি

জগাখিচুড়ি। পানিতে এসব শিকার করা ওদের নিত্য কাজ– পুরুষরা নৌকা থেকে হারপুন নামের বর্শা চালায় যা শিকারকে বিদ্ধ করে তার সঙ্গে আটকে যায়; আর মহিলারা নৌকা থেকেই বড়শি ফেলে এদের ধরে, শঙ্খ কেটে কেটে বড়শি বানানোর আর ছোট ছোট মাছ মুখে কাঁচা চিবিয়ে পানিতে তা ফেলে চার দেবার নিজস্ব পদ্ধতি তাদের ছিল।

বোটানির বে'র পাশে পাশে তাদের অস্থায়ী ঝুপড়ির মত বসত, সেখানে এসব সামুদ্রিক প্রাণীর খোল জমে জমে পাহাড় হয়েছে– যাতে এখনকার প্রত্নতত্ত্ববিদদের পক্ষে তাদের কাহিনী উদ্ধার সহজ হয়েছে। ঝুপড়িগুলো অস্থায়ী, কারণ কোন কোন মৌসুমে ওরা সাগর থেকে দূরে নানা জায়গায় চলে যায়। উদ্দেশ্য হলো পশু শিকার আর ফল-মূল সংগ্রহ। যখন যেখানে যায় আরো অস্থায়ী ঝুপড়ি বানিয়ে থাকে। তাদের শিকারের অস্ত্রে অভিনবত্ব আছে, বুমেরাং নামের একটি অস্ত্র ছুঁড়ে দিলে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পশুকে আঘাত করে আবার ফিরে আসে। প্রায় ৭০ হাজার বছর আগে যেই যাত্রায় আফ্রিকা থেকে বের হয়ে জ্ঞানীরা ভারতের দিকে এসেছিলো তারাই ভারত, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া হয়ে শেষ অবধি ৪৫ হাজার বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিলো। তখন এখানে তারা সে সব পশুপাখি দেখেছে তা আগে দেখা সব কিছু থেকে ভিন্ন ছিল। সে সব ক্যাঙ্গারু, ওয়ালাবি, ওয়াম্বাট, কোয়ালা ইত্যাদি সব ক্ষুদ্রাকারে বাচ্চা জন্ম দিয়ে বহুদিন তাদেরকে এক রকম থলিতে রেখে বড় করে। এসব ভিন্ন রকম স্তন্যপায়ীদেরকে মারসুপিয়াল বলা হয়। আর ছিল উড়তে পারেনা এমন অনেক বড় পাখি এমু। এসবই তারা শিকার করে এসেছে এতকাল ৪৫ হাজার বছর ধরে । আসলে শিকার করাটা বড় কথা নয়, এভবে ঘুরে বেড়ানোতেই যেন তাদের আনন্দ। আর বড় আনন্দ ছিল যখন বোটানি বে'তে মাঝে মাঝে তিমি ধরা পড়তো তখন দূর দূরান্তে সবাইকে দাওয়াত দিয়ে ডেকে এনে বিশাল ভোজের উৎসব করতে।

বোটানি বে'র আশেপাশে বেশ কিছু পাথুরে জায়গা আছে সেখানে পাথরের ওপর আঁচড় কেটে কেটে আঁকা ওদের অনেক ছবি পাওয়া গেছে। সেই ক্যাঙ্গারুর ছবি, এমু পাখির ছবি, নারী-পুরুষ এক সঙ্গে ছবি, বুমেরাং ও কুড়াল ইত্যাদির ছবি। ওর মধ্যে এমন সব প্রাণীর ছবিও আছে যেগুলো ১০-১২ হাজার বছর ধরে বিলুপ্ত। বোঝা যাচ্ছে কোন কোন ছবি অন্তত তার চেয়ে বেশি পুরানো। এখন যে কেউ গিয়ে এ ছবিগুলো দেখতে পারে। এ মানুষগুলো এই দু'শ বছর আগেও ওই আফ্রিকাত্যাগী একেবারে আদি মানুষদের মতই দিন কাটিয়ে গেছে প্রকৃতি সঙ্গে;

কৃষি ওভাবে তাদের মধ্যে কখনো আসেনি; গ্রাম, শহর, নগর গড়ার প্রশ্নও ওঠেনি। অথচ কাছেই নিউগিণির মানুষ নিজের থেকেই কৃষি উদ্ভাবন করেছিলো। জিনের প্রবাহে যে নতুন কিছুই যায়নি তা নয়– অতীতে মালয়, ইন্দোনেশিয়া হয়ে কিছু ভারতীয় অভিবাসন সেখানে ঘটেছিলো এমন প্রমাণ আছে, আজকের অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের ডিএনএ বিশ্লেষণে তা বোঝা যাচ্ছে। তা ছাড়া ৫ হাজার বছর আগে ডিঙ্গো নামক এক রকম কুকুর ওখানে দেখা দেয়, যাতে মনে হয় থাইল্যান্ড অঞ্চল থেকে কিছু মানুষ সে সময় ওখানে গেছে, কারণ ডিঙ্গো এর আগে একমাত্র থাইল্যান্ডেই ছিল। কিন্তু এসব অভিবাসন তাদের চরিত্র খুব একটা বদলাতে পারেনি। খুব সম্ভব ৪৫ হাজার বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায় আসার সময় তারা তাদের নিজস্ব যে ভাষা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো সেটিই একটি ভাষা-পরিবারে পরিণত হয়েছিল নানা শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। ২০০ বছর আগে ইউরোপীয়রা এসে ওখানে এই পরিবারের ৩০০টি পৃথক ভাষার সন্ধান পেয়েছিলো। সুযোগ পেলে আজো হয়তো ওরা ওভাবেই প্রকৃতির সঙ্গে মিশে স্ফুর্তিতে থাকতো– কিন্তু সে সুযোগ তারা পায়নি। দুশ' বছর আগে ইউরোপীয়রা ওখানে বসত স্থাপন করার পর ওরা দ্রুত বিলুপ্ত হয়েছে। যারা টিকে আছে, না তারা তাদের প্রাচীন ধারা বজায় রাখতে পেরেছে, না আধুনিক হতে পেরেছে– মহাদেশের গহীনে এখানে ওখানে কোন রকমে অস্থিত্ব বজায় রেখেছে মাত্র।

এর আগের মিশরে ও ইউরোপে দুই গন্তব্যে আমরা দেখেছি কী ভাবে ওখানকার মানুষ আরো ব্যাপক ও উন্নততর সভ্যতায় নিজেরা মিশে গেছে। কিন্তু এই গন্তব্য ও এর পরেরটিতে আমরা সে কথা বলতে পারছিনা। বরং বোটানি বে'র মানুষগুলোর ধারা যেন হঠাৎ থেমে গেছে অন্য মানুষের আগমনে। কিছু মানুষ টিকে থেকেও কার্যত তাদের স্রোতস্বিনী ধারাটি যেন মরুভূমিতে শুকিয়ে গেছে। অথচ অন্য অসংখ্য গন্তব্যে নতুন নতুন অভিবাসন বরং পুরানো ধারায় নতুন নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে।

উত্তর আমেরিকার একটি গন্তব্য– কোলিংটনঃ

যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ক্যারেলিনা অঙ্গরাজ্যের সাগর তীরের একটি জায়গা কোলিংটন। যাদের কথা বল্‌তে চাচ্ছি এখন তারা ওখানে নেই, ওখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে। বোটানি বে'র মানুষদের মতই, তাদেরও বংশধররা এখন প্রায় বিলুপ্ত। তবে প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর আগে এটিই তাদের জায়গা ছিল– তার কিছুদিন আগে ইউরোপীয়রা আসা সত্ত্বেও। একদিকে সমুদ্র অন্যদিকে বন ও গাছপালা

সমৃদ্ধ জায়গা থাকাতে তাদের শিকারের অভাব হতোনা– হরিণ, ভালুক, র‍্যাকুন, ওপোসাম, টার্কি, কচ্ছপ, মাছ ইত্যাদি। এদের সব ক'টির খাওয়া হাড় প্রত্নতত্ত্ববিদরা ওখানে পেয়েছেন। তাছাড়া প্রথম আসা ইউরোপীয়দের বর্ণনা থেকেও তাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেছে।

শুধু কোলিংটনে নয়, তার পশ্চিমে বেশ কিছু জায়গা জুড়ে ছিল এই চেরোকি গোষ্ঠির মানুষদের বাস, ওরা নিজেদেরকে বলে চেরোকি জাতি। তাদের পোষাক, তীর-ধনুক-বর্শার অস্ত্র, তাদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, নিজ ভূমি ও পিতৃ পুরুষের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক, তাদের কবর দেয়ার বিশেষ নিয়ম, এসব মিলে চেরোকিদের বহুদিনের ঐতিহ্য গড়ে ওঠেছে। শিকারে তাদের অনেক আনন্দ, তবে তারা অংশত কৃষিজীবী। এই কৃষি এসেছে দক্ষিণে মেক্সিকোর মানুষদের থেকে, যারা ভুট্টা, শিম, আর কুমড়াকে কৃষিতে এনেছিলো সর্ব প্রথম, এগুলোর বন্য ফসলকে গৃহপালিত করে। কোলিংটনে চাষের খেতগুলো গ্রামের বাইরে। গ্রামটি দেয়ালে ঘেরা– সরু গাছের গুড়ি একটার সঙ্গে একটা গায়ে গায়ে লাগানো অবস্থায় মাটিতে গেড়ে ডিম্বাকার ভাবে গ্রামের সীমানা তৈরি করা হয়েছে। ওর মধ্যে চারিদিকে সারি সারি বাড়ি, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি বড় মাটির ডিবি– অনেকটা একটি পিরামিডের মত উঁচু হয়ে থাকা– এটি তাদের পবিত্র জায়গা। প্রত্যেকটা বাড়ি ওই গ্রামের দেয়ালের কায়দাতেই গাছের খুঁটিতে গড়া– ভেতরে চুলা, এর চারপাশে বিশেষ ডিজাইনের পোড়া মাটির হাঁড়িকুড়ি। এদের অনেক ক'টির মধ্যে খাবার সংরক্ষণ করা। এমনি চিত্রই ছিল সাড়ে তিনশ' বছর আগেও।

তখন থেকে হাজার খানেক বছর আগে পশ্চিমের মিসিসিপি নদী-পারের মানুষের সংস্কৃতিটা তাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিলো– ভূমির প্রতি প্রীতি ওখান থেকেই এসেছে, আর কৃষি এসেছে দক্ষিণ থেকে। এই দুই প্রভাব ওই হাজার বছরের মধ্যে তাদেরকে স্থিত করেছে। নইলে উত্তর আমেরিকার সব জাতিগুলোর মত ওরা ছিল বাঁধনহীন শিকারি– বিশাল এলাকায় ঘুরে বেড়ানো মানুষ। ১২ হাজার বছর আগে এশিয়ার উত্তর পূর্ব কোণ থেকে আলাস্কা হয়ে আমেরিকা মহাদেশে ঢোকার পর থেকেই তারা এরকম জীবনই যাপন করেছে। বহু গোষ্ঠির আলাদা বিচরণ থাকলেও একটি অস্ত্রের সংস্কৃতি তাদের অনেকের মধ্যে কাজ করেছে এটিকে বলা হয় ক্লোভিস সংস্কৃতি– পাথরের তৈরি বেশ চওড়া ও লম্বা ছুরির মত এক অনন্য বর্শার মাথা থেকে এই সংস্কৃতিটির নাম এসেছে। এতে ব্যবহৃত চেরট, জ্যাস্পার ও কোয়ার্টজ পাথরের বৈশিষ্ট হলো একে খুব পাতলা ও

ধারালো-কিনারা করে ফেলা যায়, আর দেখতে ওতে থাকে একটি অনচ্ছ আভা। এই বর্শা হাতে ওরা ছিল দুর্দান্ত শিকারি। মনে করা হয় আমেরিকার এক সময়ের বিশাল সব প্রাণী ম্যাস্ট্যাডন ও ম্যামথ (উভয়েই হাতির অনেক বড় পূর্বপুরুষ), প্রাচীন বাইসন, অতিকায় ভালুক, অতিকায় গরু, আদি উট, ম্যাক্সিকান ঘোড়া এসব দলে দলে এদের হাতেই মারা পড়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কয়েক হাজার বছর পর অন্তত কোলিংটনে দেখতে পাচ্ছি তাদের অন্য রকম জীবন।

সাড়ে তিন শ' বছর আগে ইউরোপীয়রা যখন নর্থ ক্যারোলিনার এই সাগর তীরে প্রথম আসে চেরোকিরা তখন এ অঞ্চলের গর্বিত অধিবাসী। ইউরোপীয়দেরকে ওদের সঙ্গে আপোষ করে, ওদের সহায়তাতেই ওখানে থাকতে হয়েছে। কিন্তু আগন্তকরা তাদের জীবনকে একেবারে উল্‌টে পাল্‌টে দেয়– ওদের আনা ঘোড়া আর বন্দুক চেরোকিদের হাতে পড়ে তাদেরকে যুদ্ধবাজ করে তোলে, এবং দুই পক্ষ নিত্য বিবাদে লিপ্ত হয়; চেরোকিরা তাদের মত অন্য জাতির সঙ্গেও যুদ্ধে জড়ায়। ইউরোপীয়রা এর সুযোগ নেয়, নানা যুদ্ধে তাদেরকে টেনে এনে ধ্বংস করে। তাছাড়া আগন্তকরা নিজেদের সঙ্গে বসন্ত ইত্যাদি যে রোগ নিয়ে এসেছিলো তার বিরুদ্ধে স্থানীয়দের শরীরে কোন প্রতিরক্ষা ছিলনা। কাজেই মহামারীতে তারা ব্যাপক ভাবে মারা পড়ে। এভাবেই শেষ পর্যন্ত ওরা প্রায় বিলুপ্তির পথে চলে যায়।

দক্ষিণ আমেরিকার একটি গন্তব্য– কুজ্‌কো:

কুজকো নগরটি আন্দিজ পর্বতমালার উপত্যকায় এর একেবারে ভেতরে, বর্তমানে পেরু দেশটির সপ্তম জনবহুল শহর মাত্র। ওখানে এখন যারা থাকে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠরা হলো ৪ শ' বছর আগে আসা স্প্যানিশ উপনিবেশ স্থাপনকারীদের সঙ্গে এখানকার স্থানীয় মানুষ কেচুয়াদের জেনেটিক মিশ্রণের ফল। মিশ্রণের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের নানা জনের মধ্যে স্প্যানিশ ভাগ ও কেচুয়া ভাগের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন রকম। আর সংখ্যালঘিষ্ঠ বাকিদের মধ্যে আছে বিশুদ্ধ কেচুয়া আদিবাসী এবং সম্প্রতি নানা দেশ থেকে যাওয়া অভিবাসীরা। শহরটির বাইরে আন্দিজ পর্বতমালার ভেতরে ভেতরে গ্রামগুলোতে অবশ্য কেচুয়াদেরই সংখ্যাধিক্য। শহরে স্প্যানিশ ভাষার চল্‌ বেশি হলেও বৃহত্তর এলাকায় কেচুয়া ভাষার নানা বৈচিত্রই আন্দিজের এই লোকদের মুখে মুখে। ওই সুউচ্চ জায়গার বেশির ভাগ মানুষ এখনো পর্বতের আলু চাষের ওপর নির্ভরশীল– হাজার হাজার বছর ধরে যেমনটি হয়ে এসেছে। কাজেই জিন, জীবন, ভাষা

যেদিক থেকেই দেখি আজকের কুজ্‌কো শহর ও তার আশপাশে প্রাচীন প্রবাহ চলমান। তবুও আমরা আজকের বদলে সাড়ে চার শ' বছর আগের কুজকোকে বেছে নেবো আমাদের গন্তব্য হিসেবে। কারণ কন্‌কুইস্টোডোর বা বিজয়ী যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত মুষ্টিমেয় স্প্যানিশ যোদ্ধারা এখানে চড়াও হয়ে এদেশ দখলের ঠিক আগে আগের সেই দিনগুলোতে কুজকো এদেশের বহু জনপদের একটি মাত্র ছিলনা, ছিল পরাক্রমশালী ইন্‌কা সাম্রাজ্যের বিখ্যাত রাজধানী– যার সমৃদ্ধি তখন তুঙ্গে।

মূল কুজকোর নির্মাণ অবশ্য ইনকাদেরও আগের, এবং একটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত নগর হিসেবে একে গড়ে তোলা হয়েছিলো। প্রথম আসা স্প্যানিশদের বর্ণনা মত নগরের পাথরের চাই দিয়ে আচ্ছাদিত রাস্তাগুলো বিভিন্ন দিক থেকে সোজা কেন্দ্রের দিকে চলে গিয়েছে। পথের দুপাশের দালানগুলো পাথরে গড়া। কেন্দ্রের চত্বরটিতে হাজার খানেক মানুষের সমাবেশ হতে পারতো। পর্বতের ওপরে ছিল নগর প্রতিরক্ষা দুর্গ। তার প্রাচীর যে সব বিশাল পাথর খণ্ডে তৈরি; তা যে মানুষ নড়াচড়া করতে পারে এমনটি স্প্যানিশ বর্ণনাকারীদের মনেই হয়নি, অথচ সেগুলো একটির সঙ্গে অন্যটি এমন চমৎকার ভাবে ফিট্ করানো হয়েছিলো যে দুটির মাঝখানে একটি পিন ঢাকানোও অসম্ভব ছিল। বর্ণনাকারীরা মূল মন্দির ও নগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা দেখেও চমৎকৃত হয়েছে। পরে স্প্যানিশরা এর অনেকখানিই ধ্বংস করে স্প্যানিশ স্থাপত্যের আদলে ক্যাথিড্রাল ও অন্যান্য স্থাপনা তৈরি করেছে।

আসলে কুজকো রাজধানী হলেও ইন্‌কা সাম্রাজ্য তার চারিধারে আন্দিজ পর্বতমালা ও তার পাদদেশে বিশাল এলাকা জুড়ে ছিল। সর্বত্র ওরকম পাথরের স্থাপত্য গড়া এই সভ্যতার একটি বড় সক্ষমতা ছিল। কুজকো থেকে পাথরে বাঁধানো দীর্ঘ রাস্তা চলে গিয়েছিলো দুর্ভেদ্য আন্দিজ পর্বতের ভেতর দিয়ে নানা জায়গায়। গহীন পর্বতের ভেতরে নির্মিত ব্যাপক মন্দির স্থাপনা বিখ্যাত মাচুপিচু এখনো অসংখ্য পর্যটকদের বিস্ময় উৎপাদন করে। মুদ্রা ব্যবস্থা ছিলনা বলে তাদের অর্থনীতিতে বিনিময় হতো কৃষি পণ্য ও শ্রম দিয়ে। এই শ্রম ও স্থাপত্য সক্ষমতা ব্যবহার করে ওরা পর্বতের গায়ে স্বল্প প্রশস্ত ও অনেক দীর্ঘ ধাপ কেটেছে, খাড়া পাথর দিয়ে বাঁধাই করে সেই ঢালকে স্থায়ী করার ব্যবস্থা করেছে, যাতে প্রধান ফসল আলু ও ভুট্টা ফলানো যায়। আলুকে কৃষিতে আনা হয়েছে আরো প্রাচীন কালে এখানেই প্রথম। আন্দিজের ওই উচ্চতায় দিনে অবাধ সূর্য কিরণ ও রাতে প্রচণ্ড শীত– এই দুইকে ব্যবহার করে আধুনিক ফ্রিজ-ড্রাইং

(ঠান্ডায় বরফের মত জমাট বাঁধিয়ে পানিশূন্য করা) এর মত পদ্ধতিতে ওরা চট্‌কানো আলুকে দীর্ঘ মেয়াদে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতো। চুনো নামে পরিচিত এই পুনর্গঠিত ও সংরক্ষিত আলু এখনো এ অঞ্চলের একটি প্রধান খাদ্য।

এত কিছু যারা করতে পারতো তারা কিন্তু চাকার ব্যবহার জানতোনা বা করতোনা, চাকাওয়ালা গাড়ির ব্যাপারটাই সেখানে ছিলনা; আর ছোট লামা উটকে পোষ মানালেও ভার বহন করার মত কোন পশুও তাদের ছিলনা। চমৎকার বস্ত্র শিল্প ছিল– যেই বাহারি বস্ত্র এখনো ওদের মধ্যে দেখা যায়। লিপির কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও সুতার মধ্যে বিভিন্ন রকম গিট্টু একের পর এক দিয়ে গিয়ে তথ্য রেকর্ড করার একটি ব্যবস্থা ছিল যাকে বলা হতো কুইপো। বলেছি কুজকোর স্থাপনা ও এর সংস্কৃতি কিন্তু ইন্‌কাদের থেকেও প্রাচীন। ইন্‌কারা মাত্র তিনশ' বছর এই অঞ্চল শাসন করেছে। আসলে ইনকা সভ্যতা ছিল বহু হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা এই অঞ্চলের বিভিন্ন আন্ডিয়ান সভ্যতার চূড়ান্ত রূপ। মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা, এবং এই আন্ডিয়ান অঞ্চলে আমরা নগর সভ্যতাকে একটি অত্যন্ত বড় উচ্চতায় নিয়ে যেতে দেখি সেই মানুষগুলোকেই যারা আদিতে ১২ হাজার বছর আগে উত্তর পূর্ব এশিয়া থেকে আমেরিকায় এসেছিলো, তারাই পরে পৌছে গিয়েছিল দক্ষিণে এসব সভ্যতা গড়তে। ক্লোভিস বর্শা হাতে নিয়ে দলে বলে বিশাল ম্যামথ-বাইসন শিকার করে যাদের হাজার হাজার বছর কেটেছে, গত দু'তিন হাজার বছরে এসে ওরা অন্য সংস্কৃতির একটি উচ্চ রূপ দেখিয়ে দিয়েছে।

উত্তর পূর্ব এশিয়া থেকে আমেরিকায় ঢুকেছিলো কারা? যাদের পূর্বপুরুষরা ৭০ হাজার বছর আগে আফ্রিকা থেকে বের হয়ে এসে কালক্রমে সারা এশিয়ায় ছড়িয়েছিল তাদেরই কেউ কেউ। এভাবে মূল উৎস থেকে জিন, জীবন, ভাষার ধারা চলে গেছে নানা গন্তব্যে– গিয়েছে এল্ আম্‌রায়, ইউনিটিসে, বোটানি বে'তে, কোলিংটনে, কুজ্‌কোতে এবং সারা দুনিয়ায় এরকম অসংখ্য আপন পরিসরের জমজমাট জায়গায়। আমরা তারই মধ্যে থেকে চট্টগ্রামকে বেছে নিয়েছি মাত্র।

জ্ঞানীর জীবন ও যাত্রা

মামুলি জ্ঞানীর 'মানুষ' হওয়া

তখনো চোখে পড়ার মত আলাদা নয়ঃ

জ্ঞানীদের প্রথম লাখ খানেক বছর তেমন গর্ব করার মত সময় ছিলনা, কারণ তাদের জীবনের সঙ্গে সমসাময়িক অন্য মানুষদের তেমন কোন পার্থক্য ছিলনা। আফ্রিকায় তখন জ্ঞানীদের সবার সমকক্ষ বেশ কয়েক প্রজাতির প্রায়-জ্ঞানীরা ছিল। আফ্রিকার বাইরে মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ানডার্থালরা ছিল। আর আফ্রিকায় এবং দুনিয়ার নানা জায়গায় শেষের দিকের খাড়ারা ছিল। যদিও মস্তিষ্কের আয়তন ও সক্ষমতায় জ্ঞানীদের অগ্রসরতা ছিল, তারপরও যে পরিবেশে যে জীবনে তারা অভ্যস্ত ছিল সেখানে ওই সব অন্য মানুষরা মোটের ওপর একই কাতারে ছিল বলে ধরে নেয়া যায়। জীবন যাপনে তাদের মধ্যে পার্থক্যকে উনিশ-বিশ পার্থক্য বলাই ভাল।

তবে আফ্রিকায় পরিবেশের যে সংকটে জ্ঞানীরা উদ্ভুত হয়েছিলো সেই সংকট কিছুদিন পর পরই দেখা দিচ্ছিলো এবং তার কারণে জ্ঞানীর আরো বিবর্তন বেশ দ্রুতগতিতেই হয়ে চল্‌ছিলো। ওই সংকটের সময়ে ছোট ছোট দলে শিকার আর সংগ্রহ করে তাদের চল্‌তো। পরিবেশের বৈকল্য তাদের টিকে থাকার পথে প্রায়ই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল এবং সেই প্রতিকূল পরিবেশের চাপে বাড়তি বিবর্তন তার মস্তিষ্ককে ক্রমেই ওখানকার জীবন সংগ্রামের আরো উপযুক্ত করে তুল্‌ছিলো। আগে থেকে কিছুটা এগিয়ে থাকার কারণে, এবং নতুন প্রজাতি হিসেবে পরিবেশের চাপ তাদের ওপর বেশি থাকার কারণে জ্ঞানীরা সক্ষমতার দিক থেকে বাকিদেরকে খুব দ্রুত অনেক দূর ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিলো– ওই প্রথম লাখ খানেক বছরের মধ্যে। জ্ঞানীদের তার পরের ইতিহাস শুধুই অনন্যতার। কিন্তু তা যতদিন না হয়েছে তাদের সংগ্রাম ও তাদের অসহায়তা প্রায়-জ্ঞানী বা খাড়াদের মতই তীব্র ছিল। নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া, কার্যকর হাতিয়ার, গুহার বা অন্য আশ্রয়ে রাতে সারাক্ষণ আগুন জ্বালিয়ে হিংস্র প্রাণী থেকে আত্মরক্ষার সুযোগ, এই ক'টি জিনিসই ছিল ওই সংগ্রামে জ্ঞানীদের ভরসা। এগুলোর কোনটিই একেবারে নতুন ছিলনা, তবে জ্ঞানীদের অধিকতর বুদ্ধির কারণে ওরা ক্রমেই সবাইকে ছাড়িয়ে ওঠছিলো।

শিকারের অস্ত্রের মূল ধারাটি কিন্তু বদলায়নি, যেমন বদলায়নি ছোট-বড় সব রকম প্রাণী শিকার করার, বা অন্যের শিকার করা মৃতদেহকে সুকৌশলে সরিয়ে আনার শিকারি জীবনের প্রকৃতি। মাটির তলার মূল, কন্দ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে খুঁটির ব্যবহার এবং বড় পশুকে শিকারের জন্য ঘায়েল করতে কাঠের লাঠিকে সূঁচালো করে বর্শা তৈরিও বহুদিন আগে থেকে চলে আসছিলো। ও সময়ে যত্ন করে পাথর থেকে তৈরি তীর আকৃতির বর্শার মাথার কোন স্পষ্ট নিদর্শন না পাওয়াতে এমনটিই স্বাভাবিক ছিল ধরে নেয়া যায়। অথচ এর বহুদিন পর এই জ্ঞানীদের হাতে সযত্নে তৈরি বিশেষ বিশেষ বাছাই করা পাথরের বর্শার মাথার মারাত্মক কার্যকারিতা আজকের সবাইকে মুগ্ধ করেছে। শিকার করা প্রাণীকে কেটে কুটে খাবারের উপযুক্ত করতে পাথরের যে হাত-কুঠার ব্যবহার করা হতো তাতেও শুরুর দীর্ঘকাল তেমন কোন নতুনত্ব ছিলনা। এই একই হাত-কুঠার এর বহু লক্ষ বছর আগে থেকে অন্য প্রজাতির মানুষরা ব্যবহার করে আসছে। কিছুটা ত্রিভুজ অথবা অশ্রু-বিন্দুর মত দেখতে এর চওড়া অংশটি হাতে ধরে এর সরু অংশ ও পাশের ধারালো কিনারা দিয়ে কাটাকুটির কাজ সারা হতো। কিন্তু এই জ্ঞানীরাই শুধু পাথর দিয়েই আরো চমৎকার যে সব হাতিয়ার তৈরি করতে পেরেছে পরবর্তী যুগটাতে, সেটি দেখলে অবাক হতে হয়। এর মধ্যে নিশ্চয়ই তাদের মস্তিষ্কে ও হাতের কুশলতায় অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র হাতিয়ার যা আঁচড়ানো, কোরানো, ইত্যাদি সূক্ষ্ম কাজের জন্য ব্যবহৃত হতো সেগুলো অনেক বেশি সূক্ষ্ম সৌকর্যের দাবী রাখে। কিন্তু সে সব আরো পরের কথা।

শিকারি-সংগ্রাহকদের জীবনে দলবদ্ধ শিকারে বড় বড় পশুকে ঘায়েল করতে পারাটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু সেটি সম্ভব হতো বিশেষ বিশেষ মৌসুমে এবং তাও বেশ কিছুদিন পর পর। ওভাবে যথেষ্ট শিকার সম্ভব হলেও যেহেতু ওই মাংস সংরক্ষণের সুযোগ ছিলনা যথাসম্ভব খেয়েই এর অংশ মাত্রের সদ্ব্যবহার করা যেতো– বাকিটা নষ্ট হতো। অন্যদিকে দৈনন্দিন খাবারের জন্য ওই ছোট ছোট পারিবারিক দলকে নির্ভর করতে হতো বসতের সঙ্গেই বা আশেপাশে থাকা ছোট ছোট পশু ও পাখি শিকারের ওপর– ইঁদুর, খরগোস, বনমোরগ ইত্যাদি। দ্রুতগামী এসব প্রাণী লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ছোট্ট হওয়াতে অস্ত্র ছুঁড়ে এদেরকে মারা সহজ হতোনা। এদের ক্ষেত্রে ফাঁস, ফাঁদ ইত্যাদি কৌশলগুলোই বেশি কাজে আসতো। তেমনি দৈনন্দিন ফল-মূল সংগ্রহের ব্যাপারটিও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে মাটির তলার এরকম সংগ্রহের খাদ্য খুঁজে পেতে অভিজ্ঞতালব্ধ

যথেষ্ট কৌশলের প্রয়োজন হতো। কিন্তু জ্ঞানীদের শুরুর ওই দীর্ঘ সময় এসব কৌশল-নির্ভর কাজের জন্য তাদের মস্তিষ্ক পুরাপুরি তৈরি হয়ে ওঠেনি– বিবর্তনের আরো ধাপ পার হয়েই এসব কৌশলের সক্ষমতা অর্জন সম্ভব হয়েছে।

দলবদ্ধ হয়ে বড় পশু শিকারের ব্যাপারটি জ্ঞানীদের মধ্যেই প্রথম দেখা দিয়েছিলো। অন্য প্রজাতির মানুষরা একা অথবা দুই একজন মিলে শিকার করতো। খুব সম্ভব এর থেকে বেশি সংখ্যক মানুষের মধ্যে সমন্বয় করে শিকার সম্পন্ন করার মত ভাষা ও পারস্পরিক সূক্ষ্ম যোগাযোগের ক্ষমতা তাদের ছিলনা বলেই সেটি তারা করতে পারতোনা। জ্ঞানীদের নিজেদেরও যে ওই পর্যায়ে সত্যিকার ভাষা ছিল তা নয়; মানুষের উচ্চতর চিন্তা, কল্পনা, পরিকল্পনা, অন্যের মন বোঝার ক্ষমতা– মস্তিষ্কে এগুলোর স্পন্দন আনতে আপন চিন্তারও ভাষা প্রয়োজন। আবার কণ্ঠস্বরের ধ্বনির বাচনের মাধ্যমে নিজের যাবতীয় মনের ভাব প্রকাশের জন্যও ভাষা প্রয়োজন। এমন ভাষা তখনো জ্ঞানীদের মধ্যে পুরাপুরি বিকশিত হয়নি– তবে শিকার সমন্বয়ের মৌলিক যোগাযোগের মত ভাষা তখনো ছিল। এর ফলে দলবদ্ধ শিকারে জ্ঞানীদের দক্ষতা যথেষ্ট কার্যকর ছিল– বলতে গেলে প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই কার্যকর ছিল। সব মানুষের হাতে নির্বিচারে পশু হত্যা ঘটেছে, তবে জ্ঞানীদের হাতে তা এতই বড় আকারে হয়েছে যে বেশিদিন এক জায়গায় বাস করে শিকারের পশু পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হতোনা, ঘন ঘন ঠাঁই বদলাতে হতো। অন্য মানুষদেরকেও তা করতে হলেও তারা স্থানীয় ভাবে বিভিন্ন পশুর এতটা বিলুপ্তি ঘটাতে সক্ষম ছিলনা। অস্থায়ী ভাবে থাকার জন্য সব জায়গায় গুহা অথবা শিলা-আশ্রয় খুঁজে পাওয়া সম্ভব হতোনা। তাই সরু ডাল, ছোট গাছ, পাতা, খড় দিয়ে কোন রকম ঝুপড়ি বানিয়েই তাদের কাজ সারতে হয়েছে। আফ্রিকার তৃণভূমি অঞ্চলে এসবের প্রাপ্তি সীমাবদ্ধই ছিল বলতে হবে। কাজেই সেই প্রথম যুগের জ্ঞানীদের জীবন আরামদায়ক তো ছিলইনা, নিরাপদও ছিলনা– প্রকৃতির চাপ তাদের ওপর অত্যন্ত বেশি ছিল। হয়তো সে কারণে তাদের মস্তিষ্কের এত দ্রুত বিবর্তন হয়েছে, জ্ঞানী মানুষ দ্রুত আরো বেশি 'মানুষ' হয়ে ওঠেছে।

প্রকৃতির চাপ বেশি হবার আরেকটি কারণ হলো নানা দিকে জ্ঞানীদের জীবনের তুলনামূলক উন্নতি হলেও তাদের বসবাস ছিল মোটের ওপর এক একটি পারিবারিক গোষ্ঠির মধ্যে। যাবতীয় সাক্ষ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সেরকম একটি দল বড় জোর ২০-৩০ জনের বেশি হতোনা। এমন ছোট একটি দল বিশাল সাভানা তৃণভূমি, বা অন্যত্র বিস্তীর্ণ জায়গায় ঘুরে বেড়াতো অনেক বিপদের ঝুঁকি

নিয়ে। বিচরণের বিস্তারের তুলনায় তাদের জনসংখ্যা ছিল একেবারে নগণ্য। একটি দল হয়তো সারা বছর ঘোরাঘুরি করেও তাদের মত আরেকটি দলের দেখা পেতো না। এই অবস্থার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এক একটি দলের পুরো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াটিও বিচিত্র ছিলনা। ওই প্রাথমিক সময়ে সার্বিক ভাবে জ্ঞানীদের সংখ্যা কখনো কখনো এত নিচে নেমে এসেছিলো যে যেকোন সময় প্রজাতি হিসেবে তারা বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারতো। পরবর্তী কালে এরকম বেশ কিছু পারিবারিক দল প্রায়শ একত্রে ঘোরা, একত্র শিকার করে যে বৃহত্তর সমাজ গড়ার মত সক্ষমতা অর্জন করেছিল, প্রথম দিকে তা ছিলনা। এটি তাদের বিপন্নতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছেলো এরকম বিপন্নতা একদিকে যেমন তাদের বিলুপ্তির সম্ভাবনাটি পদে পদে বজায় রেখেছিলো, অন্যদিকে এর ফলে মস্তিষ্কের দ্রুত বির্তনে অভিনব অদ্ভুত সব সক্ষমতার জন্ম দিয়েছিলো।

মন-পাগলের বিপ্লবঃ

'পাগল মন রে . .' এমন গানের সমজদারদের সৃষ্টি খুব সম্ভব হঠাৎ করে হয়েছিলো ওই আফ্রিকায় জ্ঞানীদের মধ্যে– ৭০ হাজার বছর আগে। তারপর থেকে ওদের মতিগতি বদলে গিয়েছিলো। সেই অর্থেই একে মন-পাগলের বিপ্লব বলা– মনের তাড়নায় যে পাগল, সেই পাগল হবার মাধ্যমে বিপ্লব। এই বিষয়ে টের পাচ্ছি ওসময়ের আফ্রিকায় কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের কারণে, যার মধ্যে প্রধান একটি হলো দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্র পারের ব্লোম্বোস গুহা। ওখানে পাওয়া গেছে এমন কিছু নিদর্শনের সম্ভার যা ৭০ হাজার বছর আগের মানুষের কাছ থেকে আশা করা যায়না। সমসাময়িক ওখানকার জ্ঞানীদের সম্পর্কে যা কিছু জানা ছিল তার মধ্যে হঠাৎ করে এই নতুন আবিষ্কার যেন অন্য সুরে কথা বলেছে। এখনো যদি কেউ ব্লোম্বোস গুহার মধ্যে ঢুকে এর খোলা মুখের ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকায় সরাসরি চোখে পড়ে গুহাটির সঙ্গে একেবারে লাগোয়া ভারত মহাসাগরের জলরাশি এবং কিনারার একটুখানি বেলাভূমি। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এ গুহার ভেতরে প্রশস্ত স্থানে বড়সড় পরিবারের বসতের যাবতীয় আলামত পেয়েছিল– ৭০ হাজার বছরের আগের পরিবার। অদ্ভুত ব্যাপার যেটি তা হলো এখানে যে হাতিয়ার, তৈজস ইত্যাদি টিকে রয়েছে সেগুলোকে ব্যবহারে কার্যকর করে তোলার চেষ্টা যেমন রয়েছে, তেমনি প্রত্যেকটিকে সুন্দর করে তোলারও একটি প্রচেষ্টা রয়েছে। প্রথম চেষ্টাটি অন্যরাও যে করেনি তা নয়, কিন্তু ওই দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সুন্দর করার চেষ্টা এটি একেবারেই অভিনব।

এখানে পাওয়া গেছে পাথরের নানা হাতিয়ার– বিভিন্ন আকৃতির ছুরি প্রত্যেকটি ভিন্ন কাজে, যা সে সময় মোটামুটি দেখা যেতো, ক্রমে মোটা থেকে সরু হয়ে যাওয়া বিভিন্ন সাইজের ছিদ্র করার তুরপুন (ড্রিল), ছোট-বড় বিভিন্ন পাথর যাকে বর্শার আগায় বাঁধার উপযুক্ত করে আকৃতি দেয়া হয়েছে, আর কিছু ক্ষুদ্র হাতিয়ার যেমন সব্জিকে আঁচড়িয়ে ছোট করার আঁচড়ানি কিংবা নারকেলের মত জিনিস কোরানোর জন্য কোরানি ইত্যাদি। যেটি ব্যতিক্রমী তা হলো এদের প্রত্যেকটি সুন্দর ভাবে ডিজাইন করা– যেমন ছুরির ধারের দিকটায় ক্ষুদ্র খাঁজগুলো বা দাঁতগুলো যেন প্যাটার্ন তোলা, আর ধারের বিপরীত দিকটি ঘষে মসৃণ ও সুন্দর করে তোলা; যেসব শ্রমসাপেক্ষ চেষ্টা ওই ছুরির ব্যবহারে তেমন কোন কাজে আসেনা। অন্যদিকে বর্শার মাথাগুলোকে তিন দিকেই একেবারে প্রতিসম করে তোলা অনেকটা একটি সমবাহু ত্রিভুজের আকৃতি দিয়ে। সব হাতিয়ারে পাথরের পুরুত্বকে পাতলা ও যথেষ্ট সমতল করে নেয়া হয়েছে, যদিও তা মসৃণ নয়, যেন এক রকম প্যাটার্ন তোলা। আঁচড়ানোর, কোরানোর ছোট হাতিয়ারগুলোকে সুন্দর ডিম্বাকৃতি দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকেও বেশ পাতলা করে নেয়া হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যায় যে যারা এগুলো তৈরি করেছে তাদের কাছে শুধু কাজ সারাতেই এদের দাম নয়, বরং সৌন্দর্যেরও দাম ছিল, এবং সেটি তারা উপভোগ করেছে।

পাথর ছাড়া অন্য যে ক'টা বস্তুতে তৈরি হাতিয়ার টিকে ছিলো সেগুলো আরো সুন্দর, কারণ ওগুলোকে নানা রূপ দেয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। এর মধ্যে পাওয়া গেছে হরিণের শিঙে তৈরি বর্শা ও হারপুন, এবং হাড়ের তৈরি ছুরি। সামনেই সমুদ্র বলে বড় মাছ শিকারের জন্য হারপুনগুলো বেশ উপযোগী, কিন্তু ওই মাছের সঙ্গে আটকে যাওয়ার জন্য এতে যে খাঁজগুলো রয়েছে তা বেশ দৃষ্টি-নন্দন করে তৈরি। হাড়ের তৈরি ছুরিগুলোতে রয়েছে নক্শা তোলার আভাস।

এগুলোর সব অবশ্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজের জিনিস। কিন্তু সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই প্রথম মানুষের বসতে এমন কিছু জিনিস পাওয়া গেল যাকে ওই অর্থে কাজের জিনিস বলা যায়না। দেখলেই বোঝা যায় অনেক যত্নে এই যে জিনিসগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে, এর ওপর পরিশ্রম করা হয়েছে। সেগুলো হলো অলঙ্কার, প্রসাধনী, এবং নান্দনিক সৌন্দর্যের কারণে সাজিয়ে রাখার জিনিস। এর মধ্যে পাওয়া গেছে একেবারেই ছোট সাইজের অনেক শামুক– বড় পুঁতির দানার আয়তনের কিন্তু শামুকের নিজস্ব গঠনের জন্য খুব সুন্দর। প্রত্যেকটি শামুকের একই জায়গায় খুব চিকন তুরপুন দিয়ে ছিদ্র করা, বোঝা যায় গলার মালা গাঁথার জন্য। এরকম কিছু শামুক এখনো পশুর চিকন

রগের সূতায় গাঁথা আছে বাকিগুলো সূতা ছিড়ে গলার মালা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আরো রয়েছে ছোট-বড় ঝিনুকের খোল যাতে ঝিনুকের গায়ের নিজস্ব প্যাটার্নের সঙ্গে আঁচড় কেটে কেটে আরো নক্‌শা যোগ করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঝিনুকের সংলগ্ন দুটি খোল এমনভাবে আছে যেন তা ডিব্বা হিসেবে ব্যবহার করা হতো, বাকিগুলো নেহাতই অলঙ্কারিক।

আরো কিছু জিনিস পাওয়া গেছে যেগুলো নেহাত নিজে সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য সাজিয়ে রাখার জন্য অথবা উপহার দেয়া বা বিনিময় করার জন্য ছাড়া আর কোন অর্থ হয়না। এগুলো হলো সুন্দর লাল মাটির জমাট বাঁধা ডেলা, খুব নরম পাথরের মত। একে ছুরি দিয়ে কাটা যায়, চাঁছা যায়, আঁচড় কাটা যায়। এই ডেলাকে মনে হয় একটু মাপজোক করেই কেটে কেটে আয়তাকার ঘনায়তন দেয়া হয়েছে, যার চারটি লম্বাটে এবং দুটি প্রায় বর্গাকার মোট ছয়টি তল। প্রত্যেকটি তল ঘষে পালিশ করে নেয়া হয়েছে। এর ওপর আঁচড় কেটে আঁকা হয়েছে জিগজাগ নকশা যা দৈর্ঘের দিকে বিস্তৃত হয়েছে আগাগোড়া। একটি জিগজাগ নক্‌শার একটু নিচে এমনি আরেকটি, তারপর আরো একটি। সবগুলোর একেবারে ওপরে এবং একেবারে নিচে দিয়ে টানা হয়েছে দুটি সমান্তরাল রেখা। সব মিলে প্রত্যেকটি ডেলা এরকম সুন্দর নক্‌শায় ভরা। প্রশ্ন উঠতে পারে এটি কি নেহাতই সৌন্দর্য উপভোগের জন্য? এটি উপহার দিয়ে অন্যের মন জয় করার ব্যাপার ছাড়াও জাদু-টোনার ব্যাপারও থাকতে পারে এতে, অন্যের মনে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায়। আমরা শুধু আন্দাজ করতে পারি।

গলায় শামুকের মালা ছাড়াও নিজেকে সাজাবার অন্য রকম কিছু উদ্যোগের নমুনাও খুঁজে পাওয়া গেছে। বিশেষ করে কয়েকটি অনেক বড় বড় ঝিনুকের খোল লক্ষ্যনীয়। এ খোলগুলো বড় সামুদ্রিক শঙ্খের মতই শক্ত, তবে ঝিনুকের এই অর্ধ-খোলাটি কাজ করছিলো একটি শক্ত বাটির মত যার গায়ে লাল মাটির গুড়ো এখনো লেপটে রয়েছে। বোঝা যায় পাউডার করা লাল মাটির গুড়ার সঙ্গে চর্বি মিশিয়ে এই ঝিনুকের খোলের মধ্যে তা ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে নিজেকে রাঙাবার প্রসাধনী ক্রিম তৈরি করা হয়েছিরো। হয়তো নিয়মিত ভাবেই তা ওরা ব্যবহার করতো।

ব্লোম্বোস গুহায় এমন সাংসারিক পরিবেশে যা পাওয়া গেছে তা ঠিক এভাবে আশপাশে আর কোথাও তো নয়ই, জ্ঞানীদের বাস করা এই পুরো মহাদেশের কোথাও এতটা স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়নি। তবে এই না পাওয়াটিকে কাকতালীয় বলতে হবে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে থাকে– হঠাৎ সৌভাগ্য

ক্রমে একটি জায়গায় অনেক কিছু পাওয়া যায়, তারপর আর দীর্ঘকাল অন্য কোথাও কিছু নয়। তার মানে এই নয় যে একটি গুহায় বাস করা মানুষরাই শুধু ওই রকম সৌন্দর্যবোধের চিন্তা ভাবনা শুরু করেছিলো। তাদের সমাজে এর আরো বহু সমজদার না থাকলে এমন হবার কথা নয়। আসলে এই যাযাবর মানুষের এমন সব জিনিস এত ভাল সংরক্ষিত হওয়াটাই ছিল একটি বিরল ঘটনা– বিশেষ করে যখন মানুষ বলতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অল্প কিছু মাত্র জনসংখ্যা। তা সত্ত্বেও ব্লোম্বোসের মানুষগুলোর কাছাকাছি সময়ে ওখান থেকে কাছে ক্লাসিস নদীর ধারে খুঁজে গেছে বন্য ঝোপঝাড়ে মানুষের আগুন দেবার নমুনা, যাতে মনে হয় ওখানে খাবার উপযুক্ত শিকড় ও কন্দগুলোকে আরো ভাল জন্মাতে সাহায্য করতেই এই আগুন দেয়া। প্রকৃতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টার এই চিন্তাটিও কিন্তু মানব মস্তিষ্কে পরিকল্পনা করার সক্ষমতা সৃষ্টির ইঙ্গিত দেয়, যা আগে ছিলনা। দক্ষিণ আফ্রিকাতেই ডিপক্লুক নামক জায়গায় সেই ৭০ হাজার বছরের মত আগের উটপাখির ডিমের ভাঙ্গা খোলস পাওয়া গেছে যার গায়ে আঁচড়ানো নক্শা আঁকা হয়েছে। কাজেই ব্যাপক ভাবে জ্ঞানীদের মধ্যে মন-পাগলের বিপ্লব ঘটেনি, হঠাৎ কয়েকজন মানুষের মধ্যে ঘটেছে, এমন মনে করার কোন কারণ নেই।

ব্লোম্বোস গুহার বসতটি আবিষ্কারের কিছু পরে অথবা প্রায় একই সময়ে অবশ্য আফ্রিকার নানা জায়গায় এমন মন-পাগলদের আরো নিদর্শন অল্প বিস্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি টানজানিয়ায় এবং একটি মরক্কোতে মানুষের বসতে পাথরের ছোট ছোট গুটি খুঁজে নিয়ে তাকে ঘষে পূতির দানার আকার দেয়া হয়েছে এবং তার মধ্যে ছিদ্র দেখে বোঝা যায় যে মালা তৈরির জন্যই এগুলোকে এভাবে তৈরি করা হয়েছে। আবার কঙ্গোর কাতাঙ্গাতে এমন সুন্দর খাঁজকাটা হাড়ের তৈরি হারপুন পাওয়া গেছে যা ব্লোম্বোসের হরিণের শিঙের হারপুনের সঙ্গে তুলনীয়।

৭০ হাজার বছর আগে মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতায় একটি বিপ্লব যে ঘটে গিয়েছিলো তা আরো কিছু নিদর্শন আবিষ্কারের মাধ্যমে বোঝা গেছে। এই বিপ্লবের একেবারে মূল কথাটি যদি বলতে চাই বলতে হয় এটি অন্যের মনের ভাব বুঝতে পারার, আন্দাজ করতে পারার সক্ষমতা। এটি মানুষের চিন্তাকে অনেক দূর নিয়ে গেল, সে তার কাজের প্রতিক্রিয়া অন্যদের ওপর কী হবে তা বুঝতে পারলো, অন্যের চিন্তাকে প্রভাবিত করার জন্য কী করতে হবে তার পরিকল্পনাও করতে পারলো। আসলে এটি আগেকার যে কোন চিন্তার চেয়ে অনেক উচ্চতর চিন্তা– সেটি ভবিষ্যতকে বিবেচনায় নেয়, প্রয়োজনে বিভিন্ন

রূপকল্প ভেবে নেয়। এর মধ্যে অন্যের কাছে প্রীতিভাজন হবার চিন্তা যেমন আছে, তেমনি অন্যকে ভুল পথে চালিত করার চিন্তাও থাকতে পারে, ভুল সংকেত দেবার মাধ্যমে। দেখা গেছে এটি মানুষের মস্তিষ্কেরই নতুন অনন্য ক্ষমতা, অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে এসব ক্ষমতা নেই বল্‌লেই চলে। ওই যে নান্দনিকতার বোধ এটি সৃষ্টি হতোনা যদি অন্যের মন বোঝার ক্ষমতা একই সঙ্গে না জন্মাতো। তাই নান্দনিক সৃষ্টিকর্মগুলো অন্যের প্রশংসা লাভ, উপহার দিয়ে অন্যের মন জয়, অন্যকে জাদুটোনা করা ইতাদি যে কারণেই হোক মন-পাগলের ওই মন-বোঝার ব্যাপারটি ওখানে থাকেই। এটি আরো এক ক্ষেত্রে থাকে যেটি নেহাতই খাদ্য সংগ্রহ বা প্রতিরক্ষার জন্য, কিন্তু তাতেও অন্য প্রাণীর চিন্তাকে বোঝার সক্ষমতা থাকতে হয়। মোটামুটি ৭০ হাজার বছর আগের সময়ে একটি পশু ধরার ফাঁদ খুঁজে পাওয়া গেছে ওই দক্ষিণ আফ্রিকার সিবুধি নামক জায়গায়। আমাদের খুঁজে পাওয়া এটিই প্রথম পশু ধরার ফাঁদ।

তারও আগে বহু লক্ষ বছর ধরে জ্ঞানী ও তাদের আগের মানুষরা অস্ত্র ছুঁড়ে শিকার করার কৌশল জানতো। কিন্তু এই যে ফাঁদের কৌশল সেটি কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন– রীতিমত বৈপ্লবিক। কারণ এর জন্য মানুষকে প্রাণীর মন বোঝার সেই ক্ষমতাটি লাভ করতে হয়েছে। পশু কী মনে করে কোথায় পা দেবে, কী দেখ্‌লে সে তা দেবেনা, তা আগাম জানতে তার মনকে আন্দাজ করে করে নিতে হয়েছে এতে।

ব্লোম্বোস গুহার নান্দনিক জিনিসগুলো আরো কিছু বিষয়কে স্পষ্ট করেছে। ওগুলোর একমাত্র সমজদার যদি পরিবারের ওই ক'জন মানুষই হতো তা হলে এর পেছনে এত সময়, এত সৃজনশীল পরিশ্রম ব্যয় করা হতোনা। নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে মানুষের একটি বৃহত্তর সমাজ গড়ে ওঠেছিল যারা প্রায়শ এক সঙ্গে মিলিত হতো, কাজ করতো, বিনোদন উপভোগ করতো, পরস্পরের সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দিতো, মুগ্ধ হতো। সে রকম পরিস্থিতিতেই শুধু মন-পাগলের এই সৃষ্টিকর্ম সার্থক হতে পারে। ওই বিপ্লব মানুষের মস্তিষ্ককে তখন চোখের সামনের বর্তমানের সীমাবদ্ধতা থেকে বের হয়ে ভবিষ্যতের যে স্বপ্ন, যা এখন নেই, তারও কল্পনা করতে সক্ষম করেছে। সামাজিক উৎসবের আনন্দে তারা যেন অন্যদের মধ্যেও এই কল্পনাকে সঞ্চার করতে পারে সে জন্য দরকার হয়েছে এমনি পূর্ণাঙ্গ মানব ভাষার যা বিমূর্ত চিন্তারও বাহন হতে পারে। যা বাস্তবে নেই, কখনো কেউ দেখেনি সে রকম জিনিসকে, যেমন ধরা যাক পঙ্খীরাজ ঘোড়াকে, তাকেও এ ভাষা কল্পনায় সৃষ্টি করতে পারে। একেবারে

ভিত্তিহীন কল্পনা নয় কারণ সে ঘোড়াও দেখেছে, পাখিও দেখেছে, এই দুইকে মিলিয়ে পঙ্খীরাজ ঘোড়া সৃষ্টি তার ওই বিমূর্ত চিন্তার কাজ। তেমনি বজ্রের ডাক, বিজলির চমক, এবং শ্রদ্ধা উদ্রেককারী গুরুজনকে মিলিয়ে সে কল্পনায় সৃষ্টি করতে পেরেছে বজ্র দেবতাকে। শুধু একাকী নিজের মনে নিজে এটি করেনি, একের কল্পনাকে সবার কল্পনা করে তোলার উপযুক্ত ভাষার সৃষ্টিও এর সঙ্গেই হয়েছে। লাল মাটির আয়তাকার ডেলার ওপর আঁকা নক্শাগুলোর কোন সত্যিকার জিনিস না আঁকলেও তার মধ্যে সে অনেক গুরুত্ব খুঁজে পায়। সেটি নিয়ে সেই গুরুত্ব সহকারে সে অন্যদের সঙ্গে আলাপ করতে পারে, ওটি দেখিয়ে অন্যকে মুগ্ধ করতে পারে। মানুষের কাছে ব্যাপারটি একেবারেই নতুন, এমন চিন্তাটাই নতুন, ওই চিন্তার বাহক ভাষাটাও নতুন।

বহু লক্ষ বছর ধরে মানুষের মধ্যে এই ভাষার প্রস্তুতি চল্‌ছিলো। তার জিহ্বা, মুখগহ্বর, কণ্ঠনালী, কাঁপার মাধ্যমে গলার স্বর সৃষ্টির জন্য যে স্বরতন্ত্রী সবকিছু জ্ঞানীদের আগে থেকেই বিবর্তিত হয়েছে ধাপে ধাপে ভাষার উপযুক্ত হবার দিকে; এবং এই সব আংশিক ব্যবহৃতও হচ্ছিলো যোগাযোগের জন্য একরকম প্রাক-ভাষার কাজে। এটি পূর্ণাঙ্গ ভাষা না হয়ে ওঠার কারণটি ছিল মস্তিষ্কে, তখনো যে মন-পাগলের বিপ্লবটি ঘটে ওঠেনি। মস্তিষ্ক ওই বিমূর্ত চিন্তারও প্রতীকী উদ্দীপনাগুলো যখন অনুধাবন করতে পারলো, এবং একই সঙ্গে সেই অনুধাবনকে সে ধ্বনির মাধ্যমে বাচনে রূপ দিতে পারলো, তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেলো। মানুষে মানুষে ভাবের যোগাযোগকে আর প্রাক্-ভাষার মত শুধু বাস্তব ধরাছোঁয়ার বিষয়ে, চোখের সামনের জিনিসের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হলোনা, ওটি কল্পনার অসীমের দিকে চলে যাবার সুযোগ পেয়ে পূর্ণাঙ্গ ভাষা হয়ে দাঁড়ালো। এই বিরাট ব্যাপারটি ঘটেছিলো প্রায় ৭০ হাজার বছর আগে মন-পাগলের বিপ্লবের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে। ভাষা আর মন এই দুটি একাকার হয়েই ঘটেছিলো সেই বিপ্লব; উভয়ের আসল আবাস মানুষের মস্তিষ্ক– বলতে গেলে মস্তিষ্কের হঠাৎ পরিবর্তনই এই বিপ্লব সম্ভব করেছিলো। আসলে হয়তো মস্তিষ্কের পরিবর্তনটি আদৌ হঠাৎ হয়নি। ধীরে ধীরে অনেক কাল ধরে হয়েছিলো; কিন্তু ওই সমাজ, ওই পরিবেশ, ওই সংস্কৃতির অভাবে তা তার কাজ করতে পারেনি; ৭০ হাজার বছর আগের ঠিক ওই সময়টিতে এসে ব্যাটে-বলে মিলেছিলো বলে তখনই ঘটতে পেরেছিলো ওই মন আর ভাষার একত্র বিপ্লব। যে ভাবেই ঘটুক, জ্ঞানীর মানুষ হবার ক্ষেত্রে সেটি ছিল সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

সংগ্রামের দিনে স্থায়ী হয়ে যাওয়া মস্তিষ্কঃ

জ্ঞানীর প্রথম যুগটি যে নিত্য সংগ্রামে কেটেছে তা আমরা দেখেছি। ৭০ হাজার বছর আগের সেই অনন্য ঘটনার পরেও সংগ্রাম যে শেষ হয়ে গিয়েছিলো তা নয়। পেশি শক্তিতে দুর্বল শিকারি-সংগ্রাহক মানুষ ওই উন্মুক্ত প্রকৃতিতে রীতিমত অসহায় অবস্থাতেই যে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলো– তা সারাক্ষণ সংগ্রাম করে; বহু পরে কৃষি উদ্ভাবনের সুযোগে গ্রাম-শহর-নগর গড়ে যতদিন স্থিত না হতে পেরেছে– তার সংগ্রাম চলেছেই। মন ও ভাষার একত্র বিকাশে মস্তিষ্কের অনন্য সেই নতুন ক্ষমতা সংগ্রামের পথে ছিল তার একটি বড় পাথেয়। আগে পরে এমনি আরো ছোট ছোট পাথেয় তার মস্তিষ্কে সৃষ্টি হয়ে চলেছিলো, আর তা হয়েছিলো যেদিনের যা তাৎক্ষণিক সমস্যার সন্মুখীন সে হচ্ছিলো তার সমাধানের জন্য। সেই সমাধানের উপযুক্ত মস্তিষ্কটিই তখন স্থায়ী হয়ে গিয়েছিলো, ওই তীব্র সংগ্রামের দিন শেষ হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে ওখানে আর বড় পরিবর্তন ঘটেনি। তাই বলা যায় আজকের মানুষের যে মস্তিষ্ক তা প্রধানত ওই মূল সংগ্রামের দিনে সৃষ্টি হওয়া মস্তিষ্ক – সেটিই আজও স্থায়ী হয়ে আছে বংশানুক্রমে সব মানুষের মধ্যে। তাই এই মস্তিষ্ক সব চেয়ে ভাল যে কাজ করতে পারে তা হলো ওই প্রাচীন সমস্যাগুলোর সমাধান। সেগুলোরই সমাধান করতে গিয়ে আজো আমাদের মস্তিষ্কে স্থায়ী হয়ে আছে অনেক প্রবৃত্তি, অনেক ভয়, অনেক আবেগ, অনেক তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি। এগুলো আজকের আধুনিক সমস্যা থেকে তৈরি হয়নি, তৈরি হয়েছে সেদিনের প্রাচীন সমস্যাকে সমাধান করতে গিয়ে। তাই এখনো এটি সেদিনের মতই কাজ করতে চায়– সেই প্রতিক্রিয়া দেখাবার প্রবণতাগুলো যে তখন থেকেই বংশানুক্রমে আমাদের মস্তিষ্কে গাঁথা রয়েছে।

আমাদের ভাল লাগার বিষয়গুলো ধরা যাক। দুনিয়ার প্রায় সব রকম অঞ্চলের মানুষের নমুনা নিয়ে তাদের প্রত্যেককে প্রশ্ন করা হয়েছিলো যদি সুযোগ থাকতো তা হলে কী রকম আবাস সে বেছে নিতো। এর মধ্যে বনের, মরুভূমির, তৃণভূমির এবং উন্নত নগর-বন্দরের মানুষও ছিল। সবার উত্তর মিলিয়ে দেখা গেছে যে সব মানুষের কল্পনার আদর্শ আবাস স্থল মোটামুটি একই– কাছেই ফাঁক ফাঁক থাকা গাছপালা, সামনে খোলা জায়গা, তৃণভূমি, কিছু ঝোপঝাড়; যেখানে গরু, হরিণ ইত্যাদি চরবে; কাছেই পানি, দিঘি, নদী, হ্রদ, এমনি কিছু যেখানে জলজ প্রাণী, হাঁস ইত্যাদি দেখা যাবে। বোঝা গেছে এই ছবির সঙ্গে সাদৃশ্য হলো

আফ্রিকার সাভানা তৃণভূমি, যেখানে সংগ্রামের দিনে মানুষের কেটেছে, বিশ্রামে তাকে মুগ্ধ করেছে, তার বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে; ওটিই তার মস্তিষ্কে গাঁথা রয়েছে। ঘর-দুয়ার যেমনই হোক, এ পরিবেশই তার মনের কাম্য।

এখন ধরা যাক্ আমাদের ভয় অনুভব করার ব্যাপারগুলো। বিশ-পঁচিশ তলার ওপর থেকে নিচে রাস্তার দিকে তাকাতে আমরা হঠাৎ ভীত হয়ে পড়ি– বিশেষ করে বারান্দায় কিনারায় কিংবা বাইরে থাকা লিফ্ট থেকে তাকালে, অথচ আমরা জানি রেলিং, গ্রিল, কাচ ইত্যাদির কারণে ওই ভবনে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। তা সত্ত্বেও ভয় ঠিকই পাই। অতি নিরাপদ দেশের অতি নিরাপদ খোলা প্রান্তরে একা বসে থাকতে হলে, বা বিশেষ করে রাতের বেলায় একা থাকতে হলে ভয়ে আমাদের গা ছমছম করে। ওই দেশের, ওই জায়গার বাসিন্দা যে সারা জীবন দেখেছে ওটি অত্যন্ত নিরাপদ– তারও সে রকম করে। নিউয়র্ক শহরের উঁচু দালানে যে বাচ্চা বড় হয়েছে, কোনদিন সাপ দেখেনি, এমনকি সাপের গল্পও শোনেনি, তার সামনে যদি একটি রাবারের তৈরি সাপও যদি রাখা হয় যে ভয় চিৎকার করে উঠবে। এই সবগুলো উদাহরণে ভয়টি কিন্তু আজকের কোন কারণে ঘট্ছেনা, এটি প্রাচীন এক একটি ভয়– সে সময় প্রকৃতি যেগুলোকে বাছাই করেছিলো। উঁচু পাহাড়ে, বিস্তীর্ণ খালি প্রান্তর, অন্ধকার জায়গা, সাপের নিকটবর্তী হওয়া– সেই সংগ্রামের দিনে এর প্রত্যেকটি অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। যেমন হরিণের পেছনে ছুটে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উঁচু পাহাড়ে আরো উঁচুতে দৌড়ে উঠে কিনারা থেকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি ছিল; তেমনি অন্ধকারে হিংস্র প্রাণী ঘাড়ে এসে পড়ার, বা হঠাৎ সাপ এসে ছোবল দেবার। যারা এগুলোকে ভয় করে চলেছে তারাই বেশি দিন বেঁচেছে, তারাই বেশি সন্তান রেখে গেছে, তাদের মস্তিষ্কে এই ভয় ছিল; সেখান থেকে বংশানুক্রমে আমরা দুনিয়ার সব মানুষ তা পেয়েছি। তখন নানা মিউট্যাশনের মধ্যে অনেকে ছিল যাদের মস্তিষ্কে ওই ভয় ছিলনা, তারা শেষ পর্যন্ত বাঁচেনি বলে ওরকম উচ্চতায়, অন্ধকারে, সাপের দেখাদেখিতে নির্ভয় মানুষের মস্তিষ্ক আজকের কাল পর্যন্ত বেশি আসতে পারেনি।

শুধু ভয়ের ব্যাপার কেন, লোভের ব্যাপারগুলো কম কী। ডায়াবেটিসে মৃত্যুঝুঁকি আছে জেনেও আমরা মিষ্টিতে লোভ করি, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের বার বার মানা সত্ত্বেও চর্বি আর লবন দেয়া ফাস্ট ফুড এত পছন্দ করি। এগুলো আমাদের এই প্রাচীন মস্তিষ্কের প্ররোচনাতেই করি। ওই সংগ্রামের দিনে মানুষের কাছে ওই মিষ্টি, ওই চর্বি বা লবন শুধু বহুদিন পরে পরেই এক সঙ্গে অনেক পাওয়া

যেতো– ফল পাকার মৌসুমে এক সঙ্গে অনেক মিষ্টি ফল, বড় একটি পশু শিকার করার সাফল্যের পর প্রচুর চর্বি- যা খুব ঘন ঘন সম্ভব ছিলনা, অথবা ঘুরতে ঘুরতে সৌভাগ্যক্রমে লবনাক্ত পানির বা লবন সম্পৃক্ত মাটির সন্ধান পাওয়ার পর। ওসময় এক সঙ্গে যত পারে খুব বেশি খেয়ে নেয়ার মত রুচি যাদের ছিল তারাই বাঁচতে পেরেছে বেশি– কারণ চিনি বা শর্করা, চর্বি, এবং লবন বাঁচার জন্য অত্যাবশকীয় উপাদান। বাঁচার তাগিদে সৃষ্টি হওয়া মস্তিষ্কের সেই মিষ্টি, চর্বি, লবন বিলাসী রুচি বংশানুক্রমে আমাদের মস্তিষ্কে চলে এসেছে– রুচি বলি আর লোভ বলি একই কথা। কিন্তু এখন দুনিয়া পালটে গেছে মিষ্টি, চর্বি, লবন আর দুষ্প্রাপ্য নয় অনেক মানুষের জন্য, নিমিষেই তারা ওগুলো পায়। কাজেই ওগুলো আজ আর বাঁচার উপায় না হয়ে মরণের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তা হলে কী হবে, লোভটা ঠিকই রয়ে গেছে– মস্তিষ্কটি যে প্রাচীন।

বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনা-স্মৃতি ইত্যাদিতে সাড়া দিয়ে আমাদের হাসি-কান্না, ভয়-রাগ, অনুরাগ-বিরাগ ইত্যাদি প্রকাশের যে আবেগগুলো তাও সেই অতীত দিনে কোন না কোন ভাবে টিকে থাকতে সাহায্য করেছিলো বলেই তার সক্ষমতা মস্তিষ্কে গাঁথা হয়ে রয়েছে। এভাবে মনে করা হয় সুখের আবেগ থাকলে তবেই মানুষ সুখ-সৃষ্টিকারী কাজের পেছনে প্রেরণা পেয়েছে যা প্রকারান্তে টিকে থাকতে সহায়ক হয়েছে। যেমন সন্তানের মুখ দেখে তার সাথে খুনসুটি করে সুখ বোধ হওয়াতেই এত কষ্ট করে মা-বাবা সন্তান পালনে উৎসাহী হয়েছে- যা সন্তানকে টিকে থাকতে সুবিধা করে দিয়েছে। আবার সুখের বিপরীতে দুঃখবোধ আত্ম-বিধ্বংসী কাজ থেকে বিরত রেখেছে। অবশ্য কখনো কখনো এই দুঃখবোধটি অতি-বিষণ্নতায় পরিণত হয়ে আজ তার উল্টো ফল দিচ্ছে, নিজেই আত্ম-বিধ্বংসী কাজের কারণ হচ্ছে; কিন্তু অতীতে তা হয়নি। সেদিনের ভাষার সীমাবদ্ধতার কালে অনেকগুলো আবেগ দ্রুত মানুষে মানুষে যোগাযোগের সহায়ক হয়েছি– যেমন ভয়ার্ত মুখ দেখে তার সাহায্যে এগিয়ে যাওয়াটি হয়তো তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে– ভয়ের আবেগটি যার নেই তার ক্ষেত্রে তা হয়নি। আবার কোন কোন আবেগ পরস্পর সহযোগিতার বন্ধনকে একেবারে অটুট করে তুলে উভয়ের টিকে থাকাকে অনেক বেশি নিশ্চিত করেছে; এই বন্ধন আল্গা হয়ে গেলে উভয়েরই বিপদ ঘট্তে পারতো। বন্ধুত্ব, ভালবাসা এসব এমনিই আবেগ। তবে এগুলোর মধ্যে একটির থেকে অন্যটি বেশি কার্যকর হয়েছে, তখন বেশি হয়েছিলো বলে এখনো তা বেশি কার্যকর। যেমন বন্ধুত্বের সহযোগিতা ভাঙ্গতে পারলেও, ভালবাসার কারণে সৃষ্ট সহযোগিতা ভাঙ্গা খুব কঠিন; ফলে তার ওপর

বেশি ভরসা করা গেছে, এখনো করা যায়। এগুলো ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা কমাতে সাহায্য করেছে অন্য কিছু আবেগ যেমন অভিমান, রাগ, ঈর্ষা ইত্যাদি। এগুলো হয়তো আজকের আমাদের প্রাচীন মস্তিষ্কে থাকতোনা যদি না সেই সংগ্রামের দিনে টিকে থাকার ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত অপরিহার্য হয়ে না পড়তো।

প্রাচীন মস্তিষ্কই যদি আমাদের সম্বল হবে তা হলে আমরা আধুনিক কাজগুলো ওই মস্তিষ্ক দিয়ে করছি কী ভাবে। সাপ দেখলে আমরা চিন্তা না করেই প্রবৃত্তিগত ভাবেই ভয় পেয়ে চিৎকার করে লাফ দিই– ওটি মস্তিষ্কে জন্মগত ভাবেই গাঁথা রয়েছে বলে। কিন্তু হাতের কাছে খোলা ইলেকট্রিক তার দেখলে, বা রাস্তা পার হবার সময় দূর থেকে আসা গাড়ির বেগ বেড়ে যেতে দেখলেও ভয়ে হার্টের কম্পন বেড়ে যায় সেটিতো প্রাচীন মস্তিষ্কে গাঁথা থাকার কথা নয়, কারণ ইলেকট্রিক শক্ এবং দ্রুতগতিরও ধাক্কা দেবার গাড়ি কোনটিই সেই সংগ্রামের দিনে ছিলনা। এরকম আধুনিক ভয় তাই প্রবৃত্তিগত ভাবে আমাদের মাথায় নেই; এটি আমাদেরকে অন্যের কাছ থেকে বা অভিজ্ঞতা থেকে নিজে শিখতে হয়েছে। যে শেখেনি সে এ ধরনের ভয় পাবেনা। চিরকাল বনের মধ্যে কাটানো মানুষ হঠাৎ শহরে এলে সে ইলেকট্রিক তার কিংবা গাড়ির ট্রাফিককে মোটেই গ্রাহ্য করবেনা, কিন্তু ওই প্রাচীন ভয়গুলোকে করবে। অভিজ্ঞতা থেকে শেখার যে মস্তিষ্কগত প্রক্রিয়া সেটিও ওই সংগ্রামের দিনেই মস্তিষ্কে গাঁথা হয়ে গিয়েছে। সেটিকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি। তাছাড়া সেই দিনের সমস্যা সমাধানে মস্তিষ্কে যা সৃষ্টি হয়েছে তা যে একেবারে খাপের খাপ ওই সমস্যাটির জন্যই সৃষ্টি হয়েছে তা নয়, ওতে অনেকখানি বাড়তি বিস্তৃতিও একই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিলো যা তখন কাজে লাগেনি, এখন লাগছে। প্রকৃতির বাছাই, বা সঙ্গিনীর বাছাই যা কিছুই সৃষ্টি করে তাতেই এরকম বাড়তি বিস্তৃতি থাকে ওই প্রক্রিয়ারই সেটি অংশ। দু একটি উদাহরণ নেয়া যাক। মাটির ওপর হরিণের বা বাঘের পায়ের চিহ্ন পরীক্ষা করে সেই পশুটির বয়স, লিঙ্গ, চলার গতি, আহত না সুস্থ ইত্যাদি বুঝতে পারাটি ছিল সেদিনের সমস্যা, যার ওপর টিকে থাকা নির্ভর করেছে। সেটি করতে পারার সক্ষমতাতে যে বিস্তৃতি ছিল তা দিয়েই আজকের মানুষের মস্তিষ্ক লিপির চিহ্ন অনুধাবন করতে পারছে– অর্থাৎ লেখা পড়তে পারছে। সর্বোচ্চ মাত্র ৫ হাজার বছর আগে উদ্ভাবিত লিপি পাঠের ক্ষমতা মস্তিষ্কে নতুন সৃষ্টি হবার সুযোগ নেই– এই নতুন কাজটি সেই প্রাচীন মস্তিষ্কে ইতোমধ্যে থাকা ক্ষমতার বিস্তৃতির কারণেই সম্ভব হচ্ছে।

দৌড়তে দৌড়তে ও সঠিক জায়গায় বর্শা নিক্ষেপে শরীরের ভারসাম্য রাখার ক্ষমতা জ্ঞানীদেরও অনেক আগে মানুষের মস্তিষ্কে সৃষ্টি হয়েছিলো টিকে থাকার প্রয়োজনে। আমাদের মস্তিষ্কেও সেটিই রয়েছে। কিন্তু সেটি দিয়েই আমরা আজ সমুদ্রের ঢেউয়ে সার্ফিং করতে পারি, মহাশূন্য যানের বিশাল গতি-বৃদ্ধিতেও ভারসাম্য রাখতে পারি। প্রাচীন মস্তিষ্কই এভাবে আধুনিক সমস্যায়ও কাজ করতে পারছে, ক্যালকুলাস গণিত উদ্ভাবন করতে পারছে, চাঁদে যেতে পারছে; এর জন্য অন্য রকম আধুনিক মস্তিষ্কের প্রয়োজন হয়নি। যে বিষয়টি স্পষ্ট আমাদের সেই সুদূর অতীতের সঙ্গে আমরা আজও ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িয়ে আছি। আমরা আজ আপাদমস্তক যা, তা তৈরি হয়েছে সেই অতীতের গর্ভে। এ শিকড়ের তাৎপর্য তাই অনেক বেশি।

জ্ঞানীর প্রথম বিশ্বযাত্রা

কেন ওই অভিবাসন

আমাদের কালের কাছাকাছি সময়ে নানা কারণে মানুষ অভিবাসী হয়েছে– এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে, এমনকি অগম্য সব জায়গাতেও। এখনো সেই একই ব্যাপারটি দেখছি। তবে জ্ঞানীরা তাদের লালনভূমি আফ্রিকা থেকে প্রথম বড় আকারে কখন বাকি বিশ্বে অভিবাসী হয়েছিলো সেটি জানাটি সহজ কাজ নয়, আর তার কারণ বের করাটি তো আরো দুরূহ কাজ। আফ্রিকার বাইরে নানা জায়গায় পাওয়া জ্ঞানী মানুষের ফসিল এবং সেগুলোর বয়স নির্ণয় থেকে কিছুটা আন্দাজ করা যায় এমন প্রথম অভিবাসনের কাল। আরো একটি উপায় আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি, তা হলো বর্তমান নানা দেশের মানুষের মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ পরীক্ষা করে। ফসিল পরীক্ষাগুলো বেশ কিছু দিন ধরেই ৭০ হাজার বছর আগে প্রথম বড় অভিবাসন ঘটেছিল এমন ইশারা দিচ্ছিল। আফ্রিকার বাইরে এর আগের জ্ঞানীর ফসিল পাওয়া যায়নি, এর পরের থেকে যথেষ্ট সংখ্যক ফসিল পাওয়া আরম্ভ হয়েছে। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে অবশ্য ইসারাইলে পাওয়া কিছু ফসিল ১ লক্ষ বছর পুরানো দাবী করা হয়েছে, সেটি সঠিক হলেও তা বড় কোন অভিবাসনের অংশ বলে প্রমাণিত হয়নি।

মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএও এই অভিবাসন সম্পর্কে আরো জোরালো সাক্ষ্য দিয়েছে। এই পদ্ধতিটির আলোচনায় আমরা আগেই দেখেছি যে আজকের নানা অঞ্চলের নানা মানুষের মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএর মিউট্যাশনে মিল-অমিল

থেকে বোঝা গেছে যে আমাদের পূর্ব পুরুষরা অতীতে দুই দুইবার আফ্রিকা থেকে বাইরের বিশ্বে অভিবাসনে গেছে– একবার প্রায় ৩ লক্ষ বছর আগে, আরেকবার ৭০ থেকে ৮০ হাজার বছর আগে। প্রথমটি জ্ঞানীদের আগের ব্যাপার– প্রায়-জ্ঞানীদের অভিবাসন যারা পরে মধ্যপ্রাচ্যে ও ইউরোপে নিয়ানডার্থাল হিসেবে দেখা দিয়েছিলো। এখানে আমাদের আলোচ্য হলো শেষেরটি– জ্ঞানীর প্রথম বিশ্বযাত্রা, যেটি ফসিল সাক্ষ্যের সঙ্গে মোটামুটি মিলে যায়। সময়ের দিক থেকে এটি মন-পাগলের সেই বিপ্লবের কালের সঙ্গেও মিলে যায়। অভিবাসনটি কেন ঘটেছিল, কোথায় ঘটেছিলো, কত মানুষের ব্যাপার ছিল ওটি, এসব জানতে পারলে মন-পাগলের ভূমিকা ওতে কী তাও কিছুটা স্পষ্ট হতো। কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজ নয়, পারিপার্শ্বিক নানা সাক্ষ্য থেকে যদিও আন্দাজ করা যায়।

এই আন্দাজে অধিকাংশরা মনে করেন সেই আমলের পুরো আফ্রিকায় জন সংখ্যার বিবেচনায় এই অভিবাসনের সঙ্গে জড়িত মানুষ খুব বেশি ছিলনা– ৫ থেকে ১০ হাজারের বেশি হবেনা। অন্যরা অবশ্য এই সংখ্যা ৫০ হাজার পর্যন্ত হতে পারে বলে মনে করেন। অল্প কিছু কাল আগেও যেখানে ২০-৩০ জন মানুষের পারিবারিক দলে ঘোরাটাই স্বাভাবিক ছিল, এক দলের মানুষের অন্য দলের সঙ্গে একত্র হওয়াটি বিরল ছিল, সেখানে অন্তত ৫ হাজার মানুষের একই সঙ্গে বা কাছাকাছি সময়ে দীর্ঘ যাত্রায় যাওয়াটি যথেষ্ট অবাক করার মত। এমনটি হতে গেলে বহু মানুষের মধ্যে বোঝাপড়ার প্রয়োজন ছিল, সত্যিকারের ভাষার প্রয়োজন ছিল, পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল, কল্পনারও প্রয়োজন ছিল। এটি সাধারণ যাযাবর জীবনের এক জায়গার বসত উঠিয়ে কাছাকাছি আরেক জায়গায় যাওয়ার ব্যাপার ছিলনা, বরং এই পুরো অঞ্চলটি ছেড়ে অন্য আবহাওয়ায় বাঁচার জন্য অজানা নিরুদ্দেশের পথে দীর্ঘ যাত্রা। তার উপযুক্ত আয়োজনও নিশ্চয়ই প্রয়োজন হয়েছিলো। কিন্তু কেন এতদিনের গণ্ডির মধ্যে ঘোরাফেরার বদলে এই নিরুদ্দেশ যাত্রা? সেই কারণ কিছুটা হলেও উদ্ঘাটিত হয়েছে বৈকি।

অধিকাংশ অভিবাসনের ক্ষেত্রে কারণ যা থাকে এখানেও তাই হয়েছিলো; নিজের পুরানো আবাসের প্রতি কোন কারণে বিকর্ষণ, আর যেখানে যেতে চায় তার প্রতি আকর্ষণ। আফ্রিকার যেই অংশে এই অভিবাসী মানুষদের বাস ছিলো সেখানকার পরিবেশ অনেকের কাছেই অসহ্য হয়ে ওঠেছিলো– সেই বিকর্ষণটি বেশ স্পষ্ট। কিন্তু যেখানে তারা যাওয়ার কথা চিন্তা করছিলো সেখানে এই বিকর্ষণগুলো থাকবেনা, বরং আরো সহজ উপভোগ্য একটি জীবন হবে এমন একটি আকর্ষণও

নিশ্চয়ই ছিল। অথচ সেই গন্তব্য সম্পর্কে কোন তথ্যই তাদের কাছে ছিলনা, থাকা সম্ভবও ছিলনা। কাজেই আকর্ষণটি ছিল সম্পূর্ণ কল্পনা-নির্ভর, বলা যায় স্বপ্ন-নির্ভর। বোঝা যাচ্ছে ইতোমধ্যে ওরা কল্পনা শক্তির অধিকারী হয়েছিলো, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতেও শিখেছিলো। স্পষ্টত এখানে আমরা মন-পাগল মানুষদের কথাই বল্‌ছি, তাদের আগেকার মানুষের কথা নয়। ওই মানুষদের পক্ষেই সম্ভব ছিল বিকর্ষণটির পাশে কল্পনার আকর্ষণটি দাঁড় করানোর, আর এই অভিবাসনের আয়োজন করার। এর বহু আগের প্রায়-জ্ঞানীদের যে অভিবাসন তা এরকম আকর্ষণ ভিত্তিক ছিলনা, খুব সম্ভব বাধ্য হয়ে পুরানো আবাস ছেড়ে যাওয়া ছিল, তাতে বহু মানুষের সম্মিলিত পরিকল্পনাও ছিলনা। এসব একমাত্র ভাষা ও কল্পনা শক্তিতে উজ্জীবিত মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

এখন নানা সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে আমরা মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি যে অভিবাসনটি প্রথম ঘটেছিলো আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব কোণে যেখানে এখন জিবুতি নামের ছোট্ট-দেশটি, যার দক্ষিণে সোমালিয়া, আর উত্তরে ইথিওপিয়া। বর্তমানে এই জিবুতি প্রায় ছুঁই ছুঁই করছে আরব উপদ্বীপের কোণটি (ইয়েমেনের অংশ), মাঝখানে বাব এল মান্দাবের সরু সমুদ্র-প্রণালী, লোহিত সাগরের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে। ৭০ হাজার বছর আগে কিন্তু এই সমুদ্রটুকু ছিলনা– জিবুতি আর আরব উপদ্বীপ সরু স্থলের দ্বারাই সংলগ্ন ছিল, আফ্রিকা আর এশিয়া মহাদেশকে যুক্ত করে। ওটিই ছিল সেই অভিবাসনের পথ। কিন্তু কেন এই হাজার হাজার মানুষ খুব অল্প সময়ের ভেতরে এই পথে পাড়ি দিল? সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে আফ্রিকার উত্তর পূর্ব কোনায় পুরো অঞ্চলটিতে ৭০ হাজার বছর আগের ওই সময়টিতে বহু দিন ধরে একটি তীব্র খরা চল্‌ছিলো। বড় রকমের জলবায়ু পরিবর্তন এটি ঘটিয়েছিলো, ফলশ্রুতিতে পুরো এলাকা উদ্ভিদশূন্য হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো, যার মানে শিকার ও সংগ্রহ উভয়টি অসম্ভব হয়ে দারুণ খাদ্যাভাব। এক্ষেত্রে প্রায় পুরো মহাদেশ জোড়া দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু পরিবর্তনটিও প্রাসঙ্গিক। দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু পরিবর্তনের যে সাক্ষ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী ফসিলের মধ্যে দেখা যায় তার থেকেই এসব জানা সম্ভব হয়েছে। মহাদেশ জোড়া এই বিপর্যয় ঘটেছিলো ৭০ হাজার বছর আগের ওই অভিবাসন ঘটনার বেশ আগে থেকেই। তখন ওখানে সর্বত্র যাযাবর মানুষগুলো পরস্পর থেকে আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো। বলতে গেলে মানুষের অস্থিত্ব তখন বিপন্ন হয়ে পড়েছিলো। ওই চরম অবস্থাই দ্রুত বিবর্তনের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মন-পাগলের বিপ্লব, ছোট ছোট দল একত্রিত হয়ে বড় যাযাবর সমাজ গঠন ইত্যাদি

সম্ভব করেছিলো। ঠিক ওই অবস্থাতে এসেছিলো নতুন সংকট সেই উত্তর পূর্ব কোণের অঞ্চলটিতে।

এখানে জনসংখ্যা বেড়েছে অনেক, কিন্তু নতুন করে আসা এই দারুণ খরা এমন খাদ্য সংকট সৃষ্টি করেছিলো যে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অজানা দিকে অভিবাসন করা ছাড়া বাঁচার উপায় ছিলনা– জিবুতি, ইথিওপিয়া, সোমালিয়ার যারা বাব এল্ মান্দাবের ওই পথটির কাছাকাছি ছিল তারা এই পথেই সেই অজানার দিকে পাড়ি দিয়েছে। ওই সময়ে ঘটা ওই অভিবাসনটির গুরুত্বের কারণে ওখানকার সেদিনের সেই নতুন খরা সংকটটি নিয়ে সম্প্রতি অনেক গবেষণা হয়েছে। গবেষণার একটি প্রধান উপায় হয়েছে বাব এল মান্দাবের কাছের সমুদ্রের তলায় লক্ষ বছর ধরে ধীরে ধীরে যে পলি সঞ্চয় হয়েছে সেগুলো পরীক্ষা করা। বেশ কিছু গবেষণায় পৃথক ভাবে এটি করা হয়েছে। এই পলির কাদা প্রতি বছর এক একটি স্তর হিসেবে জমা হয়েছে, স্তরের ক্রম ও অন্যান্য নমুনা থেকে প্রতিটি স্তরের কাল চিহ্নিত করা গেছে। প্রত্যেক স্তরের মধ্যে পাওয়া যায় ওই সময়ের সমুদ্র থেকে যে ক্ষুদ্র উদ্ভিদ, অ্যালজি, স্থলের উদ্ভিদ থেকে বাতাসে ভেসে আসা পরাগ রেণু– সেগুলো সব পানিতে থিতিয়ে গিয়ে ওই স্তর স্তর কাদার মধ্যে জমা হয়ে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। এসবের রকমফের, প্রাচুর্য, এবং স্তরের পর স্তরে এই প্রাচুর্যের ওঠানামা ইত্যাদি থেকে সেখানকার সেসময়ের উদ্ভিদ জগতের খবর পাওয়া যায় এবং প্রকারান্তে আবহাওয়ার অবস্থাও আঁচ করা যায়। এতে যে সব রাসায়নিক দ্রব্য থাকে সেগুলোর অনুপাত আরো সূক্ষ্ম ভাবে আবহাওয়ার খবর দিতে পারে। যেমন দুই ভিন্ন প্রকার অ্যালজির অনুপাত সে বছর কত ছিল তার থেকে সে বছরের আবহাওয়ার উত্তাপ নির্ণয় করা যায়। তা ছাড়া প্রতি স্তরে সামুদ্রিক প্রবাল-কীটের অবস্থা থেকেও বোঝা যায় তখন উত্তাপ কেমন ছিল। অন্যদিকে বিশেষ কিছু উদ্ভিদের পাতায় যে মোম জাতীয় পদার্থ থাকে তার পরিমাণ থেকে পাওয়া যায় যে বছর আর্দ্রতা আর বৃষ্টি সম্পর্কে তথ্য। সবগুলো গবেষণা মোটামুটি একই রকম সিদ্ধান্ত দিচ্ছে। ৭০ হাজার বছরের কিছু আগে থেকে ওই অঞ্চলে দারুণ উত্তাপ বৃদ্ধি ও শুষ্কতা নেমে এসেছিলো যার ফলে ভূমিতে সকল রকম সবুজের উপস্থিতি দারুণ ভাবে হ্রাস পেয়েছিলো। এ কারণে শিকারের পশু দুর্লভ হয়ে পড়ে, আবার ফলমূল সংগ্রহের সম্ভাবনাও একেবারে কমে যায়। এরই ফলশ্রুতিতে আফ্রিকার ওই অঞ্চলের মানুষকে বড় দলে অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণে যেতে হয়েছিলো।

দক্ষিণাপথ ও উত্তরাপথঃ

বাব এল মান্দাবের ওই সরু স্থল ভাগটুকু পার হয়ে আরব উপদ্বীপ অর্থাৎ এশিয়াতে এসে অভিবাসীরা কোন্ দিকে এগিয়েছিলো? অধিকাংশ সাক্ষ্য-প্রমাণ বল্‌ছে তারা সমুদ্র তীর ধরেই পূর্ব দিকে এগিয়েছিলো আগাগোড়া মহাদেশেটির দক্ষিণ উপকূলে থেকে গিয়ে। এ জন্য একে বলা যায় দক্ষিণাপথ। এভাবে দক্ষিণে থাকাটির কারণ অবশ্য বেশ স্পষ্ট। উত্তর দিকে রীতিমত মরুভূমি– আরব উপদ্বীপ। লোহিত সাগরের পার ঘেঁষে উত্তর দিকে যাবার চেষ্টা করলে আবহাওয়ার উত্তাপ ও শুষ্কতায় কোন উন্নতি দেখা যায়না– অন্যদিকে আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে থেকে পূর্ব দিকে যতই এগিয়েছে ততই ওরা অনুকূল আবহাওয়া পেয়েছে। আরো বড় কথা খাদ্যের চরম সংকটটি এখানে অন্য কারণেও লাঘব হয়েছিলো এদিকটায় সমুদ্রের বেলাভূমিটা পানির সঙ্গে আসা শামুক-ঝিনুকে যথেষ্ট ভরপূর ছিল বলে। এসময়টায় সামুদ্রিক এসব খাবার যে আফ্রিকার অন্তত কোন কোন অঞ্চলের মানুষের নিত্য খাবার হয়ে পড়েছিলো তা আমরা ব্লোম্বোস গুহার নিদর্শন থেকে বুঝতে পেরেছি। হয়তো ওই দুর্যোগের আগে আগে মহাদেশটির উত্তর পূর্ব কোনার মানুষরাও এতে অভ্যস্ত ছিল। এই সব চর্বিপূর্ণ সামদ্রিক খাবার মন-পাগলের বিপ্লবের দিনে মস্তিষ্কের অধিকতর শক্তি চাহিদা পূরণে খুব সম্ভব বড় ভূমিকা পালন করেছিলো, এই বিশেষ ধরনের ফ্যাটি এসিড এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সে যাই হোক অভিবাসীরা যে তাদের সমুদ্রতীর ঘেঁষা পথে শামুক ঝিনুক খেতে খুবই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো তা স্পষ্ট।

আমরা সাধারণত শক্ত খোলার সামুদ্রিক খাবার বল্‌তে শামুক ও ঝিনুক এই শব্দ দুটি বলেই ক্ষান্ত দিই। কিন্তু এর বৈচিত্র কিন্তু অনেক– সী-ফুড সম্ভার বল্‌লেই বরং বেশি মানায়। ঝিনুক আকৃতির খোলস সহ সবগুলোকে আমরা ঝিনুক বল্‌লেও তার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কোকল্‌স, মাস্‌ল্‌স্, ইত্যাদি নামের নানা ভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণী। কোকল্‌সগুলো সাদা বা হল্‌দেটে হাতের আঙ্গুলের মত ছড়ানো তার খাঁজগুলো বেশ নিয়মিত, প্রতিসম। মাসল্‌সগুলো একটু এলেমেলো, রঙ কালচে, ঘননীল, খয়েরি ইত্যাদি। এর কোন কোনটি রীতিমত একটি ছুরি বা ছেনির মত সরু হয়ে যাওয়া, গা একেবারে খসখসে; কোনগুলোর ভেতরটা ঝকঝকে রূপালি, কোনগুলোর তা নয়। যেগুলো ওই হাতের আঙ্গুলের মত ছড়ানো খাঁজ নিয়ে ঝিনুক আকৃতির নয় তাদের অনেকগুলো লম্বাটে ডিম্বাকার, গা সমতল কিন্তু কিনারায় একটু পেঁচ খাওয়ানো– যেন মানুষের কানের আকৃতি।

এদের প্রায় সবগুলোর ভেতরটায় রয়েছে বেশ পুরু করে 'মাদার অব পার্ল'– খোলার সুন্দর ভেতরটা, যা কিনা ঝক্‌ঝকে রূপালী, তাতে নানা রঙের আভা ঝিলিক দিয়ে যায়। সমুদ্র তীরে বালির ভেতরে এদের কোন কোনটিকে বাস করতে দেখা যায়, কোন কোনটি আবার থাকে ওখানে ছিপছিপে পানির নিচে, কোন কোনটি অগভীর পানিতে পাথরের সঙ্গে লেপটে লেগে থাকে– কোথায় থাকে সে অনুযায়ী ওপরের খোলসের রঙ নানা রঙের। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা হলো এদের প্রত্যেকটির ভেতরটা মানুষের জন্য সুস্বাদু, খুব পুষ্টিকর খাদ্য, যা কাঁচাই খাওয়া যায়, এখনো সেভাবেই খাওয়া হয়।

অভিবাসীরা ছোট ছোট দলে এগিয়েছে, সবাই একেবারে একই সঙ্গে নয়। তাই সমুদ্রের ওই সী-ফুড সম্ভারের অভাব কারো হয়নি। অনেকের এক একটি জায়গা এত ভাল লেগেছে যে উপকূলের কাছে কোথাও বেশ কিছু দিন থেকেই গেছে। কিন্তু একটানা বেশ কিছু মানুষের ক্ষুধা মেটাতে গেলে ওখানে ওই খাবারে টান পড়ে, তখন আবার তারা এগিয়েছে একই পথে পূর্ব দিকে। সমুদ্র তীর ছেড়ে স্থলভাগের ভেতরের দিকে বেশি দূর গিয়ে ওখানে সুবিধা করতে পারেনি– মরুভূমি, বালিয়াড়ি, পাহাড় এসব তাদেরকে বাধা দিয়েছে, তাছাড়া ওখানে সবুজের ছোঁয়া খুব কম। সমুদ্রের অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি বরং কোন কোন জায়গায় রসালো উষ্ণ মণ্ডলীয় ফল মেলে যেমন খেজুর, অল্প কিছু গাজেল হরিণ জাতীয় প্রাণীও মেলে শিকার করার মত। তবে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে বাস করার মত যথেষ্ট পরিমাণে নয়। এভাবে দক্ষিণাপথে চলার একটি সুবিধা ছিল যে চলার পথে তাদের পরিবেশ হঠাৎ করে খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি– মোটামুটি একই সী-ফুড, একই ফল-ফলারি, একই গাজেল; উত্তাপ ও শুষ্কতা তাও একই রকম অন্তত ভারতের উপকূলে না এসে পৌঁছানো পর্যন্ত। সেখান পর্যন্ত ওরা ধীরে ধীরে কিন্তু প্রায় ধারাবাহিক ভাবে এগিয়ে গেছে। দু'চার মাসে বা দু'চার বছরে যে ভারতের উপকূলে পৌঁছে গেছে ঠিক তা নয়, থেমে থেমে, নানা জায়গায় বসত করে করে এগিয়েছে তাই একই প্রজন্ম যে অনেক দূর গেছে তাও বলা যাবেনা। তবে ওখানে পৌঁছতে হাজার বছর লাগেনি তাও নিশ্চিত।

ভারতে পৌঁছবার পরও সাধারণ যাত্রা থেমে থাকেনি, উপকূল ধরেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া হয়ে এগিয়ে গেছে সে যাত্রা; তা অবশ্য অনেকটা ধীরে, নানা প্রজন্ম হয়ে, নানা দেশে বিস্তৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে। এই অর্থে শেষ পর্যন্ত এই দক্ষিণাপথের যাত্রা শেষ হয়েছে বলা যায় অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে; সেটি অবশ্য বহু হাজার বছর পর। ইন্দোনেশিয়ার শেষ প্রান্ত যেতে সে সময় কোন সমুদ্র পার হতে হয়নি,

কিন্তু অল্প সমুদ্রের বিচ্ছিন্নতার কারণে ইন্দোনেশিয়ায় থেমে ছিল এই যাত্রা। শেষ পর্যন্ত এই সামান্য সমুদ্র পাড়ি দিয়েই ৪৫ হাজার বছর আগের দিকেই অস্ট্রেলিয়ায় তারা পৌঁছতে পেরেছিলো। মানুষ যেন সব বাধা অতিক্রম করে যাত্রার জন্যই তৈরি হয়েছে, অজানার আকর্ষণ তার প্রবল।

কোন কোন গবেষক দক্ষিণাপথের অভিবাসনের ২০ হাজার বছর পর আরেকটি বড় অভিবাসনের সাক্ষ্য প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন। অনেকে অবশ্য একেও অন্য সাক্ষ্য থেকে মূল অভিবাসনের আরো সমসাময়িক ভিন্ন যাত্রা হিসেবে মনে করেন, কারণ মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ থেকে একেবারে ভিন্ন অভিবাসন হিসেবে এটি দেখা যায়না, এই ব্যাপারে ফসিল সাক্ষ্যও খুব স্পষ্ট নয়। তবে এটি ঠিক যে যে সময়েই ঘটুক ৭০ হাজার থেকে ৫০ হাজার বছর আগে আর একটি বড় অভিবাসন ঘটেছিলো– এবারো আফ্রিকার উত্তপূর্ব অঞ্চল থেকে এশিয়াতে, তবে কিছুটা ভিন্ন পথে। এবারের যাত্রাটি শুরু হয়েছে আগেরটির আরো উত্তরে বর্তমান মিশরেরর সিনাই অঞ্চল হয়ে যেখানে আফ্রিকা ও এশিয়ার মাঝখানে সরু স্থলের সংযোগ ছিল। এবারের যাত্রায় আগাগোড়া সাগর তীর দিয়ে যাবার সুযোগ ছিলনা, মোটের ওপর স্থল পথে প্রায় সময় উত্তর দিকে মধ্যপ্রাচ্যে, আরো উত্তরে মধ্যএশিয়ায়। এজন্য এবারের পথকে উত্তরাপথ বলা যায়।

মধ্যপ্রাচ্যে অভিবাসীরা অনুকূল আবহাওয়া পেয়েছে। আফ্রিকার তৃণভূমির থেকে এর অনেক জায়গা অপেক্ষাকৃত আর্দ্র, উদ্ভিদ ও প্রাণী সমৃদ্ধ ছিল। এটি মানুষের দীর্ঘ দিনের আবাস হয়েছে। তবে এখানে ওরা জনশূন্য জায়গায় আসেনি যেটি দক্ষিণাপথের মানুষদের ক্ষেত্রে হয়েছিলো, অন্তত যাত্রার প্রথম ভাগে। মধ্যপ্রাচ্যে আগে থেকেই জ্ঞানীদের কাছাকাছি সক্ষমতার নিয়ানডার্থালরা বাস করছিলো। সেই তিন লক্ষ বছর আগের অনেক প্রাচীন অভিবাসনে যেই প্রায়-জ্ঞানীরা মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছে এরা তাদের থেকেই উদ্ভুত হয়েছিল। কাজেই মধ্যপ্রাচ্যে এই নতুন আগন্তকদেরকে কিছুটা প্রতিযোগগিতারও সম্মূখীন হতে হয়েছিলো ওটি ৫০-৬০ হাজার বছর আগে।

উত্তরাপথের যাত্রার গন্তব্য আপাতত মধ্যপ্রাচ্যে হলেও জ্ঞানীদের যাত্রা সেখানে শেষ হয়নি, আরো উত্তরে মধ্যএশিয়াতেও শেষ হয়নি। সেখান থেকে মানুষ ৪০ হাজার বছরের মত আগের সময়ে ইউরোপেও গিয়ে পৌঁছেছিল। ইউরোপে তখন বরফ যুগ চল্‌ছে, দক্ষিণ ইউরোপই শুধু মানুষের বসবাসের উপযুক্ত ছিল। জ্ঞানীরা এবার সেখানেও চলে গিয়ে আগে থেকে থাকা নিয়ানডার্থালদের

প্রতিবেশী হয়েছিলো। এই নানা দিকে যাওয়ার পালা শুরু হয়েছিলো অবশ্য দক্ষিণাপথ আর উত্তরাপথের ওই দুটি অভিবাসনের মাধ্যমে।

অভিবাসীর ভ্রমণ কাহিনীঃ

সাগরতীর ধরে দক্ষিণাপথে যারা অভিবাসী হয়েছিলো তাদের ভ্রমণ কাহিনীটি আজকের দিনে গড়ে তোলা মোটেই সহজ কাজ হয়নি। পথে পথে তারা যে চিহ্ন রেখে গিয়েছিলো তা খুবই কম, সেই অল্প চিহ্নের ওপর ভিত্তি করেই এই কাহিনী আমরা কিছুটা জানতে পেরেছি। তখনকার ফসিল সাক্ষ্যের পরিমাণ নগণ্য হওয়াতে মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ বিশ্লেষণ থেকেই তাদের যাত্রাপথকে আমরা কিছুটা অনুসরণ করতে পারছি। সে তুলনায় অবশ্য সমসাময়িক ভূ-প্রকৃতি ও আবহাওয়া সম্পর্কে নানা গবেষণায় ভাল জানা গেছে। এই প্রাকৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের উপস্থিতির সাক্ষ্য মিলিয়ে বোঝা গেছে যে দক্ষিণাপথে আফ্রিকা-ত্যাগীরা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ভারতের দক্ষিণ উপকূলে পৌঁছে গিয়েছিলো। দক্ষিণ ভারতের জাভালাপুরম নামক জায়গায় পাথরের এমন কিছু হাতিয়ার পাওয়া গেছে যার সৌকর্য জ্ঞানী মানুষদের সত্তর হাজার বছরের দিকে হাতিয়ারের সমতুল্য। আর এ হাতিয়ারগুলোর বয়স নির্ণয় করে দেখা যাচ্ছে তা ৭৪ হাজার বছর পুরানো। এতে দক্ষিণাপথের অভিবাসন আরো একটু আগে ঘটেছিলো এমন সন্দেহও দেখা দিয়েছে। কিন্তু হাতিয়ার পাওয়া গেলেও ওই সময়ের মানুষের কোন ফসিল জাভালাপুরমে বা অন্য কোন কোথাও পাওয়া যায়নি। অধিকাংশ সাক্ষ্য অবশ্য বলে যে দক্ষিণ ভারতের উপকূলে মানুষের উপস্থিতি ৬০ হাজার বছর আগে থেকে একেবারে নিশ্চিত করা যায়। অর্থাৎ এর আগে কোন এক সময়ে দক্ষিণাপথের যাত্রীদের বংশধররা ওখানে গিয়ে পৌঁছেছিল ধরে নেয়া যায়। সবদিক থেকে মনে হচ্ছে মানুষ দক্ষিণ ভারতকে একটি দীর্ঘস্থায়ী বসবাসের কেন্দ্রভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছিলো, সেখান থেকে সময় সময় দলবদ্ধ অভিবাসনে উপকূল ঘেঁষে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দিকে এগিয়েছে এবং সেখানকার নানা জায়গায় বসত করতে করতে একেবারে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। ও সময়টায় দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতের দিকেও যে তারা যায়নি তা বলা যাবেনা। কিন্তু মনে হয় ঠিক তখন সে চেষ্টা বেশি ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ ইতোমধ্যে বরফ যুগের কারণে হিমালয়ের হিমবাহগুলো (বরফের চাদর) আজকের হিমালয়ের গণ্ডি থেকে নেমে এসে উত্তর ভারতের ওপর দিয়ে

অনেকখানি দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিলো, তা মানুষকে উত্তর দিকে তখন যেতে দেবার কথা নয়।

উপকূল ঘেঁষে বার্মা, থাইল্যান্ড, মালয় হয়ে ইন্দোনেশিয়া অবধি পৌঁছে যেতে তাদেরকে বেশি বেগ হতে হয়নি। যদিও এই পুরো পথে নানা জায়গায় তারা স্থায়ী ভাবে থেকে গেছে, তারপরও তাদের মধ্য থেকে পরবর্তী নানা প্রজন্মের বেশ কিছু মানুষ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই ইন্দোনেশিয়া পৌঁছে গিয়েছিলো। এর কারণ সেই বরফ যুগে সমুদ্রের অনেক পানি বরফ হিসেবে উত্তরে আবদ্ধ থাকার ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠ অনেক খানি নেমে গিয়েছিলো। কাজেই আজ যেভাবে মালয় এবং ইন্দোনেশিয়ার নানা দ্বীপ পরস্পর থেকে সমুদ্র দিয়ে একেবারে বিচ্ছিন্ন, তখন কিন্তু তা ছিলনা; এদের মধ্যে স্থলভাগ ছিল, যে কারণে যাত্রা পথে কোথাও বড় কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। ওই অবধি পৌঁছে কিন্তু মানুষকে বেশ কয়েক হাজার বছর ওখানেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছিলো। সমুদ্রতল নেমে যাওয়ার ফলে যদিও অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে অনেকখানি স্থলভাগ তখন জেগে ওঠেছিলো এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনি পরস্পর সংযুক্ত ছিল, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউগিণির এই মিলিত মহাদেশ এবং ইন্দোনেশিয়ার ওদিকের শেষ প্রান্তের মধ্যে সামান্য কিছু সমুদ্র ব্যবধান তখনো ছিল। মিলিত নিউগিণির একটি জায়গা থেকে ইন্দোনেশিয়ার একটি জায়গা খুব কাছাকাছি ছিল– মাঝখানে ছিল মাত্র ৯০ কিলোমিটারের মত সমুদ্র। সেটিই ছিল অস্ট্রেলিয়া যাত্রায় বিলম্বের কারণ। কিন্তু শেষ অবধি তারা সেই সমুদ্র পার হয়েই নিউগিণি ও অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলো। কিন্তু প্রশ্ন হলো ওই ৯০ কিলোমিটার দূর থেকে তো মানুষের কাছে স্পষ্ট হবার কথা নয় যে সামনে একটি সমৃদ্ধ বিরাট ভূখণ্ড আছে যেখানে গেলে জীবন অনেক সহজতর হতে পারে। আদৌ ওই সমুদ্র বাধার ওদিকে যে কিছু আছে সেটিইতো তাদের কাছে জানা থাকার কথা নয়। তারপরও সাগরপাড়ি দিতে অনভ্যস্ত মানুষ সেটি করার ঝুঁকি নিতে গেল কেন?

এর একমাত্র উত্তর হতে পারে কিছু মানুষ সব সময় ঝুঁকি নিয়ে এদিক ওদিক অনুসন্ধান করছিলো। হয়তো ভেলায় বা ডিঙ্গি করে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে দূরে স্থলের আভাস পেয়েছিলো। অথবা তাদের কাছে শুধু কল্পনাতেই মনে হয়েছে এমন স্থলের কথা; সেগুলো হয়তো তারা রঙ চড়িয়ে সঙ্গী সাথীদের বলেছে। মানুষের মুখে মুখে সে কথা ছড়িয়ে পড়েছিলো হয়তো এক রকম কিংবদন্তীর রূপ নিয়েছিলো, যা সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলো। সেখান থেকেই ঝুঁকি নিয়ে বড় দলে সাগর পাড়ি দেয়া এবং সম্পূর্ণ নতুন মহাদেশ নিউগিণি-অস্ট্রেলিয়া

আবিষ্কার করা। সেটি ৪৫ হাজার বছর আগে; হয়তো বা তারো আগে যে সময়টা আমাদের কাছে চিহ্নের অভাবে ধরা পড়েনি। এর কিছু সময় পর সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা কিছুটা বাড়ার ফলে নিউগিণি দ্বীপটি অস্ট্রেলিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। এর পর থেকে নিউগিণিতে যাওয়া মানুষের থেকে অস্ট্রেলিয়াতে যাওয়া মানুষরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। তাই নিউগিণিতে যে রকম নতুন নতুন কৌশল তারা উদ্ভাবন করেছে, কৃষিও উদ্ভাবন করেছে– অস্ট্রেলিয়ার মানুষরা কিন্তু তা কিছুই করেনি। ওখানে বিশাল সমুদ্র উপকূলের কাছের সমৃদ্ধ প্রকৃতিতে অল্প মানুষ এমনিতেই বরাবরের মত শিকার-সংগ্রহ করে কাটিয়ে দিতে পেরেছে। বরং আমরা এখন জানতে পারছি যে তারা ওখানকার অতিকায় সব স্তন্যপায়ী পশুদেরকে নির্বিচারে শিকার করে ওগুলোর চির বিলুপ্তির কারণ ঘটিয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার প্রান্ত অবধি যেতে কোন প্রাকৃতিক বাধার সন্মুখীন জ্ঞানীরা হয়নি একথা সত্যি, কিন্তু অনেকে এখন মনে করছেন ওরা আগে থেকে যাওয়া অন্য রকম মানুষের বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকতে পারে। ওই অঞ্চলে যে ৪০-৫০ হাজার বছর আগেও খাড়া মানুষদের উত্তরসূরিরা ছিল সেটি এখন প্রমাণিত। ওরাও অনেক আগে এক সময় আফ্রিকা থেকে অভিবাসনে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিল। 'জাভা মানুষের' মাথার খুলিতো ইন্দোনেশিয়াতেই পাওয়া গিয়েছে। তবে এই নতুন যাওয়া জ্ঞানীদের সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হয়েছিলো কিনা, হলে তার ফলাফল কী হয়েছে সে সম্পর্কে অবশ্য খুব বেশি কিছু জানা যায়নি। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অনেক মানুষ যারা স্থায়ী ভাবে থেকেছিল তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পূর্ব এশিয়ায় বিস্তৃত হয়েছিলো।

আফ্রিকা থেকে উত্তরাপথে যারা অভিবাসী হয়েছিলো তাদের কাহিনী অবশ্য ভিন্ন। মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্যএশিয়ার (আজকের তুর্কমেনিস্তান, কিরগিস্তান, উজবেকিস্তান, চীনের পশ্চিমাংশ ইত্যাদি) তুলনামূলক শুষ্ক আবহাওয়া এবং এখানকার লবনহ্রদ এবং কিছু দূরের ইউরোপের তরল পীট কয়লার বড় বড় গর্ত-খনি ও বরফের সঞ্চয় ফসিলকে খুব ভাল সংরক্ষণ করেছে। সংরক্ষিত হয়ে যাওয়া প্রাচীন মানুষের হাড়, সম্পূর্ণ দেহাবশেষ ইত্যাদি উত্তরাপথের নানা গন্তব্যে অনেক বেশি পাওয়া গেছে। সে কারণে সেখানকার কাহিনী আরো একটু বেশি স্পষ্ট ভাবে জানা গেছে। সেটি নতুন অভিবাসী জ্ঞানীদের সম্পর্কে যেমন সত্যি, তেমনি তাদের সঙ্গে সহ-অবস্থানকারী অনেক আগের অভিবাসীদের বংশধর নিয়ানডার্থালদের জন্যও সত্যি।

আমরা আগেই দেখেছি জ্ঞানীদের সঙ্গে নিয়ানডার্থালদের শারীরিক ও মানসিক মিল কত বেশি ছিল, তা সত্ত্বেও মন-পাগলের বিপ্লব শেষের যে জ্ঞানী মানুষ অভিবাসী হয়েছে তাদের সঙ্গে পাল্লা দেয়া ওই নিয়ানডার্থালদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। জ্ঞানীরা শেষ অবধি বরফযুগের শেষের দিকে উত্তর ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো, সেখানকার তীব্র শীতেও টিকে থেকেছে। নিয়ানডার্থালরা অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর দক্ষিণ ইউরোপেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলো। মধ্যপ্রাচ্যের মত ওখানেও জ্ঞানী ও নিয়ানডার্থাল উভয়ে ৩০ হাজার বছর আগে পর্যন্ত পাশাপাশি বাস করেছে এমন প্রমাণ আছে। জ্ঞানী মানুষ ৪০ হাজার বছর আগেই ওখানে পৌঁছে গিয়েছিলো। মধ্যপ্রাচ্যে ও ইউরোপে জ্ঞানী ও নিয়ানডার্থালদের মধ্যে যে যৌন মিশ্রণ ঘটেছিলো তার প্রমাণও আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি। কাজেই পরবর্তী কালের জ্ঞানীরা বেশ কিছু জিন নিয়ানডার্থালদের কাছ থেকে পেয়েছে একথা মানতেই হবে।

উত্তরাপথের যাত্রীরা মধপ্রাচ্য ও মধ্যএশিয়া থেকে পশ্চিমে দিকে ইউরোপের দিকে যেমন ধীরে ধীরে অভিবাসন বজায় রেখেছিলো তেমনি পূর্ব দিকে তুর্কীস্তান হয়ে চীন-মঙ্গোলিয়ার দিকেও ওরা বিস্তৃত হয়েছিলো। এভাবে ওরা ৫০ হাজার বছর আগে পূর্ব এশিয়ার উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। এখানেও ওরা একেবারে উত্তরে যেতে পারেনি, সাইবেরিয়ার হিমবাহ তাদের পথে বাধা হয়ে দাড়িয়েছিলো। সমুদ্রের বাধা মানুষকে যতদিন পূর্বদিকে ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে আটকে রেখেছিলো তার চেয়ে অনেক বেশিদিন মানুষ উত্তর দিকে মঙ্গোলিয়ায় আটকে ছিলো, এর থেকে বেশি উত্তরে যেতে অনেক সময় লেগেছিলো, বরফ যুগের অবসান না হওয়া পর্যন্ত।

বেশ বোঝা যাচ্ছে যে মানুষকে সেই যুগেও এক জায়গায় আবদ্ধ রাখা কঠিন ছিল। যখনই তাদের পক্ষে সাইবেরিয়ার বরফ অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে তখনই এরা একেবারে উত্তর পূর্ব এশিয়ায় তাদের বসতকে নিয়ে গেছে আজকের এস্কিমো, ইনুইটদের পূর্বসূরি সেই মানুষগুলো সেখানকার পরিবেশকেও জয় করেছে। বরফ যুগের রেশ থেকে যাওয়ায় সমুদ্র-পৃষ্ঠ তখনো নিচু থাকায় ওই সময় ১২ হাজার বছর আগেও এশিয়ার একেবারে উত্তর-পূর্ব কোণে এখন যেখানে বেরিং সাগর (প্রণালী) সেখানে সরু স্থলভাগ এশিয়ার এই কোনাকে উত্তর আমেরিকার আলাস্কার উত্তর-পশ্চিম কোনাকে যোগ করছিলো। এই স্থল সেতু দিয়েই শীতে অভ্যস্ত ওই মানুষদের কিছু দল আমেরিকা মহাদেশে প্রবেশ করেছিলো। এভাবে আমেরিকায় প্রথম মানুষ এসেছিলো ১২ হাজার বছর আগে;

কারো কারো মতে আরো দু চার হাজার বছর আগে। তাদের সামনে তখন উন্মুক্ত ছিল বিশাল উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ– পরবর্তী সময়ে তারা ক্রমাগত প্রথমে উত্তর আমেরিকা এবং পরে দক্ষিণ আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে এক সময় তার একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। আজকের সকল আমেরিকান আদিবাসীরা ওদেরই বংশধর– কানাডায় ও যুক্তরাষ্ট্রে কম হলেও দুই আমেরিকা মহাদেশের বাকি সব অংশে আজকের মানুষের জিন প্রবাহে তাদেরই অংশ সব চেয়ে বেশি। এশিয়া থেকে মানুষ প্রথম আমেরিকায় যাওয়ার পরপরই এক সময় এই দুই মহাদেশের সংযোগকারী স্থল সেতু সমুদ্র গর্ভে চলে গিয়েছিলো এবং আমেরিকার মানুষ ওখানেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো। বড় মহাদেশের মধ্যে আমেরিকার অভিবাসন সবার পরে ঘটলেও তারপরও গুরুত্বপূর্ণ অভিবাসনে মানুষ নতুন নতুন জায়গায় গিয়েছে। চীনের কাছে তাইওয়ান অঞ্চল থেকে দক্ষিণে ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন দ্বীপপুঞ্জে– হাওয়াই, টঙ্গা, ফিজি, তাহিতি, সামোয়া ইত্যাদিতে– এই অভিবাসন শেষ হয়েছে মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে। এর অধিকাংশই ঘটেছে কিন্তু সমুদ্র পাড়ি দিয়ে। ততদিনে মানুষ তার ছোট ডিঙ্গি নৌকা করেও, যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েও, দীর্ঘ সাগর পাড়ি দিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

অভিবাসীর ভ্রমণ কাহিনী পড়তে পড়তে প্রশ্ন জাগতে পারে একই মানুষের দল যদি একই স্থান আফ্রিকার ওই উত্তর-পূর্ব কোনা থেকে দক্ষিণাপথে অথবা উত্তরাপথে সারা দুনিয়াতে বিস্তৃত হয়ে থাকে তা হলে তাদের দেহাবয়বে, চেহারায়, ও অন্যান্য নানা বৈশিষ্টে এত ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায় কেন। তার কারণ খুব গভীর কোন মৌলিক বৈশিষ্টে না হলেও চেহারা, দেহাবয়ব ইত্যাদির মত কোন কোন জিনে বিবর্তনের পরিবর্তন কিন্তু এই পুরো সময়ে চালু ছিল। মানুষ যখন যেখানে অভিবাসী হয়েছে, দীর্ঘ কাল থেকেছে, সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে টিকে থাকার স্বার্থে তার কোন কোন মিউট্যাশন প্রকৃতির দ্বারা বাছাই হয়েছে। সে জন্য একই দল থেকে এসেও বিভিন্ন জায়গার মানুষের মধ্যে কিছু কিছু ভিন্নতা দেখা দিয়েছে গত ৭০ হাজার বছরে। কিন্তু সেই বৈচিত্র খুব গভীরের কোন বৈচিত্র নয়। বরং ওই মন-পাগলের বিপ্লবের দিনেই সব মানুষের আসল বৈশিষ্ট ঠিক হয়ে গিয়েছিলো– ভাষার মুনশিয়ানায়, কল্পনা প্রবণতায়, এবং পরস্পরের সঙ্গে সামাজিকতায় দারুণ সক্ষম সব একই রকম মন-পাগল হিসেবে।

সাম্প্রতিক বহু রকম গবেষণা সারা দুনিয়ার সব রকম মানুষের অনুভূতি, মনন, আবেগ এবং তার প্রকাশের যে ঐক্য তা চমৎকার ভাবে খুঁজে পেয়েছে। যেমন সব জায়গার মানুষের সব রকমের ভাষা এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণায় দেখা গেছে যে এর মধ্যে রসবোধ, কৌতুক, অনুপ্রাস-ছন্দ ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ; বক্তৃতা দেয়ার সময় গম্ভীরতর ও আলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহার, সাধারণ কথায় অন্য রকম, আবার প্রেমালাপে ভিন্ন রকম; এগুলো কিন্তু আশ্চর্য জনক ভাবে একই ধরণের। ভাষার ব্যবহার না করে শুধু আকারে ইঙ্গিতে আমরা যেভাবে যেই কথা বলতে চাই তাতেও কিন্তু সব মানুষের মধ্যে দারুণ ঐক্য রয়েছে– ভয়, আগ্রহ, রাগ, বিতৃষ্ণা, আনন্দ ইত্যাদি সবাই একই রকম চোখ-মুখের ভঙ্গি, হাতের ভঙ্গি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করে; উহ্, আহ্, বাহ্ ইত্যাদি অস্পষ্ট কথায় প্রকাশ করে; যদিও এসব মানুষের এক গোষ্ঠির সঙ্গে অন্য গোষ্ঠির ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে বহু হাজার বছর আগে। কোন কোন গবেষণায় একেবারে আধুনিক পদ্ধতিতে মুখের ও চোখের ভঙ্গি নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন পেশি সূক্ষ্ম নড়াচড়া কুঞ্চন ইত্যাদির পরিমাপের মাধ্যমে এবং একই সময় মস্তিষ্কের যথাযথ অংশে তার উদ্দীপনা ব্রেইন স্ক্যানের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেছে সব মানুষের ওই ভাব এবং আবেগ প্রকাশের ঐক্যটি একেবারে পেশি ও মস্তিষ্ক পর্যায় পর্যন্ত বজায় রয়েছে।

আরো মজার ব্যাপার হলো বিনোদনের নানা বিষয় আমরা ওপরে ওপরে নানা মানুষের নাচগান ইত্যাদির মধ্যে যত পার্থক্য দেখি- মূলত সুর ও সুরেলা হওয়াটির প্রকৃতিটি একই রকম। যেমন যে কোন মানব গোষ্ঠিতে গিয়ে সে বনবাসীই হোক কি নগরবাসীই হোক, দূর থেকে শুধু সুরটি শুনলেই বোঝা যায় যে কোন মা বাচ্চাকে দোলাতে দোলাতে ঘুম পাড়ানি গান গেয়ে যাচ্ছে। একই চেতনার একই সুরটি সব মানুষ পেয়েছে তার কারণ সুদূর অতীতে ওরা এক জায়গা থেকেই এসেছিলো– ওখানকার সুরটিই মোটামুটি বহন করে চলেছে। সব কিছুর একটি নাম দেয়া, সেই নামে সবাই ডাকা; বাচ্চাদের সঙ্গে খুনসুটি করা, আদর করে শিশু-সুলভ উচ্চারণে তাদের সঙ্গে কথা বলা, বাচ্চাদের সঙ্গে তাদের মত করে খেলাধূলা করা; গল্প শুনতে ও শোনাতে ভালবাসা; আড্ডা দেয়ার প্রবণতা; যৌন বিষয়ে কথা বল্‌তে রাখ-ঢাক করা ইত্যাদি অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয়ের ঐক্য একেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে সবাই মূলত একই মানব গোষ্ঠি থেকে এসেছে, এবং এই প্রবণতাগুলো সে সময়েই মস্তিষ্কে গাঁথা হয়ে গিয়েছিলো। এরপর অবশ্য এসবের বহিরঙ্গে নানা পরিবর্তন স্থানীয় পরিবেশের

সঙ্গে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে হয়েছে– যেমন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন সাজসজ্জা, ভিন্ন সংস্কৃতি। আবার তাদেরও একের সঙ্গে অন্যের জিন মিশ্রণ, সাংস্কৃতিক মিশ্রণের ফলে নানা জায়গায় নানা ভাবে আরো ক্রিয়া-বিক্রিয়া করেছে। সেটিই মানব অভিবাসনের গল্প, মানুষের ইতিহাস।

চিরন্তন পেশার পরিবর্তন

শিকারি-সংগ্রাহক থেকে কৃষিজীবী

প্রকৃতিতে সবাই শিকারি-সংগ্রাহকঃ

শিকার ও সংগ্রহ বরাবরই মানুষের জীবিকা ছিল, শুধু জ্ঞানীদের নয়, তার আগে যত রকম মানুষ ছিল সবারই– প্রায়-জ্ঞানী, নিয়ানডার্থাল, খাড়া, মিস্ত্রি সবাই, আরো বহু আগের লুসির সমসাময়িকরাও। প্রকৃতিতে এটিই মানুষের জীবন ধারণের স্বাভাবিক উপায়– অন্যান্য অনেক প্রাণীরও তাই। জ্ঞানী মানুষ মস্তিষ্কের উন্নয়নে অনেক দূর এগিয়ে গেছে– উন্নত হাতিয়ার তৈরি করেছে, আগুনের ও পটারি হাঁড়িকুড়ির ব্যবহার করে রান্নায় বৈচিত্র এনেছে, পরিপূর্ণ ভাষার অধিকারী হয়েছে, অন্যের মনের বিষয়ে আন্দাজ করতে পারছে, বিমূর্ত নান্দনিক শিল্প সৃষ্টি করেছে; কিন্তু তখনো তার সেই প্রাচীন পেশা ছেড়ে অন্য রকম কোন উপায়ে জীবিকা নির্বাহের কথা তার মাথায় আসেনি। বরং ওই শিকারি-সংগ্রাহকের কাজটি ভালভাবে করার জন্যই তার এত সব সক্ষমতা নিয়োজিত হয়েছে– তার হাতিয়ার শিকারকে আরো নিশ্চিত ভাবে ঘায়েল করেছে; ফাঁদ, ফাঁস ইত্যাদি ব্যবহার করে আরো সহজ উপায়ে শিকার করেছে; মাটির ওপরের নানা রকম আলামত দেখে মাটির মধ্যে থাকা রসালো শিকড়, কন্দ ইত্যাদি খুঁজে পেয়েছে; ইত্যাদি। এর কারণ মানুষ তার দীর্ঘ ইতিহাসে এখন পর্যন্ত কখনো প্রকৃতিকে অতিক্রম করে যাবার কথা চিন্তা করেনি, প্রকৃতি যা দিয়েছে তা আরো ভালভাবে নেবার চেষ্টাই শুধু করেছে। শিকার ও সংগ্রহের ফলে, বা অন্য কোন কারণে, এক জায়গায় প্রকৃতির দান ফুরিয়ে গেলে তখন তাকে এখানকার বাস তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে হয়েছে।

এভাবে শিকারি-সংগ্রাহক জীবনের একটি আবশ্যকীয় অনুসঙ্গ হলো যাযাবর জীবন। এর ফলে এক জায়গায় দীর্ঘ দিন স্থায়ী হওয়া অধিকাংশ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাছাড়া একই সঙ্গে বেশি মানুষের বসবাস করাটিও এরকম জীবনের সঙ্গে খুব খাপ খায়না– মানুষ তাই দীর্ঘকাল ছোট দলে বাস করতে ও ঘুরতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। পরে অবশ্য কোন কোন পরিবেশে মৌসুমি বড় আকারের পশু সমাগম ইত্যাদির সুযোগ নেবার জন্য এক এক জায়গায় বড় দলে থাকার, শিকার করার, ও স্থানান্তরিত হওয়ার রীতি কোথাও কোথাও সৃষ্টি

হয়েছে; গোষ্ঠি, সমাজ ইত্যাদিও গড়ে ওঠেছে। কিন্তু ওই যে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা, তা প্রায় সব মানুষের জীবনকে ওই শিকার আর সংগ্রহের চারিদিকে আবর্তিত অবস্থায় রেখে দিয়েছিলো; গঠনমূলক বা সংগঠনমূলক অন্য কাজে নিবেদিত হবার সুযোগ তাতে কম ছিলো। যেমন সত্যিকার অর্থে গ্রাম, নগর, স্থাপত্য, নাগরিক সুবিধা, রাষ্ট্র ইত্যাদি গড়ার সুযোগ এর মধ্যে বড় একটা ছিলনা। স্থায়ীত্বের অভাবে ওরকম একটি সমাজের সঙ্গে আরেকটি সমাজের স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগও খুব সীমিত ছিল।

অতীতে যখন নেহাতই ছোট পারিবারিক দল নিজেরাই শুধু নিজের মত করে ঘুরে বেড়াতো, অন্য দলের সঙ্গে কচিৎ সাক্ষাত হতো, তখন সেই সাক্ষাতগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তখনই এই পরিবার থেকে উঠ্‌তি বয়সের কোন কোন মেয়ে হয়তো ওই পরিবারে চলে যেতো ওখানকার কারো বউ হয়ে, আবার উঠ্‌তি বয়সের কোন ছেলে হয়তো চলে যেতো ওই পরিবারে জামাই হয়ে। এভাবে জিন প্রবাহ একটি ছোট গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে থাকার হাত থেকে রক্ষা পেতো। কিন্তু ওই পরিবারগুলোর মধ্যে পরবর্তী দেখা সাক্ষাতের খুব বেশি নিশ্চয়তা বা নিয়ম থাকতোনা। মন-পাগলের বিপ্লবের পর তাতে খুব সম্ভব বড় পরিবর্তন এসেছিলো। যাযাবর দলগুলোরও এক এক বিশেষ সুবিধামত সময়ে বিশেষ জায়গায় বড় সমাবেশে মিলিত হবার রীতি চালু হয়েছে। ওগুলো হয়তো দেদার পশু সমাগমের মৌসুমের সময়, বা তার পর পর, অথবা সাগরতীরে যখন দেদার সী-ফুড মেলে তখন। কখনো কখনো ওই সমাবেশ উৎসবের রূপ নিতো, নানা সম্পর্কিত পরিবারের পুনর্মিলনীর রূপ নিতো, নতুন সম্পর্ক গড়ার দারুণ সুযোগও সৃষ্টি করতো। সবাই হয়তো তাদের সারা বছর তৈরি অলঙ্কার, নান্দনিক সৃষ্টি, নতুন ধরনের হাতিয়ার তৈজস ইত্যাদি নিয়ে আসতো– বিকিকিনির জন্য, উপহারের জন্য। খুব বিস্তারিত না জানতে পারলেও সাক্ষ্য-প্রমাণে অনেক জায়গায় এমন যে ঘটতো তা বোঝা যায়। শিকারি-সংগ্রাহকদের জীবনে সমাজ গড়া এই টুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকতো।

যেহেতু শেষ পর্যন্ত ছোট বা বড় নিজ দলের সঙ্গেই শিকার অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়ানো, কাজেই এরকম জীবনে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার অভাব হবে তা ধরেই নেয়া যায়। বিশেষ করে কম জনসংখ্যার সময়ে বিস্তীর্ণ জায়গায় ঘুরে বেড়ানো ছোট দলগুলোর ক্ষেত্রে এই অভাব খুব প্রকট ছিল। শিকারের পশুরা চলে পরিবেশের সঙ্গে তাদের নিজস্ব সম্পর্ক অনুযায়ী। পানির প্রাপ্যতা, ঘাসের অবস্থা, আক্রমণকারী হিংস্র পশুদের সংখ্যা, সাধারণ ভাবে শিকারি মানুষের জনসংখ্যা

ইত্যাদির ওপর নির্ভর করতো শিকার কত সহজে পাওয়া যাবে কি যাবেনা তা। কাজেই ওই মৌসুমি পশু সমাগমের সময়টি বাদ দিলে খাদ্যের নিশ্চয়তাটি সব সময় মিলতোনা। তা ছাড়া হিংস্র প্রাণীর ভয় মানুষের নিজেদের জন্যও কম বড় ছিলনা; সেটি শিকার-সংগ্রহের সময় ছিল, বসতের স্থানেও থাকতো কারণ অস্থায়ী এই বসত সব সময় খুব সুরক্ষিত কিছু হতোনা। এটি কিছুটা লাঘব হতো যখন মৌসুমি পশু সমাগম, মৌসুমি ফলফলারির উদ্ভিদ সমারোহ উপলক্ষে একটি বিশেষ মৌসুমে কোন জায়গায় সুরক্ষিত প্রাকৃতিক বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকতো– যেখানে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় পূর্ব নির্ধারিত ভাবে তারা কাটাতো। বরফ যুগের পর পর ইউরোপে এই ব্যাপারটি অনেক জায়গায় দেখা গেছে। আবার শীতের মৌসুমে যখন প্রধানত আগের জমানো খাবারের ওপর নির্ভর করতে হতো তখন শীতকালীন সুরক্ষিত আবাসে তারা চলে যেতো। তবে সব জায়গার সব মানুষের এতখানি সুরক্ষা বা খাদ্য নিরাপত্তা থাকতোনা।

এসব কারণেই এর আগে আমরা মানুষের যে সংগ্রামের দিনের কথা বলেছি শিকারি-সংগ্রাহক হিসেবে বেঁচে থাকা মানুষের পুরো কালটিকেই তার অন্তর্ভুক্ত করা যায়; বিশেষ করে তার প্রথম দিক্‌কার সময়কে। অনিশ্চয়তা ও অনিরাপত্তার ব্যাপারটি যে মানব ইতিহাসের সব সময়েই কোন না কোন ভাবে যে ছিলনা তা নয়; কিন্তু শিকারি-সংগ্রাহকের জীবনটি এদিক থেকে অনেক বেশি সংগ্রামের দিন ছিল। এর একটি কারণ হলো বিশেষ করে প্রাণী শিকার যদি নিয়মিত ভাবে না করা যেতো তা হলে নিয়মিত খাবারের নিশ্চয়তা থাকতোনা– একদিন বেশি শিকার পেলেও তা কয়েকদিনের বেশি সংরক্ষিত রাখার সুযোগ ছিলনা। কাজেই ব্যাপারটি অনেকটা দিন এনে দিন খাওয়ার পর্যায়ে গড়াতো। এমন সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত মানুষের পক্ষে আরো বড় কিছুর অর্জনে এগিয়ে যাওয়াটি কঠিন হতো। কাজেই মানুষ যখন অন্তত কোন কোন জায়গায় চিরাচরিত এই শিকারি-সংগ্রাহকের পেশার বদলে অন্য পেশায় যেতে পারলো তখনই তার জন্য নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিলো।

বন্য থেকে পোষ্যঃ

মানুষ যখন মন ও ভাষার একত্র হঠাৎ উন্নয়নে তার অভিজ্ঞতার বাইরের বিষয় কল্পনা করতে সক্ষম হলো তখন থেকে তার প্রশ্নের ধরণ বদলে গেছে। এমন হলে কী হতো, তেমন হলে কী হতো, এমনি ধারার প্রশ্ন প্রথম বার তার মনে উঁকি ঝুঁকি দিয়েছে। পরবর্তী কালে সে শুধু প্রকৃতির দান যে ভাবে আছে সে

ভাবেই গ্রহণ করে খুশি থাকেনি, বরং নানা রকম নতুন পরিস্থিতি কল্পনা করতে করতে সেগুলো প্রয়োগ করেও দেখেছে প্রকৃতিতে কিছু পরিবর্তন করে তাকে নিজের সুবিধায় আনতে পারে কিনা। যেমন বিভিন্ন যুগে দক্ষিণ আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায় এবং ইংল্যান্ডে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান আবিষ্কার হয়েছে যেখানে মানুষ জংলার মধ্যে ইচ্ছে করে আগুন দিয়েছে– ওখানটায় কচি ঘাস জন্মাবার সুবিধা করে দিতে এবং মাটির ভেতরে মূল, কন্দ ইত্যাদি উদ্ভিদ খাদ্যের প্রাপ্তি বাড়াতে। কচি ঘাসের লোভে হরিণের দল এখানে চরতে আসলে এতে শিকারেরও সুবিধা হবে বলে মনে হয়েছে। অন্তত একটি ক্ষেত্রে ছোটখাট প্রাণী ইঁদুর, খরগোস জংলা থেকে বের করে শিকার করাটাও আগুন দেবার একটি বাড়তি উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে ব্যাপারটি দেখা গেছে তা ৭০ হাজার বছর আগে, অস্ট্রেলিয়ায় ৩০-৪০ হাজার বছর আগে, ইংল্যান্ডে মাত্র ১১ হাজার বছর আগে। প্রত্যেকটিতে আলাদা মানুষ আলাদা ভাবে বুদ্ধি করেছে– বুদ্ধিটি হলো নিজে কিছু হস্তক্ষেপ করে প্রকৃতির কাজকে বদলে দেয়া, যাতে নিজের খাদ্য লাভে সুবিধা হয়।

এভাবে এখানে ওখানে নিজ থেকে প্রকৃতির ওপর হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা মানুষ নানা সময় করেছে, কখনো তাতে সুবিধা হয়েছে, কখনো হয়নি। ১২ হাজার বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু জায়গার মানুষদের যে পরিবেশ তাতে তাদের অনেকে প্রকৃতির ওপর এক ধরণের হস্তক্ষেপ করছিলো। ওদের খাবার সংগ্রহের তালিকায় বন্য গম ও বন্য বার্লি, এবং বন্য রাই এগুলো আগে থেকেই ছিল। এসব বন্য শস্য ঝোপঝাড়ে এখানে ওখানে পাওয়া যেতো, খুঁজে নিতে হতো। কাজটি যত পরিশ্রম সাপেক্ষ ছিল তত খাবার কিন্তু এর থেকে পাওয়া যেতোনা। এর ছরাগুলো ছিল খুব ছোট এক এক ছরায় মাত্র দু'চারটি শস্য দানা, আর দানাগুলোও খুবই ছোট। আরো বড় কথা হলো এক একটি ছরা এক এক সময় পাকে, ঠিক সময় মত সংগ্রহ করতে না পারলে পেকে ফেটে শস্য মাটিতে ছড়িয়ে হারিয়ে যায়। ওভাবে এসব অসুবিধা মেনেই আগের মত সংগ্রহ করে গেলে ব্যাপারটি ওখানেই ইতি হতো। কিন্তু তা না করে ওদের কেউ কেউ লক্ষ্য করেছে যে বন্য শস্যের মধ্যেই কিছু কিছু ব্যতিক্রমী নমুনা আছে– যেমন ওই ছোট ছরার মধ্যে দু'চারটি ছরা অপেক্ষাকৃত বড়, তার কোন কোনটায় দানাও অপেক্ষাকৃত বড়; এমনকি কোন কোন শস্য পাকলেই ছড়িয়ে পড়েনা, ছরার মধ্যেই থাকে। এমন সব সুবিধাজনক নমুনার সংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু তবুও তারা ওগুলোই বেছে বেছে সংগ্রহ করলো, অন্যগুলো বাদ দিয়ে। দীর্ঘকাল ব্যাপারটি হয়েতো

এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল– বেছে বেছে সুবিধাজনক শস্যগুলো ঘরে আনা, আর সেগুলোই খাওয়া। এমনি ভাবেই হয়তো শত শত বছর কেটে গেছে। তবুও কিছুটা সুবিধাতো তাতে হয়েছে। হয়তো এরকম ভাল শস্যের একটি বাজারও সৃষ্টি হয়েছিলো, অনেকে সংগ্রহকারীদের থেকে কিনে নিতো।

পরবর্তী ধাপটি ঘট্‌লো যখন কারো কারো মনে হলো এই ভাল শস্য সব খেয়ে না ফেলে এগুলো বাসস্থানের কাছে একটি জায়গায় ছিটিয়ে দিয়ে দেখা যাক এর থেকে চারা কেমন হয়। সত্যি সত্যি দেখা গেল অনেক চারা হলো এবং তাদের শস্যের মধ্যেও পূর্ববর্তী প্রজন্মটির ওই সুবিধাজনক গুণগুলো বজায় রইলো। ফলে তাদেরকে আর বন থেকে নতুন করে বাছাই করে সংগ্রহও করতে হলোনা, কিন্‌তেও হলোনা। এখান থেকে কিছু খেলো, কিছু আবার লাগালো। এভাবেও হয়তো বহুকাল কাটলো। তবে ওরা দেখলো যে এভাবে এক জায়গায় গজানো সব চারা ভাল গজায়না; নিজেরা মাটি খুঁড়ে দিলে, সময় মত পানি দিলে, কিছু চারা খুব চমৎকার গজায়। সেগুলোকেই ওরা বাছাই করলো, বাকিগুলো এরপর আর লাগালোনা। শুধু তাই নয় এই নতুন ভাল গজানোগুলোর মধ্যে আবার কোন কোনটির ছরা অন্যদের চেয়ে আরো বড় হলো, শস্যদানাও আরো বড় হলো, আর কম সময়ে এক সঙ্গে পাক্‌লো। এবার এই বেশি সুবিধাজনকগুলোকেই তারা বাছাই করলো, অন্যগুলো বাদ দিয়ে। এমনি ভাবে একের বাগান থেকে অন্যের বাগান হয়ে শত শত বছর ধরে এ শস্য ক্রমাগত বাছাই হয়ে হয়ে তার জেনেটিক ধরণ ধারণ সম্পূর্ণ বদলে ফেল্‌লো। এগুলো এখন বড় ছরা, বড় দানা, কম সময়ে পাকা শস্য; মানুষের পানি দেয়া, মানুষের যত্নের ওপর নির্ভরশীল। একে যদি বনে ছিটিয়ে দেয়া হয় সেখানে এরা হয় গজাবেনা, গজালেও বন্য পরিবেশে বাঁচবেনা। এরা আর বন্য থাকেনি, এরা হয়ে গেছে মানুষের পোষ্য, অন্য কথায় কৃষির শস্য। এগুলো এখন বন্য শস্যের থেকে ভিন্ন প্রজাতির শস্য।

শত শত বছর ধরে এই যে প্রক্রিয়াটি চলেছে তাতে কোন এক জন বা এক দল মানুষ এক সঙ্গে সব কিছু ভাবতে পারেনি, যখন যারা যেই ধাপটি বুঝেছে সেটি করেছে। উপকার পেয়েছে বলে ওটি বছরের পর বছর করে গেছে যতক্ষণ পর্যন্ত না আর কেউ এর পরের ধাপটির কথা মাথায় এনেছে। এভাবেই এক সময় বহু আগের বন্য শস্য সম্পূর্ণ কৃষি শস্যে পরিণত হয়েছে, যা শুধু মানুষের হাতে তাতে মানুষের যত্নে বেড়ে ওঠে। এই ভাবে কৃষি শস্যের সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় বার বার মানুষের হাতে তা বাছাই হতে হয়েছে। কিন্তু একবার ওই ভাল কৃষি শস্যবীজ এসে যাবার পর তারা যুগ যুগ ধরে এটি শুধু লাগিয়ে গেছে। অবশ্য এর পরও

আরো বাছাইয়ে এটি আরো উন্নত হয়েছে কালক্রমে। আমরা এর আগে জিন প্রবাহের পেছনে দুরকম ভাবে তা বাছাই হতে দেখেছি– প্রকৃতির বাছাই এবং সঙ্গীনীর বাছাই। কৃষি শস্য সৃষ্টির পেছনেও আছে এমনি আর এক রকমের বাছাই– সেটি ব্যবহারকারী মানুষের বাছাই। এটিও জিনের ব্যাপার, যদিও মানুষের নিজের জিনের নয়– ওই শস্যের। প্রত্যেক বাছাইয়ের পর শুধু সুবিধাজনক গুণ সম্পন্নগুলোর মধ্যে প্রজনন করানো হয়েছে বলে আগের আধা পোষ্য আধা বন্য শস্যগুলো টিকে থাকতে পারেনি– বনের মধ্যে বন্য শস্য রয়ে গেছে আর মানুষের কৃষিতে কৃষি শস্য; অনেক ভিন্ন জিন নিয়ে উভয়ে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে।

আগেই দেখেছি যেখানকার মানুষ সর্বপ্রথম এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেছিলো সেটি হলো মধ্যপ্রাচ্যের 'উর্বর বাঁকা চাঁদ' নামে কথিত সীমিত জায়গাটি– ইরাক, জর্দান, সিরিয়া, তুরস্কের খানিকটা করে জায়গা নিয়ে বাঁকা চাঁদের আকৃতির মত জায়গা। ওখানেই কেন প্রথম হয়েছিলো? তার প্রকৃত কারণ জানা মুশকিল। তবে এটি ঠিক যে ওখানকার মানুষের মাথায় এই সব বুদ্ধি খেল্‌ছিল, প্রকৃতিকে বদলে নিয়ে নিজের জন্য সুবিধা সৃষ্টি করার বুদ্ধি। তাছাড়া হয়তো ওখানকার আবহাওয়া ও পরিবেশ তাদের সহায়ক হয়েছিলো। আরেকটি বড় কথা হলো ওখানকার ঝোপেঝাড়ে বন্য রাই, বন্য বার্লি আর বন্য গম ছিল– এই তিনটি শস্যেরই এমন কিছু জেনেটিক গুণ ছিল যাতে তাদেরকে পোষ মানিয়ে কৃষি শস্যে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। সব বন্য শস্যের এই সুযোগ নেই– তাই অনেক শস্য বা অনেক উদ্ভিদ বন্য হিসেবেই এখনো রয়ে গেছে, সেগুলোকে কৃষিতে আনা যায়নি। যদি গম বা বার্লি ওই দলে পড়তো তা হলে ওই মানুষদের চেষ্টা সফল হতোনা, মাঝপথে থেমে যেতো। এসব পরীক্ষা নিরিক্ষা তাদেরকেই করতে হয়েছে যারা প্রথম বারের মত কোন শস্য বা অন্য কোন ফসলকে বন্য থেকে পোষ্য করেছে। যারা তাদের দেখাদেখি ওই কৃষি ফসলকে ব্যবহার করে কৃষিজীবী হয়েছে তাদেরকে এসব করতে হয়নি।

ওই প্রথম কৃষি উদ্ভাবন ১২ থেকে ১০ হাজার বছর আগে ঘটেছিলো। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় আজকের দিনেও ক্রমাগত মানুষের বাছাইয়ের ফলে উদ্ভিদের জেনেটিক গঠন পরিবর্তিত হচ্ছে। একই উদ্ভিদ, হয়তো সেটি বন্য উদ্ভিদ, এভাবে একেবারে ভিন্ন জাতের অথবা ভিন্ন প্রজাতির নানা কৃষিজাত উদ্ভিদে পরিণত হচ্ছে। এখন যেহেতু মানুষ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ বুঝে একেবারে সজ্ঞানে সবকিছু করছে, এবং সে একে ঠিক কী রকম উদ্ভিদে পরিণত করতে চায় তার একটি

লক্ষ্য তাদের কাছে গোড়া থেকেই থাকছে, তাই শত শত বছরের বদলে অনেক কম বছরেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হচ্ছে। যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি এভাবে অপেক্ষাকৃত অল্প আগে কম সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আড়াই হাজার বছর আগে ইউরোপের কোন কোন দেশে এক রকম বুনো শাক পাওয়া যেতো যার একটি রূপ এখনো দেখা যায় যাকে চল্‌তি কথায় বলা হয় বুনো সরষে। এর পাতাগুলো খাওয়া যেতো, কিন্তু যেহেতু পাতার পরস্পর ঘনত্ব কম বলে এগুলো জমিতে লাগালে কম শাক পাওয়া যেতো; এর পাতা ঘন করার জন্য ওখানে এক জায়গায় শুধু ঘনপাতা বাছাই করে করে শুধু তাদের মধ্যে পরাগ সংযোগ হতে দিয়েছিলো। এভাবে প্রতি প্রজন্মে বাছাই করে বেশ কিছু প্রজন্মের পর আরো ঘন ভালো শাক পেয়ে গিয়েছিলো যেটি এখনো আমরা কপি শাক হিসেবে ফলাই। চারশো বছর আগে ইউরোপে কয়েকটি জায়গায় পৃথক পৃথক কৃষক গোষ্ঠি এই কপি শাকের নানা অংশকে মোটা ও পুষ্ট হিসেবে পাওয়ার জন্য কাজ করেছে। তাদের কেউ এ শাকের প্রান্তের পাতার যে কুঁড়ি পাতা মেলার আগে পরতে পরতে ভাঁজ হয়ে ছোট্ট জায়গায় কুঁকড়ে থাকে সেটিকে বড় আকারে পাওয়ার জন্য বাছাই করেছে। তাদের চেষ্টার ফল হয়েছে বাঁধাকপি। অন্যরা পাশের পাতার কুঁড়িকে বড় করে পাওয়ার জন্য বাছাই করে পেয়েছে স্প্রাউট। অন্য এক দল একই কপি গাছের ফুলের কলিটাকে বড় করে পাওয়ার চেষ্টা করেছে, তার ফলশ্রুতি হিসেবে কেউ পেয়েছে ব্রকোলি, আর কেউ পেয়েছে ফুলকপি। কেউ আবার ওই শাকের ডাঁটাটাকে বড় করে পাওয়ার জন্য বাছাই করে করে পেয়েছে খোলরবি নামে আরেকটি সব্‌জি, যেটি আমাদের দেশে এখনো জনপ্রিয় হয়নি। এগুলো অবশ্য কপি শাকেরই নানা জাত, তার থেকে ভিন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয়নি- কোন বিশেষ অংশের জন্য দায়ী জিনের বিশেষ রূপকে গুরুত্ব দিয়ে সৃস্টি হয়েছে। কিন্তু প্রক্রিয়াটি একই ওই বন্য শস্যকে ভিন্ন প্রজাতির কৃষি প্রজাতিতে পরিণত করার মতই। কপির পরিবর্তনের কাজ আজও শেষ হয়ে যায়নি। ১৯৯৩ সালে জাপানের একটি কোম্পানী ব্রকোলির একটি নানা শাখায় বিভক্ত ছোট রূপ সৃষ্টি করে এর নাম দিয়েছে ব্রকোলিনি। কপির বিষয়টি এরকম অনেক কৃষি ফসল উদ্ভাবনে একটি উদাহরণ মাত্র।

আবার যদি আমরা ১০-১২ হাজার বছর আগের মধ্যপ্রাচ্যের সেই উর্বর বাঁকা চাঁদ নামক জায়গায় ফেরৎ যাই ওখানে ও তার আশপাশে অনেকটা একই প্রক্রিয়ায় কোন কোন বন্য পশুকে সর্ব প্রথম পোষ্য পশুতে পরিণত করা হয়েছে। প্রথম যেই পশুর ওপর সেটি প্রয়োগ করা হয়েছে তা হলো নেকড়ে, লোকালয়ের

আশপাশেই যে বন্য পশুটি ঘুরে বেড়াতো। ওখানকার কিছু মানুষ লক্ষ্য করেছিলো যে কিছু কিছু নেকড়ের স্বভাব অনেকটা নম্র; মানুষের বাসার কাছে আসতে, বা মানুষের দেয়া খাবার খেতে ভয় পায়না, আচরণ অনেকটা বন্ধু সুলভ; কোন কোনটি দেখতেও কোমল প্রকৃতির, পূর্ণ বয়স্ক হয়েও অনেকটা বাচ্চা নেকড়ের মত। তখন ওরা এরকম অনুকূল স্বভাবের নেকড়েকে বেছে বেছে ঘরে এনে তাদেরকে খাবার ইত্যাদি দিলো এবং শুধু ওগুলোর মধ্যেই প্রজনন করতে দিলো। ফলে যে বাচ্চাদের জন্ম হলো তাদের মধ্যে ওই বন্ধুসুলভ ও কোমল স্বভাব আর একটু বেশিই দেখা দিলো– মা-বাবা উভয়ে এরকম হওয়াতে। এবার এদের মধ্যে গুণগুলো আরো স্পষ্ট সেগুলোকে আবার বাছাই করে প্রজননকে তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হলো। এমনি করে বার বার বাছাই করে যা পাওয়া গেলো তা আর বন্য নেকড়ে রইলোনা হয়ে গেলো কুকুর, সম্পূর্ণ পোষ মানা, সম্পূর্ণ গৃহপালিত– একেবারেই বদলে যাওয়া প্রজাতি যা মানুষের ওপর পুরাপুরি নির্ভরশীল, মানুষের নিত্যসাথী। একই ভাবে এই অঞ্চলেই বন্য ছাগল থেকে পোষমানা ছাগল, বন্য ভেড়া থেকে পোষমানা ভেড়া, এবং কাছের এলাকাতেই বন্য গরু থেকে পোষমানা গরু সৃষ্টি করা হয়েছে। সব ক'টির ক্ষেত্রে বাছাইয়ের সময় লক্ষ্য রাখা হয়েছে পশুর তোলা খাবার খেয়ে দ্রুত বড় হয়ে মাংসল হবার দিকে, দলবদ্ধ হয়ে থাকার ও চলার স্বভাবের দিকে, ঘাস খেতে ছেড়ে দিলেও দলেবলে ফিরে আসার প্রবণতার দিকে, ভেড়ার ক্ষেত্রে গায়ে ভাল লোম দ্রুত বাড়ার দিকে, গরুর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বড় ও বলশালী হয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাতে চলে না যায় সেই দিকে, ইত্যাদি। তখনকার ওই তিনটি পশুই পোষমানার উপযুক্ত ছিল, তাই ওরা সেগুলোকে পোষ মানাতে পেরেছিলো। সব পশু সেভাবে উপযুক্ত নয়। যেমন ওই মধ্যপ্রাচ্যেই অনেক বন্য গাজেল হরিণ ছিল। সেগুলোকে অনেকে জীবন্ত ধরে বাড়িতে খোঁয়াড়ে রেখেছে। পোষ মানাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ সব পশুকে পোষ মানানো যায়না– হরিণ তার একটি। মধ্যপ্রাচ্যে যা করা হয়েছে তা হয়তো আরো অনেক অঞ্চলে করার চেষ্টা হয়েছে অন্য পশুর ওপর, কিন্তু সেগুলো পোষ মানাবার মত ছিলনা বলে সে চেষ্টা সফল হয়নি।

বন্য শস্যকে এবং বন্য পশুকে পোষ মানিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম মানুষের পেশা বদলের সূচনা হয়েছিলো শিকারি-সংগ্রাহক থেকে কৃষিজীবীতে। এটি যে রাতারাতি হয়নি শত শত বছরের চেষ্টায় হয়েছে তা আমরা দেখলাম, যার মধ্যে ছিল নানা মধ্যবর্তী স্তর। কিন্তু এই স্তরগুলোর কথা আমরা জানলাম কী করে–

সেও প্রত্নতত্ত্বের মাধ্যমেই। উদাহরণ স্বরূপ সিরিয়ার আবু হোরাইরা নামক জায়গায় ১২-১৩ হাজার বছর আগের একটানা কয়েক হাজার বছরের অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে ওখানকার আবহাওয়া, বসবাস, উদ্ভিদ ইত্যাদি সম্পর্কে। দেখা গেছে যে শিকারের জন্য প্রচুর বন্য পশু এবং বেশ কিছু বন্য শস্য থাকার কারণে ওই শিকারি-সংগ্রাহক মানুষরাও বেশ স্থায়ী গ্রাম গড়ে তুলতে পেরেছিলো। ওখানে একটি ভূমিতে কয়েকটি বন্য শস্যের পরাগ রেণু খুব ঘন সংবদ্ধ ভাবে সংরক্ষিত হয়ে থাকতে দেখা গেছে। বন্য শস্য সাধারণত ঝোপঝাড়ের এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকে– এক একটি গাছ খুঁজে খুঁজে নিতে হয় পরস্পর থেকে দূরে দূরে। এই জায়গায় অতিরিক্ত ঘন হয়ে থাকার ফলে বোঝা গেছে এখনো মানুষ বন্য শস্যই নিজের জমিতে ছিটিয়ে লাগিয়ে তাদের বাগান গড়ে তুলেছিলো। এতে ওখানে কৃষির পথে একটি ধাপ বোঝা গেল– বন্য শস্যকে নিজের তত্ত্বাবধানে জন্মানোর ধাপ। এর কয়েক শত বছরের পরের সময় থেকে এখানেই সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেছে রাই শস্যের বেশ ভিন্ন রকমের বীজ যাকে বন্য রাই বলা যায়না কারণ আধুনিক পরীক্ষায় বেশ বোঝা গেছে যে এটি বন্য থেকে পোষ্য হবার দিকে তখন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলো। এতে বোঝা গেল যে শুধু এক সঙ্গে লাগিয়ে চাষ করার ব্যাপার নয়, এর প্রকৃতিও গৃহপালিত হবার দিকে ঝুঁকে পড়েছে– বড় ছরা, পুষ্ট বীজ, মানুষের যত্নে বাড়া ইত্যাদির দিক থেকে। কৃষি ফসল হওয়ার পরের ধাপও এভাবে বোঝা গেছে। আবু হোরাইরার কাছেই সিরিয়ার আরেকটি জায়গা মুরাবেটে প্রায় ১১ হাজার বছর আগের কিছু রাই, গম ও বার্লির সংরক্ষিত বীজ পাওয়া গেছে যেগুলো একেবারেই কৃষির প্রজাতির, বন্য হবার কোন চিহ্নই আর অবশিষ্ট নেই। এভাবেই হাজার বছর ধরে ধাপে ধাপে এই জায়গায় বন্য থেকে পোষ্য হবার প্রক্রিয়া যে চলেছে তা বোঝা গেছে।

একই ভাবে এর পরের অন্য সময়ের অন্য কিছু জায়গার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকেই আমরা জানতে পেরেছি যে চীনে ধানকে প্রথম কৃষিতে আনা হয়েছে। ধানের কৃষিজ রূপ এবং এর স্থানীয় বন্য রূপ প্রত্নতাত্ত্বিক ভাবে এখানে পাওয়া যাওয়াতেই এই তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। চীনে যে প্রায় একই সময়ে বন্য শূকরকে গৃহপালিত করা হয়েছিল তাও এভাবেই জানা গেছে। একই ভাবে জেনেছি যে নিউগিনিতে কলা, আখ, কচু ও ইয়াম প্রথম কৃষিতে এসেছে, মেক্সিকোতে এসেছে ভুট্টা, শিম আর কুমড়ো, আর পেরুতে আলু। বিচ্ছিন্ন ভাবে পৃথিবীর নানা প্রান্তের নানা মানুষ এভাবে কৃষির উদ্ভাবন করেছে এক এক রকম

ফসল নিয়ে। তাদের থেকে অন্যরা শিখেছে কালক্রমে। কেউ কেউ কখনোই তাদের পেশা বদল করেনি, চিরকালের মত শিকারি-সংগ্রাহকই রয়ে গেছে। তাদের সংখ্যা অবশ্য এখন খুব অল্প।

পেশা বদলে সভ্যতায় মোড়ঃ

শিকারি-সংগ্রাহক মানুষ সেখানেই কৃষিজীবী হয়ে ওঠেছে সেখানেই তার জীবন দারুণভাবে বদলে গেছে। অনেক জায়গায় শিকারি-সংগ্রাহক মানুষ অন্তত আংশিক ভাবে স্থায়ী বসত গড়ে তুল্‌ছিলো। যেখানে শিকার ও সংগ্রহের একটি দীর্ঘমেয়াদী নিশ্চয়তা ছিল শুধু ওরকম কিছু জায়গায় এটি সম্ভব হচ্ছিলো। এরকম জায়গায় বন্য ফসল থেকে সুবিধাজনক গুণ সম্পন্নগুলো বাছাই করে নিজের বাগান রচনারও সুযোগ ঘটতো, যেখান থেকে নিয়মিত কিছু শস্য পাওয়া সম্ভব ছিল। ওপরে সিরিয়ায় আবু হোরাইরার বর্ণনাতে তা আমরা দেখেছি। তবে সাধারণ ভাবে শিকারি-সংগ্রাহকদের পক্ষে স্থায়ী গ্রাম বা শহর গড়ে তোলা সম্ভব ছিলনা।

মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম কৃষিজীবী মানুষের সংখ্যা যখন বাড়লো তখনই সেখানেই সম্ভব হয়েছে এমনি স্থায়ী গ্রাম ও শহর সৃষ্টির। ১৯৫৬ সালে এক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে জর্দানে বাইধা নামক স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে এমনি একটি প্রথম শহর– কৃষির সমৃদ্ধির কারণে যেটি গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিলো ১০ হাজার বছর আগে। এ কোন অস্থায়ী বসত নয়, বরং এর যে ৬৫টি বাড়ির ধ্বংসাবশেষ এখনো স্পষ্ট হয়ে রয়েছে তাতে স্থায়ী বসবাসের সকল চিহ্ন বর্তমান। শহরে বিন্যস্ত রয়েছে অধিকাংশ দোতলা চতুষ্কোণ এই বাড়িগুলো, আর শহরটির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে একটি বড় ভবন খুব পুরু করে চূণের পলেস্তরা দেয়া সুন্দর যার দেয়াল। এর প্রশস্ত হল্‌ঘরের মত কামরাকে মনে হয় লোক সমাবেশের উদ্দেশ্যেই গড়া হয়েছিলো। এর তৈরিতে নির্মাণ বস্তু ও শ্রমের কথা বাদ দিলেও শুধু যত খানি জায়গায় চূণের পলেস্তরা লাগানো হয়ে তা হিসেব করলে দেখা যায় অন্তত ২ হাজার কিলোগ্রামের মত চূণ প্রয়োজন হয়েছিলো, যা কলি চূণ হিসেবে লাগাবার উপযুক্ত করতে চূণা পাথর পোড়ার জন্য অন্তত ২ হাজার কিলোগ্রাম জ্বালানি কাঠের প্রয়োজন হয়েছে। এসব সংগ্রহে, আয়োজনে, এবং শ্রম দানে বাসিন্দাদের অনেককে কাজ করতে হয়েছে, নিজের নিজের ভরণ পোষণে শিকারে-সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হলে এটি সম্ভব হতো না। অন্য সব বাদ দিয়ে শুধু পলেস্তরার কথা চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে এসব আয়োজন ও নিয়ন্ত্রণ করার

মত কর্তৃপক্ষ সেখানে ছিল; সে রকম নানা কাজের জনবলও ছিল। বাইধার কাছেই পাওয়া গেছে উদ্ভিজ আঁশ থেকে কাপড় বোনার ব্যবস্থা, যার হয়তো ব্যাপক উৎপাদনও শহরবাসীর চাহিদার কারণে গড়ে ওঠ্ছিলো। মোটামুটি নগর জীবনের অনেকগুলো আলামত বাইধার ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে আন্দাজ করা সম্ভব হচ্ছে। আর সেই ১০ হাজার বছর আগে এখানেই আবিষ্কৃত হয়েছে দুনিয়ার প্রথম পূর্ণ কৃষিশস্যে পরিণত হওয়া গম, বার্লি ও রাইয়ের বীজ। একই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দুটি চেহারা– কৃষি-নির্ভর জীবিকা আর নগরায়ন।

আরো ৫ হাজার বছর পর ওই মধ্যপ্রাচ্যেই দেখা গিয়েছিলো নগরায়নের একটি অত্যন্ত উত্তুঙ্গ অবস্থা। মিশরের ফেরাউনের নগরীগুলো তার প্রাসাদ, মন্দির, পিরামিড, সড়ক, চত্বর- সে এক এলাহী ব্যাপার। হাজার হাজার মানুষ কাজ করেছে দিনের পর দিন, তারপরেই গড়ে উঠতে পেরেছে এসব। কী ভাবে সম্ভব হলো, কোথা থেকে এলো এর পেছনের সম্পদ, ফেরাউনের সোনার মুকুট, ধনরত্ন এসবও বা কোথা থেকে? সব কিছুর মূলে কৃষকের ফসল, নীল নদীর দানে যা দেদার ফলানো সম্ভব হয়েছে সীমিত সংখ্যক মানুষের পরিশ্রমে। এতে তাদেরই আহার শুধু আসেনি; যারা বাকি কাজ করছে, নগর গড়ছে, তাদেরও আহার শুধু নয়; ফেরাউনের এবং তার অভিজাত দলের খেয়ালখুশি ও বিলাসিতার খোরাকও শেষ পর্যন্ত ওই ফসল থেকেই এসেছে। শিকারি-সংগ্রাহক থেকে কৃষিজীবীতে পরিণত হতে না পারলে মানুষের এসব লাফ দেয়া সম্ভব হতোনা। এটিই যেমন রাষ্ট্র গঠন সম্ভব করেছে, তেমনি সেই রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এক রকম জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও সম্ভব করেছে। ওই জনসংখ্যা, ওই রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই এমনি চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা হয়েছে। এই সব কিছুকে আমরা বলেছি মানব সভ্যতা, এই বিশেষ ক্ষেত্রে মিশরীয় সভ্যতা। মানুষের প্রথম বৈপ্লবিক সেই পেশা বদলই একের পর এক এমন সব ঘটনা ঘটিয়েছে যে তা সেই সভ্যতার দিকে মানুষকে নিয়ে গেছে– স্থায়ী বসত, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্টি, নানা বিচিত্র কাজে দক্ষ হয়ে ওঠা, বড় সমাজের মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা, নাগরিক সুবিধা সৃষ্টি, বিচিত্র কাজের সংস্থান, নতুন নতুন উদ্ভাবন, ইত্যাদি। এরপর থেকে বহুদিন যেখানেই এমনি সভ্যতার উন্মেষ দেখা গেছে তার সঙ্গে স্থানীয় কৃষি সমৃদ্ধির সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে।

এই মধ্যপ্রাচ্যেই সেই একই সময়ে মেসোপোটেমিয়ায় (ইরাক) ছিল আরো দুর্দান্ত সব নগরী– ব্যাবিলন, উরুক, উর ইত্যাদি। ফেরাউনের নগরগুলো যদি নীল নদীর দান হয়, তা হলে এগুলো ছিল তাইগ্রীস-ইউফ্রোটিস নদীর দান। ওই

একই ফসল গম, বার্লি ও রাইয়ের কৃষি এখানকার এই নগর-রাষ্ট্রগুলো এবং পরে আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের রসদ যুগিয়েছে। শুধু যদি এখানকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথাই আলোচনায় আনি, সমসাময়িক মিশরীয়দেরকে সঙ্গে নিয়ে এখানকার মানুষ প্রাচীনতম সংখ্যা ব্যবস্থা, প্রাচীনতম গণিত, প্রাচীনতম জ্যোতির্বিদ্যা, আর প্রাচীনতম লিপির আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনের কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। প্রাচীনতম বলে নেহাত সেকেলে বা মামুলি মনে করার উপায় নেই– কারণ বিমূর্ত সংখ্যাকে সেই প্রথম মাথায় আনতে পারার মাধ্যমে ওই মেসোপোটেমিয়ান আর ওই মিশরীয়রাই আজকের উন্নত গণিতের অনেকগুলো শাখার ভিত্তি স্থাপন করেছিলো। অন্যদিকে জ্যোতির্বিদ্যার যে কাঠামো ওরা তাদের পর্যবেক্ষণ থেকে দিয়ে গেছে, এবং ক্যালেন্ডার, পঞ্জিকা ইত্যাদির উদ্ভাবন করে চাঁদ, সূর্য, গ্রহের তথ্যকে বাস্তবে ব্যবহার করার যে উপায় দিয়ে গেছে, আজো তা আমরা এক ভাবে অনুসরণ করছি। মাত্র ৫-৭ হাজার বছরের ব্যবধানে সারাক্ষণ শিকার-সংগ্রহে ব্যস্ত মানুষ এমন উচ্চ মানসিক ক্ষমতা কী ভাবে অর্জন করলো? সহজ ব্যাখ্যা হবে এসব ক্ষমতা মানুষের মস্তিষ্কে বরাবর ছিল, পেশা বদলের ফলে সেটি এখন কাজ করার সুযোগ পেয়েছে।

অন্য জায়গায়, অন্য আরেক সময়, অন্য আর এক ফসলের কৃষি গড়েছে অন্য রকম সভ্যতা। পূর্ব চীনের ইয়াং সিকিয়াং নদীর অববাহিকা একটি বিশাল অঞ্চল– এর পুরোটা ধানের কৃষিতে সমৃদ্ধ ছিল মিশর বা মেসোপোটেমিয়ার কালের আগে থেকেই। সেখান থেকে চীনা সভ্যতার শুরু। বিশাল সুশৃঙ্খল আমলাতন্ত্রের ভিত্তিতে হাজার হাজার বছর একটানা সমৃদ্ধ হয়েছে সেই সাম্রাজ্য; দিয়েছে প্রাচীন দর্শন, ধর্ম; আর সারা দুনিয়ার জন্য অনেকগুলো প্রথম উদ্ভাবন– চৌম্বক কম্পাস, জাহাজের উন্নত হাল ও পাল, বারুদ, রকেট, মুদ্রণ ব্যবস্থা, ঘোড়ার সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য তার গলায় পরাবার মত উন্নত কলার, আরো কত কি! জ্যোতির্বিদ্যায়, গণিতে মিশর ও মেসোপোটেমিয়ার মানুষ যা করেছে চীনারা তা তাদের মত করে প্রায় একই সঙ্গে করেছে।

বর্তমান মেক্সিকো সিটির কাছে সাগর ঘেঁষা আর্দ্র জায়গাতে প্রায় ৩ হাজার বছর আগের বেশ ক'টি নগর আবিষ্কৃত হয়েছে– সান লোরেঞ্জো, লা ভেন্টা, ট্রেস জাপোটেস ইত্যাদি। ওগুলোর সব ক'টিতে বিকশিত হয়েছিলো ওল্‌মেক সংস্কৃতি। প্রত্যেকটি সুন্দর সুপরিকল্পিত নগরী, কেন্দ্রস্থলে বড় বাঁধানো চত্বর, সোজা বাঁধানো সড়ক চারিদিক থেকে এখানে এসে মিলেছে। বড় বড় ভবন ও মন্দির, আর বিশাল অতিকায় সব পাথরের মূর্তি– এগুলো এ সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ

নিদর্শন; এ মূর্তি শুধু মানুষের মাথার, নিচে কাঁধ পর্যন্ত। সবকিছুর মধ্যে যা প্রকট হয়ে ওঠেছে তা হলো ভুট্টা দেবতা। এ দেবতার মূর্তি, এ দেবতার উৎসব-দিবসের আয়োজন, ইত্যাদির চিহ্ন সর্বত্র। এর কারণ ভুট্টার কৃষি ওলমেক সংস্কৃতিকে সম্ভব করেছে, এই নগর সভ্যতাকে সম্ভব করেছে। আরো আগে এই মেক্সিকোতেই বন্য ভুট্টাকে কৃষিতে নিয়ে আসা হয়েছিলো। ওলমেক সংস্কৃতির নগরগুলো এক পর্যায়ে জনশূন্য হয়ে জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছিলো, আধুনিক কালে আবিষ্কৃত হবার আগে পর্যন্ত; পুরো সভ্যতাটিই হারিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু ওলমেক সভ্যতার কিছু পরে বর্তমান মেক্সিকো সিটির আরো কাছে গড়ে ওঠেছিলো আরো সমৃদ্ধ টোয়েটিহুয়াক্যান নগরী– সেটি ওলমেক সভ্যতার ধারাবাহিকতায় এলেও তারও ছিল অনেক নিজস্ব বৈশিষ্ট, এটিও পরে হারিয়ে যায়। এখন মেক্সিকো সিটিতে ভ্রমণে গেলে পর্যটকরা এর ধ্বংসাবশেষ দেখতে যান।

এখানেই আরো কিছু পরে হ্রদের পারে এবং কিছুটা হ্রদের ওপরেই দ্বীপের মত করে অত্যন্ত সুন্দর ও সুরক্ষিত একটি নগর গড়ে তুলেছিলো আজটেক নামে পরিচিত এখানকার মানুষ। এটি কিছুটা ভিন্ন সংস্কৃতি, আজকের মেক্সিকোর বিরাট অঞ্চল জুড়ে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলো ওরা। হ্রদের ওপরের তাদের ওই অনন্য নগরীটির নাম ছিল টেনোকটিটিলান। ওতে ছিলো ওল্‌মেক কায়দায় বিশাল উঁচু ধাপ-পিরামিডের মন্দির, মাঝখানে প্রধান চত্বর যেখানে দু'তিন তলা ভবনের সারিতে রাস্তাগুলো এসে মিলিত হয়েছে। হ্রদের কারণে বাইরে থেকে আক্রমণ খুবই দুরূহ। আজ থেকে ৫০০ বছর আগে স্প্যানিশ যোদ্ধারা এসে দখল করার আগে পর্যন্ত এটি ছিল আজটেক সভ্যতার গর্বিত রাজধানী। তারপর ওই নগরটিকেই স্প্যানিশ বিজয়ীরা এবং পরবর্তী মেক্সিক্যানরা ঢেলে সাজিয়ে গড়ে তুলেছে আজকের মেক্সিকো সিটি। স্প্যানিশ বিজয়ীদের লোভ ছিল এদের দেদার সোনার ওপর। ওই সোনা এবং আরো অন্যান্য সম্পদের কল্যাণে আজটেক সম্রাট ও অভিজাতদের চাকচিক্যের অভাব ছিলনা– আর এ সম্পদ সৃষ্টি করেছিলো তাদের সাম্রাজ্যের ভুট্টা চাষীরা। ভুট্টা এবং তার সঙ্গে আরো দুটি কৃষি ফসল যা মেক্সিকোতেই বন্য থেকে কৃষিতে এসেছিলো– কুমড়া এবং শিম। সে সময় এই ভুট্টা, কুমড়া আর শিম চাষের খবর বাকি দুনিয়া জানত না; আর ওরাও বাকি দুনিয়ার কোথাও কোথাও ইতোমধ্যে কৃষিতে আসা গম, বার্লি, রাই, ধান, কলা, কচু, আখ, ইয়াম এবং আরো অন্যান্য কয়েকটির খবর জানতোনা– কারণ আজটেক সাম্রাজ্য মাত্র ৫০০ বছর আগেও

অনেকটা বিচ্ছিন্ন ছিল বাকি দুনিয়া থেকে। তেমনি বাকি দুনিয়াতে যে গরু, ছাগল, ভেড়া, শূকর, ঘোড়া, ইত্যাদি অনেক গৃহপালিত পশু রয়েছে তাও তারা জানতনা। তাদের বলতে গেলে পোষ্য কোন পশুই ছিলনা। ভারবাহী পশু না থাকার ফলে পশুতে টানা গাড়িও ছিলনা, এমনকি চাকার ব্যবহারও ছিলনা; যদিও জ্যোতির্বিজ্ঞানে, স্থাপত্যে, এবং আরো নানা জ্ঞানবিজ্ঞানে ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ওরা নিজেরাই স্বাধীন ভাবে অনেক দূর এগিয়েছিলো। ওল্‌মেকদের মত আজটেকরাও মনে করতো ভুট্টার দেবতা হলো তাদের অন্নদাতা, পরমপূজ্য।

এই যে ভুট্টা দেবতার প্রতি এমন ভাবে নত হওয়া, বলতে গেলে তাঁর মেজাজ মর্জির সম্পর্কে শংকিত থাকা মেক্সিকোর পুরো সংস্কৃতিকে ছেয়ে রেখেছিলো যেটি ব্যতিক্রমী কিছু ছিলনা। দুনিয়ার যেখানেই কৃষি ছিল সেখানেই দৈব শক্তির ওপর এমনি নির্ভরশীলতাকে ঘিরে আনুষ্ঠানিকতা, পূজা, উৎসব ইত্যাদি ছিল। এর কারণ কৃষিতে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা একদিকে কমেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতির কারণে আবার অনিশ্চয়তার অন্য রাস্তা খুলেছে– খরা, অতিবৃষ্টি, পঙ্গপাল ইত্যাদিতে। যে কোন দুর্যোগ দারুণ সব দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করতে পারতো– হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটিয়ে, এমনকি কখনো কখনো পুরা রাজ্য, পুরো সভ্যতাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে। কৃষিকে অবলম্বন করা যেন ছিল মানুষের বড় দানে পাশা খেলার মত– হয় সমৃদ্ধ নগরী, নয় দুর্ভিক্ষ ও বিলুপ্তি। কাজেই শিকারি-সংগ্রাহক মানুষের কৃষিজীবী হবার পেশা বদল সব অর্থে, সবার জন্য, সব সময় সুখকর হয়নি। তা ছাড়া যেই বড় জনসংখ্যা, নাগরিক জীবনকে আমরা নানা দিক থেকে ইতিবাচক হিসেবে দেখেছি তার নেতিবাচক দিকেরও অন্ত ছিনা। এই ঘন বসত এবং বড় জনসংখ্যা প্রথম বারের মত নিয়ে এসেছিলো ছোঁয়াচে অসুখ, সংক্রামক রোগ। সঠিক পুষ্টির অভাবও অসুখের জন্য কম দায়ী ছিলনা। সবাইকে সারাক্ষণ খাদ্য সংগ্রহের কাজে বেশি ব্যস্ত থাকতে হলেও শিকারি-সংগ্রাহকদের খাদ্যে প্রচুর বৈচিত্র ছিল– তৃপ্তি করে খাওয়া যায় এমন কোন প্রাণী বা কোন উদ্ভিদ তাদের নাগালের বাইরে ছিলনা। অথচ কৃষি জীবীরা ক্রমেই দু'একটি শস্য ও দু'একটি পোষ মানা পশু-মাংসের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল; বৈচিত্রের অভাব তাদের সুসম খাবার পাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

শিকারি-সংগ্রাহকরা ওই বিচিত্র খাবার খেতে গিয়ে নির্বিচারে পরিবেশ নষ্ট করেছে। ওরা ওদের যাযাবর জীবনে এক এক জায়গায় সব জীবের দফা রফা করে আরেক জায়গায় যেতো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। শুধু তাই নয় তাদের কারো কারো বিরুদ্ধে আজকের বিজ্ঞানীদের অভিযোগ আছে যে তারা অনেকগুলো

চমৎকার পশুর চির বিলুপ্তির জন্য সরাসরি দায়ী– বিশেষ করে প্রাচীন অতিকায় সব পশুর। নানা সাক্ষ্য-প্রমাণে অনেকেই মনে করেন উত্তর আমেরিকার ম্যাস্টাডন, ম্যামথ, বাইসন, বন্য ঘোড়া, ইত্যাদির বিলুপ্তি ঘটেছে ওখানকার মানুষের নির্বিচার শিকারের ফলে– ৫-৭ হাজার বছর আগেও এগুলো ছিল। আরো প্রাচীনকালে অস্ট্রেলিয়ার অতিকায় ক্যাঙ্গারু, অতিকায় ওয়াম্বাট ইত্যাদির বিলুপ্তি ঘটেছিলো একই কারণে। আর বরফযুগের পর ইউরোপে ম্যামথের, বন্য গরুর, বন্য ঘোড়ার ও ভালুকের একই পরিণতি হয়েছে। অন্য দিকে কিন্তু কৃষিজীবীদের দ্বারা যে পরিবেশ বিনষ্টি তার রূপ ভিন্ন প্রকৃতির, এর জন্য দায়ী প্রধানত অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ঘন বসতি; এত মানুষের চাহিদা মেটাতে অনেক প্রাকৃতিক সম্পদকে যেমন বিসর্জন দিতে হয়েছে তেমনি তাদের সৃষ্ট দূষণ ক্রমেই বেশি বেশি এলাকাকে দূষিত করেছে। এভাবেও অসংখ্য জীবের বিলুপ্তি ঘটেছে, ছোট বড় সব জীবের। কৃষি সম্প্রসারণের ফলে এই প্রক্রিয়া আজো চলছে।

কৃষিজীবীদের নেতিবাচক দিকগুলো আরো বেশি বেশি এসেছে সামাজিক দিক থেকে। শিকারি-সংগ্রাহকদের মধ্যে সংঘাত, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি ছিলনা তা বলা যাবেনা। কিন্তু বিস্তীর্ণ ভূমিতে অপেক্ষাকৃত ছোট দলের মানুষের কাছে প্রতিযোগিতার থেকে সহযোগিতাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঘনবসতির নগরে সংঘাত ও যুদ্ধের যে প্রবল প্রবণতা দেখা দিলো তা আগে ছিলনা। সাধারণ স্থানীয় অপরাধমূলক আক্রমণ ও হত্যা থেকে শুরু করে রাজ্য-সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ– এটি নাগরিক ও কৃষি জীবনের থেকেই নতুন সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য শাসন ব্যবস্থা আভ্যন্তরীণ সংঘাতকে সীমিত রাখার চেষ্টা হয়তো করেছে, কিন্তু সেই শাসক ও তার দোসররাও প্রায়ই অকারণ চরম নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে নিজেদের স্বার্থে। আমরা যদি স্মরণ করি যে মিশরের পিরামিড গড়ে উঠেছিলো হাজার হাজার দাসদের প্রতি অমানবিক আচরণের মাধ্যমে, আর মেক্সিকোর আজটেক সাম্রাজ্য-অধিপতিরা এমন সব দেবতার অধিষ্ঠান করেছিলো যে যাদের সামনে নিয়মিত ভাবে নরবলি দেয়ার রেওয়াজ ছিলো– আর বলি দেয়ার সেই হতভাগ্য মানুষগুলোও আসতো নিষ্ঠুর আক্রমণের মাধ্যমে বন্দীদের মধ্য থেকে।

মানুষের পেশা বদল সার্বিকভাবে অবশ্য পরবর্তী অগ্রযাত্রার দারুণ সুযোগ করে দিয়েছিলো, সেটি আমরা দেখেছি– তার কীর্তিতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, উচ্চতর চিন্তায় ও কাজে, আবিষ্কার-উদ্ভাবনে। কিন্তু এই পেশা বদলের ফলে সাধারণ মানুষের

জীবনে সুখ বেড়েছিলো না দুর্দশা বেড়েছিলো তা বলা মুশ্‌কিল। ছোট জায়গার ছোট কৃষক দলের ব্যক্তিগত জীবনের পরিবর্তনটি হয়তো অতটা বেশি হয়নি, ওরা নিজেদের প্রয়োজন মত কৃষিকাজ করেছে, অবসর সময়ে আগের মত শিকার-সংগ্রহও করেছে। সেদিক থেকে তাদের সন্তুষ্টি বাড়ারই কথা। কিন্তু যেখানে তাদেরকে বিশাল নগরবাসী জন্যসংখ্যার খাদ্যের জন্য রাতদিন পরিশ্রম করতে হয়েছে, রাজাকে কর দেবার শস্য যোগাতে হিমসিম খেতে হয়েছে, সেখানকার কথা আলাদা। তাদের শ্রমের ওপর নির্ভর করে অবশ্য স্তর-বিন্যস্ত নাগরিক সমাজের অন্যান্য অংশের সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ইত্যাদি ঘট্‌তে পেরেছিলো।

তা হলে কি কৃষি এনে মানুষ ভুল করেছে? সেটি কীভাবে বলা যায়? তা হলে আমরা মানুষ হলাম কেন? প্রকৃতিকে বদলিয়ে নিজের কাজে লাগাবার আকুতি ছাড়া তো মানুষের সন্তুষ্টি আসতে পারেনা। মানুষ সেটি করেছে, দারুণ আনন্দ পেয়েছে, সেটি ভুল ভাবে করে তার মূল্যও দিয়েছে; আফসোস করেছে, কখনো ভুল শোধরাবার চেষ্টা করেছে; কিন্তু প্রকৃতিকে আরো কী ভাবে বদলানো যায় সেই চেষ্টা ছাড়েনি।

পশুর পালের প্রাচীন রাখালঃ

প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন থেকে প্রথম কৃষির ও পশুপালনের খবর যেখান থেকে পাওয়া গেছে সেই মধ্যপ্রাচ্য ও তার আশপাশ থেকে মানুষের অন্য রকম এক পেশা বদলের খবরও পাওয়া গেছে– সেটি হলো রাখাল হিসেবে পশুর পাল নিয়ে যাযাবর জীবন। এই পশুগুলো সাধারণত সেই পোষ মানা পশু যেগুলো দলবদ্ধ ভাবে মানুষের তত্ত্বাবধানে চরতে পারে, যাদেরকে সহজে এক তৃণভূমি থেকে অন্য তৃণভূমিতে চারণের জন্য নিয়ে যাওয়া যায়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিক পোষমানা গৃহ পালিত না হয়েও দলবদ্ধ ভাবে থাকার স্বভাবের কারণে বন্য বা প্রায়-বন্য পশুকেও রাখালরা এভাবে চারণে নিয়ে যেতে পেরেছে– যেমন বল্গা হরিণকে। এটি একটি ভিন্ন প্রকৃতির পেশা– শিকারি-সংগ্রাহকের জীবন নয়, আবার স্থায়ী কৃষি জমির সঙ্গে বসত করা কৃষিজীবীর পেশাও নয়। যে পশু দলকে নিয়ে তাদের যাযাবর জীবন তারাই হলো এই পশুচারণ জীবিকার অবলম্বন– তাদের দুধ, তাদের মাংস, ও অন্যান্য অনেক কিছুর জন্য তাদের ওপর নির্ভর করে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো যদিও মনে হতে পারে এই পশুচারণ যাযাবর জীবনের সঙ্গে শিকারি-সংগ্রাহকের অনুরূপ জীবনের খুব তফাত নেই, আসলে কিন্তু এদের জীবন গড়ে ওঠেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায়, এবং এদেরও কারো কারো পক্ষে সম্ভব

হয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি-সভ্যতা গড়ে তোলার, এমনকি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনেরও, যা শিকারি-সংগ্রাহকদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা।

প্রাচীনতম কালের পোষমানা ছাগল ও ভেড়ার পশু চারণের নিদর্শন দেখা গেছে তুরস্কের দক্ষিণ পশ্চিমে, উত্তর সিরিয়ায়, ইরাকের পূর্ব ভাগ ও ইরানের পশ্চিম ভাগের বিস্তীর্ণ এলাকায়। এক এক জায়গায় অনেক গৃহপালিত ছাগল ও ভেড়ার হাড়ের ফসিল অন্য সব বর্জ্যের সঙ্গে বিপুল সংখ্যায় পাওয়াতেই বোঝা গিয়েছিল এখানে বড় দলে চারণের ব্যাপারটি ছিল। সেই সঙ্গে ঠিক ওই জায়গাগুলোতেই উদ্ভিদ কোষের পাথুরে অংশগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে সেখানে ভাল ঘাসের যোগান ছিল। এই অঞ্চলের পশু চারণের আর একটি বৈশিষ্ট চোখে পড়েছে– দেখা গেছে একই পশু দলের অনেকগুলোকে অনেক দূরে দূরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাতে মনে হয় এখানে পশুচারণের একটি উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন জনবসতিতে, বিশেষ করে সে সময় মধ্যপ্রাচ্যে গড়ে ওঠা অনেকগুলো নগরে, মাংসের চাহিদা মেটাতে। এটি অবশ্য অন্যান্য সব ক্ষেত্রে পশুচারণের জন্য প্রযোজ্য ছিলনা। সেখানে ওই পেশার সব পরিবারই তাদের পশুদল নিয়ে ঘুরতো এবং এক একটি তৃণভূমিতে গিয়ে অস্থায়ী আবাস গড়তো। ওখানে পশুর যত্ন নিয়ে তাদের সময় কাটতো, জীবিকাও আসতো ওই পশু থেকে। হয়তো সুবিধাজনক জায়গা হলে কিছু শিকার-সংগ্রহও চলতো।

তেমন একটি উদাহরণ দেয়া যাক। এখন আফ্রিকার নাইজার দেশটির অধিকাংশ ধূ ধূ সাহারা মরুভূমির অংশ– তার গোবেরো অঞ্চলটি সহ। আট হাজার বছর আগে এটি ছিল একটি সমৃদ্ধ তৃণভূমি- অবশ্য বেশ কিছু দিন ধরে ওখানে চল্‌ছিলো পর্যায়ক্রমে উদ্ভিদ সমারোহ আর খরায় উদ্ভিদ শূন্যতার কাল। এমনি দুটি কালের মাঝের সময়ে শিকারি-সংগ্রাহক জীবন কঠিন হয়ে উঠলে তখন গরুচারণ হয়ে পড়েছিলো গোবেরো অঞ্চলের মানুষদের বড় পেশা। আফ্রিকার উত্তর পূর্ব অঞ্চলে মধ্যপ্রাচ্যের কাছের জায়গাগুলোতে এই জাতীয় গরুগুলোকে গৃহপালিত গরুর প্রজাতিতে পরিণত করা হয়েছিলো এর প্রায় হাজার দুয়েক বছর আগে। গোবেরোর কাছাকাছি অঞ্চলের মানুষরা ঘাসের ও পানির ভাল যোগান পেলে সেখানেই তাদের গরুর পাল নিয়ে অস্থায়ী বসত গড়ে তুল্‌তো। প্রধানত গরুর দুধই ছিল তাদের খাদ্য, কালেভদ্রে অবশ্য গরুর মাংসও। নেহাত প্রয়োজন না হলে পালের গরুকে তারা জবাই করতোনা; তবে এর একটি বড় ব্যতিক্রম ছিল বছরের বিশেষ সময়ে সবগুলো দল যখন গোবেরোতে এসে একত্র হতো। সঙ্গে পশুদলকে তো আনতোই, তাছাড়া আনতো ইতোমধ্যে তাদের যারা মারা

গেছে তাদের দেহাবশেষ। গোবেরোতে ছিল তাদের বিশাল কবরখানা, যেখানে ওই দেহাবশেষকে স্থায়ীভাবে কবর দেয়া হতো। সেই উপলক্ষে হতো বড় ভোজ ওই নিজেদের পালের গরুর মাংস দিয়ে। ওই ভোজে অংশ নেয়াটিও ছিল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একটি অংশ। গোবেরোতে মানুষের বসতের চিহ্নের অনুপাতে অনেক বেশি মানুষের হাড়গোড় খুঁজে পাওয়াতেই সব জায়গায় মৃত সব মানুষের কবরখানা যে এখানে তা বোঝা যাচ্ছে। আবার সেই অনুপাতে অনেক বেশি গরুর হাড়ও এক সঙ্গে একই জায়গায় পাওয়াটি ভোজের ইঙ্গিত দেয়। বোঝা যাচ্ছে যে পশুচারণ ওদের জন্য শুধু একটি জীবিকাই ছিলনা, একটি সংস্কৃতিরও অংশ ছিল।

আফ্রিকার নানা অংশে এরকম অনেক পশুচারণকারী মানুষ বিভিন্ন সময়ে ছিলো, এখনো আছে। এদের কারো কারো গোষ্ঠিগত জেনেটিক পরিচয় প্রাচীন কাল থেকেই আলাদা, যা পশুচারণের পরিবেশের মাধ্যমেই আলাদা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আজকের কেনিয়ার মাসাই গোষ্ঠি এবং নাইজেরিয়ার ফুলানি গোষ্ঠির সম্পর্কে একথা বলা যায়। অনেক কাল আগে থেকেই গরু চারণই তাদের পুষ্টির উৎস ও সামাজিক সমৃদ্ধির প্রধান উপাদান। এর ফলে ওরা পশু মনস্তত্ত্বের অনেক কিছু নিজেরা আবিষ্কার করে তার সুযোগ নিতে পারছে। যেমন ফুলানিরা লক্ষ্য করেছে তাদের পালের গোদা গরুরা কী ভাবে হবু প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর চোট্‌পাট করে অন্যদেরকে বশে আনে এবং দুর্বলদেরকে ভয়ে তাদের অনুসরণে বাধ্য করে। সেটির অনুকরণে ফুলানিরা নিজেরাই ওভাবে চোটপাট করে নিজেই ওই গরুর মত 'পালের গোদা' হয়ে বসে, ও দলের সব পশুকে তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য করে। এরকম গো-চারণকারী কেনিয়ার মাসাইরা তাদের পুষ্টির জন্য যতটা না গরুর মাংস ও দুধের ওপর নির্ভর করতো, তার চেয়েও বেশি নির্ভর করতো জীবন্ত গরুর তাজা রক্তের ওপর। বিশেষ ধমনী কেটে এভাবে রক্ত ওরা এমন ভাবে সীমিত পরিমাণে নিয়ে পান করতো যে তাতে আসলে গরুর তেমন কোন ক্ষতিই হয়না। এখনো স্থান বিশেষে এই অভ্যাস চালু আছে।

মানুষের প্রধান জীবিকাগুলো প্রকৃতির ওপর তার প্রভাব রেখেছে এটি আমরা দেখেছি। পশুচারণও তার ব্যতিক্রম নয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলটির অতিরিক্ত মরুকরণটি একটি আলোচ্য বিষয়। সাহারার দক্ষিণে সাহেল অঞ্চলটি কিছুকাল আগেও একটি সমৃদ্ধ তৃণভূমি ছিল। কিন্তু দেখা গেছে এখানে পশুচারক মানুষের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে এ তৃণভূমির ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত ভেড়া ও ছাগল এখানে চরানো হয়েছে। ফলে পরবর্তী ঘাস জন্মানোর

ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে; তাছাড়া ভূমি যথেষ্ট পানিও ধারণ করতে পারেনি। এসবের ফলে এটি সাহারার সঙ্গে একাকার হয়ে মরুতে পরিণত হবার উপক্রম হয়েছে। কিন্তু অতীতে ভূমির উর্বরতার ক্ষেত্রে পশুচারণ বরং বেশি ইতিবাচক প্রভাব রাখতে দেখা গেছে। পরিমিত পশুচারণই তার কারণ। পশুর বর্জ্য ও হাড়ে প্রচুর নাইট্রোজেন সার তো থাকেই তাছাড়া ভূমি উর্বরতার জন্য প্রয়োজনীয় ফসফরাস, ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম যথেষ্ট থাকে। পশুচারণ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে এগুলো জমার ফলে এর উর্বরতা প্রায় ক্ষেত্রেই ভাল বজায় থেকেছে এবং বৃদ্ধিও পেয়েছে।

ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে পশুচারণের সঙ্গে জিনের পরিবর্তন ও কিছু সামাজিক আচরণের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে। কেনিয়া ও টানজানিয়ায় একই সঙ্গে পাওয়া সাড়ে তিন হাজার বছর আগের ৪৯ জন মানুষের প্রাচীন ফসিল থেকে ডিএনএ পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। তাদের মধ্যে পশুচারণ ও শিকারি-সংগ্রাহক এই দুই পেশার কিছু বৈশিষ্ট আছে এমন জিন পাওয়া গেছে। একই গবেষণায় ওখানকার স্থানীয়দের এবং ওই জায়গার উত্তরের মধ্যপ্রাচ্য ও সুদান অঞ্চলের বর্তমান মানুষেরও ডিএনএর আনুসঙ্গিক অংশ পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে বোঝা গেছে হাজার চারেক বছর আগে মধ্যপ্রাচ্য ও সুদান হয়ে কিছু পশু-চারক মানুষ ওই কেনিয়া-টানজানিয়ায় অভিবাসী হয়েছিলো। বর্তমানে এসে স্থানীয় ও অভিবাসীদের মধ্যে জেনেটিক মিশ্রণ যেমন ঘটেছে তেমনি তারা পরস্পরের থেকে শিখে ভিন্ন জীবিকায়ও অভ্যস্ত হয়েছে– পশুচারকরা শিকারি-সংগ্রাহক হয়েছে, আর শিকারি-সংগ্রাহকরা পশুচারক হয়েছে। কিন্তু ওই সাড়ে তিন হাজার বছর আগের ৪৯ জন মানুষের ফসিলের ডিএনএ পরীক্ষায় দেখা গেছে ওই সময়ের অভিবাসী জিন যাদের আছে তাদের জিনে পশুচারক পেশার বৈশিষ্ট আছে। আর স্থানীয় জিন যাদের আছে তাদের জিনে শিকারি-সংগ্রাহক পেশারই শুধু বৈশিষ্ট আছে। উভয়ের মধ্যে কোন মিশ্রণ দেখা যায়নি– না জিন-মিশ্রণ, না পেশা-মিশ্রণ। এর মানে অভিবাসীরা আসার পরের ওই ৫০০ বছর এমন কিছু সামাজিক দূরত্ব স্থানীয়দের সঙ্গে সৃষ্টি করা হয়েছিলো যে উভয়ের মধ্যে জিন-মিশ্রণ এবং পরস্পরের পেশা নেয়াটি সম্পূর্ণ অবৈধ ছিল। স্পষ্টত পরের কয়েক হাজার বছরের কোন সময় গিয়ে ওই অবৈধতার নিয়ম আর ছিলনা। বোঝা যাচ্ছে জিন-মিশ্রণের ব্যাপারে যেমন, তেমনি পেশা মিশ্রণের ব্যাপারে কখনো কখনো মানুষ যথেষ্ট সংবেদনশীল ছিল। আধুনিক কালেও মিশ্রণে এমন অনীহা

কোন কোন সমাজে যে দেখা যায়নি তা নয়, কিন্তু সাধারণ ভাবে মানব ইতিহাসে সব সময় মিশ্রণের প্রবণতাই ছিল, অন্য রকম নয়।

দশ হাজার বছর আগে প্রথম পশুচারকদের দেখা পাওয়ার পর থেকে আজ অবধি বিচিত্র পশুচারক গোষ্ঠির মানুষ দেশে দেশে দেখা গেছে– কেউ ছোট একটি বিশেষ জাতি হিসেবে, অন্যরা আবার বিস্তীর্ণ জায়গায় বিশাল জনগোষ্ঠি হিসেবে। যে পশু চরানো হয় তার বৈচিত্রও কম নয়। আফ্রিকার গরু চারণ, মধ্যপ্রাচ্যে ভেড়া ও ছাগল চারণ আমরা দেখেছি। পূর্ব এশিয়ায় ও নিউগিণিতে শূকর চারণ যথেষ্ট ছিল। আরব বেদুঈনরা মরুদ্যান থেকে মরুদ্যানে চরিয়েছে উট, তিব্বতের শীতল মালভূমিতে চরানো হয় লম্বা লোমে ঢাকা চমরী গাই বা ইয়াক– এই সবগুলো পশুকে এর আগে গৃহপালিততে পরিণত করা হয়েছে। মঙ্গোলিয়ার যাযাবর মানুষরা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে ওখানকার বিস্তীর্ণ সমতলে এক তৃণভূমি থেকে অন্য তৃণভূমিতে ঘোড়া, ভেড়া, এবং দুই কূঁজওয়ালা বাকটেরিয়ান উট চরিয়ে বেড়িয়েছে। ওখানকার রুক্ষ জীবন, ঘোড়ার গতি ইত্যাদিই হয়তো তাদেরকে বেপরোয়া যোদ্ধা করে তুলেছিল; হালাকু খান, চেঙ্গিস খান, কুবলাই খান, তৈমুর লং প্রমুখ ইতিহাসের দুর্দান্ত ও কোন কোন ক্ষেত্রে চরম নিষ্ঠুর সব দিগ্বীজয়ী যোদ্ধা-সম্রাটদের নেতৃত্বে। ওরা একদিক থেকে ইরাকে বাগদাদ, ভারতে দিল্লী, চীনে উত্তর চীনকে আক্রমণ করে ধ্বংস করেছে; অন্য দিকে চীন সাম্রাজ্যে নিজেদের সমৃদ্ধ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেছে। মঙ্গোলরা এদিক থেকে ব্যতিক্রমই বলতে হবে, কারণ বেশির ভাগ পশুচারকরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় গোষ্ঠি।

আগেই দেখেছি কোন কোন চারণ পশু গৃহপালিত নয়। সুইডেন, ফিনল্যান্ড, রাশিয়ার একেবারে উত্তরে মেরু অঞ্চলে সামি, ইনুইট ইত্যাদি পশুচারক মানুষরা বল্গা হরিণের পাল নিয়ে এক এক মৌসুমে এক এক দিকে যায়– শীতে বনে, আবার গ্রীষ্মে খোলা জায়গায় বরফ-গলা ভূমিতে চরাতে। এই বল্গা হরিণ পোষা না হলেও তাদের ঝাঁকে থাকার এবং ঝাঁকে চলার অভ্যাস এই ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। এরকম কিছু কিছু পশুর ঝাঁকে চলার অভ্যাস বন্য অবস্থাতেই গড়ে ওঠে– হিংস্র প্রাণী থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে। বল্গা হরিণ শীতে বনে থাকে, তখন শরীরে খাদ্যের প্রয়োজন কমিয়ে ফেলে, ওখানে লাইকেন নামের ক্ষুদ্র মস্ উদ্ভিদ খেয়ে কাটায়। গরমে অবশ্য বরফ-গলা পানিতে ঘাস, মাশরুম ইত্যাদি যথেষ্ট পায় খোলা সমভূমিতে। তাই এ ভাবে দুই জায়গার মধ্যে যাতায়াত করে চলাটি তাদের প্রবৃত্তি। পশুচারকরা এর সুযোগ নেয়। জীবিকার জন্য বল্গা হরিণের মাংস, চামড়া, শিং ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে উত্তরের এই মানুষরা।

মধ্যএশিয়ার কিরগিস্তান ও অন্যত্র কিরগিজরা শীতে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ছাগল, উট, ইয়াকের পাল নিয়ে তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান ও চীনের অপেক্ষাকৃত দক্ষিণের সমতলে কাটায়– এখানে শীত কম বলে তখনো কিছু ঘাস-উদ্ভিদের সাক্ষাত মেনে। গরমের সময় অবশ্য আরো উত্তরে উচ্চ ভূমিতে বরফ গলার পর নতুন ঘাসের যে সমারোহ তার সুযোগ নিতে সেই পার্বত্য এলাকায় পশুদলকে নিয়ে যায়। সুইজারল্যান্ডে আল্পস পর্বত অঞ্চলের পশুচারকরাও গরু ও ভেড়ার পালকে শীতে পর্বতের নিচে নামিয়ে আনে। শীত কেটে গেলে অবশ্য এদেরকে পর্বতের ঢালে সবুজ জায়গায় আবার নিয়ে যাওয়া হয়। এভাবেই পশুচারণের জীবিকা দেশে দেশে মানুষের জীবনে বিভিন্ন মৌসুমি অভ্যাস গড়ে তুলেছে। তাদের উৎসব, তাদের সংস্কৃতি, তাদের সামাজিকতা, পারিবারিক উদযাপন সবই এই নিয়মে আবর্তিত হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে এখনো হচ্ছে।

এই গন্তব্যে মানুষ

আফ্রিকার অভিবাসীরা এ তল্লাটে

অস্পষ্ট অতীতঃ

সত্তর হাজার বছর আগে যারা সমুদ্রের ধার ঘেঁষে দক্ষিণাপথে আফ্রিকা ছেড়েছিলো তারা যে শিগ্‌গির ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে পৌঁছে সেখানে বসত সৃষ্টি করেছে এমন প্রমাণ আছে, কিন্তু প্রমাণগুলো খুব ব্যাপক নয়। ভারতে এই অভিবাসনের কিছু প্রমাণ মিলেছে আজকের মানুষের ডিএনএ বিশ্লেষণে, আর বাকিটা দক্ষিণ ভারতের কিছু কিছু জায়গার জ্ঞানীদের উপযুক্ত পাথুরে হাতিয়ার থেকে, যা আফ্রিকায় থাকা তাদের হাতিয়ারের থেকে খুব আলাদা নয়। ডিএনএ পরীক্ষায় অভিবাসন অনুসরণে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে আফ্রিকা থেকে সমুদ্রতীর ধরে এসব মানুষ ভারত হয়েই বার্মা, থাইল্যান্ড, মালয়ের উপকূল ঘেঁষে ৫০ হাজার বছরের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছে গিয়েছিলো, এর মধ্যে তাদের একটি বড় অংশ দক্ষিণ ভারতে থেকে গিয়েছে। পূর্ব দিকে তাদের অভিবাসন পথ যে চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে বা কাছে দিয়ে যাওয়ার কথা সেটিও বোঝা যায়। কিন্তু সমস্যা হলো সেই ৭০ হাজার বছর আগে থেকে মাত্র ১৫-২০ হাজার আগে পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের মানুষের ফসিল ও তার বসতের অন্যান্য স্বাভাবিক জিনিসের চিহ্ন সহ মানুষের জীবন যাপনের কোন সরাসরি নিদর্শন খুঁজে এই ভারতের কোথাও পাওয়া যায়নি। অথচ এ সময় মধ্যপ্রাচ্যে, ইউরোপে এবং আরো কিছু কিছু জায়গায় এমনি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের যথেষ্ট প্রাচুর্য দেখা গেছে। যা পাওয়া গেছে তা হলো বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু হাতিয়ার; পারিপার্শ্বিক অন্য কিছু না থাকাতে এগুলোর বয়স নির্ণয় করা দুরূহ হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাতিয়ারকে মনে হয়েছে এগুলো জ্ঞানী মানুষের আফ্রিকা থেকে আসারও দু'তিন লক্ষ বছর আগের। তাতে কেউ কেউ মনে করেন সেই আফ্রিকার জ্ঞানীরা এসে দক্ষিণ ভারতকে একেবারে জনশূন্য বিরান অবস্থায় পায়নি, অন্যরকম মানুষ আগে থেকেই এখানে ছিলো। মানুষের ফসিল খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে এই যে ব্যর্থতা তাতে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে ভারতের মধ্য প্রদেশের নর্মদা নদীর অববাহিকায় হাতনোরা নামের জায়গাটি। এখানে প্রাচীন মানুষের পায়ের একটি হাড়, হাতের একটি বাহুর হাড়, আর কাঁধের একটি হাড় পাওয়া গেছে যা ৭৪

হাজার বছর আগের। হাড় দেখে মনে হচ্ছে এগুলো জ্ঞানীর হাড় নয়, প্রায়-জ্ঞানী বা অন্য কোন রকম মানুষের হতে পারে। তেমনটি যদি হয় তা হলে পরে আফ্রিকা থেকে আসা মানুষদেরকে দক্ষিণ ভারতে সাবধানে এগোতে হয়েছে– কারণ ওখানে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ ইতোমধ্যেই ছিল। তবে ওই পূর্ববর্তীদের আর কোন নিশানা পরে পাওয়া যায়নি। নতুন আসা জ্ঞানীদের পাথরের হাতিয়ার এখানে ওখানে পাওয়া গিয়েছে; এমনকি চট্টগ্রামে এবং তার আশেপাশেও পাওয়া গেছে। অবশ্য এর অনেকগুলোর বয়স সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যায়নি, তাই এই অতীত অস্পষ্টতায় ভরা।

এই অস্পষ্টতা কেটেছে মাত্র ১০-১২ হাজার বছর আগের ইতিহাসে এসে তখনকার ভারতবর্ষের পরিপূর্ণ মানব বসতের বিভিন্ন নিদর্শন নানা জায়গায় আবিষ্কার হতে থাকার মাধ্যমে। ইতোমধ্যে বরফের যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে হিমালয়ের হিমবাহগুলো উত্তর ভারত থেকে পশ্চাদপসরণ করেছিলো, কাজেই সারা ভারতে মানুষের ছড়িয়ে পড়ার পথে কোন বাধা আর ছিলনা। এমন মানব বসতের ভাল নির্দশনের কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

যেই গঙ্গা বাংলার দিকে ওই প্রাচীন কাল থেকে বয়ে এসেছে তারই প্রবাহের মাঝামাঝি জায়গায় ভারতের এলাহাবাদ শহর। তার কাছাকাছি দমদমা, মহাদহ, সরাই নগর রাই এই তিনটি ছোট ছোট গ্রাম– এই তিনটিতেই আলাদাভাবে ১১ হাজার বছর আগের মানব বসতের স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া গেছে। বিশেষ করে দমদমার প্রত্ন এলাকায় পর পর থামের খুঁটির গর্ত থেকে ওখানকার বাড়িগুলোর বিন্যাসটি স্পষ্ট বোঝা যায়। ওখানে স্তরে স্তরে বিভিন্ন গভীরতায় পাওয়া গেছে নানা সময়ের বসত থেকে অনেক টুকরা টুকরা খাওয়া পশু হাড়, অন্য কাজে ব্যবহৃত পশু হাড়, পাথরের হাতিয়ার ইত্যাদি পাওয়া গেছে। ল্যাবোরেটরিতে এখানকার এবং অন্য দুটি জায়গার একই রকম বসতের সব পশু হাড় বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ৭৭% হাড়ই স্তন্যপায়ী বন্য প্রাণীর; বাকি সব সরীসৃপ পাখি ও মাছের। সব চেয়ে বেশি পাওয়া গেছে বন্য শূকরের। একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি হলো বান্দিকূট নামের বিশেষ জাতের ইঁদুরের হাড়– যেই ইঁদুরই নিয়মিত ভাবে মানুষের ফেল্‌নার ওপরেই শুধু বেঁচে থাকতে পারে, অন্য কিছুর ওপর নয়। এর থেকে বোঝা যায় যে ওখানে মানুষের দীর্ঘস্থায়ী বসত ছিল। একই ব্যাপারে আর একটি প্রমাণ হলো এখানে বসতবাড়িগুলোর সঙ্গেই অনেকগুলো সযত্নে দেয়া কবরের সন্ধান পাওয়া গেছে।

অন্যান্য অনুসন্ধান থেকে সে সময় ওখানকার ভূপ্রকৃতি ও বন্য পশু ইত্যাদির কিছুটা ধারণা পাওয়া গেছে। জায়গাটিতে বন ও বন্য পশু সমৃদ্ধ ছিল এবং একই ভাবে সমৃদ্ধ ভূমি নেপালের তরাই অঞ্চল পর্যন্ত চলে গিয়েছিলো। এ কারণেই শিকারি-সংগ্রাহক হয়েও এখানে মানুষ গ্রাম রচনা করে স্থায়ী ভাবে বাস করতে পেরেছিলো। তবে ওই পুরো অঞ্চলের কোথাও হাতিয়ার তৈরির মত পাথর ছিলনা, এ পাথর তাদের কাউকে কাউকে নিয়মিত দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতের কাছে গিয়ে আন্‌তে হয়েছে। এটি একটি বিপদ সংকুল দীর্ঘ পথ, গঙ্গা পেরিয়ে যেতে হতো। তবে মনে হয় কিছু মানুষ একাজে দক্ষ ছিল, এবং একেই পেশা হিসেবে নিয়েছিলো। আর বাইসনের হাড় এবং হাতির দাঁতের মত বড় বড় পশুজাত দ্রব্য দিয়ে তাদের যে হাতিয়ার তা বলে দিচ্ছে তখন হিমালয়ের কাছাকাছি জায়গার বড় পশুগুলো তরাই অঞ্চল হয়ে এক এক মৌসুমে তাদের কাছে চলে আসতো, তবে এ দ্রব্যগুলোও নানা জায়গায় খুঁজে সংগ্রহ করতে হতো, খুব সম্ভবত স্বাভাবিক ভাবে মৃত পশুর মৃতদেহ থেকে। বোঝা যাচ্ছে শিকারি-সংগ্রাহক জীবনের মধ্যেও ওখানে একটি বহুমাত্রিক স্থায়ী সমাজের সূচনা হয়েছিলো।

এর প্রায় হাজার বছরের পরের আর একটি বসতের নিদর্শনগুলো কিন্তু যতটা না পাওয়া গেছে সত্যিকারের হাড় বা হাতিয়ার থেকে, তার থেকে বেশি পাওয়া গেছে ওখানকার বাসিন্দাদের আঁকা ছবি থেকে। ভারতের মধ্য প্রদেশের ভূপাল নগরটির কাছে একটি বিরান পাহাড়ি জায়গায় পাহাড়ের শিলা-দেয়ালে আঁকা আড়ালে থাকা ছবিগুলো দৈবক্রমে চোখে পড়ে গিয়ে জনৈক প্রত্নতত্ত্ববিদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ভীমবেতকা নামের এই জায়গাটিতে এরপর আবিষ্কৃত হয় ১০ হাজার বছর এবং তারো কিছু আগের মানুষের প্রচুর গুহা-বসত। এখানে ৬-৭ কিলোমিটার ধরে পর পর ৭টি পাথুরে পাহাড়ের খোপেখাপে রয়েছে ৭৬০টি গুহা আর শিলা-আশ্রয়, যার অনেকগুলোতে পাওয়া গেছে মানুষের বসতের চিহ্ন এবং কিছু কিছু শিলা আশ্রয়ের দেয়ালে ওই ছবিগুলো। রঙীন মাটির সরল রেখাচিত্রেই বেশির ভাগ ছবি আঁকা, সঙ্গের অন্যান্য নিদর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে এবং আরো নানা কৌশলে ছবিগুলোর প্রাচীনত্ব বোঝা গেছে। এতে স্পষ্ট হয়েছে ১০ হাজার বছর আগের এখানে বাস করা মানুষদের শিকার, উৎসব, নানা জীবজন্তুর সঙ্গে সম্পর্ক, দৈনন্দিন নানা কাজে স্ত্রী-পুরুষের ভূমিকা ইত্যাদি। অদ্ভুত ব্যাপার হলো অধিকাংশ ১০ হাজার বছর আগের হলেও অল্প কিছু ছবি দেখা যাচ্ছে যেগুলো বয়স নির্ণয়ে আরো পেছনের কালে যেতে হয়– এমনকি কয়েকটি ৩০ হাজার বছর পর্যন্ত; যদিও এক্ষেত্রে বয়স নির্ণয়ে অনিশ্চয়তা বেশি। আবার মাত্র

৫-৬ হাজার বছর আগে আঁকা ছবিও পাওয়া গেছে– এ রীতিমত পরিবর্তিত যুগের ছবি; এতে দেখা যাচ্ছে মানুষ ধাতুর তৈরি তলোয়ার নিয়ে, ঘোড়ার পিঠে বা হাতির পিঠে চড়ে যুদ্ধ করছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে এই গুহাগুলো ধারাবাহিক ভাবে দীর্ঘকাল ধরে মানব-বসতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ওই ৫-৬ হাজার বছর আগের বসত থাকলেও ওর মধ্যে শিকারি-সংগ্রাহক জীবনের বাইরে কৃষি বা অন্য কোন জীবিকার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি– না ছবি থেকে, না কোন নিদর্শন থেকে।

চট্টগ্রামকে যদি আমাদের বর্ণনার গন্তব্য ধরি তা হলে তার আরো কাছের জায়গার অতীতকে খোঁজ করলে সময়ের দিকে অত আগের কিছু পাওয়া যায়না। মধ্য প্রদেশ বা উত্তর ভারতের গঙ্গা অববাহিকার তুলনায় এদিককার ভূপ্রকৃতি অপেক্ষাকৃত নবীন, মাটি নরম, আর গভীর জঙ্গলে আবৃত; বড় আকারের মানব বসত যেমন এখানে কঠিন ছিলো, প্রাচীন নিদর্শন বেশি স্থায়ী হওয়াটাও কঠিন। তবুও এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে, কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে, রাজশাহী-বগুড়ার বরেন্দ্র ভূমিতে কিংবা পশ্চিম বঙ্গে বর্ধমান ঘেঁষা কিছু জায়গায় তখনকার মানব বসত আন্দাজ করা যায়। অতি স্বল্প কিছু নিদর্শন যে চট্টগ্রামের একেবারে কাছে থেকে পাওয়া যায়নি তা নয়, কিন্তু এগুলোর বয়স সঠিক ভাবে নির্ণয় কোনটির ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে রাঙ্গামাটিতে পাথরের ছোট আঁচড়ানি জাতীয় হাতিয়ার পাওয়া গেছে যা যথেষ্ট প্রাচীন হতে পারে। বসতের অন্য কোন নিদর্শনের কাছাকাছি না হওয়াতে এটি কি ওখানকার, না কোন কারণে স্থানান্তরিত হয়ে ওখানে এসেছে বলা মুশ্‌কিল। তৈরির ভঙ্গিতে এটি নব্য প্রস্তরযুগের, অন্তত ৪-৫ হাজার বছর পুরানো হতে পারে। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি ফসিল পাথরে পরিণত কাঠের তীক্ষ্ণ হাতিয়ারের মত জিনিস পাওয়া গিয়েছে যাকেও নব্য প্রস্তর যুগের বলে আন্দাজ করা যায়, আরো উত্তরে ফেনীর ছাগলনাইয়াতে ওই সময়ের মনে হতে পারে এমন পাথরের আঁচড়ানি পাওয়া গেছে। তবে কোন অকাট্য প্রমাণ নেই যে এগুলো ওসময়েই তৈরি ও ব্যবহৃত হয়েছে; কারণ এমনি হাতিয়ার এর পরেও ব্যবহারে ছিল। অন্যান্য বেশ কিছু নিদর্শনের সঙ্গে না পেলে, মানুষের বসতের ইঙ্গিত না থাকলে, সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন। তবে আর একটি পাথুরে পাহাড়ি জায়গা অথচ ভীমবেতকার মত এত দূরে নয় এমন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়নি যে ওখানে ৭-৮ হাজার বছর আগে স্পষ্ট মানব বসত ছিল। এটি হলো পশ্চিম বঙ্গের একেবারে সংলগ্ন ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যার কিছু জায়গা জুড়ে ছোট

নাগপুরের পাহাড়। এ অঞ্চলে রাঁচি, চকরাধাপুর, সম্পলপুর, আঙ্গুল– এই ক'টি জায়গায় ও সময়ের মানব বসত আবিষ্কার হয়েছে। প্রধানত অজয় ও সুবর্ণরেখা এই দুটি নদী অববাহিকা জুড়ে এই বসত। এমনকি এখানকার ঘাটশিলা নামক জায়গায় ভীমবেতকার ছবিগুলোর মত দেখতে শিলা দেয়ালে কিছু ছবিও আবিষ্কৃত হয়েছে। ছোট নাগপুর থেকে চট্টগ্রামের দিকে যত আসি বিচ্ছিন্ন ভাবে পাথরের হাতিয়ার নানা জায়গায় পাওয়া গেছে, যদিও এমন পারিপার্শ্বিকতায় নয় যাতে করে ছোট নাগপুরের মত ৭-৮ হাজার বছর আগের বলে দাবী করা যাবে। পশ্চিম বঙ্গে বাঁকুড়ায়, বীরভূমে, বর্ধমানে; বাংলাদেশের মহাস্থানে এমন হাতিয়ার পাওয়া গেছে।

নিশ্চিত কালের নিশ্চিত মানুষঃ

সাড়ে তিন হাজার বছরের মত সময় আগেকার থেকে যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আমাদের গন্তব্যের কাছাকাছি জায়গায় পাওয়া গেছে সেগুলোই শুধু নিশ্চিত কালের নিশ্চিত মানুষের বলে বিবেচনা করা যায়। কারণ তখন থেকে জিন, জীবনধারা, ভাষা প্রায় সবদিক থেকে এ অঞ্চলের মানুষকে আমরা কিছুটা বৈজ্ঞানিক ভাবে চিহ্নিত করতে পারছি। এদিক থেকে পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার অজয় নদীর অববাহিকায় পাণ্ডু রাজার ডিবি নামে পরিচিত প্রত্নস্থলটি একটি অনন্য সাক্ষ্য। কার্বন ডেইটিঙের মত আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে সব কিছুর কাল নির্ণয় করে নিদর্শনগুলোর সঠিক পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে পারাতেই এটি সম্ভব হয়েছে। এখানকার নানা স্তরে পাওয়া নিদর্শনগুলো ৩,৫০০ বছর থেকে ২,৯০০ বছর আগের। এখানে পাথরের হাতিয়ারের সঙ্গে ধাতুর হাতিয়ারও পাওয়া গেছে (তামা ও লোহা)। তবে আরো বড় কথা হলো কবর দেয়া মানুষের ফসিল কঙ্কালও পাওয়া গেছে– যা এ অঞ্চলের প্রত্ন-প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিরল ঘটনা। এখানকার মানুষের সাংস্কৃতিক দিকটি সব চেয়ে ভাল ভাবে ধরা পড়েছে এখানকার বৈশিষ্টময় কালো-লাল পটারি হাঁড়ি এবং তার ওপরের নক্‌শা থেকে। এ অঞ্চলের মানুষের ব্যবহারে পোড়া মাটির পটারি হয়তো আরো আগে থেকে ছিলো, কিন্তু এই প্রথম সেটি স্পষ্ট দেখা গেলো, এটি সংস্কৃতির চিহ্ন হিসেবে ধরা পড়লো। ওই নক্‌শাগুলো খুবই বিশিষ্ট, প্রধানত দুটি মোটিফ– একটিতে রয়েছে কালো উজ্জ্বল হাঁড়ির ওপর সাদা সারস পাখি যার ঠোঁটে সাপ অথবা কেঁচো; অন্যটিতে মাছের সারি। আর রয়েছে পোড়া মাটির সীল ও ছোট মূর্তি। সীল মোহরের নক্‌শাগুলো বেশ নান্দনিক; এর মধ্যে একটি গ্রীসের ক্রীট দ্বীপের

সুপরিচিত সীলের নক্‌শার সঙ্গে এত বেশি মেলে যে অনেকে মনে করেন সেখান থেকেই এর মূল মোটিফটি পাওয়া গিয়েছিলো। হাড়ের এবং ধাতুর তৈরি ছোট ছোট জিনিসগুলো বেশ ব্যতিক্রমী– হাড়ের সূঁচ, তামার পিন, তামার ঝুড়ি, তামার বড়শি, ইত্যাদি; তাছাড়া লোহার ছুরি, তলোয়ার, বর্শা ইত্যাদিও।

বাড়ির যে চিহ্নগুলো পাওয়া গেছে পাণ্ডু রাজার ডিবিতে তাতে মনে হয় প্রথমে প্রথম দিকেরগুলো নেহাত কুঁড়েঘর হলেও পরের দিকেরগুলোতে মাটির প্রলেপ দেয়া নল্‌খাগড়ার দেয়াল ব্যবহার করা হয়েছে। এখানকার বসতের পরিবেশ, হাতিয়ার সবকিছু মেলালে বোঝা যায় দেরিতে হলেও ইতোমধ্যে এই অঞ্চলে কৃষির পেশা এসে গেছে; এবং আমরা পরে দেখবো কী ভাবে বাইরের কৃষিজীবী মানুষের অঞ্চল থেকে কিছুটা প্রভাব, কিছুটা সরাসরি অভিবাসনের মাধ্যমে এখানকার শিকারি-সংগ্রাহক জীবনে কৃষির প্রবেশ ঘটেছিলো।

আরেকটি এরকম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল যেখান থেকে প্রায় ও সময়ের থেকে জিন, জীবনধারা ও সংস্কৃতির ভাল আভাস মিলেছে তা হলো বগুড়ার মহাস্থানগড়। এখানে প্রায় ২৪০০ বছর আগে থেকে মাত্র ৭০০ বছর আগের ধারাবাহিক বসতের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানে অবশ্য আমরা এর শুরুর দিকটাতেই বেশি আগ্রহী। এটি একটি নগর সভ্যতারই বসত– পোড়া ইটের স্থাপনা, সুরক্ষিত প্রাচীর, পোড়ামাটির ফলক, মূর্তি, অলঙ্কার সবই তা নির্দেশ করে। এমনকি বাড়ির ছাদের সুনির্মিত পোড়ামাটির টালিও। সবচেয়ে পুরানো যা পাওয়া গেছে তা হলো তার বিশেষ ধরণের পটারির ভাঙ্গা টুকরা– এগুলো উত্তরের কালো পালিশ করা হাঁড়ি হিসেবে বেশি পরিচিত, খুব সম্ভব উত্তরের গঙ্গা অববাহিকা থেকেই এর চলন এসেছে।

মহাস্থানের সম্পর্কে আগের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় মনে করা হতো এই নগর সভ্যতা নিশ্চয়ই রাতারাতি গড়ে ওঠেনি। এর নিশ্চয়ই অন্তত কয়েক হাজার বছরের পূর্ব ইতিহাস আছে, তখন নগর না হয়ে কুঁড়েঘর জাতীয় বসতের গ্রাম হওয়াতে পরে সেগুলো বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু সর্বশেষ আধুনিক গবেষণায় এই ধারণা বাতিল হয়ে গেছে। ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় বোঝা গেছে যে ২৪০০ বছর আগে নগর সভ্যতার পত্তন হবার ঠিক আগে পর্যন্ত ৫-৬ হাজার বছর ধরে এই অঞ্চল বিপুল পানি প্রবাহ ও পানি সঞ্চয়ের আওতায় ছিল। ওই অবস্থায় কোন ধরণের জনবসতির সম্ভাবনা ওখানে ক্ষীণ। আসলে বদ্বীপে গড়া পুরো পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি মোটামুটি এরকমই ছিল, খুব উচ্চ ভূমিগুলো বাদ দিলে। এখানে ব্যাপক মানব বসত ৩ হাজার বছর বা তার থেকে কিছু বেশি সময়ের

থেকে অধিক পুরানো নয়। কিন্তু তেমনি মানব বসত ও সংস্কৃতি বরাবর তার ধারে কাছেই ছিল সেটি আমরা দেখেছি। আমাদের গন্তব্য চট্টগ্রাম অন্তত ৭-৮ হাজার বছর ধরে তাদের বসতের মধ্যে না থাকলেও তাদের যাতায়াতের মধ্যেই ছিল এটি আন্দাজ করে নেয়া যায়। এর তুলনামূলক ভূমি উচ্চতা এবং সাগর তীর ঘেঁষে এর যাতায়াত সুবিধা, সেদিক থেকে সহায়কই হবার কথা। তবে সমস্যা হলো ওরা কেউ চিহ্ন রেখে যায়নি।

ওই মানুষের পরিচয়

এখন কোথায় পাব তারেঃ

যে কোন মানুষকে দেখিয়ে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তিনি কোন্ গোষ্ঠির বা কোন্ জাতি-সত্তার, কিছু না জেনেই চোখ বুঝেই যে জবাবটি দিতে পারবো তা হলো তিনি বহু জাতি-সত্তার নানা পূর্বপুরুষের একটি মিশ্রণ, এক শব্দে তাঁর গোষ্ঠিগত পরিচয় দেয়া যাবেনা। আমাদের গন্তব্যের যে মানুষদের কথা একটু আগে বললাম তারা কোন ব্যতিক্রম নয়। মানুষের মধ্যে যে কোন সুযোগে ক্রমাগত জিন মিশ্রণ ঘটেছে। আমাদের ওই মানুষরা আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে চলে এসেছে নিশ্চিত ভাবেই ৬০ হাজার বছর বা তারো আগেই, কিন্তু আমরা সত্যিকার অর্থে আমাদের গন্তব্যে তাদের উপস্থিতি অনুভব করছি মাত্র গত সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। এর পরের মিশ্রণগুলো তাই আমাদের কাছে কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে; কিন্তু আগের ওই দীর্ঘ সময়েও যে মিশ্রণ ঘটেনি তা বলা যাবেনা। এই যে নানা দিকের কিছু কিছু নতুন জিন প্রবাহ ওদের মূল জিন প্রবাহের সঙ্গে মিশেছে, তা সত্ত্বেও মূলত ওই মানুষগুলো কোন্ গোষ্ঠির এ প্রশ্নটি তার অর্থ হারিয়ে ফেলেনি। আফ্রিকা থেকে দক্ষিণাপথে আসা মানুষগুলো ভারতে আসতে আসতে, আর এখানে থাকতে থাকতে জেনেটিক দিক থেকে মূল একটি গোষ্ঠি-চরিত্র তো লাভ করেছিলো, যার সঙ্গে পরে অন্য মিশ্রণগুলো ঘটেছে। প্রশ্নটি হলো সেই মূল গোষ্ঠি-চরিত্রটি কী? এখনকার অধিকাংশ বিশেষজ্ঞরা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বাসিন্দাদের সঙ্গে আজকের যে সব মানুষের জেনেটিক মিল সব থেকে বেশি দেখেন তারা হলো আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে 'ছোট আন্দামান' নামের দ্বীপটির বাসিন্দা ওঙ্গোদের সঙ্গে। কারণ তাঁদের গবেষণা দেখিয়েছে যে সাম্প্রতিক বহু হাজার বছর ধরে ওঙ্গোদের সঙ্গে অন্য কোন গোষ্ঠির তেমন কোন জিন মিশ্রণ ঘটেনি, কাজেই আজকের তাদের মধ্যে আমরা আমাদের মূল পূর্বপুরুষদেরকে পাই। অবশ্য এই ওঙ্গোদের যারা এখন অবশিষ্ট আছে তাদের

সংখ্যা একশ'র বেশি নয়। বঙ্গোপসাগরের মাঝে এই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ মূল ভারতীয় ভূখণ্ড বা অন্য যে কোন জায়গা থেকে অনেক দূরে বলেই বৃটিশ আমলে 'বিপজ্জনক' রাজবন্দীদেরকে কালাপানির দেশ বলে কথিত ওখানকার কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হতো। ওই একই বিচ্ছিন্নতার কারণেই ওখানকার আদিবাসীরা অন্যদের থেকে এমন আলাদা থাকতে পেরেছে। পরে আগন্তুক লোকসংখ্যা বাড়লেও তারা কারো সঙ্গে না মিশে নিজেদের জিন-সমগ্রকে অবিমিশ্র রেখে দিয়েছে। তাদের এই অবিমিশ্রতাটি ওঙ্গেরা ছাড়াও আন্দামানের সব আদিবাসীদের মধ্যেই অনেকটা রয়েছে– বড় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের জারাওয়া এবং রাটল্যান্ড দ্বীপের জাঙ্গিলরা সহ। নিজেদের মূল জিন-সমগ্র নিয়ে পুরো আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এরকম প্রায় চারশ' মানুষ সাম্প্রতিক গণনায় পাওয়া গেছে।

আমাদের আদিতম গোষ্ঠির স্বরূপ দেখতে আমাদেরকে কি তা হলে ওই আন্দামানে যেতে হবে? হ্যাঁ তুলনামূলক ভাবে সেটিই আদর্শ কাজ হবে। তবে এতদূর না গিয়েও আজকের বাংলাদেশে এবং ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যায় যথেষ্ট সংখ্যায় যে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, শবর, ভূমিজ এই আদিবাসীরা রয়েছে তাদের মধ্যেই ওই আদিতম জেনেটিক ভিত্তিটি অনেকটা খুঁজে পাওয়া যায়। ব্যাপক জেনেটিক জরিপে দেখা গেছে আন্দামানের ওঙ্গোদের সবার মধ্যে, ওখানকার বাকি আদিবাসীদের প্রায় সবার মধ্যে, এবং ওই সাঁওতাল- মুণ্ডা আদিবাসীদের খুব বড় অংশের মধ্যে মাইটোকোনড্রিয়াল ডিএনএ'তে একটি বৈশিষ্ট সূচক 'মার্কার' দেখা যায় যাকে বলা যায় হ্যাপলোগ্রুপ M। এটি আজকের আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যেও যথেষ্ট দেখা যায়, আবার মালয়েশিয়ার সিমাং আদিবাসীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে রয়েছে। আরো বড় কথা হলো আজকের দক্ষিণ এশিয়া অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের মধ্যে সাধারণ ভাবে এটিই সব চেয়ে বেশি পাওয়া যাওয়া মার্কার– অন্তত শতকরা ৬০ ভাগ মানুষের মধ্যে। এর অর্থ হলো উপমহাদেশের সকল মানুষের একই মূল পূর্বপুরুষরা এই মার্কারটি বহন করতো। আজকের ওঙ্গেদের মধ্যে, অন্য আন্দামানীদের মধ্যে, এবং সাঁওতাল-মুণ্ডা-ওঁরাওদের মধ্যে এটি ব্যাপকভাবে থাকার কারণ ওই পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সব চেয়ে বেশি সাদৃশ্য তাদেরই, আর আফ্রিকা থেকে আসার সময়েই ওটি তারা বহন করেছে। যারা ভারত ছাড়িয়ে আরো এগিয়ে গিয়ে মালয়, ইন্দোনেশিয়ায় গিয়েছিলো আজকের সিমাংরা তাদের সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত, তাই মার্কারটি ওখানকার সিমাংদের মধ্যেও বেশি দেখা যায়। এভাবে আজকের মানুষদের ডিএনএ বিশ্লেষণ আমাদের

পূর্বপুরুষদের মূল গোষ্ঠিটি দেখিয়ে দিচ্ছে; ওই সাড়ে তিন হাজার বছর বছর আগের, বা ৭-৮ হাজার বছর আগের, অথবা ৩০-৪০ হাজার বছর আগের, এমনকি ৬০ হাজার বছর আগের সেই পূর্বপুরুষকে মোটের ওপর তার চেহারায়, তার বৈশিষ্টে দেখতে চাইলে কাদের দিকে তাকাতে হবে তা বলে দিচ্ছে।

অতীতে নৃতত্ত্ববিদরা মানুষের দেহাবয়ব, চেহারা, মাথার খুলির আকৃতি ইত্যাদির নিরিখে নানা জাতি, গোষ্ঠিতে ভাগ করেছেন– ককেশয়েড, অস্ট্রেলয়েড, মঙ্গোলয়েড, নেগ্রোয়েড ইত্যাদি। আজকাল ওই বিভাজনগুলো অচল হয়ে গেছে। এখন ডিএনএ মিশ্রণে নানা মার্কারের ভিত্তিতে কে কোথায় পড়ে তা দেখা হয়, গড়পড়তা একটি মোটামুটি বিভাজনের জন্য। তবুও বোঝার সুবিধার জন্য আমরা– ইউরোপীয়, ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, অস্ট্রেলীয়, আফ্রিকান ইত্যাদি জাতিসত্তার কথা বলতে পারে। এখানে অস্ট্রেলীয় কথাটির মানে কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী নয়, শব্দটির অর্থ দক্ষিণ দেশীয়– বলা যায় শুরুতে দক্ষিণাপথে আসা মানুষগুলো দক্ষিণ ভারতে, ইন্দোনেশিয়ায়, নিউগিণিতে, অস্ট্রেলিয়ায় যারা গিয়েছিলো তারাই অস্ট্রেলীয়; সেদিক থেকে আমাদের ওই আদিতম পূর্বপুরুষরা অস্ট্রেলীয়। আজকের আন্দামানীরা, সাঁওতাল-মুণ্ডা-ওঁরাওরা অনেকটা বিশুদ্ধভাবে অষ্ট্রেলীয়। আর ভারতীয় উপমহাদেশের সবার মধ্যে ওই অস্ট্রেলীয় প্রকৃতিটিই সব থেকে বেশি উচ্চকিত, তার কারণ এর পরের বিভিন্ন জিন-মিশ্রণ সত্ত্বেও ওই আদি জিনের প্রাধান্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে রয়ে গেছে; এই গন্তব্যে আমরাও তার ব্যতিক্রম নই।

ভাষা দিয়ে প্রাচীন নিজেদেরকে চেনাঃ

আদিতম পূর্বপুরুষের সঙ্গে সব থেকে বেশি মিল আজকের যাদের মধ্যে রয়েছে, তাদেরও জিন মিশ্র প্রকৃতির, কারণ এতগুলো বছরে তাদের জিনও বদলেছে, অন্য জিন-মিশ্রণ ঘটেছে, এমনকি সেই একেবারে বিশুদ্ধ আদি যাদের বলেছি সেই আন্দামানীদের ক্ষেত্রেও তা কিছুটা ঘটছে। অনেক আগের এমন মিশ্রণের ঘটনার একটি সাক্ষী হলো অস্ট্রোএশিয়াটিক ভাষা-পরিবারের মানুষের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে ওদের ভাষার পরিবর্তন আসা। ভাষার পরিবর্তনটি ওই মিশ্রণের খবরটি সর্ব প্রথম আমাদেরকে দিতে পেরেছে। অবশ্য আরো সম্প্রতি ডিএনএর মাধ্যমেও খবরটি স্পষ্ট হয়েছে। এখন সাঁওতাল, মুণ্ডা, শবর এরা যে ভাষায় কথা বলে তা সবই একই ভাষা-পরিবারের অংশ, আবার অনেক দূরের অনেকগুলো ভাষাও এই একই ভাষা-পরিবারের। লক্ষ্য করা গেছে যে বহুকাল যাদের মধ্যে

ভাষার মিল বেশি, জেনেটিক দিক থেকেও ওরা প্রায় অভিন্ন। যেমন মুণ্ডাদের ভাষা মুণ্ডারিতে যারা কথা বলে তাদের চেহারা, দেহাবয়ব এবং জেনেটিক মিল, যারা প্রায় একই গোষ্ঠির হয়েও মুণ্ডারিতে কথা বলেনা, তাদের থেকে বেশি। কাজেই ওই মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল, শবর সবার ভাষা খুব কাছাকাছি, এবং এগুলো অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠির মাধ্যমে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার মোট ১৬৯টি ভাষার সমগোত্রের– এমনটি হলে ওই এতগুলো সমগোত্রের ভাষায় কথা বলা মানুষের সঙ্গে তাদের জিনের কিছু সম্পর্ক থাকবে এটিই স্বাভাবিক। ওরা প্রধানত ভিয়েৎনাম, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, বার্মা, ও বাংলাদেশের, এবং ভারতের কিছু অঞ্চল- ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, উত্তর পূর্ব অঞ্চলের রাজ্যগুলো, মধ্য প্রদেশ– এসবের আদিবাসী; অস্ট্রোএশিয়াটিক কথাটির মানেই হলো দক্ষিণ এশীয়। এই বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে ভাষার এমন মিলটি সম্পর্কে যে গবেষণা হয়েছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে দক্ষিণ চীন অঞ্চলের মানুষেরা এই ভাষার প্রাচীনতম রূপে কথা বলতো। সেখান থেকে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে এরকম মানুষের ক্রমাগত অভিবাসন ঘটার ফলে ওই বিস্তৃত অঞ্চলে তাদের জিন ও তাদের ভাষা ছড়িয়ে পড়েছিলো। এই মিশ্রণের আগে আমাদের আদিবাসী পূর্বপুরুষের একটি বৈশিষ্ট বিবেচনা করি যা হলো ছোট ছোট কোঁকড়ানো কালো চুল। এখনো কোন কোন আদিবাসীর বিশেষ করে আন্দামানী আদিবাসীদের চুল ঠিক ওরকম রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশদের ক্ষেত্রে এটি বদলে গিয়ে চুল কিছুটা লম্বা ও খাড়া হয়েছে ওই অস্ট্রোএশিয়াটিক ভাষা ভাষী মানুষদের জিন-মিশ্রণের ফলে। ফলে আমরা এখানকার বর্তমান সাধারণ অধিবাসীদের, এমনকি অনেক আদিবাসীরও চুল কোঁকড়ানো নয়, খাড়া। এখানকার মূল আদিবাসীরা ছিল খুব বেঁটে– আন্দামানে যেমন এখনো আছে। কিন্তু ওই মিশ্রণের ফলে তারা অনেকটা দীর্ঘকায় হয়েছে এখন। ওই অস্ট্রোএশিয়াটিক ভাষার একটি শাখার প্রকৃতিটি বাকি শাখার থেকে আলাদা– ওটি চীনা ভাষা, ভিয়েৎনামিজ ভাষার মত ধ্বনির খাদের (তীক্ষ্ণতার) ওঠানামার সঙ্গে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায়। ভাষার এই চরিত্রটিকে বলা হয় টোনালিটি, আর এটি সাধারণত আজকের সিনোটিবেটান নামে পরিচিত ভাষা-পরিবারে দেখা যায়– বর্মী, চীনা, থাই, ভিয়েৎনামিজ ইত্যাদি ভাষা যার মধ্যে রয়েছে। আমাদের দেশের খাসিদের ভাষা এই শাখার অন্তর্গত; তাছাড়া জিন মিশ্রণে ওরা ওই রকম ভাষাভাষীর মঙ্গোলীয় প্রকৃতিটিও নিয়ে এসেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও খাসিদের ভাষা মুণ্ডারির মতই আরেকটি অস্ট্রোএশিয়াটিক ভাষাও বটে এবং উভয়ের মধ্যে

যথেষ্ট সাযুজ্য রয়েছে। এই দুই ভাষার অনেক শব্দই একই রকম। কাজেই আদিবাসীরা আমাদের যে পূর্বপুরুষদের প্রতিনিধিত্ব করছে তাদের মধ্যে মঙ্গোলীয় মিশ্রণটিও রয়েছে, এবং বিশেষ করে চট্টগ্রামের মত পূর্বাঞ্চলীয় জায়গাগুলোর ক্ষেত্রে এটি বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

কাজেই একদিকে আমরা ভাষার মিশ্রণকে জিনের মিশ্রণের সঙ্গে একতালে চল্‌তে দেখেছি, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমও দেখছি। যেমন দেখলাম মুণ্ডারি ও খাসি ভাষা একই গোষ্ঠির দুই শাখা– উভয়ের মধ্যে অনেক মিল; অথচ খাসিরা মঙ্গোলীয় জিনে বেশি সমৃদ্ধ, মুণ্ডারা সাঁওতাল ও অন্যান্যদের মত অস্ট্রেলীয় জিনে। এর আরেকটি উদাহরণ দেয়া যায় ওঁরাওদের নিয়ে। সিলেটের চা শ্রমিকদের মধ্যে অনেক ওঁরাও রয়েছে যাদেরকে বৃটিশ আমলে চা বাগানে কাজ করার জন্য দক্ষিণ ভারত থেকে আনা হয়েছিলো। ওঁরাও ভাষা অন্য দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার মত দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের অন্তর্গত, মুণ্ডারির মত অস্ট্রোএশিয়াটিক নয়। কিন্তু জিন প্রাধান্যের দিক থেকে ওঁরাওরা মুণ্ডাদের মতই অস্ট্রেলীয়।

কাজেই চার হাজার বছর আগের বা তারো আগের চট্টগ্রামের ও আশপাশের মানুষেরা কারা এ প্রশ্নের জবাব যেইটুকু দেয়া যায় তা হলো ওরা শুরু করেছিলো পুরো ভারতবর্ষের মানুষেরই আদি জেনেটিক ভিত্ অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠির মানুষ হিসেবে; যাদেরকে সাঁওতাল-মুণ্ডাদের মধ্যে আমরা এখন কিছুটা দেখি, অথবা আরো ভাল দেখি আন্দামানীদের মধ্যে। কিন্তু শিগ্‌গির তাদের সঙ্গে জিন মিশ্রণ ঘটেছিলো অস্ট্রোএশিয়াটিক ভাষা ভাষী মানুষের যারা দক্ষিণ চীন থেকে ভিয়েৎনাম, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, বার্মা হয়ে এদিকে এসেছিলো। তারা সেই আদি পূর্ব পুরুষের ভাষাকে বদলিয়েছে, জিনের মাধ্যমে চেহারা এবং অবয়বও কিছুটা বদলিয়েছে। তাদের একটি শাখা মঙ্গোলীয় জিন এবং চীন-বার্মা-ভিয়েৎনামের ভাষার টানটিও এখানে নিয়ে এসেছে, যেই টান আজকের খাসিদের মধ্যে স্পষ্ট দেখলেও অন্যদের মধ্যে যে একেবারে নেই তা মোটেই বলা যাবেনা, বিশেষ করে চট্টগ্রামের মানুষের মধ্যে। আজকের আমাদের ভাষার অসংখ্য 'দেশি' শব্দ তখনই, এই ভাবেই, এসেছে– বাংলায় তো বটেই, চাটগেঁয়েতে আরো বেশি। চাটগেঁয়ে ভাষার মধ্যে টোনালিটি অর্থাৎ ধ্বনির ওঠানামার সঙ্গে শব্দের অর্থ পরিবর্তনটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এসব আমরা পরে দেখবো। কিন্তু এই সব ছিল মিশ্রণের শুরু মাত্র– মিশ্রণের তখনো আরো অনেক বাকি।

বড় অভিবাসনে বড় মিশ্রণ

জিনের মিশ্রণ, জীবিকার মিশ্রণ

এই তল্লাটে কৃষির প্রথম স্বাক্ষরঃ

ছোট নাগপুরের পাহাড়ে, পাণ্ডু রাজার ডিবিতে অথবা মহাস্থানে পরিপূর্ণ মানব বসতের প্রথম সাক্ষ্য যখন পাচ্ছি তখন পুরোপুরি কৃষিজীবী হয়ে না উঠলেও কৃষি ওখানে অপরিচিত ছিলনা। কিন্তু সে তো মাত্র তিন বা সাড়ে তিন হাজার বছর আগের কথা। ইতোমধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেক পানি গড়িয়ে গেছে, ভারত-বর্ষের কোথাও কোথাও জীবিকা হিসেবে কৃষি বহু আগেই চালু হয়ে গেছে। তবে এটি ঠিক যে কৃষি এখানে যথেষ্ট দেরিতে এসেছে, শিকারি-সংগ্রাহকের জীবনেই যেন তারা চিরতরে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো– তাই ভীমবেতকায় যেখানে ৪-৫ হাজার বছর আগের আঁকা ছবি পাওয়া যায়, তখনো সেখানে কৃষির কোন চিহ্ন দেখা যায়না। অথচ মধ্যপ্রাচ্যে কৃষি উদ্ভাবন হয়ে চালু হয়ে গিয়েছিলো তার ৫-৬ হাজার বছর আগেই এবং কৃষি সম্প্রসারণের সেই ঢেউ ভাতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তে বর্তমান ইরান-আফগানিস্তানে চলে আসতে তারপর বেশি দেরি হয়নি; কিন্তু শুধু ওই পর্যন্তই, ভারত অবধি তা পৌঁছেনি।

কিন্তু এর একটি বড় ব্যতিক্রমের সন্ধান পাওয়া গেছে মোটামুটি সাম্প্রতিক কালে, ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে মেহেরগড় নামক জায়গায় সাড়ে আট হাজার বছর প্রাচীন কৃষি সমৃদ্ধ বসত আবিষ্কারের মাধ্যমে। এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে সেই সময় থেকে ৫ হাজার বছর আগের সময় পর্যন্ত দীর্ঘ সময় জুড়ে পর পর কৃষি সমাজের বসতগুলো উদ্ঘাটিত হয়েছে। বোলান নদীর তীরের ওই জায়গাটি পর্বত থেকে বরফ গলা পানির সেচে বেশ সুজলা সুফলা থাকতোই মনে হয়েছে। বিভিন্ন যুগের বাড়ির চিহ্নের সঙ্গে মাটির তৈরি দেয়ালের প্রকৃতি নিদর্শনও এতে পাওয়া গেছে যার সঙ্গে উঠোন, হেঁশেলের চুলা, হাতিয়ার, পশুর হাড় ইত্যাদিও পাওয়া গেছে। এর বিশ্লেষণে স্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে হাজার বছর ধরে চলা কৃষি জীবিকার। পরাগ রেণুর বিশ্লেষণ জানিয়ে দিয়েছে যে ওখানে গম ও বার্লির কৃষি-প্রজাতিরই চাষ হতো; তবে পাশাপাশি এর বন্য রূপেরও চাষ হতো একই জায়গায় রোপন করে। আর হাড়ের বিশ্লেষণ জানিয়ে দিয়েছে তিনটি গৃহপালিত পশু ছাগল, ভেড়া ও গরুর নিয়মিত ও সমৃদ্ধ পশুপালন ওখানে চালু

ছিল। এগুলোর প্রজাতি মূলত কোথা থেকে এসেছে এ নিয়ে দুটি মত আছে। একটিতে মনে করা হয় যে মূল গৃহপালিত পশুগুলো পশ্চিমের দেশগুলোতে ইতোমধ্যে চালু থাকা পশু পালন থেকে আনা হয়েছে। কিন্তু অন্য মত হলো স্থানীয়ভাবে থাকা ছোট বন্য ছাগল ও স্থানীয় বন্য জেবু গরুকে অনেক দিন ধরে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত প্রজাতিতে পরিণত করা হয়েছে– এগুলো একান্তই ভারতীয়। সেটি হতে পারে, তবে পশ্চিমের সঙ্গে যোগাযোগটিও খুব স্পষ্ট। এমন কিছু রত্নপাথরের অলঙ্কার এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেছে, যেগুলোর একমাত্র সম্ভাব্য উৎস হতে পারে উত্তর আফগানিস্তান অথবা ইরানের সুদূর জায়গায়। মেহেরগড়ে আবিষ্কৃত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো ওখানকার কবর– যাতে মৃতদেহের কঙ্কালের সঙ্গে পাওয়া গেছে নানা রকম সুন্দর হাতিয়ার, অলঙ্কার এমনকি পোষা ছাগলের কঙ্কাল।

ওই কবরের কোন কোন কঙ্কালের হাড়ের ডিএনএ অবিকৃত ভাবে পাওয়ায় তার বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে। ডিএনএ'র চিহ্নগুলো আজকের ওখানকার স্থানীয় মানুষদের এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের আজকের মানুষের ডিএনএর সঙ্গে তুলনা করে বোঝা গেছে যে আজকের স্থানীয় বাসিন্দারা মেহেরগড়ের সেই মানুষদের বংশধর নয়; বরং তাদের বংশধর বলে মনে হচ্ছে আজকের দক্ষিণ ভারতের মানুষরা। পরবর্তী ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের সঙ্গে এবং ভাষা তাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে এর একটি অর্থ দাঁড়ায়। মেহেরগড়ের সমাজ প্রায় ৫ হাজার বছর আগে কোন দৈব দুর্বিপাকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সময় এখানকার মানুষ দক্ষিণ ভারতে অভিবাসী হয়েছিলো। ওরাই দক্ষিণ ভারতের আজকের দ্রাবিড় জনগোষ্ঠির একটি বড় উপাদান; এবং দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলেগু, মালায়লাম ইত্যাদি ভাষার যে দ্রাবিড় ভাষা পরিবার তার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে মেহেরগড়কে কেন্দ্র করে তৎকালীন বেলুচিস্তান অঞ্চলের ভাষা। এজন্য ওই মানুষ আর ওই ভাষাকে আমরা আদি-দ্রাবিড় বলতে পারি।

কিন্তু মেহেরগড়ের ওই মানুষরা যারা পরে দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলো তারাই বা কোথা থেকে এসেছিলো– তারা কি নিতান্তই মেহেরগড়েরই মূল বাসিন্দা? ডিএনএ ও অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণে বোঝা যাচ্ছে– তা নয়। পশ্চিমের ওই পুরানো কৃষিজীবীদের কিছু মানুষ এখানে এসেছিলো এবং তারা স্থানীয়দের সঙ্গে এখানে তাদের জিন-মিশ্রণ ঘটিয়েছিলো ওদেরকে কৃষি জীবিকা শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে। এই মিশ্রণ এক প্রজন্মে ঘটেনি হাজার বছর ধরে বার বার ঘটেছে। কাজেই যে আদি-দ্রাবিড় দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলো তারা একটি মিশ্র জিনের মানুষ–

ভারতবর্ষের সেই মূল আদিবাসী এবং এখানকার আফগানিস্তান-ইরান অঞ্চলের কৃষিজীবীদের মধ্যে মিশ্রণ। আর এই আদি দ্রাবিড় শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতেই দীর্ঘ মেয়াদে দ্রাবিড় গোষ্ঠির এবং দ্রাবিড় ভাষার প্রতিষ্ঠা করলেও শুরুতে বহুদিন এই দ্রাবিড় জিন ও দ্রাবিড় ভাষা পূর্ব ভারতে– বাংলায়, ঝাড়খন্ডে, উড়িষ্যায়– বিস্তীর্ণ জায়গায় বিস্তার লাভ করেছিলো, যদিও শেষ পর্যন্ত তাদের প্রাধান্য সেখানে ছিলনা। দ্রাবিড় মানুষ ও দ্রাবিড় ভাষার আদি ভূমি বেলুচিস্তানের বর্তমান একটি উপজাতি ব্রাহুই; এখনো ওরা এমনি দ্রাবিড় ভাষা ব্রাহুইতে কথা বলে; আফগানিস্তান এবং ইরানেও কেউ কেউ বলে। পশ্চিমের ওই মিশ্রণ আদি-দ্রাবিড় ও দ্রাবিড় রূপে আমাদের গন্তব্যেও নতুন মিশ্রণ ঘটিয়েছে সেই ৫ থেকে ৩ হাজার বছরের মধ্যে। তাই দ্রাবিড় জিন ও দ্রাবিড় ভাষা হলো আমাদের এখানকারও একটি বড় মিশ্রণ।

পাণ্ডুরাজার ডিবিতে অথবা মহাস্থানে আমরা যে কৃষিজীবীদের দেখেছি তারা শুধু সেই মূল আন্দামানী বা মুণ্ডা বা সাঁওতাল গোষ্ঠির আদিবাসী ছিলনা– না জিনের দিক থেকে, না ভাষার দিক থেকে। তাদের সঙ্গে প্রথমে মিশেছিলো উত্তর পূর্ব দিক থেকে আসা অস্ট্রোএশিয়াটিক ভাষাভাষী মানুষের জিন আর অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা। তাদের মধ্যে অস্ট্রেলীয় জিনের মানুষ যেমন ছিল তেমনি ছিল মোঙ্গলীয় জিনের মানুষ, ভাষার মধ্যেও এই দুই শাখার প্রতিনিধিত্ব ছিল। তারপর এসে মিশেছে আদি-দ্রাবিড় মানুষের জিন আর আদি-দ্রাবিড় ভাষা; যেই জিন আর ভাষায় মেশানো ছিল মেহেরগড়ের সভ্যতার আদিবাসীর এবং পশ্চিমের অর্থাৎ সে সময়ের আফগানিস্তান-ইরানের কৃষিজীবীদের জিন আর ভাষা। মেহেরগড় সভ্যতা বিলুপ্ত হওয়ার পর তার কাছাকাছিতেই গড়ে ওঠেছিলো হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগর ভিত্তিক সিন্ধু সভ্যতা। এটিও ছিল সমৃদ্ধ কৃষিকে ভিত্তি করে ব্যবসা, ধর্ম, বহির্বাণিজ্যে গড়া একটি উঁচু দরের সভ্যতা। অনেকে এর মধ্যে মেহেরগড়ের ছায়া দেখতে পেলেও গবেষণায় বোঝা গেছে ওরা পরস্পর সম্পর্কহীন। তা ছাড়া দ্রাবিড় সভ্যতায় বা ভাষায়ও সিন্ধু সভ্যতার অবদান তেমন প্রতিষ্ঠিত নয়। এখনো মনে হয় সিন্ধু সভ্যতা ওখানে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা– উল্কার মত এসে দারুণ উচ্চ সংস্কৃতির সৌকর্য দেখিয়ে কেমন ভাবে যেন একদিন হারিয়ে গিয়েছিলো তেমন কোন উত্তরসূরিকে স্পষ্ট ভাবে না রেখে।

ধানের কৃষি এবং কৃষির ভাষাঃ

পশ্চিমের কৃষিজীবীর অভিবাসন মেহেরগড়ের শুরু থেকেই ঘটেছিলো, আর তার ঢেউ এসে লেগেছিলো আমাদের কূলে বহু পরে ৫ হাজার বছর আগে আদি-দ্রাবিড়দের মাধ্যমে। কিন্তু তারো কিছু পরে, হয়তো অস্ট্রোএশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠির আসারও পর উত্তর পূর্ব দিক থেকেও আবারো একটি অভিবাসন ঘটেছিলো। এবার অভিবাসনটি ছিল চীন ও বার্মার মঙ্গোলীয় জিনের মানুষের, তারা এসেছে উত্তর পূর্ব ভারত হয়ে। কিন্তু তাদের সংস্কৃতির প্রধান অংশ ছিলো ধানের কৃষি; যে কৃষির জন্মই হয়েছিলো চীনে। এই কৃষি সাদরে গৃহীত হয়েছিলো এখানকার আদি-দ্রাবিড় সংস্কৃতিতে। আদি-দ্রাবিড় যখন পরে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠির দ্রাবিড় সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে তখন সেখানেও ধানের কৃষির বিস্তার ঘটেছে। তবে তার প্রথম শুরু এই বাংলায়। মঙ্গোলীয় গোষ্ঠির এই অভিবাসনে বাংলার পূর্বাঞ্চলে চট্টগ্রাম ও তার আশপাশে জিন প্রবাহও কম আসেনি। তবে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো পূর্বাঞ্চলের এখানকার কৃষির চরিত্রটাই পশ্চিমের অভিবাসনে আসা কৃষির থেকে ভিন্ন রূপ লাভ করেছে– এই গন্তব্যে আবহমান কাল থেকে আমরা কৃষির এই রূপটি দেখে আসছি। ছিপছিপে জমা বৃষ্টির পানিতে ধানের ছিটা, ধানের রোপার যে দৃশ্য চীনে, বার্মায়, থাইল্যান্ডে বরাবর দেখা গেছে এখানেও সেই দৃশ্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু যদি আমরা পশ্চিমে একটু দূরে যাই ঝাড়খণ্ডে, বিহারে, উত্তর প্রদেশে সেখানে মেহেরগড়ের কৃষি পূর্ণ রূপ পেতে পারেনি, চীন বার্মা থেকে আসা কৃষি তো নয়ই। সেখানকার ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুতে বরং গমের সদৃশ কিন্তু রুক্ষ আবহাওয়ায় চাষ সম্ভব সেই জোয়ার, বজরা ইত্যাদি শস্যকে কৃষিতে আনা হয়েছে। কিন্তু বাংলায় তো বটেই এখানকার আদি-দ্রাবিড় সভ্যতার কল্যাণে পুরো দক্ষিণ ভারতে ধানের কৃষি সংস্কৃতির চমৎকার বিস্তার পেয়েছে।

অস্ট্রোএশিয়াটিক ভাষা গ্রহণ করা আদিবাসী, পশ্চিম থেকে নতুন অভিবাসী আদি-দ্রাবিড়দের ভাষা, ধানের কৃষি নিয়ে পূর্ব দিক থেকে আরো নতুন অভিবাসী, সব মিলে যে সংস্কৃতি সেদিন তৈরি হয়েছিলো আজ তার সব চেয়ে স্থায়ী চিহ্নগুলো আমরা খুঁজে পাব কৃষির উপকরণে এবং সেগুলোকে প্রকাশের শব্দগুলোতে। পরবর্তী কালে আসা অনেক শব্দের ভিড়ের মধ্যেও আমাদের একান্ত ভাষায় দেশি শব্দ হিসেবে এগুলো টিকে আছে; শুধু টিকে নেই অনেকটা যেন অন্তরঙ্গ ভাবেই আছে। এর কারণ কৃষি যখন প্রবর্তিত হয়েছিলো তা এতই আপন ভূবনের কাজ ছিল যে সেদিন যেই ভাষা আমাদের মুখে ছিল কৃষির

কথাগুলো সেই ভাষাতেই স্থায়ী হয়ে গেছে। এটি অবশ্য শুধু কৃষির ক্ষেত্রে নয়, অন্য অন্তরঙ্গ ক্ষেত্রেও ঘটেছিলো– যেমন বউ, খোঁপা, ছুটি, চুলা, ঘুম এই শব্দগুলো তাদের অন্তরঙ্গতার কারণেই আমাদের ভাষায় আজো কথায় কথায় ব্যবহৃত হচ্ছে, যদিও এগুলো ওই তখনকারই প্রাচীন দেশি শব্দ।

কৃষির মূল যে হাতিয়ার সেই লাঙ্গল শব্দটি অস্ট্রোএশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠির মুণ্ডারি দিকের শাখা থেকে এসেছে; যে কারণে সাঁওতালিতে এটি নাহেল, রাজবংশিতে নাঙোল। খুব সম্ভব মুণ্ডারি-সাঁওতালি ইত্যাদি ভাষা যখন এখানে আদি-দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে মিশছিলো তখনই এটি দ্রাবিড় ভাষা-পরিবারে চলে যেতে পেরেছিলো; তাই তামিল ভাষায় এটি নাঞ্চিল এবং কানাড়ায় নেগল। নৌকার গতির দিক ঠিক রাখার জন্য যে হাল ধরা হয় সেই হাল শব্দটিও অস্ট্রোএশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠি থেকে আসা– সাঁওতালিতে এটি হাল। এর সঙ্গে লাঙ্গলের হাতলের সাদৃশ্য আছে বলে হালকে লাঙ্গলের বিকল্প শব্দ হিসেবে তখন থেকে ব্যবহার করা হয়েছে, আর এটি চালানোর কাজটিকে বলা হয়েছে হাল চাষ। কেউ কেউ এটি সংস্কৃত ভাষার হল (হল কর্ষণ) থেকে এসেছে যে বলে থাকেন তা খুব সম্ভব ঠিক নয়, বরং সংস্কৃতে হল শব্দটি এখান থেকে যাবার সম্ভাবনাই বেশি।

এবার লাঙ্গলের বিভিন্ন অংশের নামের কথায় আসা যাক। লাঙ্গলের সঙ্গে দীর্ঘ খাঁজ কাটা কাঠের দণ্ডটিকে বলা হয় ঈষ। সংস্কৃতে ইষা শব্দটির এমন মানে হয়। তবে সাঁওতালি ও মুণ্ডারি ভাষায় একে ইশি বলা হয় আর সেখান থেকে দেশি শব্দ ঈষ আসাটি বিচিত্র নয়। সংস্কৃতে এমন শব্দ দেশি থেকে ধার করার প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। আদি লাঙ্গল আগাগোড়া কাঠের তৈরি ছিল কর্ষণের অংশটি সহ। তবে পাণ্ডু রাজার ডিবিতে তিন হাজার বছর আগের লোহার তলোয়ার, ছুরি ইত্যাদি দেখে মনে হয় এসময়ে বা এর পরে এখানে লাঙ্গলে লোহার ফাল লাগানো শুরু হতে পারে। ফাল শব্দটি সংস্কৃতে আছে, আবার দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠির তামিলে, কানাড়ায় ও মালায়ালামে এটি পল; তেলেগুতে এটি পলু। সংস্কৃত থেকে ওখানে যাওয়ার বদলে বরং ওখান থেকে সংস্কৃতে ধার শব্দ হিসেব আসার সম্ভাবনা বেশি। কাজেই খুব সম্ভব ফাল শব্দের উৎস আদি-দ্রাবিড়ের দেশি শব্দ হিসেবে, পশুচারক আদি আর্যরা কৃষি পরবর্তী সময়ে এখানকার মানুষ থেকেই শব্দটি শিখেছিলো।

লাঙ্গলের হাতল, ইষ, ফাল এই জরুরি জিনিষগুলো বাদে তার বাকি থাকে শুধু মাঝখানের ত্রিভুজাকৃতি কাঠের ভারি অংশটি যাকে বলা হয় গাদা। সব সময়

মাটির সঙ্গে লেপটে থাকা এই নিরেট অংশটির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে লাঙ্গলের বাকি সব অংশ। গাদা শব্দটি এসেছে মুণ্ডারি শব্দ গদি, সাঁওতালি শব্দ গাদি থেকে যার ওপর বসা হয়, যা বিছিয়ে ওপরে সব কিছু রাখা হয় সেই গদি– নির্ভেজাল দেশি শব্দ। পুরো লাঙ্গল জিনিসটিতেই আমরা দেখি নিজেদেরকে আরো প্রাচীন বৈশ্বিক অগ্রযাত্রার উত্তরসূরি হিসেবে। তাই ৫ হাজার বছর আগের মিশরে ফেরাউনের মন্দির-দেয়ালে আঁকা গমের খেতে যেই লাঙ্গলের চাষ দিতে দেখি মহাস্থানের পোড়ামাটির ফলকে তার ২ হাজার বছর পরের লাঙ্গলে হুবহু সেটিকেই দেখি, এমনকি আজকের লাঙ্গলেও, বলতে গেলে কোন পরিবর্তন ছাড়াই। ওভাবে আমাদের আজকের ভাষাতে এই লাঙ্গলের ও কৃষির নানা শব্দেও আমাদের সরাসরি প্রাচীন শিকড়ের চিহ্নগুলো স্থায়ী ভাবে রয়ে গেছে; মূল আন্দামানী জেনেটিক ভিত্তি, অস্ট্রোএশিয়াটিক মিশ্রণ, আদি-দ্রাবিড় মিশ্রণ সবই এতে এসেছে।

কৃষির সঙ্গে জড়িত অন্য কিছু শব্দের দিকে তাকানো যাক। কৃষির সনাতন সেচের পদ্ধতি হলো নালা বা খাল থেকে বালতির মত কোন পাত্রের ভেতর নিয়ে পানি জমিতে তুলে তুলে দেয়া। একা একজন অথবা দুজনে দুদিকে ধরা দড়িতে পাত্রটি আটকিয়ে তালে তালে এই কাজ করতে পারে। আরো একভাবে করে থাকে একটি ডুবানো নৌকাকে একবার এই প্রান্ত নিচু করে পানি নিয়ে তারপর অন্য প্রান্ত নিচু করে পানি খেতে ঢেলে দিয়ে। এগুলোর জন্য বর্তমানে আমরা যে সব শব্দ ব্যবহার করি তাও প্রায় সবই প্রাচীন দেশি শব্দ। পাত্রের আকৃতি অনুযায়ী এটি দোল, দুলি, ডাব, ডাবা, ডোঙ্গা, উচি ইত্যাদি। দোল ও ডোঙ্গা সাধারণত নৌকা আকৃতির হয়, ডোঙ্গা নামের নৌকাই আছে। ডাব, ডাবা এগুলোর নাম এর নারকেল আকৃতি থেকে এসেছে, এগুলো বাঁশ-বেত দিয়ে ঘন খাঁচার মত করে তৈরি হয়, ময়মনসিংহ এলাকায় বেশি ব্যবহৃত উঁচিও একই ভাবে তৈরি ত্রিকোণকার পাত্র। অঞ্চল বিশেষে শব্দগুলো কিছুটা ভিন্নরূপ নিয়েছে বটে, কিন্তু সবই এসেছে অস্ট্রোএশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠির মুণ্ডারি, সাঁওতালি ইত্যাদি ভাষা থেকে। ওই যে পানি খেতের কাছে আনার জন্য যে নালা– সেই শব্দটিও তাই।

সে তো গেলো সেচের পানি দেবার পাত্রের কথা, শস্য রাখার পাত্রের যে বিচিত্র প্রকার ও নাম রয়েছে সেগুলোও একই রকম দেশি শব্দ। চট্টগ্রামে আড়ি এরকম একটি ধান রাখার পাত্র খেতের তৈরি, ধান মাপার জন্য ও আয়তনের একক হিসেবেও এই পাত্র ব্যবহৃত হয়। শব্দটি খুব সম্ভব এসেছে সাঁওতালি আঁড়াচ

থেকে, যা কোন কিছু তুলে রাখার জায়গা, আবার দ্রাবিড় শব্দ আড়া থেকেও আসতে পারে যার মানে স্তুপ। রাজশাহীতে মাটি ও খড় মিশিয়ে তৈরি হয় কুটি, যাও ধান রাখার ও ধান মাপার পাত্র; দ্রাবিড় শব্দ কুডসি হলো শস্যের গোলা। গোলা শব্দটিও এসেছে ধান রাখার জন্য গোলাকৃতির ঘর থেকে, গোল আকৃতি বোঝাতে সাঁওতালি শব্দ হলো গুল যার থেকে বাংলার এই দেশি শব্দ। ডুলা চট্টগ্রাম ও সিলেটে ঝুড়ির মত পাত্র, এর উৎস মুণ্ডারি শব্দ ডোল থেকে যাও এমনি পাত্রের নাম। কোথাও কোথাও মাটির বড় পাত্রকে সাধারণভাবেও ডোল বলা হয়। চট্টগ্রামে এবং আরো অনেক জায়গায় চাল রাখার বেশ বড় মোটাসোটা পাত্রকে মট্কা বলা হয়, খুব সম্ভব মোটা মানুষ বোঝাতে সাঁওতালি মোটকা থেকে এসেছে। নানা দ্রাবিড় ভাষায় মোটা মানুষ হলো মটক্ক– ভারতীয় নানা ভাষায় মোটা শব্দের নানা রূপের মূল উৎস ওই আদি-দ্রাবিড়ই হতে পারে। সাঁওতালি ভাষায় মদ চোলাই করার হাঁড়িকে বলে হান্‌ডি। দিনাজপুরের ভাষায় কলসের আকারের শস্য রাখার বড় মাটির পাত্রকে হান্‌ডা বলা হয়। চাটগেঁয়ে ভাষায় রান্নার পাত্রকে হান্‌ডি বলার উৎস শব্দটি খুব সম্ভব ওই সাঁওতালি শব্দটিতেই।

ধান থেকে চাল বের করার প্রক্রিয়াটি কৃষি প্রযুক্তিতে বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ। চাল শব্দটিই এসেছে মুণ্ডারি চাওলে থেকে। ঢেকিতে কাজটি সেভাবে করা হয় তাকে কোথাও বলে ধান কাঁড়া, কোথাও বলা হয় ধান কোটা ইত্যাদি। কাঁড়া, কোটা, কুটা এগুলো দ্রাবিড় শব্দ– মানে ওই একই। আমরা যখন বলি 'ভিক্ষার চাল কাঁড়া আকাঁড়া কী' তখন ওই উৎসটি মনে রাখা উচিত; আকাঁড়া শব্দটিও দ্রাবিড়, যার মানে ধানের তুষ। তুষকে বা যে কোন শস্যের খোসাকে ভূষিও বলা হয়– সাঁওতালি শব্দ ভূষা থেকেই এটি এসেছে– যার ঠিক এটিই মানে। যেই কূলা দিয়ে ঝেড়ে ধান আর তুষকে আলাদা করা হয় সেটি হুবহু সাঁওতালি শব্দ; আর ঝাড়া শব্দটিও মুণ্ডারি ভাষার, দ্রাবিড় নানা ভাষাতেও একই অর্থে এই একই শব্দ। আলাদা করার পর চালকে ডালা, ঝুড়ি অথবা টুক্‌রিতে রাখা হয়। এই তিনটি শব্দই অস্ট্রোএশিয়াটিক, সাঁওতালিতে হুবহু রয়েছে। সব কিছুর মূলে যেই যন্ত্রটি সেই ঢেকি শব্দটি এসেছে অস্ট্রো-এশিয়াটিক থেকে যা আদি-দ্রাবিড়েও ঢুকেছে। তাই মুণ্ডারিতে এটি চেংকি, রাজবংশীতে ঢেকি, তামিলে ঢিংকি। ধান থেকে তৈরি মুড়িকে চাটগেঁয়ে ভাষায় বলা হয় হুড়ুম– ওটি এসেছে মুণ্ডারি থেকে, সেখানেও মুড়িকে বলা হয় হুড়ুম। জাঁতা ব্যবহার করে গুড়ো করা হয় এমন নানা শস্যবীজের মধ্যে ডাল, মটর, কলাই, ছোলা, ছাতু এই শব্দগুলোর কোনটি

অস্ট্রোএশিয়াটিক উৎসের ও কোনটি আদি-দ্রাবিড় উৎসের। তেল শব্দটি এসেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ তৈল বীজ তিল থেকে ওটি দ্রাবিড় শব্দ, অন্য একটি তৈল বীজ তিসি মুণ্ডারি শব্দ।

আমাদের জন্য কৃষির শুরুটি যেমন দূর অতীতের, তেমনি কৃষির ভাষাও দূর অতীতের; উভয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতাই এর প্রাচীন শব্দগুলোকে আমাদের ভাষায় টিকিয়ে রেখেছে।

ঘোড়া, রথ, নীতিমন্ত্র

ভল্গা থেকে গঙ্গা:

পশ্চিম ও পূর্বের অভিবাসীরা আমাদের গন্তব্যে কৃষি নিয়ে এসেছিলো, অবশ্য মূল অধিবাসীদের সঙ্গে মিশ্রণে আদি-দ্রাবিড় এবং মঙ্গোলীয় মিশ্র জিনের মানুষ হিসেবে। এই দুই অভিবাসনের রেশ শেষ হবার আগেই আর একটি বড় অভিবাসন প্রায় একই পশ্চিমা পথে ভারতবর্ষে এসেছিল এবং পরে এক সময় পূর্ব ভারতেও তার প্রভাব দারুণ ভাবে বিস্তৃত হয়েছিলো। নানা কারণে এ প্রভাব শেষ পর্যন্ত বেশ বড় হয়েই এসেছে, অথচ যে মানুষগুলো এ অভিবাসনে এসেছিলো তারা মূলত অনেক দূর থেকে এসেছে। আরো বড় কথা, ওই মানুষরাই প্রায় একই সময়ে ওই দূরদেশ থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে– দক্ষিণ ইউরোপে, ইরানে, এবং ভারতে এসেছিলো, সবগুলো জায়গাতেই তাদের ভাষাটিকে নিয়ে গিয়ে। এর ফলশ্রুতিতে ইউরোপ, ইরান ও ভারতবর্ষের প্রধান সব ভাষাই আজ একই ভাষা-পরিবারের অংশ যাকে বলা হয় ইন্দোইউরোপীয় ভাষা-পরিবার; এটি দুনিয়ার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষা-পরিবারগুলোর মধ্যে একটি। শুরুতে ওই ভাষার কারণেই এই বিভিন্ন জায়গায় তাদের অভিবাসনের কথা আমরা জানতে পেরেছি এবং আমাদের নিজেদের ওপরেও অন্যান্য প্রভাবের সঙ্গে তার ভাষা-প্রভাবটি অত্যন্ত বড় ভাবে আজ অবধি রয়ে গেছে– অন্য সব ভাষা-প্রভাব থেকে অনেক বেশি।

ঠিক কোন্ জায়গা থেকে ওই অভিবাসীরা এসেছিলো তার অনেকটা হদিশ মিলেছে ভাষা গবেষণা থেকে; তবে ফসিল ও অন্য প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা এবং একেবারে আধুনিক সময়ে ডিএনএ গবেষণা থেকেও বটে। এতে বোঝা যাচ্ছে প্রায় ৫ হাজার বছর আগে ইউক্রেন, রাশিয়া, কাজাকস্তান এবং ইরানের উত্তরে কাস্পিয়ান-হ্রদের কাছের জায়গাগুলো যেখানে মিলিত হয়ে স্টেপ্‌স নামে পরিচিত যে বিস্তীর্ণ সমতল তৃণভূমি গঠন করেছিলো, ওখানকার অধিবাসীরাই ওই ত্রিমুখী অভিবাসনটি ঘটিয়েছিলো। ওখানে তখন ওরা যে ভাষায় কথা বল্‌তো সেটিই

ছিল ইন্দোইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের প্রাচীনতম উৎস। ওই ভাষা নিয়েই ওরা এই সব জায়গায় এসেছিলো, এবং পরে তা এক এক জায়গায় এক এক রূপ লাভ করেছে। আরো সুনির্দিষ্ট করে বল্‌লে ওদেরকে ভল্গা ও ডন এই দুই নদীর অববাহিকার মানুষ বলে চিহ্নিত করা হয়। যে সময়ের কথা বলছি তখন ওই অঞ্চলটির দুই পাশের মানুষের জীবিকা অনেকটা পরস্পর ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। এর পশ্চিমে রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চল ও পশ্চিম ইউরোপে তখনো শিকারি-সংগ্রাহকের জীবিকার দিন চল্‌ছে, মধ্যপ্রাচ্যের প্রবর্তিত কৃষি ওখান পর্যন্ত তখনো যায়নি। আর ওই ভল্‌গা-ডন অঞ্চলের পূর্ব দিকের মধ্যএশিয়া-চীনে তখন কৃষি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই দুইয়ের মাঝখানে ওই বিস্তীর্ণ স্টেপ্‌স তৃণভূমিতে যে মানুষদের কথা বল্‌ছি তারা বেছে নিয়েছিলো তৃতীয় অন্য জীবিকাটি– পশু চারণের জীবিকা। ওই উন্মুক্ত সমতলে পোষমানা ছাগল, ভেড়া ও গরুর পালকে নিয়ে যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত ছিল ওরা; আর এতে তাদের সহায়ক ছিল অন্য আর একটি পোষা পশু ঘোড়া। পশুচারণের কাজটি তারা করতো ঘোড়ায় চড়ে, আর ঘোড়া নিজেও তাদের চারণের পশুর একটি ছিল– ঝাঁকে ঝাঁকে ঘোড়াকে চরিয়ে নেয়াও তাদের কাজ ছিল। সবদিক থেকেই ঘোড়া ছিল তাদের বন্ধু, তাদের জীবন যাপনের প্রতীক।

প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে ওই মানুষরাই যে আমাদের সেই অভিবাসী, সে ব্যাপারটি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে রাশিয়ার ইয়ামানাইয়া নামের সভ্যতার নানা নির্দেশক থেকে। রাশিয়ান ভাষায় ইয়ামানাইয়া শব্দটির মানে হলো গর্ত-কবর; গর্তের মত জায়গায় বিশেষ কবর দেয়ার রীতি থেকেই ওই সভ্যতাটির এই নাম। ওরাই যে স্টেপ্‌স তৃণভূমির পশুচারক বাসিন্দা, ইন্দোইউরোপীয় আদি ভাষাভাষী, ঘোড়া যে তাদের প্রধান অবলম্বন, তারাই যে পরে নানাদিকে অভিবাসী হয়েছে, এই তথ্যগুলোর ওপর ভিত্তি করে যে অভিবাসন তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছে তাকে বলা হয় ইয়ামানাইয়া তত্ত্ব। এই তত্ত্বটিই এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সমর্থন পায়। এতে অভিবাসনের কারণ হিসেব যা বোঝা যায় তা হলো সাড়ে চার হাজার বছর আগে এই এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনে তীব্র জীবিকার সংকট দেখা দেয়ায় ইয়ামানাইয়া সভ্যতার মানুষকে নানা দিকে চলে যেতে হয়েছিলো। এটি রাতারাতি হয়নি, বরং ধীরে ধীরে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো। ইউরোপে ওসময় তীব্র শীতের প্রভাবে নাতিশীতোষ্ণ স্টেপস্ অঞ্চলে অতিরিক্ত শুষ্কতার সৃষ্টি হয়েছিলো- তারই ফলে ভাল ঘাস না পাওয়াতে পশুর পাল নিয়ে ওদেরকে ঘন ঘন জায়গা বদল করতে হতো, ঘাসের খোঁজে অনেক দূরে দূরে চলে যেতে

হতো- জীবনযাত্রা ক্রমে কঠিন হয়ে পড়েছিলো। এ সময় সবকিছু নিয়ে একেবারে দূরে চলে যেতে হতো বলে ওরা ঘোড়ায় টানা বড় ওয়াগন জাতীয় গাড়ি ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। পরিস্থিতি যখন একেবারেই অসম্ভব হয়ে ওঠে চার হাজার বছর বা তার কিছু বেশি সময় আগে ওরা স্টেপ্‌স অঞ্চল একেবারে ছেড়ে দিয়ে নানা দিকে চলে যেতে শুরু করে; কিন্তু ওই ঘোড়া, ওই ঘোড়ার টানা ওয়াগন গাড়ি সেই সুদূর যাতায়াতেও তাদের সঙ্গী ছিল। কাজেই যখন তারা একদিকে ইউরোপে, অন্যদিকে ইরানে, এবং আরো এক দিকে ভারতবর্ষে এসে হাজির হলো তখন তাদের ভাষা, তাদের ঘোড়া, আর তাদের গাড়িই সেখানে গুরুত্বপূর্ণ নতুন জিনিস হিসেবে দেখা দিয়েছিলো।

ওই যে বিশাল স্টেপ্‌স অঞ্চলের মানুষ, যাদেরকে আমরা এক ইয়ামানাইয়া সভ্যতার মানুষ বলে একই বন্ধনীতে আবদ্ধ করেছি তারা কিন্তু মোটেই সবাই এক ধাঁচের, এক চোহারার, বা এক গায়ের রঙের ছিলনা– ছিল নানা বৈচিত্রে গড়া। আর বিভিন্ন দিকে যাওয়ার সময়ও এই মিশ্র চরিত্র নিয়েই তারা নানা দিকে গিয়েছে। তবে ওই স্টেপ্‌স সমতলের প্রায় অন্তহীন বিস্তারের ঘুরে বেড়ানো, ওই ঘোড়া হাঁকানো, ওই পশুচারণ এসব তাদের মধ্যে একটি ভাবুক কল্পনা-বিলাসী মন সৃষ্টি করেছিলো; নিজেদেরকে ওরা খুবই বীরবেশে চিন্তা করতে, উচ্চ মাপের নীতিবাগিশ মানুষ হিসেবে চিন্তা করতে ভালবাসতো। কাজেই সাধারণ আটপৌরে জিনিস তাদের কল্পনায় উচ্চাঙ্গের কিছু হয়ে দাঁড়াতো– তাদের ঘোড়া হতো বীরের বাহন, তাদের মানুষ ও মালটানা ওই ওয়াগন গাড়ি হতো যুদ্ধের রথ, আর তাদের ভাষার একটি প্রধান ব্যবহার হয়ে দাঁড়ালো নীতিকথা, ধর্মের কথা নিয়ে গম্ভীর স্তোত্র রচনা, মন্ত্রবাক্য রচনা; সেই সঙ্গে কল্পনার আদর্শ সত্য-রাজ্য, সত্য-যুগের নানা কাহিনী উপ্যাখ্যান রচনা– সবই তাদের মুখে মুখে, সবই আবৃত্তি করার জন্য। এটি বিশেষ ভাবে দেখা গেছে যারা ইরানে এসেছিলো আর ভারতবর্ষে এসেছিলো তাদের মধ্য। তারা নিজেদেরকে আর্য বলে পরিচয় দিতে ভালবাসতো তাদের ভাষায় আর্য মানে অভিজাত। এর মানে অবশ্য কোন বিশেষ দেহাবয়ব, গায়ের রঙ বা চেহারা ছিলনা– যা ছিল সেটি তাদের কল্পনাপ্রবণ মনের একটি আভিজাত্যের ধারণা, যা তাদের ওই নীতিমন্ত্র, ওই উপাখ্যানের মধ্যে প্রকাশ পেতো।

প্রকৃতপক্ষে অভিবাসী জীবনে তারা যা চেষ্টা করছিলো যারা যেখানে গেছে সেখানকার মানুষের সঙ্গে মিশে ওখানকার নতুন জীবিকায় অভ্যস্ত হতে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৃষি জীবিকাকে আয়ত্ত্ব করতে। হাজার চারেক বছর আগে

শুরু হওয়া এই অভিবাসনের সময়কে আমরা অন্যভাবেও বল্‌তে পারি। যীশুখৃষ্টের জন্ম হয়েছিলো এখন থেকে দু'হাজার বিশ বছর আগে। সেই হিসেবে ওই অভিবাসন ঘটেছিলো খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার বছরের মত সময়ে। আমরা এখন থেকে সন তারিখকে ওভাবে খৃষ্টপূর্ব ও খৃষ্টাব্দ হিসেবেই বলবো– তাকে ইতিহাসে স্থাপনের সুবিধার জন্য। ইরানে যারা গিয়েছিলো স্থানীয়দের সঙ্গে মিশতে মিশতে তাদের ওই নীতি-চিন্তা ও ধর্ম-চিন্তাগুলো ক্রমে একটি বিশেষ রূপ পেয়েছিলো যা ওখানে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। সেটি তারা তাদের ভাষার ওই পারসিক রূপে জিন্দাবেস্তা নামক মৌখিক গ্রন্থে রূপ দিয়েছিলো যা তখন ইরানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রিয় হয়ে ওঠে। এতে ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠাতা ও আলোর উৎস হিসেবে দেখা হয় 'আহুরা মাজদা' নামের সত্তাকে। এই ধর্মের প্রচারকের ভূমিকায় ইরানের এই মিশ্র মানুষদের মধ্য থেকে যিনি এলেন তাঁর নাম জরাথ্রুস্ট। তাই ধর্মটি পারসী ধর্ম বা জরাথ্রুষ্টের প্রচারিত ধর্ম নামে পরিচিত– ভারতে এখনো তার বিপুল সংখ্যক অনুসারী রয়েছে। ভল্গাতীর থেকে আসা ওই অভিবাসীদের ভাষার পারসিক রূপটি স্থানীয় ভাষার সঙ্গে মিশে ধীরে ধীরে আদি ফারসি ভাষায় রূপ নেয়।

ভারতেও অনেকটা এরকম ঘটনা ঘটলো। খৃষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের দিকে এখানে আসা আর্যদের সঙ্গে স্থানীয়দের সে রকম বিক্রিয়াই ধীরে ধীরে ঘটেছে, যা সব অভিবাসনে ঘটে থাকে। ভাষার দিক থেকে অভিবাসীদের ভাষাটি স্থানীয় ভাষার সঙ্গে মিশে কিছু নতুন ভারতীয় ভাষায় রূপ পায়। যেহেতু মূল আর্যদের ভাষাটি ইতোমধ্যেই সাহিত্যে, স্তোত্রে, উপাখ্যানে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল, বিশেষ করে স্টেপ্‌সে তাদের নানা গোষ্ঠির মধ্যে এর আনুষ্ঠানিক প্রমিত রূপে, ওই মিশ্র ভারতীয় ভাষাগুলোতেও যথেষ্ট প্রাধান্য রইলো মূল ইন্দোইউরোপীয় ভাষার। এভাবে ধীরে ধীরে এসব ভাষার একটি আনুষ্ঠানিক প্রমিত রূপ সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হলো। এ ভাষা যতটা না দৈনন্দিন গণ-যোগাযোগের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হলো তার চেয়ে অনেক বেশি হলো একটি পবিত্র ভাষা হিসেবে। ভল্গা তীরের ওই ভাবগম্ভীর নীতি স্তোত্রগুলোর ধারাবাহিকতায় ভারতের আর্য প্রভাবিত জনগোষ্ঠির মধ্যে রচিত হলো বেদমন্ত্র, যা উচ্চারিত হলো এখানে সৃষ্ট পবিত্র ভাষা সংস্কৃতে। এটি এলো ঋগবেদ হিসেবে– ধর্মগ্রন্থ বেদের সব চাইতে প্রাচীন অংশ। আর ঋগবেদের ভাষাই হলো সংস্কৃত ভাষার সব থেকে আদি রূপ। সেই সঙ্গে একই ভাষায় সৃষ্টি হলো মহাকাব্যের মত উপাখ্যান যেমন রামায়ন, মহাভারত এবং অন্যান্য পৌরানিক কাহিনীর আদিতম রূপগুলো। এগুলোর

কোনটিই কিন্তু মূল ভল্গা তীরের মানুষের সৃষ্টি নয়, বরং একেবারেই তখনকার মিশ্র গঙ্গাতীরের মানুষের সৃষ্টি, উপাখ্যানের কাহিনীগুলোর পটভূমিও এই গঙ্গাতীরের ভারতীয় সমভূমি– অযোধ্যা ইত্যাদি। মুখে মুখে রচিত এই সব গুরু থেকে শিষ্য শিখে মুখস্ত করে নেয়– প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

এখানে যে দেবদেবী, যে মানুষ, যে রাজা-রাজ্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে তা গঙ্গাতীরের মানুষেরই নিজেদের ও তাদের মননের প্রতিফলন; স্থানীয় আদি দ্রাবিড় ও অন্যান্যদের সঙ্গে তাদের জিন-মিশ্রণ, সাংস্কৃতিক মিশ্রণের ফলে উত্তর ভারতের গঙ্গা অববাহিকায় গড়ে ওঠা মানুষই ছিল তার মূলে। বেদমন্ত্রকে যারা ধর্ম হিসেবে বরণ করেছে, অন্তত যে ব্রাহ্মণদের ওপর বেদমন্ত্র উচ্চারণের ভার এ ধর্ম দিয়েছে, তারাও উত্তর ভারতে গঙ্গাতীরের মানুষদের ওপরেই সব ধর্মকর্মের জন্য ভরসা করেছে। ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির দিক থেকে আর্য অভিবাসন শুরুতে এই উত্তর ভারতেই প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে। তবে এটি গেলো তাদের একটি দিক; অন্য প্রশ্নটি হলো মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর এই অভিবাসন কী প্রভাব রেখেছিলো।

আর্যরা খৃষ্টপর্ব ২০০০ অব্দের দিকে মূলত খাইবার গিরিপথের মধ্য দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে শ'দুয়েক বছরের মধ্যে ওরা পশ্চিম ও উত্তর ভারতের নানা অংশে ছড়িয়ে পড়েছিলো প্রধানত গঙ্গা অববাহিকায়। ওখানে তাদের স্থানীয়দের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবার শুরুর সময়টিকে খৃষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দ পর্যন্ত সময়কে বলা হয় ঋগবেদের যুগ। তখনই আদি সংস্কৃত হিসেবে একটি প্রমিত ভাষা সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে ঋগবেদ রচিত হয়েছে। কিন্তু জীবিকার দিক থেকে তখন আর্য প্রভাবটি এসেছে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার সেই পশুচারণের মাধ্যমে। ভেড়া, ছাগল, গরু ইত্যাদি চরাবার যাযাবর জীবন তারা প্রবর্তন করেছে বটে, কিন্তু যতই সময় গেছে সেটির থেকে ক্রমে সরে এসে আগে থেকে এখানে যা চালু ছিল সেই কৃষির মধ্যেই আবার নিজেদেরকে শামিল করেছে। শুরুতে স্থানীয় দ্রাবিড়দের সঙ্গে এই সব চিন্তার, ধর্মের, জীবন-জীবিকার ক্রিয়া-বিক্রিয়ার, সহযোগিতা-প্রতিযোগিতা কী রূপ পেয়েছিলো তা অনেকটা অস্পষ্ট। তবে মহাভারতের কাহিনীর বর্ণনায় যেই যুদ্ধ বিগ্রহের কথা বলা হয়েছে, অথবা অন্যান্য উপাখ্যানেও যা ছিল, সেসব আর্য-অনার্যের লড়াই ছিলনা; বরং আর্য-অনার্য মিশ্র জিনের মানুষের নিজেদের মধ্যেই পারিবারিক, গোত্রীয় নানা বিবাদের প্রতিফলন ছিল। খৃষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের পরবর্তী ৫০০ বছরকে বলা হয় বেদ যুগের শেষ ভাগ যখন ঋগবেদ পরবর্তী অন্যান্য বেদ এবং পুরান রচিত হয়েছে;

অন্যদিকে গঙ্গা অববাহিকার ওই মানুষ চিরতরে যখন কৃষিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এ কাজটিতে সময় লেগেছে; আর্য প্রভাব গঙ্গা অববাহিকায় সে সময়ের বনে আকীর্ণ জায়গাগুলোকে বৃক্ষমুক্ত করে কৃষি-উপযোগী প্রচুর ভূমি সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিলো, এমন প্রমাণ রয়েছে। পশ্চিম ও উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত হলেও পূর্ব ভারতে এই একই প্রক্রিয়া ঘটতে আরো বেশ কিছু সময় লেগেছে। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় সংস্কৃতিটি এবং দ্রাবিড় ভাষাই রয়ে গেছে, যদিও সংস্কৃত ভাষা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেখানেও যথেষ্ট প্রভাব রেখেছে। এভাবে এই আর্য অভিবাসনটি ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে পৌঁছে কমবেশি প্রভাব রেখেছিলো, উত্তর ও পশ্চিম ভারতে সবচেয়ে বেশি।

ভারতের জিন-সমগ্রে একাকার আর্য জিনঃ

আর্যরা উত্তর ভারতে বিস্তৃত হয়েছে, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে বেশি সংখ্যায় যায়নি; সেখানে দ্রাবিড়রা তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অনেকটাই বজায় রেখেছে, এবং তাদের ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যও। পূর্ব ভারতে আর্যরা এসেছে পরে, এবং একেবারে পূর্বে ও উত্তর পূর্বে আগের দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জিন ও ভাষার মধ্যে আর্যদের প্রবেশ অনেক সীমিত। এই সীমাবদ্ধ প্রবেশ বলতে গেলে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে তারপর একেবারেই সীমাবদ্ধ ভাবে। এক সময় পণ্ডিতরা ভাবতেন আর্যরা সত্যিই 'অভিজাত', এবং আভিজাত্য বজায় রেখে ওরা ভারতে আসার পর স্থানীয় অভিজাতদের সঙ্গেই শুধু জিনগত ভাবে মিশেছে; তাদের উচ্চ বর্ণ আভিজাত্য তারা যুগে যুগে ধরে রেখেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক ডিএনএ গবেষণায় এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। চার হাজার বছর আগে ভল্লা তীর থেকে যারা ভারতবর্ষে এসেছিলো তাদের জিনের মার্কার এখন ভারতের সবার মধ্যে কমবেশি পাওয়া যাচ্ছে, এমনকি দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যেও। এতে বোঝা যায় ভারতে এসে তাদের জেনেটিক পরিচয় সবার মধ্যে একাকার হয়ে গেছে। এখানে সবার মধ্যে তাদের কিছু জিন-মিশ্রণ রয়েছে, কিন্তু সবার মধ্যেই সেটি সীমিত আকারের। এমন কি পশ্চিম ভারতে যেখানে তারা প্রথম ঢুকেছে, বহুদিন বেশি সংখ্যায় থেকেছে, সেখানেও জনসংখ্যার মধ্যে এখন তাদের জিন জিন-সমগ্রের অংশমাত্র; অন্যত্র যেমন এখানেও তেমনি। অপেক্ষাকৃত সীমিত সংখ্যক অভিবাসী জনবহুল একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে এবং জিন মিশ্রণ ঘটালে এমনটিই হবার কথা।

সে জিন মার্কারটি চার হাজার বছরেরও আগের ইন্দোইউরোপীয় পরিচয়কে স্পষ্ট করে ওই ভল্গা তীরের স্টেপ্‌স অঞ্চলের মানুষের সবার মধ্যে ছিল তার নাম Steppe-EMBA। এটি যেখানে সব চেয়ে কম যাবার কথা সেই দক্ষিণ ভারতের আজকের সব রকম মানুষের ডিএনএতে এর খোঁজ করে দেখা গেছে এটি তাদের অনেকের জিন-সমগ্রে মিশ্রিত রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের যে গোষ্ঠিগুলো একেবারেই নিজেদের মধ্যে নিজেরা আলাদা থাকে– তাদের মধ্যেও এটি ১০% থেকে ১৫% মানুষের দেহে পাওয়া গেছে। এটিই সেখানে সর্বনিম্ন মাত্রা, বাকি দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যে এর থেকে বেশি। পূর্ব ভারতেও এটি তুলনামূলক ভাবে কম– বেশ বোঝা যায় যে আর্য সংস্কৃতি ও ভাষার প্রভাব যথেষ্ট পৌঁছতে পারলেও আর্যরা নিজেরা সশরীরে এখানে কমই এসেছিলো– যেমন বাংলায়। গড়পড়তা বাঙলীদের ডিএনএ পরীক্ষায় সেই Steppe-EMBA ২৫% এর বেশি ক্ষেত্রে নেই। আজকের গড়পড়তা বাঙ্গালীর পুরো জেনেটিক পরিচয় তুলে ধরলে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই ২৫% কে দেখলে বিষয়টি ভাল বোঝা যাবে। খুব মোটা দাগে বলা যায় এতে আদি ভারতীয় অস্ট্রোএশিয়াটিক জিন মার্কারের অবদান হলো ৪০%, আদি-দ্রাবিড় ২৫% এবং মঙ্গোলীয় ১০%; আর্য অবদান ২৫% তো বলাই হয়েছে। বাংলার পূর্ব সীমান্ত চট্টগ্রাম হয়ে আরো উত্তর পূর্ব ভারতে মঙ্গোলীয় অবদান বেড়েছে, আর্য অবদান কমেছে। গুজরাট, সিন্ধু, পাঞ্জাব, ও পাঠান অঞ্চলকে নিয়ে পুরো পশ্চিম ভারতবর্ষকে এক সঙ্গে নিলে সেখানে আর্য অবদান সব চেয়ে বেশি দেখা যায়– প্রায় ৩৫-৪০%; আর রয়েছে আদি-দ্রাবিড় ৩০-৩৫%, এবং বাকিটুকু আদি-ভারতীয় ও মঙ্গোলীয়। পাকিস্তানে পাঠান অঞ্চলে কালাস নামের একটি উপজাতি আছে যাদের জেনেটিক পরিচয়ে আর্য অবদান সবচেয়ে বেশি– প্রায় ৫০%। মোট কথা হলো সংস্কৃত ভাষা, ধর্মীয় আর্যত্বের প্রভাব ইত্যাদির সঙ্গে জিনগত ভাবে আর্য হবার তেমন কোন সম্পর্ক নেই। এখানে সবাই আর্য ছিল, আবার সবাই অনার্যও ছিল, জিনের আগাগোড়া মিশ্রণ তাই বলে।

আর্য সংস্কৃতির প্রভাবের কারণঃ

বহু দূর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের ভিন্ন ভাষা নিয়ে কিছু যাযাবর পশুচারক মানুষ এত বড় এত মানুষের একটি দেশে এলো, আর এরপর থেকে এখানকার সব মানুষ ভাষায়, ধর্মে, আচরণে, সামাজিক ব্যবস্থায় তাদের সব কিছু মেনে নিলো, এমনকি এরা নিজেদেরকে সর্বোচ্চ আসন দিয়ে এবং স্থানীয়দেরকে দাসের

পর্যায়ে গণ্য করে যে বর্ণভেদের বিধান দিলো তাও মেনে নিলো, আর সেই প্রভাব চার হাজার বছর পর আজ পর্যন্ত বজায় রইলো; এমন অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটতে পারতো যদি আগন্তকরা সাংঘাতিক উচ্চ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উচ্চ প্রযুক্তির অধিকারী হতো, আর স্থানীয়রা নেহাতই এখনো মৌলিক জীবন ধারণের কাজে ব্যস্ত থাকতো। কিন্তু ব্যাপারটিতো মোটেই সেরকম ছিলনা। যেই পথ দিয়ে আর্যরা ঢুকেছিলো সেখানেই তো তখন ছিল অত্যন্ত অগ্রসর আদি-দ্রাবিড় সভ্যতা ও যাযাবর পশুচারকদের থেকে অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত সমৃদ্ধ কৃষি। আর এর মাত্র কিছু দিন আগেই সেখান থেকে বিলুপ্ত হয়েছে দুনিয়ার চমক লাগানো নগর সভ্যতাগুলোর অন্যতম– সিন্ধু সভ্যতা। তাহলে আসলে কী হয়েছিলো?

মানুষকে তাদের আভিজাত্য ও পেশা অনুযায়ী চার বর্ণে বিভক্ত করার বিধান ঋগবেদেই ছিলো। তা ছাড়া এখনকার একজন বড় আর্য শাস্ত্রজ্ঞ মনু তাঁর মনুস্মৃতি নামক মৌখিক রচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন। সেই মত অনুযায়ী আর্যরা আভিজাত্যের ক্রম অনুযায়ী নিজেদের জন্য ব্রাহ্মণ (ধর্ম কর্ম, শাস্ত্র চর্চা), ক্ষত্রিয় (রাজ্যশাসন, যুদ্ধ) বৈশ্য (ব্যবসা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড) ইত্যাদি তিনটি বর্ণ নির্দিষ্ট করেছিলো এবং স্থানীয় সবাইকে শূদ্র নামে দাসের সমপর্যায়ে ফেলে তাদের জন্য পরিচ্ছন্নতার কাজ, মুচির কাজ, মৃতদেহ সৎকারের মত অপ্রিয় কাজগুলো বরাদ্দ করেছিলো– এটিই হলো পরবর্তী কালের সৃষ্ট ধারণা। ঋগ্‌বেদের কাল ও তারও পরের বেদের যুগে যে বেদ, পুরান, মহাকাব্য, উপাখ্যান ও অন্যান্য মৌখিক সাহিত্য রচিত হয়েছে তাতে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের কথা বললেও সেগুলোর কোনটি আর্যদের সঙ্গে স্থানীয়দের যুদ্ধ, আর সেখানে স্থানীয়রা পরাজিত হয়ে দাসত্ব বরণ করেছে, এমনটি মনে হয়নি– বরং সবগুলো নিজেদের নানা গোষ্ঠির অন্তর্বিবাদ হিসেবেই দেখা গেছে। কাজেই একটি যোদ্ধা জাতি এসে এখানকার মানুষকে পদানত করে দাসে পরিণত করেছে এবং নিজেরা তিন বর্ণে বিভক্ত হয়ে এখানকার সব কিছু নিজেদের ভাষায়, নিজেদের রীতিনীতি ও ধর্মে, নিজেরা পরিচালনা করেছে এমন চিন্তাগুলো পরবর্তী কালের কল্পিত চিন্তা বলেই এখন মনে হচ্ছে।

সাহিত্য ওই প্রচলিত ধারণাকে সমর্থন দিচ্ছেনা, তাহলে আমাদের তো ওই মূল প্রশ্নের জবাব আশা করা উচিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে এবং একেবারে সাম্প্রতিক বিজ্ঞান ডিএনএ বিশ্লেষণ থেকে। এখানে মনে রাখতে হবে ওই বেদ, পুরান, মহাকাব্য, আর অন্য সব সাহিত্য যার কথা বল্‌ছি সেটি লিখিত কিছু ছিলনা– ভারতে তখনো কোন লিপির প্রচলন হয়নি। এমন ক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্বের

ওপরেই ইতিহাসের উদ্ঘাটনটি নির্ভর করে। অথচ না প্রত্নতত্ত্ব, না ডিএনএ বিশ্লেষণ কোনটি থেকেই ওই উত্তর মেলেনি– কেন আর্যরা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলো। সেই উত্তর দিতে না পারলেও নেতিবাচক ভাবে এক রকম উত্তর প্রত্নতত্ত্ব ও ডিএনএ উভয় বিদ্যাই দিতে পেরেছে, কারণ এই দুইয়ের কোনটার মধ্যে দিয়ে আর্য-অনার্য বিরাট যুদ্ধের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। যা পাওয়া গেছে তা হলো সাধারণ অভিবাসনের চিহ্ন, জিন-মিশ্রণ আর ভাষা মিশ্রণের চিহ্ন। যেই চিহ্নে পরাক্রমশালী আর্যরা দ্রাবিড়দেরকে পরাজিত করে দাসে পরিণত করেছে বা অন্যত্র তাড়িয়ে দিয়েছে, সে রকম কিছু নেই।

এখন নানা গবেষণায় বোঝা যাচ্ছে যে আগন্তকদের সঙ্গে স্থানীয়দের ক্রিয়া বিক্রিয়া মোটেই এক পাক্ষিক ছিলনা। এর ফলে আর্য মিশ্রিত যে ভারতীয় জনগোষ্ঠি সৃষ্টি হয়েছিলো তাতে উভয়ের অবদানই ছিলো; এবং সুদূর স্টেপস তৃণভূমির দেশ থেকে আসা মানুষগুলোর বরাত দিয়ে যে কাহিনী চালু হয়েছে তা আসলে পরবর্তী কালের এই মিশ্র মানুষদের সৃষ্টি; বর্ণাশ্রম সহ যে সব বিধি-বিধান বাস্তবে চালু হয়েছে তাও এই মিশ্র ভারতীয় জনগোষ্ঠির মধ্যেই তৈরি হয়েছে। সেটি করতে গিয়ে পশ্চিম ভারতের ও গঙ্গা অববাহিকার উত্তর ভারতের মানুষরা এক ভাবে বিধি-বিধান রচনা করেছে, দক্ষিণ ভারতের মানুষরা অন্য ভাবে করেছে। দক্ষিণে আর্যদের সঙ্গে জিন মিশ্রণ কম হয়েছে, ভাষা মিশ্রণ আরো কম– যে কারণে তাদের ভাষাগুলো ইন্দোইউরোপীয় ভাষা-পরিবারে গণ্য না হয়ে দ্রাবিড় ভাষা-পরিবার নামে ভিন্ন ভাষা-পরিবার হয়েছে। কিন্তু সেই ভিন্ন ভাষা গোষ্টিতেও সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ গৃহীত হয়েছে, আবার তাদের নিজেদের ভাষা থেকে অনেক শব্দ সংস্কৃত ভাষায়ও গৃহীত হয়েছে। শুধু ভাষায় লেনদেন নয়, খৃষ্টপর্ব ৫০০ অব্দের মধ্যে উভয়ের ধর্ম বিশ্বাসও বেশ কিছু লেনদেনের মাধ্যমে উভয়ের কাছাকাছি চলে আসে– যেমন এখানকার দ্রাবিড় ধর্মের একটি বৈশিষ্ট জন্মান্তরবাদ উত্তর ভারতের ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অংশ হয়, এবং উভয় অঞ্চলে ধীরে ধীরে এক ধরণের হিন্দু ধর্ম ঐক্য গড়ে ওঠে। এর পরে দক্ষিণ ভারতে বড় বড় হিন্দুরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে, পরে তার কোন কোনটি খুবই শক্তিশালী হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দু ধর্ম ভিত্তিক সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলো দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়– থাইল্যান্ড, মালয়, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় শ্রী বিজয়া, মাতরম ইত্যাদি নামে।

যেখানে আর্য প্রভাব সব থেকে কম সেই দক্ষিণ ভারতে এমনটি হয়েছে, অন্যত্র এই প্রভাব অনেক বেশি ছিল; যদিও পূর্ব ভারতে তা অপেক্ষাকৃত পরে দেখা

গেছে। সর্বত্র এই প্রভাবের মূলে কী ছিল? এখন যেটি বোঝা যাচ্ছে তা হলো বেদের যুগের পর অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দ থেকে আর্যমিশ্রিত ভারতীয়দের প্রভাবশালী অংশ নিজেরাই নিজেদের সুবিধার জন্য আর্যত্বকে বড় করে তুলেছিলো; বর্ণাশ্রমের ধারণাটিকে সত্যি সত্যি প্রয়োগের উদ্যোগ নিয়েছিলো; অনেকে মনে করেন মনুর অনুশাসনও তখনকারই সৃষ্ট। একই ভাবে স্টেপস তৃণভূমির সেই কল্পনাপ্রবণ পশুচারকরা নিজেদের ভাষায় ও সাহিত্যে যেই অশ্ব-রথ, যেই দিগ্বিজয়, যেই ঋগবেদ স্তোত্রের মন্ত্রমুগ্ধতা সৃষ্টি করেছিলো, ভারতে আসার এক হাজার বছর পর এগুলোকে এখানকার মিশ্র জিনের মানুষরা নতুন ভাবে রূপ দিয়েছিলো নিজেদের প্রয়োজনে। প্রভাবশালী গোষ্ঠিগুলো নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় সুবিধা পাওয়ার চেষ্টায় নিজেদের মধ্যেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এসব বিভাজনে সৃষ্টি করেছিলো আর্যত্বের দোহাইকে সামনে রেখে। সংস্কৃত আখ্যান ও সাহিত্য যেহেতু এ কাজে সহায়ক হয়েছে তাকে ধর্ম, রাজকার্য এবং যাবতীয় পবিত্র ও আনুষ্ঠানিক কাজের জন্য পবিত্র ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে এবং এখনকার বিভিন্ন মৌখিক ভাষার ওপরও এটি বিশাল প্রভাব বিস্তার করে। শাস্ত্রকে বড় করে তুলতে গিয়েই শাস্ত্রের ভাষাকেও বড় করে তুলতে হয়েছে। এমনি ভাবেই পশ্চিম থেকে পূর্বে উত্তর ভারতের ভাষাগুলো কালক্রমে ইন্দোইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটি এতটাই হয়েছিলো যে ভারতের একেবারে পূর্বের সেখানে আর্যদের জিন মিশ্রণের প্রভাব খুব কমই হয়েছে সেখানেও চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে চাটগেঁয়ে ভাষা ও চাকমা ভাষাকে সুস্পষ্ট ভাবে ইন্দোইউরোপীয় ভাষা পরিবারে গণ্য করা হয়; অথচ এর মধ্যে চাকমারা জিন মিশ্রণে আর্য জিনের থেকে মঙ্গোলীয় জিনেই বেশি সমৃদ্ধ।

যেহেতু প্রতিযোগিতায় সুবিধা পাওয়ার চেষ্টাতেই শুরুতে বর্ণাশ্রম সৃষ্টি তাই সব থেকে প্রভাবশালীরা আর্যত্বের প্রতীক হিসেবে দেহাবয়ব ও গায়ের রঙকে বেছে নিয়ে ব্রাহ্মণের সঙ্গে বেশি ফরসা গায়ের রঙ, ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে কিছু কম, বৈশ্যের সঙ্গে আরো কম, এবং শূদ্রের সঙ্গে গায়ের কালো রঙের এক রকম কৃত্রিম সম্পর্ক ঘটিয়েছিলো- যা সব সময় জিন-মিশ্রণের কমবেশির সঙ্গে সঙ্গতি সম্পন্ন ছিলনা। তখন খুব সম্ভব এটি ছিল একটি মোটা দাগের বিভাজন– মোটা দাগেই শুধু যার বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল; বেছে নেয়া, বা অর্জন করা পেশার নিরিখটি এবং সুবিধাজনক অবস্থানের থাকার ব্যাপারটিও সেখানে ভূমিকা রেখেছে। আর এ বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হয়েও সবার মধ্যে জিন-মিশ্রণের আগের ধারাটি তখনো স্তিমিত হয়ে যায়নি। বর্ণে বিভক্ত হবার পরও অগ্রগণ্যতা নিয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য প্রমুখের মধ্যে যে টানাটানি হতোনা তাও নয়; শাস্ত্র শাসন, রাজ্য শাসন, অর্থ শাসনের ওই টানাপোড়েনের একটি অন্তস্রোত খুব সম্ভব এর মধ্যেও ছিল। যেখানে আর্য জিন সব থেকে কম মিশেছে আর যেখানকার সংস্কৃতিতে আর্যত্বের পরিমাণ সব চেয়ে কম আছে বলে মনে করা হয় সেই দক্ষিণ ভারতও এই অন্তস্রোত থেকে মুক্ত ছিলনা। দরিদ্র ও সুবিধা-বঞ্চিত মানুষ শূদ্রদের কথা অবশ্য আলাদা। এই প্রতিযোগিতায় শাস্ত্রকে ও শাস্ত্রের ভাষাকে যেমন উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে তেমনি ওই শাস্ত্র-শাসিত ধর্মটিও সবাই গ্রহণ করেছে সনাতন আর্য ধর্ম; তবে কার্যত ব্রাহ্মণকে ধর্মের মধ্যে প্রধান করে তোলাতে এবং বাকি সবাই তাঁকে এ ধর্মের অতি পূজনীয় শীর্ষ ব্যাখ্যাকারের স্থান দেয়াতে, এটি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম হিসেবে বেশি পরিচিত। একেই সবাই তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রধান নিয়ামক করে তুলেছিলো, কোন কোন সময়ে কোন কোন জায়গায় রাজনৈতিক ভাবেও। অন্য সব অভিবাসন থেকে ভল্গা তীরের মানুষদের অভিবাসনটি, সেটি ঘটার হাজার খানেক বছর পরে, এভাবেই একটি অনন্যতা লাভ করেছিলো তার নানা প্রভাবের মধ্যে।

এ প্রভাব বিস্তৃত হবার সুযোগ হয়েছে সব বর্ণের মানুষের মধ্যে মেলামেশা, জিন-মিশ্রণের সুযোগ অব্যাহত থাকার ফলে। সমাজের সবাই চেষ্টা করেছে ওই ভাষা, ওই শাস্ত্রীয় অনুশাসন ইত্যাদি যথাসম্ভব গ্রহণ করে এর মধ্যে নিজেদের অবস্থানকে যতদূর পারা যায় এগিয়ে নিয়ে যেতে। তাদের মধ্য থেকেই এ সময় বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি বিকল্প ধর্ম গড়ে ওঠায়, সেগুলোও শক্তিশালী হয়ে ওঠায়, অনেক রাজ্য শাসক এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সেগুলো গ্রহণ করে সেগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করায়, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কড়াকড়ির ধার অনেকটা কমে যায়। ফলে ভারতীয় জিনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে আর্যত্বের অভিমানের গুরুত্ব থাকলেও এর বিশুদ্ধ রূপটি শুধু পেশাগত ব্রাহ্মণদের সংস্কৃত ভাষা ভিত্তিক শাস্ত্র চর্চার মধ্যেই অক্ষুণ্ন ছিল।

আরো এক হাজার বছর পর ৫০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এসে এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এ সময় উত্তর ভারত জোড়া শক্তিশালী গুপ্ত সাম্রাজ্যের কালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এক রকম পুনরুত্থান ঘটেছিলো– বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ভেতরেও এতোদিনের উদারপন্থী নীতিগুলো এসময় দুর্বল হয়ে পড়ে, অন্য দিকে শেষেরটিতে শাস্ত্রীয় কড়াকড়ি এক নতুন তুঙ্গে পৌঁছে যায়– যাতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সার্বিক পরিবেশটি সহায়ক হয়। এ পর্যায়ে এসেই যেই বর্ণাশ্রম দু'হাজার বছরের আগে থেকে ঢিলে ঢালা নিয়মে চল্‌ছিলো তাকে হঠাৎ

করে কঠিন ও কাঠার করে তোলা হলো এবং অনেকগুলো জাতের খোপে খোপে আবদ্ধ করে তাকে জাতিভেদ প্রথায় পরিণত করা হলো। মূল চারটি বর্ণের প্রত্যেকটিকে অনেকগুলো 'জাতিতে' ভাগ করে, শুধু নিজ জাতির মধ্যে বিয়েকে অলঙ্ঘনীয় করে এমনি এক একটি বিধান প্রবর্তন করা হলো- যাতে এক জাতির সঙ্গে অন্যের কোন জাতির জিন-মিশ্রণ আর না ঘট্‌তে পারে। তখন থেকে একেবারে আধুনিক কাল পর্যন্ত এ নিয়মকে হিন্দু সমাজের এবং অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় সমাজেরও একেবারে মূল কাঠামো হিসেবে দাঁড় করিয়ে রাখার চেষ্টায় তেমন কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। ইতোমধ্যে সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্য লিপির আওতায় চলে আসার ফলে এসব শাস্ত্রীয় বিধান কড়াকড়ি ভাবে আরোপ আরো সহজ হলো। তাছাড়া ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হওয়াতে আজ তার উদ্ঘাটন সহজতর হয়েছে, যেখানে এর আগের ঘটনাগুলো প্রত্নতত্ত্ব, ভাষা ও ডিএনএ থেকে আন্দাজ করাই শুধু গিয়েছে। সেই সঙ্গে অস্পৃশ্যতার একটি নতুন ধারণা প্রবর্তন করা হলো ওই জাতিভেদের মধ্যে– শূদ্রের বহু রকম ভাগের মধ্যে সর্বনিম্নদেরকে অস্পৃশ্যে পরিণত করা হলো যাদের ছোঁয়াছুঁয়ি পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্তযোগ্য। আধুনিক গবেষণার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে আর্য প্রভাবকে এক সময় স্থানীয় দ্রাবিড়দের ওপর আর্যদের বিজয়ের তাৎক্ষণিক ও অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছিলো, তাকে আসলে স্বাভাবিক অভিবাসনের দুই হাজার বছরের মিশ্রণের ফলশ্রুতি হিসেবেই দেখা সম্ভব। এই মিশ্রণের শক্তিটিই এমন প্রবল যে ৫০০ খৃস্টাব্দে গুপ্ত যুগের থেকে কড়া বিধি-নিষেধে মিশ্রণ বন্ধের চেষ্টা সারা ভারতজোড়া সাধারণ জিন-প্রকৃতিতে তেমন কোন পার্থক্য ঘটাতে পারেনি– কারণ এই অভিবাসী ও স্থানীয় জিন-মিশ্রণ তার আগে দু'হাজার বছর ধরে ঘটে গিয়েছে। বরং পরবর্তী কালে আরো অন্যান্য অভিবাসনে এই জিন-মিশ্রণে আরো নতুন নতুন ধারা যোগ হয়েছে।

ধর্ম-নির্ধারিত সমাজ, সমাজ-নির্ধারিত ধর্ম

আদি ভারতীয় সমাজে ধর্ম

আর্যদের প্রভাব বাংলার পূর্বাঞ্চলে এসে পৌঁছতে অনেক সময় লেগেছে, পৌঁছার পর সে প্রভাব অন্যান্য জায়গার মত এত তীব্র হতে পারেনি। তারপরও আমাদের গন্তব্যে অর্থাৎ চট্টগ্রাম ও আশপাশের অঞ্চলে সমাজ ব্যবস্থায় এটি হাজার বছর ধরে বড় প্রভাব হয়ে এসেছে; আর তা এসেছে প্রধানত ধর্মীয় প্রভাবের হাত ধরে। ভারতবর্ষের যে সব অঞ্চলে আর্য-মিশ্রিত জনগোষ্ঠি খৃষ্টপূর্ব প্রায় ১৫০০ অব্দ থেকেই ঋগবেদের বাণী অনুসরণ করে হিন্দু ধর্ম চর্চা আরম্ভ করেছিলো, সেখানে সমাজের ওপরও তার প্রভাব পড়েছিলো সব চেয়ে বেশি। শেষ পর্যন্ত এর প্রভাব সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে যে এক রকমের হিন্দু ধর্ম ঐক্য এখানে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছিলো সেটি আমরা আগেই দেখেছি। তার থেকে উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত, পশ্চিম ভারত, পূর্ব ভারত কোন অংশই বাদ যায়নি। সমাজের মধ্যে ধর্মকর্ম সৃষ্টি এবং সমাজের ওপর ধর্মের প্রভাব কৃষি ও নাগরিক সভ্যতা প্রবর্তনের পর ধারাবাহিক ভাবেই পৃথিবীর সর্বত্র দেখা গেছে। মিশরের হীরোগ্লিফিকে লেখা বহু প্যাপিরাসে আমরা ফেরাউনদের নানা রাজবংশের ইতিহাস যখন দেখি, দেখা যায় ওখানকার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বড় বড় পরিবর্তন, এমনকি বিপ্লব, ঘটে গেছে ধর্মীয় পরিবর্তনের ফলে। ব্যাবিলনের সম্রাট হামুরাব্বির অনুশাসনের ধারাগুলো পড়লে দেখবো কী ভাবে তিনি সামাজিক ন্যায়বিচার যাকে বল্‌ছেন তা ধর্মের বরাত দিয়েই বলেছেন। এসবের বহু বছর পর ভারতবর্ষের সর্বত্র লিপি খোদাই করে সম্রাট অশোক নিজেকে দেবস্প্রিয় নামে উল্লেখ করে ধর্ম-সংঘের বাণী সবাইকে দিতে চেয়েছেন, নিজেদের জীবনকে ও সমাজকে তার আদলে গড়ার জন্য সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন। অশোকের সময়ের ভারতবাসী ছিল আর্য-মিশ্রিত জনগোষ্ঠিতে গড়া– ইতোমধ্যে বেদ এবং বেদ বহির্ভূত শাস্ত্র, পৌরানিক কাহিনীর অনুশাসন, হিন্দু ধর্মের ব্রাহ্মণ্যবাদকে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত করেছে। বৈদিক যুগে একে একে সামবেদ, যজুরবেদ, এর অনেক পরের দিকে অথর্ববেদ স্মৃতি ও শ্রুতির মাধ্যমে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বংশ পরম্পরায় চলে এসেছিলো। এতে এক দিকে দেবগণের অন্য দিকে অসুরগণের চরিত্রের ভালমন্দ মানুষের চরিত্রের মধ্যেও দেখার চেষ্টা

ছিল। এরপর খৃষ্টপূর্ব নবম ও অষ্টম শতাব্দীতে উপনিষদের বাণী এসেছে যাতে ধর্মের দার্শনিক তত্ত্বগুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যা ভগবানের প্রদর্শিত পথ হিসেবে ভগবৎ গীতায় হিন্দু ধর্মের সারাৎসার হয়ে এসেছে। তার সঙ্গে অবশ্য মনু সংহিতার বিধানও সমাজে বর্ণাশ্রমকে নিয়ম-নীতিতে পরিণত করেছিলো, যেগুলোর কড়াকড়ি প্রয়োগের কিছুটা প্রতিক্রিয়া হিসেবেই একই ওই আর্য-মিশ্রিত ভারতবাসীদের মধ্যেই এসেছিলো খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের মধ্যে বুদ্ধের ও মহাবীরের বাণী। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্ম ও দুটি শক্তিশালী সংগঠিত ধর্ম হিসেবে এই একই সমাজে আত্ম-প্রকাশ করে। অশোক ছিলেন সেই প্রতিক্রিয়ারই একজন প্রতিনিধি। আমাদের গন্তব্যের অঞ্চলটি ছিল তাঁর লিপি প্রচারের যে বিশাল ভূখণ্ড তারও সীমানার বাইরে একটি প্রান্তিক অঞ্চল। অথচ হাজার খানেক বছরের মধ্যে সারা ভারতে শক্তিশালী প্রভাব রাখা বৌদ্ধ ধর্ম যখন এই পুরো অঞ্চল থেকেই তিরোহিত হলো, তখনো কিন্তু এটি শেষ পর্যন্ত টিকে রইলো এই প্রান্তিক অঞ্চলটিতেই– চট্টগ্রামে।

বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্ম ভারতের একটি বিশাল অঞ্চলে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করলেও আরো আদিতে যে ধর্ম ছিল সেই ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মই কিন্তু বরাবর ভারতীয় সমাজের ওপর তার মৌলিক প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিলো যার প্রভাব থেকে তার সমাজ গঠন, দৈনন্দিন জীবন-জীবিকা, এবং রাজ্য- সাম্রাজ্যের রাজনীতি, কোন কিছুই কখনো দূরে ছিলনা। এই প্রভাবের সীমান্তে অবস্থান করলেও বাংলা কিংবা চট্টগ্রাম তার বাইরে ছিলনা মোটেই। পরে যা কিছু ঘটুক না কেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুশাসন সমাজের সব শ্রেণীর মধ্যে এক রকম মজ্জাগত হয়ে ছিলো।

সমাজে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের প্রভাব

ভারতে সর্বজনীন সমাজের ওপর হিন্দু ধর্মের শক্তিশালী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় চতুর্থ ও পঞ্চম খৃষ্টাব্দে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়। এসময় ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় অনুশাসন এবং এ সংক্রান্ত অত্যন্ত বিস্তারিত পূজা-অর্চনা, যাগযজ্ঞ ইত্যাদি ব্যাপক গুরুত্ব পায় এবং ব্রাহ্মণ শ্রেণী ও সব ধর্মীয় ব্যাপারে এর একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য লাভ করে। বৈদিক যুগে প্রবর্তিত ঢিলেঢালা বর্ণাশ্রম নীতি এসময় কার্যক্ষেত্রে অত্যন্ত কড়াকড়ি রূপ লাভ করে এবং অতিক্রমযোগ্য চারটি বর্ণের স্থানে এক একটি বর্ণের মধ্যেই অসংখ্য জাতিভেদের কড়াকড়ি সৃষ্টি হলো যাদের মধ্যে শুধু অন্তর্বিবাহই ঘটতে পারে। ফলে পুরো সমাজ পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং বংশানুক্রমিক ভাবে একই জীবিকার মধ্যে আবদ্ধ থাকার ফলে

অত্যন্ত শ্রেণী-বিভক্ত হয়ে গড়ে। আজকের বাংলা সেদিন গুপ্ত সাম্রাজ্যর কেন্দ্রীয় বলয়ের অংশ ছিলনা, সেই কেন্দ্রীয় বলয় ছিল উত্তর ভারত ও বিহার অঞ্চল যেখানে ছিল গুপ্তদের রাজধানী পাটলিপুত্র। কাজেই ওই সময়ের কঠোর রক্ষণশীলতা আমাদের গন্তব্যে পুরোপুরি পৌঁছতে পারেনি যতটা ছিল ওই কেন্দ্রীয় বলয়ে। অন্য দিকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবটি এদিকটায় পুরো বাংলাতেই বেশি ছিল, স্থায়ীও হয়েছে বেশি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসানের পর প্রধানত বাংলার গৌড়কে কেন্দ্র করে যে পাল, সেন রাজ্য পূর্ব ভারতে বিস্তৃত হয়েছিলো তাদেরও রাজাদের অনেকে বৌদ্ধ ধর্মের বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, অনেকে নিজেরাও বৌদ্ধ ধর্মাবম্বী ছিলেন; পূর্ব ভারতের বড় বড় বৌদ্ধ বিহারগুলো তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই গড়ে ওঠেছিলো। বাংলার পূর্বাঞ্চলের সেদিনের রাজ্য সমতটের চন্দ্র, দেব ইত্যাদি রাজবংশের ক্ষেত্রে কথাটি আরো বেশি প্রযোজ্য। তারপরও ব্রাহ্মণকে ভূমি দান ও দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থা করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে সর্বত্র জাগরুক করে রাখার ক্ষেত্রেও তাঁদের প্রায় সবারই প্রচুর মনোযোগ নিবদ্ধ ছিলো– যা তামার পাতের খোদাই করা অনেকগুলো দানপত্রের মাধ্যমে আমরা জান্‌তে পারছি। এসব তামার পাতের লিপিতে বিস্তারিত বলা আছে রাজ সরকার কী ভাবে উর্বর ভূমি, কোন কোন ক্ষেত্রে পুরো গ্রাম, ব্রাহ্মণদের নিজেদের জন্য, তাঁদের ধর্ম-কর্ম পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য, মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দান করে গেছে এবং বংশানুক্রমে তাঁরা এর থেকে উৎপাদিত আয় ভোগ করেছেন ও এসব কাজে ব্যয় করেছেন। একই ভাবে বৌদ্ধ শ্রমণদের জন্য ও বৌদ্ধ বিহারের জন্যও দানপত্র পাওয়া গেছে।

গুপ্ত যুগের দামাদপুর তামার পাতে এবং ধনাইদহ তামার পাতে (যে অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে সে জায়গার নামে) থেকে জানা যায় ও সময় উত্তর বঙ্গে অনেক ব্রাহ্মণকে এনে প্রতিষ্ঠিত করানো হয়েছিলো। একই রকম তথ্য আরো পরের গুপ্তোত্তর কাল থেকে পাওয়া গেছে ফরিদপুর লিপি এবং ত্রিপুরা লিপি (কুমিল্লার কাছে পাওয়া) থেকে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে শত শত ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করার জন্য ভূমি দানের কথা রয়েছে। এর পর শত শত বছর ধরে এই ব্রাহ্মণরা যাতে সমাজের নানা বিষয়ের ওপর ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ রাখার কাজ করে যেতে পারেন, বিধি-বিধানে প্রতিটি লঙ্ঘনের বিষয়ে তাঁদের কঠোর রায় দিতে পারেন ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ও সামাজিক প্রত্যেকটি পদক্ষেপে অত্যন্ত জটিল পূজা অর্চনা-যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা করতে পারেন, তার ব্যবস্থার নানা প্রমাণ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে দেব-ভক্তি ছিল এখানকার মানুষের অন্তরে; এই বাংলার একান্ত নিজস্ব

সংস্কৃতির মধ্যেই হিন্দু ধর্মের দেবদেবীকে যেভাবে মূর্ত করা হয়েছে তা আমরা টের পাচ্ছি এখানে আবিষ্কৃত অনেক পোড়ামাটির ফলকে, যাতে এই দেবদেবীর পূজা অর্চনার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। একই ভাবে জানছি পাথরের ও ব্রোঞ্জের তৈরি অনেক মূর্তিতেও, যার মধ্যে সব থেকে বেশি পাওয়া গেছে মনসাদেবীর, বিষ্ণুর, বলরামের, বরাহ অবতারের, দুর্গার, সদাশিবের ও তারা দেবীর মূর্তি। সবগুলো মিলিয়ে দেখলে এসব ফলক ও মূর্তির আবিষ্কার বাংলার এক এক অঞ্চলে ও এক এক কালের বৈশিষ্ট অনুযায়ী হিন্দু ধর্মের বিকাশের ইতিহাস তুলে ধরছে। এখানে মানুষের হৃদয়ে এ ধর্মের আবেদনটি এসেছে এই দেবদেবীর প্রতি ভক্তি ও এবং সেই ভক্তি ভরে তাঁদের কাছে পূজা দানের মাধ্যমে।

কিন্তু মানুষের সামাজিক, পারিবারিক জীবনে ধর্মের প্রভাবটি বেশি পড়েছে তার কড়া অনুশাসনের মাধ্যমে। এই দীর্ঘ সময় ধরে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কিছু বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য থেকে যা গুপ্তযুগের পাটলিপুত্রে একটি শীর্ষ বিকাশে পৌঁছেছিল এবং পরেও অব্যাহত ছিল; যা তখন থেকে লিখিত রূপেই পাওয়া গেছে। এই অধিকাংশ সাহিত্য অবশ্য সরাসরি বাংলার মানুষকে নিয়ে নয়, এর পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে তো নয়ই। কিন্তু নানা সূত্রে পাটলিপুত্র বা মগধ অঞ্চলের (বিহার) সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের দিক থেকে যে যোগসূত্র ছিল, তাতে ওই পুরো অঞ্চলে তা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে প্রায় একই ভাবে প্রভাবিত করেছে বলে ধরে নেয়া যায়। তাই ওই সাহিত্যের থেকেও এখানকার অবস্থা কিছুটা আন্দাজ করা যায় বৈকি। পরবর্তী এক দীর্ঘ সময় বাংলার পশ্চিমাঞ্চল ও এই মগধ অঞ্চল একই রাজ্যের অধীনে শাসিত হয়েছে। বাংলা ভাষার সাহিত্য লিখিত রূপে আসতে অবশ্য তখনো যথেষ্ট বাকি, যদিও চর্যাপদের মাধ্যমে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে তারও কিছু কিছু আলেখ্য আমরা পেতে আরম্ভ করেছি।

এসব উৎস থেকে বোঝা যায় এই আগাগোড়া সময়ে গুপ্তযুগের জাতিভেদ প্রথা বেশ ভাল ভাবেই প্রযুক্ত হয়ে চলেছিলো– এমনকি বিশ্বাসে ও ধর্মচর্চায় যারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল অথবা খুব আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম চর্চায় মনোযোগী ছিলনা, তাদের মধ্যেও জাতিভেদ বজায় থেকেছে। এগুলো ছিল জন্মগত ভাবে একেবারে পূর্ব নির্ধারিত এর ব্যতিক্রমের সুযোগ বড় একটি ছিলনা। এর মধ্যে বহির্বিবাহকে কতখানি অসম্ভব করে তোলা হয়েছিলো তা বোঝা যায় যখন ব্রাহ্মণ নারী ও শূদ্র পুরুষের বিবাহজাত সন্তানকে একেবারে নিম্ন শ্রেণী চণ্ডালের মর্যাদা দেয়া হয়। ওই জাতিগুলোর অধিকাংশ আবার তার নিজস্ব বিশেষ জীবিকায়

আবদ্ধ যা বংশানুক্রমে পালনযোগ্য। ফলে এরকম জীবিকার সংখ্যাও হয়ে পড়েছে অতি বিশেষায়িত এবং অতি নির্ধারিত। যেমন একটি তামার পাতের আলেখ্যতে দেখা যাচ্ছে যে ওই পাত ও ওই লিপি তৈরি করতেই তিনটি আলাদা আলাদা পেশার ও জাতির মানুষ দরকার হয়েছে– কুলিক (কারিগর), কায়স্থ (লিপিকার), পুস্তপাল (তথ্য সংগ্রাহক)। এর প্রত্যেকটি পেশা শুধু বিশেষ জাতির মানুষরাই শুধু গ্রহণ করতে পারতো বংশানুক্রমে, এবং তারা শুধু নিজেদের জাতির মধ্যেই বিয়ে করতে পারে। এই ব্যবস্থা যে প্রাচীন বা মধ্য যুগে শেষ হয়ে গিয়েছিলো তা নয়, কিছু কিছু পরিবর্তন সহ এটি এই অঞ্চলে প্রায় আধুনিক কাল পর্যন্ত টিকে থেকেছে।

তামার পাতে ভূমি দান সম্পর্কে যে আলেখ্য রয়েছে সেখানে ভূমির সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের জন্য যে সম্বোধনগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। তার থেকেই দেখা যায় স্তরে স্তরে বহু বিভাজন। প্রথমত ব্রাহ্মণদেরকে সম্বোধনটি এসেছে মহত্তম, উত্তম ইত্যাদি ক্রমে। তারপর এসেছে ভূমি অধিকারী জৈষ্ঠ কায়স্থগণ– সম্বোধন হলো মহামহত্তর, মহত্তর ইত্যাদি। উচ্চ স্তরে কৃষকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে অধিকরণ কুটুম্বিন, গ্রামিক কুটুম্বিন ইত্যাদিতে; সাধারণ কৃষকদেরকে কর্ষক (চাষী) হিসেবে, এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরণের সেবাদানে নিয়োজিতদের ওপর থেকে নিচের মেদ, অন্দ্রক, এবং সবার নিচে চণ্ডাল ও পামর। এই সম্বোধনগুলো দেখা যায় শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন বলে পরিচিত একটি তামার পাতে যা সিলেটে আবিষ্কৃত হয়েছে। পূর্ব বাংলায় সমতট নামের রাজ্যের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের (দশম শতাব্দী) সময় সিলেট তাদের রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। এই আনুষ্ঠানিক দানপত্রটি সংস্কৃত ভাষায় সে সময়ের লিপিতে লিখিত যা তখনো ব্রাহ্মী থেকে বিবর্তিত নাগরীর কাছাকাছি। এই লেখা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে চন্দ্র বংশীয় রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম উভয়কেই পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁদের সমসাময়িক কালে চট্টগ্রাম হরিকেল নামের আরেকটি রাজ্যের অন্তর্গত ছিল যার অবস্থান ছিল সমতটের পূর্বে। আরাকানের ও বৌদ্ধ ধর্মের অধিকতর প্রভাবে থাকা চট্টগ্রামের মানুষের ক্ষেত্রে এই আলেখ্যে পাওয়া পরিস্থিতিগুলো হুবহু কতখানি প্রযোজ্য হবে তা বলা যাবেনা। শ্রী চন্দ্রের তাম্র শাসনের মাধ্যমে ব্রাহ্মণদের একটি মঠ ও সেই মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছু পরিমাণ ভূমিদান করা হয়েছিলো। এই ব্যয় নির্বাহের মধ্যে ওখানকার নানা কাজের জন্য বিভিন্ন পদে উপযুক্ত পেশার মানুষকে নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল, এবং তাদের প্রত্যেকের পারিশ্রমিকের জন্যও প্রয়োজনীয় ভূমি বরাদ্দ রাখা হয়েছিলো। এসব পদের যে

তালিকা দেখা যায় তাতে মনে হয় ব্রাহ্মণদের প্রশাসিত ওই মঠ ও তার সংলগ্ন ভূমি ব্যবস্থার জন্য কিছু হিসেব নিকেশ ও ভবিষ্যত ভাগ্য গণনা ইত্যাদি কাজের জন্য কিছু শিক্ষিত মানুষের পদ, অন্যদিকে নানা নির্মাণ-মেরামত ইত্যাদি কাজের উপযুক্ত কয়েক ধরনের কারিগরের ব্যবস্থা ছিল। একই ভাবে সেখানে যে ধর্মীয় ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা হবে তার সঙ্গে সঙ্গীত নৃত্য ইত্যাদি যোগের জন্য কয়েক ধরণের শিল্পীর, এবং পূজা-অর্চনায় নিয়োজিত ব্রাহ্মণদের ও অন্যান্যদের সেবা কাজে শ্রম দেয়ার জন্য কিছু সেবক-শ্রমিকের, পদও ছিল। এখান থেকে সমাজে বিভিন্ন পেশার বিভিন্ন স্তরের মানুষদের কাজ ভাগের ব্যবস্থার একটি ধারণা যেরকম পাওয়া যায়, তেমনি তাদের প্রত্যেকের তুলনামূলক বরাদ্দ দেখলে সমাজে তার কাকে কতখানি মূল্য দেয়া হতো তারো একটি ধারণা জন্মে। বরাদ্দের ক্রমানুযায়ী তাম্রশাসনে উল্লেখ করা পদগুলো দেয়া হলো:

শিক্ষিত পেশাজীবী: কায়স্থ, গণক (জ্যেতিষী)। কারিগর: মালাকর (সজ্জার কাজে), তৈলিক (কলু), কুম্ভকার (কুমোর), চর্মকার, সূত্রধর (ছুতোর মিস্ত্রি), স্থপতি (ঘরামি), কর্মকার (কামার)। শিল্পী: কাহলিক, শঙ্খ বাদক, ঢক্কর বাদক, (ঢাকি), নট। সেবক-শ্রমিক: চেট্টিকা (চাকরানী), নরসুন্দর (নাপিত) রজক (ধোপা)। শিক্ষিতদের বরাদ্দ সব চেয়ে বেশি, সেবক-শ্রমিকদের সব চেয়ে কম, প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে আগের দিকের গুলোর বরাদ্দ, পরের দিকের থেকে বেশি। কিন্তু এর মধ্যে ব্যতিক্রম রয়েছে– যেমন চেট্টিকার বরাদ্দ যে কোন কারিগরের থেকে বেশি; মনে হয় পুরো আয়োজনে তার একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আরো একটি বিষয় বোঝা যায় যে মন্দির-মঠকে কেন্দ্র করে বেশ বড়সড় আনুষ্ঠানিক সংগঠন কাজ করতো এবং ব্রাহ্মণরাই ছিল তার মালিক, ধারক-বাহক। সমাজের অনেকের জীবন এবং রুটিরুজি এই ধর্মীয় আয়োজনকে আশ্রয় করেই চল্‌তো এবং সমাজকে তার অনুশাসন মেনেই চল্‌তে হতো।

তবে এটি ঠিক যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে থাকার সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জাতিভেদ এবং এর আনুষ্ঠানিক যাগযজ্ঞের যে বড় ও জটিল আয়োজনের শৃঙ্খলাটাই সবার ওপরে বড় হয়ে দেখা দিতো, এর পরের সময়ের অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী রাজাদের শাসনে তার ধার কিছুটা কমে গিয়েছিলো– অন্তত বাংলার নানা অঞ্চলে। বৌদ্ধ ধর্মের একটি বড় প্রভাব এতে ছিলো, বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে তখন জৈন ধর্মেরও বেশ খানিকটা প্রভাব ছিল; জৈন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের সমসাময়িক কালে উদ্ভূত হয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিপরীতে ভারতের, বিশেষ করে পশ্চিম ভারতের, একটি প্রধান ধর্মে পরিণত হয়েছিলো। বাংলায় এর প্রভাব পরে প্রায়

লোপ পেয়েছে বটে, কিন্তু ভারতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা কার্যত না থাকলেও জৈন ধর্ম এখনো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব ছাড়াও গুপ্ত পরবর্তী কালে হিন্দু ধর্মের মধ্যেও অনেক জনবান্ধব ভক্তিবাদী ধর্মীয় আন্দোলন সৃষ্টি হওয়াটি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কড়াকড়ি কমার আরো একটি কারণ ছিল– বিশেষ করে বাংলায় যার প্রভাব ছিল বেশি। এর মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব, ভক্তি ও তান্ত্রিক ভাবধারা উল্লেখযোগ্য। যে সব পোড়ামাটির ফলক, পাথরের ও ব্রোঞ্জের মূর্তির আবিষ্কারের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে তাতেই তার প্রমাণ মেলে। আরো পরে বাংলা সাহিত্যে পদাবলীগুলোতে প্রাচীন আর্য ধর্মের তুলনায়, এমনকি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায়, এখানে যে হিন্দু ধর্মের একটি অপেক্ষাকৃত নমনীয় ও ভাববাদী রূপ বিকশিত হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে মানুষের ধর্ম-চেতনা, ভক্তি ইত্যাদিতে এসব উদারপন্থী ধর্ম ও ধর্মীয় আন্দোলন যথেষ্ট জায়গা পেলেও যেখানে পারিবারিক ও সামাজিক নিয়ম নীতি শৃঙ্খলার প্রশ্ন উঠ্‌তো তখন সামাজিক বিচারে এবং রাজকীয় আইনের বিচারেও ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন থেকে খুব বেশি দূরে যাওয়া সম্ভব হতোনা। বিশেষ করে বিয়ের নিয়ম, নারী-পুরুষের আপেক্ষিক স্থান ও অধিকারের নিয়ম এসবের রক্ষণশীলতা অনেকটা গুপ্ত যুগেই থেকে গেছে বরাবর। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম বা হিন্দু ভাববাদী চেতনার দিক থেকে ধর্মপালন, সদাচরণ, নির্বাণ বা মোক্ষ লাভ, দেব-প্রেম, ইত্যাদির ওপর প্রচুর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও তা ওই পারিবারিক নিয়ম, নারী-পুরুষের বাস্তব অধিকার ইত্যাদি নিয়ে স্পষ্ট কোন বিধান দেয়নি। সেখানে মনুর বিধানই অনেকটা অপ্রতিহত ছিলো। হিন্দু ধর্মে দেবীকে অনেক উচ্চাসন দেয়া হয়েছে, বিশেষ করে বাংলায়তো বটেই; কিন্তু নারীকে আনুষ্ঠানিক ধর্ম চর্চার দায়িত্ব বা অধিকার কোনটি দেয়া হয়নি। কার্যত বৌদ্ধ ধর্মেও তাই ছিল। এর প্রতিফলন পরিবারেও পড়েছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম মোটের ওপর একটি কড়া পুরুষতান্ত্রিক সমাজই প্রতিষ্ঠা করেছিলো; অবশ্য এর ব্যতিক্রম বড় বড় ধর্মগুলোর কোনটাতেই কখনো তেমন দেখা যায়নি– ভারতেও নয়, পুরো দুনিয়াতেও নয়। মনুর বিধান অনুযায়ী বাংলা সমাজেও স্বামীর সেবা স্ত্রীর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল। নিজ জাতির বাইরে গিয়ে অসবর্ণ বিবাহকে প্রায় অসম্ভব করা হয়েছে। নারীর দ্বিতীয় বিয়ের কোন সুযোগ ছিলনা, বিধবারও নয়। অন্য দিকে ব্রাহ্মণ প্রমুখ অভিজাত কিছু গোষ্ঠিতে পুরুষদের একাধিক পত্নী রাখার বিধান ছিল। ভার্যাসপ্তগতি নামক সংস্কৃত কাব্যের একটি অংশ সপত্নী সম্পর্কে নারীকে মন খারাপ না করার উপদেশ দিয়েছে যা বাংলা অনুবাদে এরকম দাঁড়ায়;

‘কোলে শিশুপুত্র, চরণে সেবাদাসী, পৃষ্ঠপোষক রূপে প্রিয় স্বামী থাক্‌তে হে গৃহিণী তোমার আর অভাব কী? এই নতুন আসা বালিকা বধূকে তুমি ভয় করছো কী কারণে?’

গুপ্ত যুগে কালিদাস প্রমুখের সংস্কৃত নাটকের সংলাপে সংস্কৃত ব্যবহার করেছে শুধু অভিজাত পুরুষরা। আর ওই একই অভিজাত পরিবারের নারীরা মাগধী ও অন্যান্য প্রাকৃত ভাষায় সংলাপ করেছে, যা কিনা আভিজাত্যে এক ধাপ নিচের পুরুষদেরও সংলাপের ভাষা ছিল। কাজেই স্তর বিভাজনে কে কোথায় তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। অন্য দিকে চর্যাপদ ইত্যাদির সূত্র থেকে দেখা যায় অভিজাত গৃহিণীর সপত্নী পরিবেষ্টিত পরিস্থিতি প্রান্তিক জনগোষ্ঠির নারীদের মধ্যে মোটেই ছিলনা। তারা এক ভাবে ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের বাইরে থেকে পারিবারিক পূজা থেকে শুরু করে শিকার, আমোদ প্রমোদে পুরুষদের সঙ্গে অংশ নিচ্ছে। কিন্তু এটিও সাধারণ গেরস্ত পরিবারের চিত্র নয়। গেরস্ত পরিবারের নারীরা উচ্চ শ্রেণীর নারীদের মত সেবাদাসীর সেবার ও স্বচ্ছলতার নিরাপত্তাও পেতোনা, আবার প্রান্তজনা নারীদের মত পুরুষের পাশে সম অধিকারে থেকে সংগ্রামের সুযোগও পেতোনা– পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মধ্যেই নিয়ম কানুনের হাজারো সংস্কার মেনে চলাই যেন ছিল তাদের কাজ।

জাতিভেদের যে কড়াকড়ি অনুশাসন প্রাহ্মণ্য ধর্ম কড়াকড়ি ভাবে দীর্ঘকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো বৌদ্ধ ধর্ম সে ব্যাপারে স্পষ্ট বিধান দেয়নি, তাই পুরো সমাজেই তা বিস্তৃত ছিল। পরবর্তী কালে ইসলাম ধর্ম বাংলায় বিস্তৃত হলে এবং তাতে জাতিভেদের বদলে সামাজিক সাম্যের বাণী স্পষ্ট ভাবে থাকলেও, মুসলিম সমাজও তার থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। একই কথা মুসলিম সমাজে নারীর অধিকারহীনতার ব্যাপারেরও প্রযোজ্য। কার্যত সমাজের ওপর এই দিকটিতেও সব ধর্মের একই রকম ফল ছিল।

বৌদ্ধ ধর্মের সামাজিক প্রভাব চট্টগ্রামেই শেষ পর্যন্ত টিকে থেকেছে

খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে প্রবর্তনের পর পরই বৌদ্ধ ধর্মকে মানুষের কাছে নেবার চেষ্টা চলেছে। অশোক লিপির বাণী সেই চেষ্টারই অংশ হিসেবে আমরা দেখেছি– যা সারা ভারতে বিস্তৃত ছিল। সেই থেকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রায়শ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। যে গুপ্ত সাম্রাজ্য ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন তার চরম রক্ষণশীলতা লাভ করেছে, সেখানেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা একই সঙ্গে অব্যাহত ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্রভূমি মগধ গুপ্ত সাম্রাজ্যেরও কেন্দ্র ছিল।

এখানে কুশী নগরে বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির এবং নালন্দা মহাবিহার গুপ্ত সম্রাটদের উদ্যোগেই স্থাপিত হয়েছিলো। কিন্তু এটিও ঠিক যে এর আগে প্রায় হাজার বছর ধরে বুদ্ধের বাণী যে ভাবে তাঁর জন্মভূমির এ অঞ্চলটিতে মানুষের জীবনকে স্পর্শ করছিলো, সেই জনপ্রিয়তায় ইতোমধ্যেই তখন ভাটার টান দেখা গিয়েছে। গুপ্ত যুগ থেকে শুরু করে বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান নামক মতবাদটি প্রতিষ্ঠিত হয় যাতে নানা রকম আনুষ্ঠানিক শাস্ত্রীয় ও ধর্মীয় সাধনা যুক্ত হয়। সাধারণ মানুষকেও নির্বাণ লাভের পথে নানা রকম আচারের শিক্ষা দেয়া হয়, যার মধ্যে রয়েছে বহু সংখ্যক বোধিসত্ত্বের প্রতি পূজা দেবার রীতি। বোধিসত্ত্বরা হলেন নির্বাণ লাভে সফল সাধকরা যাদের ওপর এক রকম বুদ্ধত্বই আরোপ করা হয়েছে এবং বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও মূর্তি গড়ার রীতি প্রচলিত হয়। আগেকার বৌদ্ধ ধর্ম বাণীর সারল্য কমে গিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মাচারের দিক থেকে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সীমারেখাটি ক্রমে কমে এসেছিলো। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের মধ্যে অবশ্য এর স্বতন্ত্র চর্চা অব্যাহত থাকে– যা মহাবিহার ও বিহারগুলোতে শত শত ছাত্র-শিক্ষক, ভিক্ষু, শ্রমণদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার বিবরণী থেকে বোঝা যায়; পালি সাহিত্যেও তার পরিচয় রয়েছে।

গুপ্ত সম্রাটরা এবং গুপ্তোত্তর কালে মগধ অঞ্চলের শাসকরা বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার এরকম নীতি চালিয়ে গেছেন। গৌড় কেন্দ্রিক বাংলার রাজন্যরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দ্বারা সত্যিকার গ্রামে গ্রামে সমাজকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করার পরিবেশকে দীর্ঘ মেয়াদী ভূমিদান ও ব্রাহ্মণ বসতের মাধ্যমে শক্তিশালী করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিও তাঁদের যে পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত ছিল সেটি কিন্তু শাস্ত্র চর্চার কেন্দ্র হিসেবে বিহারগুলোতেই শুধু কেন্দ্রীভূত ছিল– সাধারণ সমাজকে কতখানি প্রভাবিত করছিলো তা বলা মুস্কিল। এর পরিচয় সব চেয়ে ভাল পাওয়া যায় বাংলার দীর্ঘ পাল শাসনের সময়, যার একটি বড় সময় এ শাসন বিহার-উড়িষ্যা ইত্যাদি অঞ্চলেও বিস্তৃত ছিল। পাল রাজা গোপাল (সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে) উদন্তপুরের মহাবিহার, ভাগলপুরের কাছে বিক্রমশীলা মহাবিহার (উভয়ে বর্তমান বিহারে) এবং এর কিছু পর দেব পাল সোমপুর মহাবিহার (বাংলাদেশের পাহাড়পুরে) স্থাপন করেন। পাল বংশের শেষের দিকের রাজা রামপাল দ্বাদশ শতাব্দীতে স্থাপন করেন জগদ্দল মহাবিহার (সোমপুর মহাবিহারের মত এটিও বাংলাদেশের নওগাঁ জেলায়)। নালন্দা, উদণ্ডপুর, বিক্রমশীলা, সোমপুর ও জগদ্দল- এই পাঁচটিকে সে সময় মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের সবচেয়ে বড় চর্চাকেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হতো। যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়

পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই পাঁচটির কার্যক্রম এক সূত্রে গাঁথা ছিল, এবং এদের জন্য একটি সমন্বিত পরিচালনা ও আর্থিক ব্যবস্থা ছিল। এমনকি পাল শাসনের পর দক্ষিণ পশ্চিম ভারতের কর্নাটকের থেকে আসা সেন বংশীয় ব্রাহ্মণ শাসকদের রাজত্বেও বিহারগুলোর প্রতি একই পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত থাকে। অথচ সাধারণ মানুষের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব তখন একেবারে স্তিমিতই বল্‌তে হবে, শুধু বাংলার একেবারে পূর্বাঞ্চলে হারিকেল রাজ্যে, বিশেষ করে তার চট্টগ্রাম অংশে ছাড়া।

পূর্বাঞ্চলে আরো একটু আগের সময়ে চলে যাই যখন ওখানকার আরেক রাজ্য সমতটে দেব বংশীয় রাজারা রাজত্ব করেছেন (সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী)। তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি এতই অনুরাগী ছিলেন যে শুধু কুমিল্লার শালবন বিহার স্থাপন করেননি, বরং ওখানে এবং কাছাকাছি লালমাই পাহাড় অঞ্চল থেকে পাওয়া নিদর্শন বল্‌ছে ওখানে একটি সমৃদ্ধ বৌদ্ধ সংস্কৃতির অস্থিত্ব ছিল যা শুধু বৌদ্ধ-বিহারে শ্রমণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। অষ্টম শতাব্দীতে পাল রাজাদের সমান্তরালে পূর্বাঞ্চলে চন্দ্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল, শুরুতে কুমিল্লা-লালমাই থেকে চট্টগ্রাম; পর্যন্ত পরে যা একদিকে হরিকেল (সিলেট) এবং অন্যদিকে চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিলো বিক্রমপুরে (মুনশীগঞ্জ) রাজধানী করে। এই চন্দ্র বংশীয় রাজারাও বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন এবং আগে উল্লেখিত বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। এই চন্দ্র রাজারা আবার আরাকানের চন্দ্র বংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন যাঁরা দশম শতাব্দী পর্যন্ত আরাকান শাসন করেছেন।

এই পটভূমি বলে দিচ্ছে যে ভারতের সর্বত্র এবং বাংলার পাল-সেন শাসনে বৌদ্ধ ধর্মের সামাজিক অস্থিত্ব যখন ক্রমাগত স্তিমিত হচ্ছিলো বাংলার পূর্বাঞ্চলে তার পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ব্রাহ্মণ সেন রাজাদের প্রত্যক্ষ ব্রাহ্মাণ্য প্রভাবে এবং আরো পরে মুসলিম শাসনে পৃষ্ঠপোষকতাটি একেবারে লোপ পেলে এখানেও বৌদ্ধ ধর্মের একই পরিণতি ঘটে– শুধু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া; সেটি হলো চট্টগ্রাম, যার ভাগ্য তখন আরাকানের ভাগ্যের সঙ্গে অনেকটা গ্রথিত ছিল। প্রথমে সেন শাসন ও পরে মুসলিম সুলতানী শাসন উভয়ের জন্য সেটি ছিল একটি প্রত্যন্ত সীমান্ত অঞ্চল। সুলতানরা মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম দখল ও শাসন করলেও আরাকানী প্রভাব বার বার ফিরে এসেছে, এবং বৌদ্ধ প্রাধান্য সেখানে অব্যাহত ছিল।

বার্মায় আর আরাকানে বৌদ্ধ ধর্মের বাণী প্রায় বুদ্ধের সময় থেকেই বিস্তৃত হয়েছিলো এবং সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত ছিল। সেই আরাকানের জনজীবনে যেমন বৌদ্ধ ধর্মের সরাসরি প্রভাব ছিল অনেকটা তারই অনুসরণে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠির ওপরও তার সরাসরি সামাজিক প্রভাব ছিল, নেহাৎ বিহার-কেন্দ্রিক চর্চায় তা সীমাবদ্ধ ছিলনা। এখানকার জনগোষ্ঠিতে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম উভয়েই পাশাপাশি যেমন ছিল তেমনি প্রধানত আরব ধর্ম প্রচারকদের কারণে এখানে ইসলাম গ্রহণকারী মানুষের সংখ্যা দশম খৃষ্টাব্দ থেকেই বেড়ে ওঠেছিলো– যা বাংলায় মুসলিম শাসন শুরু হবার অনেক আগে। কাজেই পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে ওই তিন ধর্মের জনগোষ্ঠিই নিজ নিজ সামাজিক বাতাবরণে বাস করতে পেরেছে। বাংলায় যখন সুলতানী শাসন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত তখনো চট্টগ্রাম এই শাসন কর্তৃপক্ষ ও আরাকানী রাজাদের মধ্যে একটি সংঘাতের জায়গা হিসেবে বিরাজ করছিলো, বাংলায় মোগল শাসনের প্রথম দিকেও সেই সংঘাত একই ভাবে চল্‌ছিলো। এর মধ্যে পর্তুগীজরা আর একটি পক্ষ হিসেবে যোগ দেয়াতে চট্টগ্রামের ওপর কারো একক কর্তৃত্ব বহুদিন প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

কোন কোন ইতিহাসবিদ মনে করেন চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও সমাজ তিনটি বিভিন্ন স্রোতের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিলো। বাংলার বাকি অঞ্চল বিশেষ করে সমতট ও হরিকেল রাজ্যের বৌদ্ধ সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট স্থানীয় বৌদ্ধ জনগোষ্ঠি; আরাকানী বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে লালিত যারা চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল; বৌদ্ধ ধর্মের আদি ভূমি মগধ অঞ্চলে এর প্রভাব স্তিমিত হয়ে পড়লে ওখান থেকে যে প্রচুর বৌদ্ধ চট্টগ্রামে অভিবাসী হয়েছিলো। এই তিনের প্রত্যেকটিতে বেশ কিছু স্বাতন্ত্র্য যেমন ছিল তেমনি যথেষ্ট সংমিশ্রণ ও সহযোগিতাও ছিল। কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন যে মগধ থেকে আসা অভিবাসীরা মহাযান বৌদ্ধ ধর্মে নিজেদের কিছু কৌলীন্য দাবী করতেন এবং এ কারণে বড় আর্য বা বড়ুয়া নাম-পদবী গ্রহণ করেন। সেখান থেকেই চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের নামের সঙ্গে বড়ুয়া পদবীটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাছাড়া মগধ থেকে আসা অভিবাসীদের সম্পর্কই চট্টগ্রামের বৌদ্ধদেরকে মগ্ নাম অভিহিত করার আদি কারণ ছিল– যেটিকে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এর অনেক পরে। মূলত স্থানীয় বৌদ্ধ ও মগধ থেকে আসা অভিবাসী উভয়েই মহাযান শাখার অনুসারী হলেও কালক্রমে প্রধানত আরাকানী প্রভাবে এবং বার্মার প্রভাবে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ধর্ম আরাকানে ও বার্মায় প্রচলিত হীনযান বা তেরাভাদা শাখার

অনুসারীতে পরিণত হয় এবং সেখানকার বৌদ্ধ ধর্ম পালন রীতির সঙ্গে অধিকতর সংযুক্ত হয়। তেরাভাদা শব্দটির অর্থ হলো আদি গুরুর পথ– বুদ্ধের আদি বাণীতে ফিরে গিয়ে এর সরল মর্মার্থটিকেই বড় করে তোলা তার লক্ষ্য। সংসার ত্যাগী ভিক্ষুরাই (যারা মানুষের ভিক্ষার অন্নের ওপর নির্ভর করে) সত্যিকার অর্থে বুদ্ধের অষ্ট মার্গের মাধ্যমে (সৎ চিন্তা, সৎকর্ম ইত্যাদি) নির্বাণ লাভ করতে পারেন– তাই এই সমাজে ভিক্ষুদের সম্মান খুব উচ্চে; কিন্তু সাধারণ মানুষও অন্তত কিছুদিনের জন্য ভিক্ষুর ব্রত গ্রহণ করার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে এতে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়।

তবে নানা রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ফলে এখানকার বৌদ্ধ ধারাকেও নানা ভাবে সমঝোতা করে চলতে হয়েছে– বিশেষ করে মোগল আমলের শুরুর দিকে যখন আরাকান রাজ আর মোগলদের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত অবস্থায়। মোগলদের চোখে আরাকানীরা ছিল দস্যু, আর দস্যু অর্থে মগ্ শব্দটির ব্যবহার তখন থেকে (যেমন মগের মুলুক)। আরাকানীদের সঙ্গে ধর্মগত সংশ্রবের কারণে পাছে অন্যান্য বৌদ্ধদেরকেও মোগলরা সন্দেহের চোখে দেখে সেজন্য ধীরে ধীরে চট্টগ্রামের অন্যান্য বৌদ্ধরা আরাকানী বৌদ্ধদের সঙ্গে একটি দূরত্ব সৃষ্টিতে বাধ্য হয়, এবং তাদের আরাকানী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে অনেকখানি ত্যাগ করে। উদাহরণ স্বরূপ এখানকার বৌদ্ধদের মধ্যে নামের পদবী বা পারিবারিক নাম হিসেবে মনফ্রু, সাচানফ্রু, নন্দিতাফ্রু ইত্যাদি জনপ্রিয় বৈচিত্র থাকলেও মোগল আমলে এসব নামের আরাকানী উৎসের কারণে এরকম সব পদবীর বদলে একই বড়ুয়া পদবী বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে– বড়ুয়া চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের প্রায় সাধারণ পদবীতে পরিণত হয়। তাছাড়া মোগল প্রশাসনে বিভিন্ন চাকরী গ্রহণের ফলে মুৎসুদ্দি, তালুকদার, চৌধুরী ইত্যাদি পারিবারিক নামও স্থানীয় বৌদ্ধদের মধ্যে দেখা দেয়। চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব এড়াতে পেরেছে বটে কিন্তু রাজনৈতিক সংঘাতের প্রভাব এড়াতে পারেনি– আরাকানী বৌদ্ধ সংঘ থেকে তাদের নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে হয়েছে মোগল শাসনের কারণে। পর্যায়ক্রমে আরাকানের সঙ্গে প্রথমে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, সেখান থেকে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, এবং তারপর ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে।

বাংলার পূর্বাঞ্চলে মুসলিম কৃষক সমাজ সৃষ্টি

প্রথম যুগের মুসলিম জনগোষ্ঠিঃ

বাংলায় মুসলিম জনগোষ্ঠির শুরুটি মোগল আমলের বহু আগেই হয়েছিলো, ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে এখানে মোগল আমল সৃষ্টির কালে এই জনগোষ্ঠি নেহাৎ কম ছিলনা– যদিও কোথাও হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। শুরুটি ঘটেছিলো কোন ধরনের মুসলিম শাসক এখানে আসার বহু আগে– প্রধানত আরব বণিক আর ধর্ম প্রচারকদের মাধ্যমে। একেবারে পূর্বাঞ্চলে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়েই তাদের বড় প্রবেশ ঘটেছিলো দশম শতাব্দীরও আগে– তাই এই প্রক্রিয়ার মুসলিম জনসংখ্যা বেশি গড়ে ওঠেছিলো চটগ্রামে ও পূর্বাঞ্চলের অন্যত্র নোয়াখালী ইত্যাদি উপকূল অঞ্চলে, কোন কোন ক্ষেত্রে আরো দূরে যেমন সিলেটে। তবে ক্রমে এখান থেকে বাংলার পুরোটা পূর্বাঞ্চলে, নানা অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে জনবসতি পূর্ণ জায়গায়, ইসলাম ধর্ম বিস্তৃত হয়েছিলো। একই রকম ভাবে আরাকানের আকিয়াব বন্দর ও সংলগ্ন উপকূল দিয়েও আরবরা এসেছিলো। এই উভয় আগমনের কিছু বর্ণনা আদি মধ্য যুগের আরাকানী বর্ণনায় পাওয়া যায়– এতে ধর্ম প্রচারক আউলিয়াদের কথা, তাঁদের সঙ্গে আসা অভিবাসীদের কথা, চট্টগ্রাম ও আরাকান উভয় উপকূলে একটি ক্রম-বিস্তৃত মুসলিম জনগোষ্ঠির কথাও বলা হয়েছে। একই আরাকানী উৎসে স্থানীয় একজন মুসলিম নেতার 'সুলতান' উপাধি নিয়ে অস্থায়ী শাসক হয়ে বসার কাহিনীও আছে। আসলে ধর্ম প্রচারক, বণিক, এবং অন্যান্য যাঁরাই আরব অঞ্চল থেকে এখানে এসেছিলেন তাঁদের অনেকে আর ফিরে যায়নি– এখানকার মানুষের সঙ্গেই মিশে গিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে সে সময়ের সমুদ্র যাত্রা এই আস্‌লাম আর এই গেলাম প্রকৃতির ছিলনা, আসা কঠিন ছিল, যাওয়াও কঠিন হতো অনেক সময়। এভাবে খুব ব্যাপক আকারে না হলেও নতুন একটি বিদেশি জিন-মিশ্রণ এই অঞ্চলে ঘটেছে। চাটগেঁয়ে ভাষার চট্টগ্রাম অঞ্চলের রূপ এবং রোহিঙ্গা রূপ উভয়ের মধ্যে আরবী শব্দের তুলনামূলক আধিক্যও এতে সাক্ষ্য দেয়– মনে হয় যে এই অঞ্চলের অন্যান্য মুখের ভাষায় আরবী শব্দ এখান থেকেই প্রবেশ করেছে। চট্টগ্রামকে বলা হয় বার আউলিয়ার দেশ– বার সংখ্যাটি বলা হলেও এই আউলিয়াদের সংখ্যা অনেক– শুধু সব থেকে বিখ্যাতদের দরগাগুলোই এখনো ভক্তদের কেন্দ্র। মূল চট্টগ্রাম শহরের প্রতিষ্ঠাতা-আউলিয়া বলা হয় পীর বদর শাহকে যাঁর অতি প্রাচীন মাজার শহরের পুরাতন কেন্দ্রস্থলে। আউলিয়াদেরকে অনুসরণ করে এসেছিলেন এবং এদেশকে নিজের দেশ করে নিয়েছিলেন আরো অনেকে; তাঁদের স্থানীয় ভক্ত প্রচারকদের

সংখ্যাও কালক্রমে পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলো। ইসলাম ধর্মের সঙ্গে এভাবে কিছু মধ্যপ্রাচ্যীয় জিনও এখানে বেশ আগেভাগেই প্রবেশ করেছিলো বৈকি।

মরক্কোর বাসিন্দা পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৪৬ সালের জুলাই মাসে মালদ্বীপ থেকে একটি চীনা পালতোলা জাহাজে এসে চট্টগ্রাম বন্দরে নামেন। এখানে আসার তাঁর মূল কারণ ছিলো সিলেটে গিয়ে হযরত শাহ জালালের সঙ্গে দেখা করা– যাঁর কথা তিনি মধ্যপ্রাচ্য থেকেই শুনে এসেছিলেন, এবং যা শুনেছিলেন তাতে তাঁকে দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে নদীপথে ও স্থলপথে কী ভাবে সিলেট পৌঁছলেন এবং তাঁর আরাধ্য মানুষটির সঙ্গে দেখা করলেন তার বর্ণনা তিনি তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে লিখে গিয়েছেন। সেখানে এই সাধকের ভক্তকূলের পরিচয় তিনি পেয়েছেন– চট্টগ্রামে, সিলেটের পথে, সিলেটে, সেখানে থেকে সোনারগাঁওয়ের পথে। তাঁদের অনেকে মুসলিম, অনেকে অমুসলিম ভক্ত। একটি কথা আন্দাজ করা যায়, যদিও তখন বাংলায় মুসলিম সুলতানী শাসন চল্‌ছে এবং সেই শাসন ব্যবস্থার সঙ্গেও অনেক মুসলিম জনগোষ্ঠি জড়িত আছে, এই যে মুসলিম জনগোষ্ঠির দেখা সিলেটে যাওয়া আসার পথে ইবনে বতুতা দেখেছেন তাদের মুসলিম হওয়াটি এই সুলতানী শাসনের কারণে ঘটেনি, বরং বদর শাহ, শাহ জালালের মত আউলিয়াদের দীর্ঘকালীন ধর্ম প্রচার ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণের কারণে ঘটেছে। তাঁদের বাণী ছিল প্রধানত সুফী দরবেশের বাণী, শাসকের বাণী নয়।

এই মুসলিম জনগোষ্ঠিই বেশ কয়েক শত বছরের বিস্তৃতির মাধ্যমে বাংলার সাধারণ জনগোষ্ঠির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য জায়গা দখল করেছিলো– এমনকি পূর্ব বাংলার নদী প্লাবিত, বন আকীর্ণ দুর্গম অংশেও। ইবনে বতুতা চট্টগ্রামকে গঙ্গার মোহনার বন্দর বলে ভুল করেছিলেন, সে জন্য এর নাম হিসেবে ব্যবহার করেছিল সাত্ এল গাঙ্গ (আরবীতে গঙ্গা নদী)– অনেকে চাটগাঁও নামটি ওখান থেকে এসেছে মনে করেন। এই ভুলের কারণ এর আগের চীনা পর্যটকদের লেখায় চট্টগ্রামকে গঙ্গার ধারে বলে ধরে নেয়াটিও হতে পারে।

এয়োদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে আফগান-তুর্কি বখতিয়ার খিলজি বাংলা আক্রমণ করে সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করার পর থেকে বাংলার একাংশে মুসলিম রাজত্বের সূত্রপাত হয়। এইভাবে যে মুসলিম সুলতানী আমল সৃষ্টি হয় তার ফলেও অন্যরকম আর একটি মুসলিম জনগোষ্ঠি এখানে সৃষ্টি হয়েছিলো। মুসলিম শাসকদের পারিষদ, অমাত্য ও নানা রকম শাসক পদ পাওয়ার আশায়, অথবা নেহাৎ ভাগ্যান্বেষণে তুর্কি, আফগান, ও মধ্যএশিয়ার

নানা অঞ্চলের বেশকিছু মানুষ এখানে আসে। অনেকে ভারতের অন্যান্য অংশে আগে থেকে এসেছিলো বংশানুক্রমে এখানেই বাস করছিলো, সেখান থেকে এদিকে আসে। মুসলিম শাসকদের সব অমাত্য যে এভাবে এই আগন্তকদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হতো তা কিন্তু নয়– এ শাসকদের শাসন নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রায়ই স্থানীয় নানা ধর্মের প্রতিশ্রুতিশীল মানুষরাও বড় বড় পদে নিযুক্ত হয়েছেন; গোঁড়া ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে অনেকে স্থানীয় শাসক, মন্ত্রী, এমনকি প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও নিয়োগ পেয়েছেন। কাজেই নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে ওই তুর্কি-আফগান-পারসিক যাঁরা এখানে উচ্চ পদের আশায় এসেছেন সবাই যে সফলকাম হয়েছেন তা বলা যাবেনা– তবে অনেকে হয়েছেন। অনেকে বিচার বিভাগে কাজী, আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছেন, অনেকে হেকিম হয়ে চিকিৎসক হিসেবে, অনেকে মোল্লা হিসেবে ধর্মতত্ত্ববিদ হয়েছেন; পণ্ডিত, ইতিহাসবিদ, শিক্ষক ইত্যাদি নানা পেশাও তাঁরা গ্রহণ করেছেন। বংশানুক্রমে তাঁদের বেশির ভাগই এদেশের মানুষ হয়ে গেছেন, যদিও অধিকাংশই ফারসি-তুর্কি ইত্যাদি ভাষা নিয়ে, ভিন্ন সংস্কৃতি নিয়ে, মূলধারা থেকে একটু আলাদাই থেকেছেন বহুকাল। তাছাড়া তাঁদের অধিকাংশের বাস ছিল শহরে বন্দরে, প্রধানত রাজধানী শহরে; আর নিজেদের মধ্যে এক রকম আভিজাত্যের অভিমান তাঁদেরকে মুসলিম সমাজের 'আশরাফ' (অভিজাত) শ্রেণীতে আলাদা করে রেখেছিলো। দিন যত গেছে ততই এ রকম আশরাফরাও বৃহত্তর সমাজে মিশে যাওয়ার কিছু কিছু কারণ ঘটেছে। স্থানীয় মানুষদের ভাষা গ্রহণ করে এবং বৈবাহিক সম্পর্কে তাদের সঙ্গে একাকার হয়ে বাংলায় মুসলিম জনগোষ্ঠির সৃষ্টিতে তাদেরও একটি অবদান ছিল, কিন্তু সংখ্যায় বা বিস্তৃতিতে তারা ধর্ম প্রচারক-দীক্ষিত মুসলিমদের বংশধরদের সমান ছিলনা। শুধু চট্টগ্রামের কথাই যদি বলি প্রধানত শহরাঞ্চলে বেশ কিছু পরিবার এখনো ওই মধ্যএশীয় আগন্তকদের থেকে নিজেদের বংশ পরিচয় দাবী করেন, এবং অতীতে অন্তর্বিবাহের মাধ্যমে এই কৌলীন্যের দাবী বজায় রাখার চেষ্টা করে এসেছেন, যত দিন সম্ভব ছিল।

মুসলিম কৃষক সমাজ সৃষ্টিঃ

আগাগোড়া সুলতানী শাসনের সময় মুসলিম সংখ্যাবৃদ্ধি সুলতানদের রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের মধ্যে ছিলনা– জোর করে সংখ্যা বৃদ্ধি তো নয়ই। বরং তাঁদের নীতি ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এমন ভাবে পরিচালিত করতে পারা যাতে শান্তিপূর্ণ শাসন ও অধিক কর আদায় সম্ভব হয়। আপাতত এটি হিন্দু

ভূস্বামী এবং ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেই ভাল ভাবে সম্পন্ন হচ্ছিলো। তাছাড়া সাধারণ শিক্ষিত, স্বচ্ছল মানুষদের সঙ্গে সুসম্পর্কও তাঁদের লক্ষ্য ছিল। এটি বিশেষ ভাবে স্পষ্ট ছিল শেষের দিকের বাংলার স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ, আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মত গুরুত্বপূর্ণ সুলতানদের আমলে। সে কারণে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি এবং সাহিত্য তাঁদের কাছে উৎসাহ পেয়েছে– বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের বিকাশ, এবং দেশীয় ধর্মীয় ভক্তিবাদ ইত্যাদি তাঁদের কাছে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। কাজেই রাজানুগ্রহ পাওয়ার জন্য দলে দলে মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েছিলো এমন চিন্তা ধোপে টিকেনা। পূর্ব বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টির বিষয়টি ঘটেছে আরো পরে মোগল আমলে ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে এবং তারও পরে; আর এটি ঘটেছিলো পরিবেশ পরিবর্তন, মোগল কৃষিনীতি, সামাজিক পরিস্থিতি ইত্যাদি কয়েকটি জিনিসের একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণের ফলে।

খৃষ্টপূর্ব কাল থেকেই বাংলার পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা স্যাঁতসেতে অথবা পানিতে ডোবা বনভূমিতেই ভর্তি ছিল, যে কারণে পশ্চিমের সাম্রাজ্যগুলো এদিকে তেমন বিস্তৃত হতে পারেনি। মধ্যযুগে একটি ভৌগলিক পরিবর্তনের ফলে অবস্থার আরো অবনতি হয়েছিলো। সে পর্যন্ত গঙ্গা নদীর প্রধান স্রোত ছিল হুগলি নদীর মধ্য দিয়ে, কিন্তু ও সময় গঙ্গা গতি পরিবর্তন করে যাতে তার প্রবাহের বড় অংশ পদ্মা নদী হয়ে পূর্বাঞ্চলে চলে আসে। পদ্মার প্লাবন পূর্বাঞ্চলের স্যাঁতসেতে পরিস্থিতিকে আরো বাড়িয়ে দিয়ে একে প্রধানত নদী জালের মধ্যে একটানা এঁদো বনভূমিতে পরিণত করে। ১৫০০ শতকে মোগলরা যখন বাংলার কর্তৃত্বে আসে তখন বাংলার পশ্চিম ভাগেই তাদের রাজত্ব নিরঙ্কুশ এবং সহজ ছিল; কিন্তু পরে পূর্বাঞ্চলের দিকেও তাদের দৃষ্টি গেলো; এটিও যেন মোগল রাজ সরকারের সমৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে তাই ছিল লক্ষ্য। তাদের দৃষ্টি পূর্বে আরাকান ও পর্তুগীজ প্রভাবে থাকা চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিলো– তখন পর্যন্ত যা ছিল তাদের কাছে একেবারেই অধরা। লক্ষ্য অর্জনের একটি পদক্ষেপ হিসেবে মোগল প্রাদেশিক রাজধানী রাজমহল থেকে পূর্ব বাংলার ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হলো, এবং মোগল নৌশক্তির যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটানো হলো। উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলাকে কৃষির মধ্যে এনে খাদ্য উৎপাদন ও কর আদায়ের ক্ষেত্র বিস্তৃত করা। অথচ সে সময় না এখানকার ভূমি কৃষির উপযুক্ত ছিল, না এখানকার মানুষ বড় আকারে কৃষিতে অভ্যস্ত ছিল।

পরিবেশই পুরো অঞ্চলটিকে একটি প্রান্তিক অঞ্চল করে রেখেছিলো। এই কারণে প্রভাবশালী মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভূস্বামী, বড় মাপের ব্যবসায়ী বৈশ্য, বা ক্ষত্রিয় রাজপুরুষদের, অর্থাৎ হিন্দু সমাজপতিদের পদচারণা এদিকে তেমন ছিলনা। মোগল শাসন পশ্চিমেই ব্যস্ত থাকাতে এদিকে মুসলিম আশরাফ সমাজের উপস্থিতিও ছিল বিরল। হিন্দু-মুসলিম বড় যারা ছিল তাদের সঙ্গতি ও সাধ্য ছিল কম, কিন্তু জাত্যাভিমান কম ছিলনা। এখানকার বিপুল সংখ্যক মানুষ ছিল সাধারণ মানুষ– গরিব হিন্দুই বেশি, তার সঙ্গে গরিব মুসলিম। তাদের প্রধান চিন্তা ওই প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার মত জীবিকা নিয়ে– অধিকাংশই মৎস্যজীবী, নৌকা চালক, তাঁতী- ইত্যাদি পেশার মানুষ। অনেকে অবশ্য এক ধরনের অস্থায়ী কৃষির সঙ্গেও জড়িত, একরকম ঝুম চাষের মত; বন্যা প্লাবিত জায়গার বাইরে যখন যেটুকু চাষযোগ্য জমি পায় সেখানে ধান ছিটিয়ে একটি ফসল পাওয়ার চেষ্টা। শহরাঞ্চলে অভিজাত হিন্দুদের কাছে এরা সবাই নেহাৎ নানা কাজে লাগা মানুষ, মুসলিম আশরাফদের কাছেও তাই। এদের মধ্যে মুসলিমদেরকে আশরাফরা পূর্ণ শরিয়া মানা মুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত করতোনা, বরং সহজিয়া বাউল গান গাওয়া, পুঁথি শোনা এক রকম আধা মুসলিম মনে করতো যাদের উঠা বসা ওই একই স্বভাবের হিন্দুদের সঙ্গেই। তবে ওই সহজিয়া মুসলিমদের মধ্যে কিছু মোল্লা নেতা গোছের মানুষ ছিলেন যাঁরা নিজেরা কৃষিকর্ম করলেও প্রতিবেশী মুসলিমরা তাঁদেরকে মান্যগণ্য করতো– তাঁদের কিছু আরবী পড়া জ্ঞান, বাংলা পুঁথি পড়া রসবোধ এবং ধর্মীয় দিক থেকে এক রকম পীরগোছের আকর্ষণের জন্য। তাঁদের স্বভাব-নেতৃত্বের গুণ পেশাগত কাজেকর্মেও বিস্তৃত হতো, এবং সেদিক থেকেও অনেকে তাঁদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। সাধারণ হিন্দুদের মধ্যেও এরকম নেতা থাকলেও জাত-পাতে বেশি বিভক্তির কারণে তাঁদের কার্যকারিতা ও নেতৃত্বের প্রভাবটি কম ছিল। হিন্দুদের অনেকেও বরং ওই পীরগোছের মুসলিম নেতাদের আকর্ষণ অনুভব করতো। মোগল রাজ প্রতিনিধিরা এখানকার প্লাবিত ভূমিকে উদ্ধার করে, বন কেটে জায়গাগুলোকে স্থায়ী কৃষির অধীনে আনার পরিকল্পনা করছিলো, এবং এসব জায়গা যথেষ্ট সংখ্যক কৃষককে কী ভাবে নতুন আবাদী কৃষি জমি পত্তন দেয়া যায় সেই চেষ্টায় ছিলেন। কারণ ইতোমধ্যে তা মোগল রাজ সরকারের সুনির্দিষ্ট কৃষিনীতিতে পরিণত হয়েছিলো। এর বাস্তবায়নে সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধিরা স্বাভাবিক ভাবে ওই স্বভাব-নেতাদের দ্বারস্থ হলেন, যাঁরা সহজে বহু মানুষকে একত্রিত করে স্থানে স্থানে এই কাজে লাগাতে পারবে।

রাজ সরকারের প্রতিনিধিদের ওই প্রস্তাবটি এখানকার খেটে খাওয়া বহু মানুষের কাছে বেশ আকর্ষণীয় ছিল। যদি একযোগে কাজ করে কিছু ভূমি উদ্ধার করে তাতে স্থায়ী কৃষক হতে পারে তাহলে তাদের জীবনে কিছুটা স্থিরতা আসবে। সরকারী জমির প্রজা হয়ে ওখানেই বসত্বাড়ি, ওখানেই চাষবাস, সেটি তাদের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি ছিল। কিন্তু তার আগে কঠিন কাজগুলো হলো নিচু জমি ভরাট করে ভূমি উদ্ধার, বন কেটে সাফ করা, গাছের শিকড়গুলো তুলে ফেলে সেখানে লাঙ্গলের কর্ষণ দেয়া। কঠিন কাজ– কিন্তু মনোবল ও জনবল থাকলে অসম্ভব নয়। এই কঠিন কাজকে অনেকটা সহজ করেছিলো ওই উৎসাহী ও আগুয়ান স্বভাব-নেতারা। তাঁরা বাইরের মানুষ নন, বাকিদের মত খেটে খাওয়া মানুষ, কিন্তু এখন তাঁদের বড় কাজ হয়ে দাঁড়ালো মানুষকে সামাজিক ভাবে আকর্ষণ করা, এবং কর্মযজ্ঞে নেতৃত্ব দেয়া। সারাদিন এক যোগে কাজ, এক যোগে জামাতে নামাজ, রাতে বয়ান, কেতাব পাঠ, পুঁথি পাঠ, সেই সঙ্গে কাজের অগ্রগতির, ভবিষ্যতের সোনালী দিনের কথা।

ওই পীরগোছের নেতার যে আস্তানা বা হুজরা সেটি আবার মসজিদ, সেটিই পুরো কাজের দলের সামাজিক সমাবেশের জায়গা। এভাবে কাজ যত এগুলো, সাফল্য যত এলো, নেতা ততই হয়েই উঠলেন সিদ্ধ পীরের মত। বয়ানের সঙ্গে ঘটে জিকির আজগার, সবার মঙ্গলের জন্য মানত, শিন্নি। বাচ্চাদের জন্য সকালের মক্তবের ব্যবস্থাটুকুও হলো। এমন সামাজিক শক্তি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষ সবাইকে আকর্ষণ করতো। জাত-পাতের কথা ভুলে, সমাজপতিদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, কাজের প্রেরণার এ সুযোগ অনেকেই দলে দলে গ্রহণ করলো। হিন্দু-মুসলিমদের একই পীরের ভক্ত হওয়াটি আগে থেকেই একটি প্রচলিত ব্যাপার ছিল। এখন ব্যাপারটি আরো গড়ালো– এখন এটি একই ধর্ম গ্রহণের দিকে চলে গেলো। ওই পীরও তাঁর হিন্দু ভক্তদের বোঝার উপযুক্ত করেই বয়ান দিতেন, তাঁদের মধ্যে ইতোমধ্যে থাকা ভক্তির আবেগকে বোঝার চেষ্টা করতেন এবং তাকে গুরুত্ব দিতেন– এমনকি হিন্দু ভক্তিবাদে জনপ্রিয় দেব চরিত্র শিব, বিষ্ণুকে আলোচনায় আনতেন। মোগল রাজসরকারের নজর ছিল দ্রুত জমি উদ্ধার করে তাতে কৃষক বসাবার। সরকারের প্রতিনিধিরা পুরো পীরালি ব্যাপারটিকে তাঁদের কৃষি প্রকল্প বাস্তবায়নের সহায়ক হিসেবেই দেখ্ছিলেন এবং এ জন্য সাধ্যমত এতে সাহায্য করেছেন– নেতার হুজরায় মসজিদ তৈরি করে দিয়ে, পুকুর কেটে দিয়ে, শুক্রবারের জুমার নামাজের পর শিন্নির ব্যবস্থা করে

দিয়ে– রাজ কোষাগার থেকে নানা সামাজিক কাজের জন্য যখন যতটা মঞ্জুরি দেয়া সম্ভব হয়েছে তা দিয়ে।

কিছু বছরের মধ্যেই হাতে নাতে এর ফল দেখা দিলো– বিপুল পরিমাণ জমি আবাদে এলো, একটি নতুন কৃষক সমাজ সৃষ্টি হলো, যাতে মুসলিমদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়লো। এই প্রক্রিয়া কিন্তু প্রজন্মান্তরেও চলতে থাকলো। কয়েক প্রজন্মের মধ্যে ওই স্বভাব-নেতার স্মৃতি সবার কাছে কিংবদন্তীর একজন কামেল পীরের স্মৃতির মতই উজ্জলতর হতে থাকে; তাঁকে তারা এই পুরো পরিবর্তনের আধ্যাত্মিক স্থপতি হিসেবে স্মরণ করতে থাকে এবং শিগ্‌গির ওটি পীরের ব্যস্ত দরগায় পরিণত হয়ে আরো শক্তিশালী আকর্ষণ স্থল হয়ে ওঠে। বাংলার পূর্বাঞ্চলে প্রত্যেক স্থানে স্থানে আজো যে অনেক দরগা রয়েছে তাদের অনেকগুলোর ইতিহাস ওই কৃষি পত্তনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। ওই পীরের স্মৃতির মধ্যে অনেক সময় মূল প্রকৃত স্বভাব-নেতা অগ্রণী ব্যক্তিটি হারিয়ে গেছেন– কিংবদন্তীর যে পীর তাকে স্থানীয় মানুষ হিসেবে নয় অনেক সময় আরব, পারস্য, তুরস্ক কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের অন্য কোথায়ও থেকে আসা ব্যক্তিত্ব হিসেবে মানুষ জেনেছে স্থানীয় উপকথায়। অন্যদিকে হিন্দু ও মুসলিম উভয় কবিদের সাহিত্যে বনে জঙ্গলের অসম্ভব বিপদ ও অপদেবতাকে কাবু করে বনকে জয় করার কাজে তাঁদের নানা অলৌকিক সাফল্যের কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর দরগাকে কেন্দ্র করে মোগল রাজ সরকারের অর্থে চমৎকার স্থাপত্যের মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

এই পীরের বংশধররা আবার অনেক জায়গায় মোগল ফরমান বলে ছোট জমিদারী লাভ করে তাঁদের পূর্বপুরুষের নেতৃত্বে আবাদে আনা জমির মালিক হয়েছেন। বড় জমিদারী অবশ্য ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ইত্যাদি বর্ণ হিন্দুদের হাতে গেছে কারণ তাঁরা জমির কাজে কখনো না থাকলেও ইতোমধ্যে অনেক অর্থের মালিক ছিলেন ও মহাজনী করতেন। আধুনিক গবেষণায় এই পুরো ইতিহাসের প্রমাণ পাওয়া গেছে মোগল আমলের ও পরে বৃটিশ আমলের জমিদারী, জমি স্বত্ত্ব দানের বিভিন্ন ফরমান ও খতিয়ান থেকে, যেখানে হিন্দু বড় জমিদারী ও মুসলিম ছোট জমিদারী লাভের উৎসগুলোর অনুসরণ করা সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় দরগা এবং মসজিদের ওপর উৎকীর্ণ আলেখ্য এবং সেগুলোর নির্মাণ ইতিহাস সম্পর্কে স্থানীয় ভাবে প্রচলিত কাহিনীর সঙ্গে এসব মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয়েছে। আর একটি বড় উৎস হলো হিন্দু ও মুসলিম কবিদের কবিতা; যেখানে 'সত্যপীর', 'গাজীপীরদের' কাহিনী বর্ণিত আছে।

এই পুরো প্রক্রিয়ায় অবশ্য দূরে সরে থাকা প্রভাবশালী বর্ণ হিন্দুদেরও একটি বড় অবদান ছিল। আগেই দেখেছি এই এঁদো বনভূমির দেশে তাদের যে উপস্থিতিটুকু ছিল তাতে সংখ্যা, সক্ষমতা ও প্রভাব এতটা ছিলনা যে তারা স্বজাতির মধ্যে এই প্রক্রিয়ার চলাতে তেমন কোন বাধা দিতে পারে। অথচ জাত্যাভিমান কম ছিলনা বলে এতে তারা এতে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া যা হয়েছে তা হলো ওই মুসলিম, ওই মুসলিম ঘেঁষা ও মুসলিম হওয়া মানুষগুলোকে সমাজে ঘৃণাভরে বর্জন করা– তাদেরকে এক রকম অস্পৃশ্যতে পরিণত করা। এজন্য তাদের এবং এমনকি তাদের ছোঁয়া লাগা অন্ন জল পর্যন্ত (আশরাফ মুসলিমদের নয়) বিষের মত পরিহার করাটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গেল। যারা এই বর্জন নীতি মানলোনা তাদেরকেও সমাজচ্যুত করা হলো। ফলে যারা এখনো মুসলিম হয়নি কিন্তু মসুলিমদের সঙ্গেই ওঠাবসা করছে, এক সঙ্গে খাচ্ছেদাচ্ছে তাদেরকেও এই বর্জনের মাধ্যমে দ্রুত মুসলিম হওয়ার দিকে ঠেলে দেয়ার ব্যবস্থা তারাই করলো। এ ভাবেই বাংলার পূর্বাঞ্চল প্রথমে প্রান্তিক ও ছোট কৃষককূল সৃষ্টি, এবং পরে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ কৃষক প্রজাদের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যেই একটি বড় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা সৃষ্টি হয়েছিলো, এবং বাংলার পরবর্তী ইতিহাস সৃষ্টিতে তাদের একটি বড় ভূমিকা তৈরি হয়েছিলো। কৃষি সমৃদ্ধি এতটাই এগিয়েছিলো যে তার সুযোগ নিতে এই প্রজাদের ওপর বড় বড় জমিদারী সৃষ্টি হয়েছিলো, মধ্যসত্ত্বভোগী হিসেবে।

চট্টগ্রাম অঞ্চল মোগলদের শাসন আসে সবার পরে, আরাকানী ও পর্তুগীজদেরকে পুরোপুরি পরাজিত করতে পারার পর। চট্টগ্রাম বন পরিস্কার করে কৃষক সমাজের প্রতিষ্ঠা এবং একই প্রক্রিয়ায় সে সমাজে মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার প্রক্রিয়াটি ঘটেছে অপেক্ষাকৃত কিছুটা পরে। চট্টগ্রামে প্লাবিত ভূমি পুনরুদ্ধারের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ না হলেও কাছেই নোয়াখালী অঞ্চলে সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তা ছাড়া পুরো উপকূল অঞ্চলের ভাঙ্গন ও নোনা পানি কৃষির জন্য একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। চট্টগ্রামে কৃষি বিস্তারে বড় সমস্যা ছিল সমতলে ও অনুচ্চ টিলা পাহাড় জুড়ে ঘন বনভূমি। এই বন কেটে কৃষি বাড়াতে মোগল আমলে এখানেও ঠিক একই রকম উদ্যোগ নিতে হয়েছে। চট্টগ্রাম-নোয়াখালী অঞ্চলের মানুষদের জন্য কৃষির বাইরে আরেকটি আকর্ষণীয় পেশা বহুদিন থেকে উন্মুক্ত ছিল এবং এর আকর্ষণ তাদের মধ্যে ক্রমেই বেড়েছে। আরব বণিকদের আসার সময় থেকে শুরু করে, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ (ডাচ্), ও ইংরেজ জাহাজিদের আনাগোনা পর্যন্ত এ অঞ্চলের অনেক মানুষের মধ্যে সমুদ্রযাত্রা তীব্র নেশার মত

হয়ে পড়েছিলো। অনেকে তরুণ বয়স থেকে একে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নানা দেশের পালতোলা জাহাজে খালাসি (নাবিক) হিসেবে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছে। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে এসে চট্টগ্রাম-নোয়াখালীর খালাসিরা দুনিয়ার যাবতীয় সওদাগরি জাহাজের একটি বড় চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো যাতে পরে সিলেট অঞ্চলের মানুষরাও একটি বড় সংখ্যায় যোগ দিয়েছিলো। এখানেও দেখা গেছে খালাসিদের সিংহ ভাগই ছিল মুসলিম, এবং তারা যখন এ জীবন শুরু করে তাদের স্থানীয় নেতারা তাতে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটকের কাজ করেছে, যাদের বলা হতো টেন্ডল এবং অতি সফল টেন্ডলদের মধ্য থেকে কেউ কেউ সারেং। চট্টগ্রামের একজন সারেংকে অনায়াসে একটি বিশ্ব-সমুদ্রে বিচরণকারী পর্তুগীজ কিংবা ওলন্দাজ, কিংবা ইংরেজ জাহাজের প্রাণ-পুরুষ বলা যেতে পারতো। চট্টগ্রামকে গন্তব্য ধরে আমরা যে বিশ্ব-প্রবাহের আলোচনাকে এই বইয়ের উপজীব্য করেছি তার অংশ হিসেবে এই খালাসি জীবনেরও বিস্তারিত পরে দেখবো। সারেংদের নেতৃত্বে এসব সামুদ্রিক জাহাজে এ অঞ্চলের যত খালাসি কাজ করতো এক সময় তার মোট সংখ্যা যথেষ্ট বড় ছিলো, কারণ পালতোলা জাহাজকে বাতাসের মতিগতির সঙ্গে সংগ্রাম করে সচল ও নিরাপদ রাখতে প্রচুর মানুষের সার্বক্ষণিক শ্রম ও কৌশল দরকার হতো। চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠির উদ্দীপনার পেছনে মোগল কৃষি পত্তনের মত মোগলদের আগে-পরের এই জাহাজি জীবনও কম অবদান রাখেনি। তাছাড়া দীর্ঘকাল ধরে এটি এখানকার সাধারণ মানুষকেও বিশ্ব প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে।

প্রধানত হিন্দু-মুসলিম সুবিধা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠি থেকে মুসলিম কৃষক সমাজ গড়ে ওঠার ফলশ্রুতিতে এই সমাজেও এখানকার প্রাচীনতর সমাজের অনেক কিছুর রেশ থেকে গেছে। যেমন অনেক কম তীব্রতায় হলেও বহু কাল জাতিভেদের একটি ছোঁয়া এতেও ছিল। সেই সঙ্গে কন্যাদায়গ্রস্ত হওয়া, যৌতুক আবশ্যকীয় হওয়া ইত্যাদিও, যা মুসলিম সমাজে থাকার কথা ছিলনা। ঠিক তেমনি সমাজ-সংস্কৃতির অনেক আনন্দময় বিষয় ধর্মকে অতিক্রম করে সর্বজনীন হতে পেরেছিলো অনেক কাল- যেটি পোষাক, পালা-পার্বন, বিয়ের আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি নানা কিছুতে প্রকাশ পেতো।

মুখের ভাষার ভাষা-পরিবার

ভল্গা তীরে শুরু হওয়া ভাষা-পরিবার

আমরা দেখেছি ডন ও ভল্গা অববাহিকার পশুচারকরা কীভাবে নিজ দেশে খরার কারণে দক্ষিণ ইউরোপে, ইরানে আর ভারতে অভিবাসী হবার সময় সর্বত্র তাদের একই মুখের ভাষাটি নিয়ে গিয়েছিলো। এর প্রত্যেকটি জায়গায় যাওয়ার পর অবশ্য সেখানকার স্থানীয়দের ভাষার সঙ্গে মিশে নানা ভিন্ন ভাষা সৃষ্টি হয়েছে শত শত বছর ধরে। প্রত্যেক জায়গায় পরিবর্তিত হয়ে যে ভাষায় তা রূপ পেয়েছে তাতে ভল্গা তীরের ভাষার অনেক চরিত্র ও অনেক শব্দ স্থান পেয়েছে। ওখানে বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত হবার ফলে সেটি আবার কিছু শব্দ ও চরিত্র ঠিক রেখে আরো নানা ভাষায় বিস্তৃত হয়েছে; যেমন দক্ষিণ ইউরোপে গিয়ে প্রাচীন গ্রীক, ল্যাটিন ইত্যাদিতে বিভক্ত হয়েছে– ওখানে বিস্তৃত হয়ে যা পরে আজকের গ্রীক, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ ইত্যাদি ভাষায় পরিণত হয়েছে। ইরানে গিয়ে তা পারসিক ভাষার বিভিন্ন রূপে; আর ভারতে গিয়ে ভারতের নানা অঞ্চলের প্রাকৃত ভাষায়, যা পরে আজকের গুজরাটি, হিন্দি, বাংলা ইত্যাদিতে পরিণত হয়েছে। এর সবগুলো যে ওই ডন-ভল্গা অববাহিকার মানুষদের ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত তা বুঝতে পারি এত দূরের দূরের এত রকম ভাষার মধ্যে আজও অনেক শব্দের আশ্চর্যজনক মিল দেখে। এসব মিলই আজকের ইউরোপের প্রায় সব ভাষা, আজকের ইরানের ও ভারতের সব ভাষাকে একই ভাষা-পরিবারের অন্তর্ভূক্ত করেছে যার নাম ইন্দোইউরোপীয় ভাষা-পরিবার; শব্দটির অর্থ ভারতীয়-ইউরোপীয়। এই এত সব ভাষার মধ্যে চরিত্রগত নানা মিলও রয়েছে। ভাষা-পরিবারটি যেন একটি বৃক্ষ– এত রকম শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে; যতই বিভক্ত হয়েছে ততই অন্য মূল শাখার প্রশাখা থেকে তাদের অমিল বেড়েছে, কিন্তু ওই কিছু মিল তারপরও রয়ে গেছে।

ভাষাকে এভাবে একটি বৃক্ষের চিত্রে কল্পনা করার ব্যাপারটি আমরা আগেই দেখেছি। তাছাড়া আমরা এক একটি জায়গার মানুষের মুখের ভাষায় নানা দিকের প্রতিবেশী ভাষার প্রভাব ঢেউয়ের মত এসে যে কোন দিকে কিছু দূর যাওয়ার পর পর ভাষা বদলের ব্যাপারটিও দেখেছি। সেটি ছিল ভাষাকে ঢেউয়ের চিত্রে কল্পনা করা। তবে ভাষা-পরিবারকে বুঝতে বৃক্ষ রূপে কল্পনা করাটাই

সুবিধাজনক। ইন্দোইউরোপীয় ভাষা পরিবারটি সব চেয়ে বড় একটি ভাষা-পরিবার। এর মূল ভাষাটি স্টেপস তৃণভূমির পশুচারকরা ব্যবহার করতো চার হাজার বছরের আগে। তারপর সেটি নিয়ে গিয়েছিল পরস্পর অনেক দূরের অঞ্চল গ্রীস-ইতালীতে এবং ভারতে। অথচ এতদিন পর বাংলাভাষী আমি যদি ইতালিয়ান ভাষার খোঁজ নিই দেখি সে ভাষায় মাংস, কামিজ, গলা, অক্ষি, দন্ত, বিধবা ইত্যাদি হুবহু শব্দ বাংলার মত হুবহু একই অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং বাংলার আরো অনেকগুলো শব্দ এদের খুব কাছাকাছি– দুই (দুয়ো), ত্রি (ত্রে), সাত (সেত্তে), আট (অত্তা), দশ (দিয়েচি), যৌবন (জিওভানি), দেব (দিও), সর্প (সের্পে), বোমা (বোম্বা), পা অর্থে পদ (পেডি) এমনি আরো অনেক। একই ভাবে ইতালিয়ানের কাছাকাছি ভাষাগুলো গ্রীক, স্প্যানিশ ইত্যাদিতে দেখলে আর বাংলার কাছাকাছি ভাষা হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি ইত্যাদিতে গেলে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সব ভাষার মধ্যেই এমনি মিল দেখতে পাই। বোঝা যাচ্ছে যে বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হলেও সেই প্রাচীন শব্দ, যেগুলো স্পষ্টত ডন-ভল্গা অববাহিকার মানুষদেরই প্রাচীন শব্দ সেগুলো এখনো আজকের নানা জায়গার মানুষের মুখে বজায় রয়ে গেছে। এ কারণেই এসব ভাষাকে এক পরিবারভুক্ত বলা, যা একই জায়গার মানুষের বিভিন্নমুখী অভিবাসনের সাক্ষ্য দেয়।

এমনি আরো নানা ভাষা-পরিবার রয়েছে যাও কোন একটি মূল ভাষাভাষী মানুষের নানা দিকে বিস্তৃত হওয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। চীন, বার্মা, এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আরো কিছু কিছু দেশের ভাষাগুলো একই পরিবারের যার নাম সিনোটিবেটান। এই ভাষা-পরিবারের একটি বড় বৈশিষ্ট হলো এতে একই শব্দের ধ্বনির খাদ বা তীব্রতার উঁচু-নিচু হওয়া অনুযায়ী তার অর্থের পার্থক্য ঘটে। এভাবে খাদকে নানা রকম উচ্চতা দিয়ে নানা কিছু বোঝাতে একই শব্দ ব্যবহার করা হয়। এতে ভাষার কথনের মধ্যে এক ধরনের সঙ্গীতের গুণ লক্ষ্য করা যায়, সেদিকে সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য না করলে কথাকে সঠিক ভাবে অনুধাবন করা যায়না। এই ব্যাপারটিকে টোনালিটি নামে আগেই দেখেছি। আমাদের কাছের দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম, কানাড়া ইত্যাদি সব গুলো ভাষা দ্রাবিড় ভাষা-পরিবারের সদস্য। তুরস্ক এবং মধ্যএশিয়ার মানুষের রয়েছে আরেকটি ভাষা-পরিবার যার নাম আলতাইক। তবে দুনিয়ার সনাক্তকৃত মোট ১৩৫টি জীবিত ভাষা-পরিবারের মধ্যে আমরা যদি সব চেয়ে বেশি মানুষ কথা বলে এমন কয়েকটি ভাষা-পরিবারের নাম বলি তাতে সবার ওপরে আসে আমাদের ইন্দোইউরোপীয়, মোট ৪৩৭টি ভাষা এর অন্তর্ভুক্ত, দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি

সংখ্যক মানুষ এর কোন না কোনটিতে কথা বলে। এর পরেই আসে সিনোটিবেটোন ৪৫৩টি ভাষা এর অন্তর্ভুক্ত হলেও বেশির ভাগই চীনা ভাষার বিভিন্ন রূপ এবং পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নানা উপজাতির ভাষা; তবে বার্মিজ, তিব্বতী, ভিয়েৎনামিজ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষাও এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর আসে নাইজারকঙ্গো নামের ভাষা-পরিবার আফ্রিকার একটি বিশাল অংশে ১,৫২৪টি ভাষা এর অন্তর্গত, যেগুলোর সবই পরস্পর সম্পর্কিত। পূর্ব আফ্রিকার প্রধান ভাষা সোয়াহিলি এবং পশ্চিম আফ্রিকার ইগবো, সোনা, ইউরোবা, ফুলা ইত্যাদি বিপুল সংখ্যক মানুষের মুখের ভাষাগুলো এই একই পরিবারে। অনেকেই ব্যবহার করে এবং ভাষার সংখ্যাও বিরাট (১,২২৪) এমন আরেকটি পরিবার হলো অস্ট্রোলেশিয়ান যার মধ্যে মালায়ান, ইন্দোনেশিয়ার জাভানিজ, ফিলিপাইনের তাগালোগ ইত্যাদি বড় বড় ভাষা তো রয়েছেই প্রশান্ত মহাসাগরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেক দ্বীপের অল্প মানুষের মুখের ভাষা হিসেবেও অনেকগুলো ভাষা এর মধ্যে আছে।

ভাষা বৃক্ষ বলে গাছের সঙ্গে কেন ভাষা পরিবারকে তুলনা করা হয় তা বোঝা যায় এর শাখা-প্রশাখাগুলোকে দেখলে। একটি মুল কাণ্ডই যেভাবে পরে পুরো ঝাঁকড়া গাছে পরিণত হয় তেমনি উদাহরণ স্বরূপ ইন্দোইউরোপীয়া পরিবার সেই মূল কাণ্ডটি হলো চার হাজার বছর আগের স্টেপস তৃণভূমির মানুষের ভাষা। এটি তিনটি বড় বড় শাখায় ভাগ হয়েছে– ইউরোপীয়, ইরানী, এবং ভারতীয়। ইউরোপীয় শাখাটিকে যদি দেখি তার শুরু হয়েছিল দক্ষিণ ইউরোপীয় ভাষাগুলো দিয়ে, প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিনে যার শুরু। ল্যাটিন ভাষা গোষ্ঠির গুরুত্বপূর্ণ প্রশাখাগুলো গ্রীক, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ ও ফরাসী ভাষা। এখানকার মানুষের ভাষার প্রভাব উত্তর ইউরোপে গেলে সেখানে জার্মানাইক বলে আরেকটি ছোট শাখা যার মধ্যে প্রশাখা হলো জার্মান, ইংরেজি, সুইডিশ, ড্যানিশ ইত্যাদি। আরেকটি ছোট শাখা স্লাভোনিকের প্রশাখা রাশিয়ান, পোলিশ, সাবোক্রোয়াট, বুলগেরিয়ান ইত্যাদি; আবার আরেকটি ছোট শাখা গেইলিকের প্রশাখা আইরিশ, স্কটিশ ইত্যাদি। প্রশাখাগুলোর মধ্যে যে আরো কত ক্ষুদ্রতর প্রশাখা আছে তার ইয়ত্তা নেই।

কাণ্ড থেকে শাখায়, শাখা থেকে প্রশাখায় শব্দগুলো যায় কী ভাবে? তাছাড়া কাছাকাছি থাকে এক শাখা থেকে অন্য শাখায়, এমনকি এক শাখার প্রশাখা থেকে অন্য শাখার প্রশাখায়ও শব্দ যায়, সেও বা কেমন করে? আমরা আগে ভাষার খাড়া প্রবাহ দেখেছি– কাণ্ড থেকে শাখায় বা শাখা থেকে প্রশাখায়

যাওয়াটি সেই খাড়া প্রবাহের ফল; মূলত মা-বাবার সঙ্গে শিশুর কথোপকথনে বংশানুক্রমে যাওয়া। সেই প্রক্রিয়ার ভেতর পরের মা-বাবাদের ভাষায় পরিবর্তন দেখা গিয়ে নতুন শব্দ আসাতে তাও শিশুদের কাছে যাওয়ার ফলে নতুন শাখা সৃষ্টি হয়। মা-বাবার ভাষার পরিবর্তন অবশ্য আসে তারা যখন অন্য নতুন বয়স্কদের সঙ্গে কথা বলে তার মাধ্যমে– সেটি পার্শ্ব-প্রবাহ হিসেবে আমরা আগে দেখেছি। শাখা থেকে শাখায়, প্রশাখা থেকে অন্য প্রশাখায় ভাষার যাওয়াটিও সে রকম পার্শ্ব-প্রবাহ। খাড়া প্রবাহ এবং পার্শ্ব-প্রবাহ উভয়টিতেই আমরা দেখেছি যে কোন অর্থ বোঝাতে যে প্রতিশব্দটি সব থেকে ঘন ঘন কথোপকথনে আসবে সেটিরই বেশি প্রবাহ ঘটবে– অর্থাৎ সেটিই নতুন শাখায় বেশি যাবে। স্বাভাবিক ভাবে যে সব অন্তরঙ্গ শব্দ বেশি জনপ্রিয় হয় সেগুলোই বেশি ঘন ঘন ব্যবহৃত হয়, এবং নানা শাখায় ছড়িয়েও পড়ে বেশি।

যেমন ইন্দোইউরোপীয় ভাষা-পরিবারে বাংলা ভাষার দুটি শব্দের বিস্তৃতির মধ্যে তুলনা করি– একটি হলো 'পাখি', একটি 'দুই'। এই পরিবারের নানা ভাষায় পাখিকে কী বলা হয় দেখা যাক, বিশেষ করে অন্য শাখার ভাষায়। ফারসিতে পারিন্দা শব্দটি পাখির কিছু কাছাকাছি বলা যায়। কিন্তু ইউরোপীয় শখায় গেলে সেখানকার নানা ভাষায় পাখির প্রতিশব্দগুলো তার সঙ্গে বেশি ক্ষেত্রে মেলেনা। গ্রীকের পাউলি ও স্প্যানিশের পাজারোর সঙ্গে কিছু মেলে, কিন্তু ফারসিতে ওইশ্যু, জার্মানে ফোগেল, ইংরেজিতে বার্ড, আইরিশে ইয়ান, বা রাশিয়ানে পিস্টিনার সঙ্গে মোটেই মেলেনা। খোদ বাংলাতেই পাখি বোঝাতে বহু বিকল্প শব্দ ব্যবহার করা যায় যেমন বিহগ, বিহঙ্গ, খেচর, পতঙ্গ, পতগ, পত্রী ইত্যাদি। বোঝা যাচ্ছে যে ইন্দোইউরোপীয় ভাষী গড়পড়তা মানুষের মধ্যে পাখি জিনিসটি এবং তার জন্য 'পাখি' এই শব্দের কাছাকাছি একটি মাত্র শব্দকে গুরুত্ব দিয়ে বার বার ব্যবহার করা হয়নি, তাই এটি এদিকের প্রশাখার ভাষায়ও বিস্তৃত হয়নি, ইউরোপের নানা প্রশাখায়ও বিস্তৃত হয়নি।

অন্যদিকে বাংলায় 'দুই' শব্দটি দেখা যাক। বাংলায় এর তেমন প্রতিশব্দ নেই বল্‌লেই চলে। ফারসিতে এটি দো, গ্রীকে দিয়ো, ইতালিয়ানে দুয়ে, স্প্যানিশে দস, ফরাসীতে দিউজ, রাশিয়ানে দবা, আইরিশে দো। অবশ্য ইউরোপীয় অংশের জার্মানাইক শাখায় গিয়ে দুইয়ের দ অক্ষরটি ত বা স হয়ে যায় যেমন ইংরেজিতে টু, সুইডিশে তোভো, জার্মানে সোয়াই। মোটের ওপর বলা যায় ইন্দোইউরোপীয় পরিবারের সকল শাখা প্রশাখায় দুই বোঝাতে দুই শব্দটির কাছাকাছি শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে– অন্য রকম প্রতিশব্দ তার তেমন

কোথায়ও নেই। এর মানে গত চার হাজার বছর ধরে এর সর্বত্র কথোপকথনে 'দুই'য়ের কাছাকাছি শব্দটি 'পাখি' শব্দটির থেকে অনেক বেশিবার পুনরাবৃত হয়েছে।

আমরা বিভিন্ন ভাষা-পরিবার দেখেছি। এরাও কি পরস্পরের থেকে একেবারেই স্বাধীন, তাদের মধ্যেও কি কোন মিলই নেই– এমন শব্দ কি নেই যা দুটি ভিন্ন ভাষা-পরিবারে একই অথবা কাছাকাছি রকমের আছে। অবশ্যই আছে, তবে সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম, একই ভাষা-পরিবার হলে একই শব্দ যেমন নানা ভাষায় পাওয়া যায়, ভিন্ন ভাষা-পরিবারের তার থেকে অনেক কম পাওয়া যায়। কিছু যে পাওয়া যায় তার কারণ হলো দুই ভাষা-পরিবারের মানুষের মধ্যেও পরে কখনো যোগাযোগ হয়, তারাও পরস্পরের কাছে থাকে, পরস্পরের সঙ্গে শব্দ বিনিময় করে কথা বলার সময়। যেমন নিউজিল্যান্ডের আদিবাসী মাওরিদের ভাষায় এখন বেশ কিছু ইংরেজি শব্দ আছে, আর নিউজিল্যান্ডের ইংরেজিতে বেশ কিছু মাওরি শব্দ আছে– অথচ মাওরি ভাষা অস্ট্রেলেশিয়ান ভাষা-পরিবারের, আর ইংরেজি ইন্দোইউরোপীয়। তার চেয়ে বড় কথা হলো কাছাকাছি ভাষা-পরিবারগুলোর একেবারে আদি মূল ভাষাগুলোতে যারা কথা বল্‌তো তাদেরও সাধারণ পূর্বসূরিরা একই আরো আদি ভাষা বল্‌তো। এই একই আরো আদি ভাষাটি থেকে দুই মূল ভাষা হয়ে দুই ভাষা-পরিবারে একই শব্দ কিছু কিছু আসতেই পারে।

'দুই'কে আমরা ইন্দোইউরোপীয় পরিবারের সর্বত্র জনপ্রিয় শব্দ হিসেবে দেখেছি। এতে আরো জনপ্রিয় শব্দ আছে– যেমন বাংলায় 'মা' শব্দটি। ইন্দোইউরোপীয় প্রায় সব ভাষায় মা বোঝাতে মা এর খুব কাছাকাছি শব্দ ব্যবহার করা হয়। ফারসিতে এটি মাদার, গ্রীকে মিটেরা, ইতালিয়ানে মাদ্রে, স্প্যানিশে মাদ্রে, ফরাসীতে মেরে, রাশিয়ানে মামা, ইংরেজিতে মাদার, আইরিশে মাতাইর, জার্মানে মুটার, সুইডিশে মোর, এমনকি ছোট্ট দেশ ল্যাটাভিয়ার ভাষায় মাতে। এতো গেলো ইন্দোইউরোপীয় পরিবারের ভেতরে, এর বাইরে অন্য কিছু পরিবারের ভাষায় দেখা যাক মাকে কী বলে। সিনোটিবেটান পরিবারের ভাষা মান্দারিন চীনাতে ম'ায়ের কয়েকটি শব্দ রয়েছে– মা, মামা, মুকিন। মজার ব্যাপার হলো চীনা ভাষায় টোনালিটির কারণে মা শব্দটি উচ্চ-নীচু বিভিন্ন খাদের ধ্বনিতে বিভিন্ন কিছু বোঝায় বটে, কিন্তু জন্মদাত্রীকে বোঝাতে মাকে যেই খাদের ধ্বনিতে বলে তা ঠিক আমাদের মা ডাকের মতই। কোরিয়ান ভাষায় মা হলো এ্যামনি- শুনতে অনেকটা মামণির মত, আর বাবা হলো আবোজি। কিন্তু বাচ্চারা

মাকে ডাকে মা, আর বাবাকে আব্বা। এই একই ভাষা-পরিবারের বার্মিজে মা হলো আমায়; দ্রাবিড় পরিবারের তামিলে এটি আম্মা, আর সেমিটিক পরিবারের আরবীতে উম্মু, নাইজারকঙ্গো পরিবারের সোয়াহিলি ভাষায় এটি মামা। বোঝা যাচ্ছে যে জন্মদাত্রীকে বোঝাতে মা বা মায়ের কাছাকাছি শব্দ বার বার ব্যবহারে কারো ক্লান্তি ছিলনা– ইন্দোইউরোপীয় পরিবারের সব ভাষাভাষীদের মধ্যে তো বটেই। এক ভাষা-পরিবারের সঙ্গে আদি সম্পর্ক আছে এমন অন্য ভাষা-পরিবারের মধ্যেও; যেখান থেকে শব্দটি তাদের পরিবারেও ঢুকেছে, অথবা হয়তো পরে দুই ভাষা-পরিবারে মেলামেশার মাধ্যমে একটি থেকে অন্য পরিবারটিতে ঢুকেছে। তবে সবক্ষেত্রে শব্দটির জনপ্রিয়তা ছিল বলেই এমনটি হতে পেরেছে।

মুখের ভাষা থেকে উপভাষা, সেটিই ভাষা

তা হলে দুই নাম কেনঃ

ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি ভাষার জন্ম, বিকাশ সব কিছু একেবারেই ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যাপারে, মানুষের কথোপকথনেই তা ঘটে। এর ফলে মুখে যে ভাষা তাতে কিছু দূর পর পর মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এই মিহি পরিবর্তন সত্ত্বেও বেশ বড় জায়গার অনেক মানুষই পরস্পরের কথা প্রায় পুরোটাই বোঝে এবং স্বচ্ছন্দে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারে। এটিই তাদের উপভাষা (ডায়ালেক্ট), এবং এটিই তাদের ভাষা। এখানে ভাষা আর উপভাষার মধ্যে কোন তফাত নেই– উপনদী আর নদীর মধ্যে যেমন কোন তফাত নেই- কোন্‌টি এসে কোন্‌টিতে পড়েছে সেই হিসেবে আমরা কোনটিকে উপনদী আর কোনটিকে নদী বলি বটে, কিন্তু যে সেটি বলছে তার পছন্দের ব্যাপার। নদীর ক্ষেত্রে যেমন ভাষার ক্ষেত্রেও সে রকম সাধারণ ভাবে যেটিকে বড় মনে করা হয়, যেটিতে বেশি মানুষ কথা বলে, তাকেই ভাষা বলার প্রবণতা থাকে, এবং অন্যগুলোকে উপভাষা। কিন্তু আসলে এদের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। উপভাষা বলা হয় এমন ভাষাও নিজে কিন্তু যথেষ্ট বড় ও ব্যাপক হতে পারে– তার পাশাপাশি যে ভাষা থাকে তার সঙ্গে এই উপভাষায় অনেক শব্দের ও অনেক নিয়মের মিল্‌ থাকতে পারে, অনেক অমিলও থাকতে পারে, কোন্‌টি থেকে কোনটিতে মিলগুলো গেছে তাও সব ক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়। তবুও একটিকে বেশি সাধারণ ও বেশি ব্যাপক দেখে আমরা সেটিকে ভাষা বলি, অন্যটিকে উপভাষা বলি। এমন মনে করার কারণ নেই যে উপভাষা লেখা হয়না, উপভাষায় সাহিত্য

নেই; আর অন্যদিকে ভাষা মাত্রই লেখা হয়, তার সাহিত্য আছে। লেখা হয় এমন উপভাষা আছে, আর বহু বড় বড় ভাষা আছে যা লেখা হয়না। আর সাহিত্যের কথা বল্‌লে নিজস্ব সংস্কৃতি ও নিজস্ব লোকজ বিষয় নিয়ে মৌখিক সাহিত্য– উপভাষা, ভাষা নির্বিশেষে সবারই আছে। কাজেই দুই নাম যে ব্যবহার করা হয় তা নেহাত তুলনামূলক ভাবে প্রযোজ্য, পরমভাবে হিসেবে নয়।

মুখের ভাষা যেই উপভাষা তৈরি করে, তার সঙ্গে ভাষার তফাত না থাকলেও এর মধ্যে কোন কোনটিকেই যে শুধু ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়, এমন ঘটনার একটি উদাহরণ দেয়া যাক, দক্ষিণ ইউরোপের নানা ভাষা-উপভাষাগুলোতে একটি মাত্র শব্দের বিবর্তনকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে। শব্দটি হলো তালা-চাবির চাবি বুঝাতে যেই শব্দ ব্যবহৃত হয় সেটি। চাবিকে কোথাকার মানুষ কী বলে এখানে সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। স্পেনের কাতালান অঞ্চলের মানুষের মুখে চাবি হলো ক্লাউ। ওই স্পেনেই আর একটু উত্তর পূর্বে গিয়ে ফ্রান্স সীমান্তের ফ্রাঙ্কো-প্রোভাঁ অঞ্চলে একে বলা হয় ক্লাঁ। এখান থেকে সোজা পূর্বে গেলে সুইজারল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলে রোমান্স ভাষীদের মুখে চাবি হলো ক্লাভ। আরো পূর্বে উত্তর ইতালীর পিডেমোন্টিজ ভাষাভাষীরা একে বলে চাভ। এরপর মধ্য ইতালীর ফ্লোরেন্টাইন ভাষীদের মুখে এটি কিয়াভে। আর এখানকার ভাষাটিকেই ইতালিয়ান ভাষা হিসেবে গ্রহণ করাতে প্রমিত ইতালিয়ান ভাষাতেও এটি কিয়াভে। এখানে চাবি জিনিসটির জন্য যত রকম শব্দের কথা বলা হলো তার প্রত্যেকটির সঙ্গে আমাদের বাংলা শব্দ চাবির সাদৃশ্যটি লক্ষণীয়; সবগুলোই ইন্দোইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের সদস্য হওয়াতেই এই মিল। বিশেষ করে গ্রীক ও ল্যাটিনের মাধ্যমে এই পরিবারের ল্যাটিন শাখার সঙ্গে চার হাজার বছর আগের মূল ভল্গা তীরের ভাষার বেশি মিল থাকায় এমনটি হয়েছে। এখানে উল্লেখিত বেশির ভাগ ভাষা কিন্তু উপভাষা হিসেবে পরিচিত– কাতালান, ফ্রাঙ্কো-প্রোভাঁ, পিডেমোন্টিজ, ফ্লোরেন্টাইন এই সব। এগুলোর প্রত্যেকটি কিন্তু বেশ বড় অঞ্চলে কথিত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টময় ভাষা, তারপরও তাদেরকে উপভাষা হিসেবেই আমরা জানি। অথচ দক্ষিণ সুইজারল্যান্ডের ছোট্ট পার্বত্য অঞ্চলের খুব অল্প সংখ্যক মানুষের ভাষা রোমান্স শুধু ভাষা হিসেবেই স্বীকৃত নয় এটি একটি জাতীয় ভাষাও বটে; এটি সুইজারল্যান্ডের চারটি জাতীয় ভাষার একটি– জার্মান, ফরাসী, ইতালিয়ান এবং রোমান্স। বৈশিষ্টের বিবেচনায় ওই তিনটি বড় বড় ভাষার সঙ্গে এই ছোট্ট ভাষাটিকেও সমান জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেয়া হয়েছে। অথচ এর থেকে অনেক বড় অঞ্চলে অনেক বেশি মানুষ উল্লেখিত

উপভাষাগুলোতে কথা বলে। তা সত্ত্বেও যে পুরো অঞ্চলের কথা বলা হলো সেখানে ভাষা বলতে আমরা শুধু স্প্যানিশ, ফরাসী, ও ইতালিয়ানকেই জানি, ওই রোমান্সটি ছাড়া।

ফ্লোরেন্টাইন ভাষাটি যতক্ষণ ফ্লোরেন্স অঞ্চলের মুখের ভাষা হিসেবে বিবেচিত এটি ততক্ষণ একটি উপভাষা। অথচ ইতালীর মানুষ ইতালী নামক রাষ্ট্র গঠনেরও অনেক আগে যখন ইতালীয় নামক সংস্কৃতিক সত্তার দাবীদার সব মানুষের জন্য একটি প্রমিত ভাষা ওখানকার উপভাষাগুলোর মধ্য থেকে বেছে নিয়েছিলো, তখন এই ফ্লোরেন্টাইনকেই বেছে নিয়েছিলেন। এটির সঙ্গেই আজকের ইতালিয়ান ভাষার সিংহভাগ মিল। ইতালীর এত উপভাষার মধ্যে এটি বেছে নেয়াটি নেহাত একটি সাংস্কৃতিক পছন্দ ছিলো, আর কিছু নয়। এসব দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় উপভাষা আর ভাষায় কোন মৌলিক তফাত নেই।

জনৈক ভাষাবিদ কিছুটা কৌতুকচ্ছলেই বলেছেন কোন উপভাষার যখন সেনাবাহিনী আর নৌবাহিনী গড়ে তোলা হয় তখন তাকে ভাষা বলা হয়। অর্থাৎ কিনা এখানে কর্তৃপক্ষীয় একটি পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপার আছে, এবং সেটিই কোন উপভাষার ভাষা হবার ক্ষেত্রে বড় নিয়ামক। কথাটি আরো ভাল খাটে ভাষাটিকে যখন প্রমিত ভাষা করে তোলা হয়। কিছু কিছু বড় বড় ভাষা আছে যেগুলো কখনো আনুষ্ঠানিক ব্যাকরণ, নিয়ম কানুন ইত্যাদি নিয়ে প্রমিত হয়ে ওঠেনি– যেমন আফ্রিকার ইয়ুরুবা, ফুলা ইত্যাদি বিপুল সংখ্যক মানুষের ভাষা এগুলো উপভাষা হয়েই রয়েছে। কিন্তু উপভাষা না বলে ভাষা যেগুলোকে বলা হয় তাদের বেশির ভাগকেই ওভাবে প্রমিত করে তোলা হয়েছে। ভাষা নিজে স্বাভাবিক ভাবে মুখের কথায় জন্ম নিলেও প্রমিত করার কাজটি অনেকটা কৃত্রিমভাবে আরোপিত কাজ– যেটি পন্ডিতরা, সাহিত্যিকরা করে থাকেন; নাটকের-সিনেমার পরিচালকরাও খানিকটা করে থাকেন। কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য, কোন্‌টি ব্যাকরণ সম্মত, কোন্‌টি শুদ্ধ উচ্চারণ ইত্যাদিকে নিয়ম-নিগড়ে বেঁধে দেওয়াটাই প্রমিতকরণ। এতে সুবিধা হয় যে সবাই এক নিয়মে ভাষা ব্যবহার করে বলে বিশাল সংখ্যক লোকের পরস্পরের মনের ভাব সূক্ষ্মভাবে বোঝা সহজ হয়; বিদেশী যারা এ ভাষা শিখবে তাদের জন্যও সুবিধা হয়। অসুবিধাটি হলো নিজেদের প্রমিত ভাষাকেও কমবেশি সবাইকে শিখতে হয়, কারণ এটি সাধারণত সবার নিজেদের মুখের ভাষার অনুরূপ হয়না– যদিও অনেকে একে মুখের ভাষায় পরিণত করে। সেটি করুক বা না করুক, একে সবাই আনুষ্ঠানিক কাজে ব্যবহার করে। যদিও এটি আরোপিত, তবে এর মূলেও থাকে কোন না কোন উপভাষা,

অথবা কয়েকটি উপভাষার থেকে কিছু কিছু নিয়ে। সাধারণত রাজধানী অঞ্চলের উপভাষা, কিংবা গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অঞ্চলের উপভাষা, অথবা গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক রচনায় ব্যবহৃত উপভাষা এজন্য নির্বাচিত হয়। ভাষাকে প্রমিত করা যায়, কিন্তু একেবারে কৃত্রিম কিছু সংকেতের সমগ্ররূপ ভাষা হতে পারেনা– ভাষার সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক কথা বলা এবং কথা বল্‌তে গিয়ে তা মস্তিষ্কে ধারণ করাটি খুব জরুরী।

প্রমিত ভাষা যেন সাধারণ নিত্য ব্যবহার্য আটপৌরে জিনিসের মধ্য থেকে কিছু ব্র্যান্ড সৃষ্টি করে সুসজ্জিত নামকরা দোকানে তা পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা। এই পরিপাটি করে রাখার ব্যাপারটি অনেক বেড়ে যায় যখন ভাষাটিকে দাফ্‌তরিক ভাষা, জাতীয় ভাষা ইত্যাদির স্বীকৃতি দেয়া হয়, অতীতে কখনো কখনো একটি ভাষাকে দুনিয়ার একটি বড় অংশজোড়া সাম্রাজ্যের ভাষার স্বীকৃতিও দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে কোন কোনটি আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ভাষায় পরিণত হয়েছে যাকে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা নামে অভিহিত করা হয়েছে। তখন দুনিয়ার নানা দেশের নানা ভাষী বহু মানুষকে এটি শিখতে হয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান বা ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে। অতীতে এক এক সময় গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী, স্প্যানিশ, ফরাসী, রাশিয়ান ইত্যাদি ভাষা অন্তত বিশাল ভূ-ভাগের জন্য এই ভূমিকা পালন করেছে, এখন ইংরেজি তা করছে। এসব রাজ্য, সাম্রাজ্য, বা বিশ্বের ভাষা হবার সম্মান পেলে তার পারিপাট্য সাধনের কাজটি বেড়ে যায় বৈকি; অনেকে মিলেই তা তখন করে থাকে। কিন্তু তার ভেতর ভাষার যে গুণ সেটি কিন্তু ওই মানুষের মুখের ভাষা অর্থাৎ উপভাষা থেকেই আসে, বাইরের পারিপাট্য সেই মৌলিক গুণ এনে দিতে পারেনা।

কোন কোন ভাগ্যবান উপভাষা কী ভাবে ভাষায়, প্রমিত ভাষায়, এমনকি কোন কোনটি জাতীয় ভাষায় পরিণত হলো তার কিছু উদাহরণ দেয়া যাক। ইতালির ব্যাপারটি আরো একটু ভাল করে দেখি। আধুনিক কালে ইতালি একটি দেশ হয়েছে খুব সম্প্রতি ১৮৬০ সালে। এর আগে এটি নানা রাজ্যে বিভক্ত ছিল যদিও সাংস্কৃতিক একটি ঐক্য ছিল সবগুলোর মধ্যে। এসব রাজ্যে বা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উপভাষাই ছিল মানুষের ভাষা। তবে ১৪০০ শতকের দিকে সাংস্কৃতিক ঐক্যের সঙ্গে একরকম ভাষাগত ঐক্যও গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে– টাস্‌কেনি অঞ্চলের, বিশেষ করে এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যধারী ফ্লোরেন্স নগরী অঞ্চলের উপভাষাকে (ফ্লোরেন্টাইন) প্রায় পুরো ইতালির জন্য একটি প্রমিত ভাষা হিসেবে গড়ে তুলে। এর কারণ এখানকার সাংস্কৃতিক প্রভাবটি ইতালির সব মানুষই গর্ব

ভরে অনুভব করতো। এভাবেই ইতালীয়ান ভাষার জন্ম, ইতালী দেশের জন্মের বহু আগেই। ফরাসী ভাষাটি অবশ্য অনেকটা রাজনৈতিক প্রভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। ১৪০০ সালে প্যারিস-কেন্দ্রিক ফরাসী রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়ে উঠলে প্যারিসের কাছাকাছি উত্তর ফ্রান্সের উপভাষাটিকে ব্যবহার করে সবাই রাজধানীর পরিশীলিত ভাষা ব্যবহারের সুযোগটি নিতো এবং এভাবে এখানকার ভাষা সমগ্র উত্তর ফ্রান্সের আনুষ্ঠানিক ভাষায় পরিণত হয়। কিন্তু ওসময় দক্ষিণ ফ্রান্সের ওপর এ রাষ্ট্রের এখতিয়ারটি খুব বেশি শক্তিশালী ছিলনা– ওখানকার মানুষ ওই প্রমিত ফরাসীর বদলে তাদের নিজস্ব একটি ভাষাকে আনুষ্ঠানিক কাজে ব্যবহার করতো, তাদের একটি উপভাষাকে ভিত্তি করে। এর দুশ' বছর পর ১৬০০ শতকে চতুর্দশ লুইয়ের মত অত্যন্ত প্রভাবশালী ফরাসী রাজার পক্ষেই সম্ভব হয়েছিলো প্যারিস-ভিত্তিক প্রমিত ফরাসীকে সারা ফ্রান্সের আনুষ্ঠানিক ভাষা হিসেবে গ্রহণযোগ্য করতে।

জার্মান ভাষার ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটি নানা দিক থেকে ভিন্ন। আধুনিক একীভূত জার্মানি রাষ্ট্রটিও খুবই সাম্প্রতিক ব্যাপার, ইতালিরও পরের। এর আগে জার্মানির নানা রাজ্যের নানা উপভাষায় সব কাজ চল্‌তো, যাদের লিখিত রূপও আছে, যদিও এগুলো মূলত ওখানকার মানুষের মুখের ভাষা। ১৪০০ শতকে যখন জার্মানিরই একজন বিদ্রোহী খৃষ্টান যাজক মার্টিন লুথার রোমান ক্যাথোলিক ধর্মগুরু পোপের একচ্ছত্র ধর্ম-শাসনকে অগ্রাহ্য করে প্রটেস্টান্ট খৃষ্টান ধর্মের প্রবর্তন করলেন, তখন সব মানুষ যাতে নিজেই বাইবেলের মূল মর্মবাণী বুঝতে পারে তাই বাইবেলের একটি জার্মান অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু সেটি কোন্ জার্মান উপভাষায় করবেন? তাই তিনি সব জার্মান উপভাষার সঙ্গে মিল্ রেখে জার্মানির সবাই বুঝতে পারবে এমন একটি প্রমিত ভাষা সৃষ্টি করে তাতেই অনুবাদটি করলেন, একে বলা হলো উচ্চ জার্মান। ওসময় জার্মানিতেই পৃথিবীর প্রথম আধুনিক ছাপাখানার প্রযুক্তি সবে চালু হয়েছিলো। অনেক সংখ্যায় মুদ্রিত বাইবেলের কল্যাণে উচ্চ জার্মান প্রমিত ভাষা জার্মানির ঘরে ঘরে এবং আনুষ্ঠানিক আবৃত্তিতে ও বক্তব্যে সবার মুখে মুখে পৌঁছে গেলো। সেই থেকে এটিই প্রমিত জার্মান ভাষা। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যের বা অঞ্চলের উপভাষাগুলোই সত্যিকার ভাবে মুখের ভাষা হয়ে রইলো– কারণ সাধারণ কথাবার্তা তারা উপভাষাতেই বলে। আমাদের বাংলার বেলায়ও আধুনিক প্রমিত বাংলা তৈরিতে সাংস্কৃতিক প্রভাবটিই কাজ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা সারা বাংলার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কেন্দ্র হয়ে ওঠেছিলো বলে কলকাতা ও কাছের নদীয়া-

শান্তিপুর অঞ্চলের মুখের ভাষাটিই প্রমিত বাংলা হিসেবে গড়ে ওঠে– শুরুতে প্রধানত সাহিত্যের প্রভাবে, তারপর বড় আসরের কথাবার্তায়, তারপর এক সময় আনুষ্ঠানিক কাজেও। রাজনৈতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও বাংলাভাষী দুই অংশেই এই রীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। এভাবে একটি অঞ্চলের মুখের ভাষাকে সর্বজনীন প্রমিত হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকদের বড় ভূমিকা ছিল।

ইতালিয়ান বা জার্মান ভাষা গড়ে উঠতে রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন হয়নি, কিন্তু ফরাসী ভাষার ক্ষেত্রে তা প্রয়োজন হয়েছে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে কলকাতার সাংস্কৃতিক প্রভাব কাজ করেছে বটে, কিন্তু ইংরেজ শাসকের রাজধানী না হলে কলকাতা সেই সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হতোনা। অন্য দিকে সুইডিশ, নরওয়েজিয়ান, ড্যানিশ এগুলোর প্রত্যেকটির পৃথক প্রমিত ভাষা হবার কথাই ছিলনা– কারণ এই তিন দেশের সব মানুষ পরস্পরের সব কথা চমৎকার বুঝতে পারে, এতই মিল তিনটিতে– বড় জোর এই তিনটি উপভাষা নিয়ে একটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ভাষা হবার কথা। কিন্তু বহুদিন আগে থেকে এগুলো তিনটি আলাদা স্বাধীন দেশ হয়ে গেছে, কাজেই প্রত্যেকের নিজের ভাষা থাকা দরকার– তাই হয়েছে। ওই যে বলা হয়েছে সেনাবাহিনী আর নৌবাহিনী থাকলেই উপভাষাটি ভাষা হয়ে যায়। এটিই সাধারণত হয়ে থাকে– এমনকি কখনো কখনো এরকম বাহিনীর জোরে বাইরের সম্পূর্ণ নতুন ভাষাকে কোথাও প্রতিষ্ঠিত করে ফেলা যায়, স্থানীয় উপভাষার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে। ভাষা-ঢেউয়ের আলোচনায় আমরা দেখেছি কিছু দূর পর পর খুব সামান্য একটু একটু করে মুখের ভাষা পরিবর্তিত হতে হতে হঠাৎ এক জায়গায় একটি সীমান্ত পার হলেই সম্পূর্ণ অচেনা, একেবারে অন্যরকম একটি ভাষাতে হঠাৎ বদলে যেতে পারে। সেটি ওরকম রাজনৈতিক কারণেই শুধু হতে পারে। যেমন একটি উদাহরণ নিলে দেখি দক্ষিণ আমেরিকায় গ্রামের পর গ্রাম স্থানীয় 'ইন্ডিয়ান' আদিবাসীর মুখের ভাষা একটু একটু করে বদলে যায় জায়গার সঙ্গে, কিন্তু হঠাৎ একটু বড় নগরের সীমানায় এসে দেখা যায় ওখানে ওই 'ইন্ডিয়ান' ভাষাগুলোর সঙ্গে একেবারে অসম্পর্কিত সম্পূর্ণ নতুন স্প্যানিশ ভাষায় সবাই কথা বল্‌ছে যা ওই গ্রামগুলোর আদিবাসীদের অচেনা। ১৫০০ সালের দিকে স্প্যানিশ বিজয়ী যোদ্ধারা এসব রাজ্য দখল করে অন্তত নগরাঞ্চলে নিজেদের ভাষাকে আনুষ্ঠানিক ভাষা করার ফলেই আজ অবধি এমনি আছে। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন সুইজারল্যান্ডের শক্তিশালী সেনাবাহিনী আছে, কিন্তু সে দেশের ভাষা সুইস

জার্মান একটি উপভাষাই হয়ে আছে, ভাষা হয়নি। এটিই সে দেশের জার্মানভাষী অঞ্চলে সবার ভাষা; যারা কিনা সংখ্যাগরিষ্ঠ, এভাষাতেই সব সাধারণ কাজ চলে, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই। এর লিখিত রূপ, কম্পিউটার কী বোর্ড সবই আছে– বলতে গেলে যে কোন অর্থেই এটি এখানকার মানুষের প্রমিত জাতীয় ভাষা। কিন্তু তারপরও তার স্থান উপভাষার; কারণ কেউ যদি একটি আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা দেয় তখন এ ভাষা ব্যবহার করেনা, করে সেই উচ্চ জার্মান, যা জার্মানিরও ভাষা। যদি গুরুগম্ভীর আনুষ্ঠানিক প্রবন্ধ লিখতে হয় তখনো উচ্চ জার্মান, যদি কোন আইন জারী করতে হয় তাও উচ্চ জার্মান। উচ্চ জার্মান এখানে কারো মুখের ভাষা নয়, স্কুলেই শেখে; আসলে তা ওই আনুষ্ঠানিক কয়েকটি কাজের বাইরে কখনোই ব্যবহৃত হয়না।

বহুদেশ জুড়ে সর্বজনীন ভাষা লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কার ক্ষেত্রেও কিছু অদ্ভুত জিনিস দেখা যায়। মরক্কোর মানুষকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তার ভাষা কী, সে উত্তর দেবে আরবী; জর্দানের মানুষকে যদি জিজ্ঞেস করলে সেও একই উত্তর দেবে আরবী। কিন্তু এই দুই দেশের মানুষের দেখা হলে যদি যার যার আরবী ভাষায় কথা বলে কারো কথা কেউ বুঝবেনা। সেক্ষেত্রে তাদের যোগাযোগের একমাত্র উপায় হবে আধুনিক প্রমিত আন্তর্জাতিক আরবী– যা পুরো আরব জগতের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা। বললাম আধুনিক, কিন্তু আসলে এটিকে সযত্নে রেখে দেয়া হয়েছে ষষ্ঠ শতাব্দীর আনুষ্ঠানিক আরবী ভাষায়, যে ভাষায় কোরান রচিত হয়েছে; এটি মোটের ওপর সেই কোরানের আরবী। এর মানে কি মরক্কোর আরবী বা জর্দানের আরবী ওই প্রমিত আরবীর উপভাষা? না, একথা ওরা কেউ মানবেনা। সেগুলো প্রত্যেকটিই একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষা– জাতীয় ভাষা, আন্তর্জাতিক ভাষা, বা সর্বজনীন ভাষা নয় বটে, তবে তাদের গর্বের ভাষা অবশ্যই। মরক্কোর সংস্কৃতিকে ধারণ করতে পারে একমাত্র তার ওই ভাষা, প্রমিত আরবী নয়, জর্দানেরও ঠিক তাই। আসলে প্রত্যেক উপভাষার ক্ষেত্রে একথা বলা চলে– মরক্কোর মত একটি পুরো দেশের উপভাষা না হলেও।

মুখের ভাষার মধ্য দিয়ে ভাষার পরিবর্তনঃ

আর্য অভিবাসনের ফলে আমাদের ভাষা খুব বড় রকমে বদলে গিয়েছিলো একথা ঠিক, কিন্তু সেটি স্পেনের বিজয়ী যোদ্ধাদের মত ভাষা চাপিয়ে দেয়ার মত করে যে হয়নি সে সিদ্ধান্ত আমরা ইতোমধ্যেই নিতে পেরেছি। আর্যদের জিন-মিশ্রণের মধ্য দিয়ে যেমন একটি মিশ্র জাতির সৃষ্টি হয়েছে তেমনি ভাষা মিশ্রণের মধ্য

দিয়ে মিশ্র ভাষার সৃষ্টি হয়েছে যার শাখা প্রশাখাগুলো আজকের ভারতবর্ষের আধুনিক বহু ভাষা– ইন্দোইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের। এটি সত্য যে সেই মিশ্র ভাষার মধ্যে আর্যদের ইন্দোইউরোপীয় ভাষার শব্দগুলো যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করেছিলো, সেটি আজকের ভাষাগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। নতুন আসা কারো সঙ্গে কথোপকথনে আগের ভাষাটি যখন বেশি বদলায় তখন বুঝতে হয় যে সে সময়ের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, ব্যবসা-বাণিজ্যিক এবং প্রশাসনিক আবহে ওই নতুন ভাষার বেশি গুরুত্ব থাকে। কারণ তা হলেই কথোপকথনে নতুন শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি বেশি হবে এবং মিশ্র ভাষায় সেগুলোর স্থান বেশি হবে।

অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে বল্‌তে গেলে আধুনিক ভাষাবিদদের চোখের সামনে ঘটা এরকম কিছু পরিবর্তন থেকে আমরা আমাদের প্রাচীন ভাষা পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলো কিছুটা ভাল বুঝতে পারবো। দু তিনশ' বছর আগে থেকে ইউরোপীয় কিছু উপনিবেশবাদী শক্তি ইংরেজ, ফরাসী, স্প্যানিশ, ডাচ পর্তুগীজ এরা এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকায় ও নানা দ্বীপাঞ্চলে কোথাও সরাসরি রাজত্ব করেছে, কোথাও তা না করেও ধর্মীয়, ব্যবসায়িক, জীবিকা সংক্রান্ত, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি দিক থেকে বড় প্রভাব রেখেছে। এসব প্রভাবের একটি ফল হলো ওসব দেশের ভাষা বড় রকমে বদলে যাওয়া। সে রকম কয়েকটির উদাহরণ নেয়া যায়। এরকম প্রায় সবক্ষেত্রে ওই নতুন ভাষার সংস্পর্শে এসেছে প্রথমে বয়স্ক মানুষরা যাদেরকে কর্মক্ষেত্রে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে হয় নতুন আগন্তকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বল্‌তে হয়েছে, অথবা আগন্তকদের ভাষায় বা তার শব্দাবলীতে খুব অভ্যস্ত হয়ে গেছে এমন বহু স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে। ওই ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, ব্যবসায়িক, প্রশাসনিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা যত বেড়েছে তাদের কথোপকথনে এসব নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তি ততই বেড়েছে এবং পার্শ্ব-প্রবাহে বিস্তৃত হয়েছে। এভাবেই অন্তত বয়স্কদের ভাষাটি একটি মিশ্র রূপ ধারণ করেছে। পরে বিষয়টি যখন এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে এই বয়স্করা তাদের শিশু সন্তানের সঙ্গে কথা বল্‌তে গিয়েও এই মিশ্র ভাষাই ব্যবহার করেছে ওই সব নতুন শব্দের অধিক পুনরাবৃত্তি বজায় রেখেছে, তখন শুধু পার্শ্ব-প্রবাহে নয়, বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে খাড়া প্রবাহেও এটি ঢুকে পড়েছে, অর্থাৎ এই নতুন মিশ্র ভাষাই পরের প্রজন্মগুলোর মাতৃভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্রমে।

আফ্রিকার বিশাল দেশ নাইজেরিয়ার সরকারী ভাষা ইংরেজি। এখানে বড় বড় গোত্রগুলোর তাদের নিজস্ব ভাষা আছে– ইগবো, ফুলা, হাউজা, ইউরুবা

ইত্যাদি। তবে সারা নাইজেরিয়া জুড়ে সব জায়গায় সবাই যে ভাষা বেশি ব্যবহার করে সেটি একটি মিশ্র ভাষা– ওপরে যে ভাবে মিশ্র ভাষা সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে ঠিক সেভাবেই যার সৃষ্টি। এমন মিশ্র ভাষাকে প্রথম পর্যায়ে সাধারণত পিজিন ভাষা বলা হয়, যা মুখে মুখে সৃষ্টি হয়। পরের প্রজন্মগুলোতে যাওয়ার পর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তাকে ক্রেয়োলও বলে। সাধারণত একটি প্রভাবশালী ভাষার প্রভাবেই এই পিজিন বা ক্রেয়োল সৃষ্টি হয়। নাইজেরিয়ার ক্ষেত্রে সেই প্রভাবশালী ভাষাটি হলো ইংরেজি। নাইজেরিয়ার এই মিশ্র ভাষাটির নাম নাইজা। এটি নাইজেরিয়ার কোন স্বীকৃত বা প্রমিত ভাষা নয়, কিন্তু এরও একটি ব্যাকরণ আছে, ব্যাপক ব্যবহারের কারণে এক রকম আন্তর্জাতিক গুরুত্বও আছে– যেমন বিবিসি'র বহির্দেশীয় সম্প্রচার করা হয় যে সব ভাষায় তার মধ্যে নাইজাও রয়েছে। কয়েকটি বাক্য দেখলে বোঝা যায় মিশ্রণটি কী রকমঃ উনা দে ম্যাড (তোমরা সবাই পাগল)– ইগবো ভাষায় উনা মানে হলো তোমরা সবাই। বিকো ফ্রি মি (আমাকে দয়া করে একা থাকতে দাও)– ইগবো ভাষায় বিকো মানে দয়া করে। ইংরেজির শব্দ যেহেতু সব রকম ব্যবসা-বাণিজ্যে, কাজে-কর্মে, সরকারী দলিল-পত্রে ঢুকে গেছে, সাধারণ মানুষকে নিজেদের মধ্যে নিজেদের ভাষায় কথা বলার সময় এসব শব্দ ও বাক্য গঠন রীতি ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়েছে বলে পিজিন হিসেবে এটি গড়ে ওঠেছিলো কর্মস্থলে। এক পর্যায়ে এটিতে ওরা এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে এটি ঘরে ও পরিবারে চলে এসেছে, এবং পরিবারের শিশুর প্রথম মুখ ফোটার সময়ও বাবা-মা এই শব্দগুলো বার বার ব্যবহার করেছে; যার ফলে যা ছিল নেহাত বাইরের কাজ চালাবার একটি খিচুড়ি ভাষা সেটি শিশুর জন্য হয়ে পড়েছে মাতৃভাষা– যা তার মস্তিষ্কে আত্মস্থ হয়ে গেছে; তখন থেকে এটি পুরা দস্তুর ভাষা, ক্রেয়োল ভাষা। নাইজা পরে এমন ব্যাপক ভাষা হয়ে পড়লো যে এটি নাইজেরিয়ার বাইরে ঘানা, গিনি, বেনিন ইত্যাদি দেশে অনেকের মুখের ভাষা হয়ে পড়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো সুদূর আমেরিকার কাছে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের ভাষার সঙ্গে নাইজার কিছু কিছু মিল লক্ষ্য করা যায়। অতীতে দাস-শ্রমিক হিসেবে প্রচুর নাইজেরিয়ানকে ক্যারিবীয় অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো বলে তাদের সঙ্গে তাদের ভাষাও গিয়েছিলো। ওই ভাষা আবার ক্যারিবিয়ান ভাষাতে প্রভাবে রেখেছে।

এত প্রভাব থাকা সত্ত্বেও নাইজা একটি উপভাষা হয়েই রয়েছে, কারণ দেশ হিসেবে নাইজেরিয়া একে প্রমিত করেনি, জাতীয় ভাষাও করেনি, সেটি করেছে ইংরেজিকে। কিন্তু সব মিশ্র ভাষার এমন পরিণতি হয়নি। পাপুয়া-নিউগিনি

দেশটির রাষ্ট্রীয় ভাষা হচ্ছে টক্ পিসিন– নামটিই বলে দিচ্ছে মিশ্রভাষা হিসেবে তার প্রকৃতি। ভাষাকে এটি বলছে টক্, যেই ইংরেজি শব্দের অর্থ মুখের কথা, যে বিদেশি ভাষায় প্রভাবিত এই মিশ্র ভাষা তা ইংরেজি; আর পিজিন বলা হয় বাজারি পরিবেশে বল্‌তে বলতে যে মিশ্র ভাষা সৃষ্ট হয় তাকে। অথচ আজ এটি একটি দেশের রাষ্ট্র ভাষা, ওই নামেই। এক সময় পাপুয়া-নিউগিণির বিপুল সংখ্যক মানুষ উত্তর অস্ট্রেলিয়ার কাজ করতে গিয়ে কাজের কারণে ইংরেজি ভাষীদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত কথোপকথন করেছে। দেশের মধ্যেও উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন সময় জার্মান, বৃটিশ এবং অস্ট্রেলিয়ার শাসনে এবং তত্ত্বাবধানে থাকার কারণে কাজের জায়গায় ইংরেজি, জার্মান ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার প্রভাবে আসতে হয়েছে। তাদের নিজেদের ছিল অসংখ্য মৌখিক ভাষা, যার প্রত্যেকটি আদি অস্ট্রালেশিয়ান ভাষা-পরিবারের অল্প সংখ্যক লোকের ভাষা। এরকম অবস্থায় মিশ্র ভাষা টক পিসিন এই অসংখ্য ভাষাভাষীদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং এক সময় প্রমিত ও স্বীকৃত ভাষা হয়ে ওঠে।

এর বাক্য গঠন রীতি স্থানীয় ভাষাগুলো অনুযায়ী অস্ট্রালেশিয়ান ধরণের, কিন্তু শব্দ বেশি ইংরেজির। তবে ওভাবে আনা শব্দ যাতে অপেক্ষাকৃত কম হয় সে জন্য একটি শব্দকেই নানা ভাবে ব্যবহার করে প্রসঙ্গ অনুসারে বুঝে নেয়। যেমন 'কী বিলং ইউ' (তোমার চাবি) এই বাক্যে এবং 'অল্ বিলং মার্কেট' (সব কিছু বাজার থেকে এসেছে) এই বাক্যে বিলং শব্দটির ভিন্ন ব্যবহার বুঝে নিতে হয়। অনেক সময় নতুন ইংরেজি শব্দ আনার থেকে যেগুলো ইতোমধ্যে এসেছে তা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করে। চুলের জন্য হেয়ার শব্দটি আনার চেয়ে একে গ্রাস বিলং হেড (মাথার ওপরের ঘাস) বলাতেই সারে। এভাবে একই শব্দকে নানা পরিস্থিতি অনুযায়ী নানা ভাবে বুঝে নেয়া, শব্দের সংখ্যা না বাড়ানো, এসব তাদের আদি অস্ট্রালেশিয়ান ভাষার রীতি, যাতে খুব সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত করার থেকে সরল ও কাটা কাটা রাখাটিই গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে প্রভাবশালী ইংরেজি ভাষার অনেক শব্দ নেবার সঙ্গে সঙ্গে এই মিশ্র ভাষাতে আগের ভাষার অনেক রীতি বজায় আছে; কেউ বল্‌বেনা যে প্রভাবশালী ভাষাটি কেউ হুবহু গ্রহণ করেছে। টক্ পিসিন ইংরেজি শব্দ গ্রহণের ক্ষেত্রে আরো দারুণ মিতব্যয়ী হয়েছে; যেমন ইংরেজিতে ফিশ (মাছ), পীস (শান্তি), পীচ (এক প্রকার ফল), ফীস্ট (ভোজ) প্রত্যেকটি একেবারে আলাদা হলেও টক পিসিনে এর সবগুলো অর্থ একটি মাত্র শব্দ পিস দিয়ে বোঝানো হয়, প্রসঙ্গ থেকে বুঝে নিতে হয় কোন্

অর্থে তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতখানি পরিবর্তিত একটি মিশ্র ভাষাকে কোন্ ভাষা-পরিবারে ফেলা যাবে তা ঠিক করা কঠিন।

কিন্তু বাংলার মত ভাষা তিন হাজার বছর ধরে আগের ভাষার সঙ্গে আর্য ভাষার মিশ্রণে সৃষ্টি হওয়ার সময় আর্য ভাষার অনেক মূল শব্দ গ্রহণে, এবং তার অনেকগুলোকে সুবিধামত বদলে নিতে মোটেই কার্পণ্য করেনি– তাই একে অনায়াসে আর্য ভাষার পরিবার ইন্দোইউরোপীয় হিসেবে চিহ্নিত করা গেছে। এর আগে আমাদের এই ভাষাটিই অস্ট্রোএশিয়াটিক, আদি-দ্রাবিড় ইত্যাদি পরিবারের থাকলেও এর পর তা ওই সব পরিবারে গণ্য হবার সুযোগ আর ছিলনা। এই পরিবর্তন অবশ্য কয়েক হাজার বছর ধরে ঘটেছে। আমাদের কাছাকাছি সময়ে এমন পরিবার পরিবর্তন নিজেদের প্রতিবেশীদের মধ্যেই ঘটেছে, এমন একটি উদাহরণ দেয়া যায়।

নেপালে দুটি প্রধান ভাষা নেওয়ারি (যাকে নেপাল ভাষাও বলা হয়) এবং নেপালি। নেওয়ারি কাঠমন্ডু অঞ্চল অর্থাৎ মধ্য নেপালের নেওয়ারি জনগোষ্ঠির মানুষের ভাষা, আর নেপালি প্রধানত গুর্খা জনগোষ্ঠির ভাষা। নেওয়ারি ছিল সিনোটিবেটান ভাষা-পরিবারের ওই পরিবারের, বৈশিষ্ট টোনালিটি অর্থাৎ খাদ উঁচুনিঁচু করে শব্দের অর্থ পরিবর্তন এতেও ছিল। কিন্তু অনেক দেরিতে হলেও এক সময় সংস্কৃত প্রভাবিত কাছাকাছি ভাষাগুলো এর ওপর প্রভাব বিস্তার করে, এসব ভাষাভাষী জনগোষ্ঠির সঙ্গে নেওয়ারিদের মেলামেশা ও কাজকর্ম বেড়ে যাওয়ার ফলে। এই প্রক্রিয়াটি বিশেষ ভাবে জোর পায় ১২০০ খৃষ্টাব্দের দিকে যখন কাছাকাছি ভারতের বিহার অঞ্চলের ইন্দোইউরোপীয় মৈথিলি ও অন্যান্য কয়েকটি ভাষার শব্দ ও সে সঙ্গে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ এতে ঢোকে। ফলে নেওয়ারিতে এখনো সিনোটিবেটান আদিবাসী ভাষা চেপাং থেকে প্রায় ৩০% শব্দ থাকলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ শব্দ কিন্তু ইন্দোইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের। পরে নেপালি, হিন্দি, ইংরেজি, ফারসি ও উর্দূ থেকেও আরো ইন্দোইউরোপীয় শব্দ এতে ঢুকেছে। তাছাড়া সিনোটিবেটানের ওই টোনালিটিও এটি হারিয়ে ফেলেছে। ফলে ভাষাটি অনেকদিন থেকেই ইন্দোইউরোপীয় পরিবারের দিকেই ঝুঁকে পড়েছে। সিনোটিবেটান ছেড়ে ইন্দোইউরোপিয়ান পরিবারে আসার আর একটি বড় নিদর্শন হলো এতে এখন পদ, কারক, বচন, কাল, বাচ্য ইত্যাদি পরিবর্তন করে একই শব্দের বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি করা যায় যেমন আমি থেকে আমরা, আমার, আমাকে ইত্যাদি সৃষ্টি; যেটি সিনোটিবেটানে সম্ভব নয়। নেওয়ারিতেও ছিলনা, পরে ঢুকেছে। নেওয়ারি এক সময় নেপালের রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল, কিন্তু পরে গুর্খারা

প্রাধান্য লাভ করলে নেপালিই সেই জায়গাটি দখল করেছে। নেপালি অবশ্য অনেক প্রাচীন কালেই ইন্দোইউরোপীয় রূপ লাভ করেছিলো, বাংলাসহ অন্যান্য অনেক ভাষার পূর্বসূরিদের মত।

সব ভাষাই মুখে মুখে তৈরি হয়েছে, বদলিয়েছে। কর্তৃপক্ষীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এর মধ্যে কোন কোনটি প্রমিত হয়েছে, বড় বড় স্বীকৃতি পেয়েছে। বৃহত্তর গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির জন্য এতে অনেক কিছু যোগ-বিয়োগও করা হয়; এর ব্যাকরণের নিয়মগুলো বেঁধে দেয়া হয়। এটি অনেক প্রাচীন কালেও করা হয়েছে। যেমন বহু হাজার বছর পুরানো মেসোপোটেমিয়ার ভাষাগুলোর মধ্য থেকে খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দেও সুমেরিয়ান, আক্কেডিয়ান এবং ব্যবিলনিয়ান বেশ শক্তিশালী ভাষায় পরিণত হয়েছিলো এমনি পৃষ্ঠপোষকতার কারণে। দুনিয়ায় একেবারে প্রথম আসা লিপিও ব্যবহৃত হয়েছিলো এই ভাষাগুলো লিখতে। পণ্ডিতদের দ্বারা সুসংবদ্ধ নিয়মে এসে আক্কেডিয়ানের পরবর্তী একটি রূপ আরামাইক নামে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে, এমনকি ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পর্যন্ত, একটি ব্যাপক ও প্রধান ভাষা হিসেবে প্রায় আধুনিক কাল পর্যন্ত চলে এসেছে। এরই একই ভাষা-পরিবার হচ্ছে সেমিটিক ভাষা-পরিবার যার প্রাচীন সদস্যদের মধ্যে রয়েছে ফীনিশীয়, হিব্রু, আরবী। এগুলোর সবই মধ্যপ্রাচ্যে সৃষ্ট– ফীনিশীয় লেবানন উপকূলে, হিব্রু প্যালাস্টাইনে, আরবী আরবে। প্রত্যেকটির ওপর পণ্ডিতদের বেঁধে দেয়া নিয়ম কানুন যথেষ্ট প্রাচীন। আর্যরা ভারতে আসার পর প্রমিত ও অতি আনুষ্ঠানিক কাজের উপযুক্ত করে সংস্কৃত ভাষাকে গড়ে তুলেছিলো। আর্যদের মুখের ভাষার অনেক শব্দে ও রীতিতে সমৃদ্ধ থাকলেও সংস্কৃত কখনো কারো মুখের ভাষা ছিলনা, তবে ওটিও মুখে মুখেই সৃষ্টি করা ভাষা ছিল, শিক্ষার্থীরা শুনে শুনে শিখতো, এর রচনাকে মুখস্ত করতো। আরো পরে খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে সংস্কৃত পণ্ডিত পাণিনি ওভাবে মুখে মুখেই এর অত্যন্ত নিয়ম নিগড় বাঁধা ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। ওই অতি বিস্তারিত নিয়মে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ব্যাকরণ সংস্কৃত ভাষাকে তো বটেই, তাছাড়া তার প্রভাবিত বহু কাল পরের বাংলার মত ভাষাকেও এক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে, ও করছে। অথচ সংস্কৃত ছিল প্রধানত শাস্ত্রীয় কাজের বাহক, যদিও সাহিত্যের বাহকও হয়েছিলো; আর বাংলা প্রধানত মানুষের কথার বাহক। প্রমিত ভাষা ক্ষেত্র বিশেষে মুখের ভাষা থেকে অনেক দূরে চলে যেতে পারে, নানা বাড়তি বিধিনিষেধের শাসনের ফলে। অন্তরঙ্গ ভাষার জন্য এটি ভাল কথা নয়।

আমাদের ভাষার পটভূমি

আর্য প্রভাবে আমাদের মুখের ভাষায় পরিবর্তনঃ

আর্যরা যখন ভারতে আসে তখন তারা নিজেদের মধ্যে তাদের নিজেদের ভাষাতেই কথা বলে চলেছিলো বহু বছর ধরে– ওই সুদূর স্টেপস তৃণভূমিতে যে ভাষায় তারা কথা বলতো, যার থেকে দুনিয়ার এক বিশাল অংশের ভাষাগুলো ইন্দোইউরোপীয় হয়েছে। ভারতে যারা এসেছিলো তাদের মধ্যে নানা গোত্রের ও তাদের মূল ভূমির নানা অঞ্চলের মানুষ ছিলো। তাই তাদের সবার হুবহু একই ভাষা ছিলনা, যদিও পরস্পর যথেষ্ট মিল ছিলো। ভারতে এসে এ ভাষাগুলো ধীরে ধীরে নানা জায়গায় একটু একটু করে পরিবর্তিত হয়েছে। তাদের মুখের মিশ্র ভাষার মধ্য থেকেই বাছাই করে নিয়ে একটি প্রমিত ভাষাও তারা গড়ে তুলেছিলো, সেটিই সংস্কৃত অর্থাৎ পরিশীলিত। এটি আর্যরা আনুষ্ঠানিক কাজে এবং ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করতো; কিন্তু এটি নিজে কারো মুখের ভাষা ছিলনা। আর্যদের মুখের ভাষা ও সংস্কৃতের এই পর্যায়কে বলা যায় আর্য ভাষার আদি যুগ। আর্যরা খৃষ্টপূর্ব ২ হাজার অব্দের দিকে আসলেও এই সংস্কৃত ভাষা ও নিজেদের মুখের ভাষার বিবর্তন চলেছে দেড় হাজার বছরের মত দীর্ঘ সময়। এ সময় স্থানীয়দের সঙ্গে আর্যদের জিন-মিশ্রণ থেমে ছিলনা, ভাষা-মিশ্রণও নয়; তবুও তখনো আর্যদেরকে হয়তো আলাদা ভাবে চেনা যেতো, তাদের ভাষাকেও। এরপর থেকে যখন আর্য ভাষার মধ্য যুগ শুরু হলো তখন তা কিন্তু আর অভিবাসী আর্যদের নয়, সেটি মিশ্র উত্তর ভারতীয়দের ভাষা; সেখানেও আনুষ্ঠানিক ভাষা সংস্কৃত, তবে তা ইতোমধ্যে ভারতীয় দ্রাবিড় ভাষাগুলো থেকে নানা বৈশিষ্ট গ্রহণ করেছে, বেশ কিছু শব্দও। এ সব হয়েছে পাশাপাশি সব মানুষের মিশ্র মুখের ভাষার প্রভাবে। উত্তর ভারতের অধিকাংশ মানুষের ভাষা তখন ইন্দোইউরোপীয় ভাষায় পরিণত হয়েছে, সংস্কৃত থেকে আসা প্রচুর শব্দ তাতে; যদিও এখানকার আদি অস্ট্রোএশিয়াটিক ও দ্রাবিড় ভাষারও বৈশিষ্ট তাতে কম নয়। এসব ভাষার বহু স্থানীয় রূপ রইলো বহুতরো উপভাষা হিসেবে– কোন কোনটি নামযুক্ত, কোন কোনটি নামহীন। ভাষা- ঢেউকে যেমন কিছু দূর পর পর বদলে যেতে দেখা যায় সেরকমই। তবে এক এক পুরো অঞ্চলের অনেক মানুষের বোধগম্য করে এসব মুখের ভাষায় কিছু প্রমিত রূপও গড়ে উঠলো। সংস্কৃত পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই বিভিন্ন প্রমিত ভাষাগুলো হলো প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃত জনের ভাষা; আসলে এও পরিশীলিত নাগরিক জনেরই ভাষা– সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা নয়। এভাবে প্রধান প্রাকৃত ভাষাগুলো মধ্যে বিশিষ্ট

ছিল উত্তর ভারতে সৌরসেনী, পশ্চিম ভারতে মহারাষ্ট্রী, পূর্ব ভারতে মাগধী ইত্যাদি। খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে ভারতে যখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ঘটলো তখন বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকগণ এর ধর্মীয় ভাষা হিসেবে একটি প্রাকৃতকেই বেছে নিলেন, এভাবে শাস্ত্রীয় কাজের উপযুক্ত হবার জন্য আরো আনুষ্ঠানিক রূপ নিয়ে এভাবে পালি ভাষার সৃষ্টি হলো।

এই প্রাকৃত ভাষাগুলো থেকেই আধুনিক ভারতীয় নানা ভাষার জন্ম হয়েছে বাংলা যার মধ্যে একটি। ১২০০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে প্রাকৃতের থেকে আধুনিক ভাষায় বিবর্তনের এই পালাটি শুরু হয়েছিলো। একে আমরা বলতে পারি আর্য ভাষার, বা আরো সঠিক অর্থে আর্য প্রভাবিত ভাষার আধুনিক যুগ। বাংলার ক্ষেত্রে এই আধুনিক বিবর্তনটি আমরা একটু পরে দেখবো। তবে তার আগে আর্য ভাষার মধ্য যুগে প্রাকৃত ভাষাগুলো কী ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছিলো তা একটু দেখা যাক।

প্রথম যুগের আর্য ভাষায় ছিলনা এমন অনেক ভাষা-রীতি মধ্য যুগের প্রাকৃত ভাষায় দেখা দিয়েছে স্থানীয় দ্রাবিড় ভাষার প্রভাবে। ওখান থেকে পরে আধুনিক ভাষাগুলোতেও তা চলে এসেছে– ওগুলো দ্রাবিড় ভাষার চিহ্ন, আর্য ভাষার নয়। আধুনিক বাংলার তার দু'একটি উদাহরণ দেয়া যায়। থাকা এবং ছাড়া দুটি ক্রিয়া পদ। বাংলায় এই দুটি ক্রিয়ার অদ্ভুত কিছু ব্যবহার দেখা যায় 'এটি থেকে ওটিতে যাও' এবং 'এটি ছেড়ে ওটির কথা বলো'। এখানে থাকা ও ছাড়ার যে ব্যতিক্রমী ব্যবহার হয়েছে তা দ্রাবিড় ভাষার বৈশিষ্ট, যা আর্য ভাষায় ছিলনা। দ্রাবিড় ভাষার আর একটি বৈশিষ্ট হলো কারো বরাত দিয়ে কথা বলা, এটিও আর্য ভাষায় ছিলনা, সংস্কৃতেও নেই। যেমন দ্রাবিড় গোষ্ঠির তামিল ভাষায় এই বাক্যটি বলা যায় (বাংলা অনুবাদে), 'দুধ নেই তিনি বলেছেন'। আরেক জনের বরাত দিয়ে কথাটি বলা হলো– এমন বাক্য আর্য ভাষায় না থাকলেও প্রাকৃত হয়ে তা আধুনিক উত্তর ভারতীয় ভাষাগুলোতে আছে, যেমন বাংলায় 'আপনি ঢাকায় যাচ্ছেন বলে শুনেছি'। এমন বরাত দিয়ে কথা সংস্কৃতে বলা যায়না, আমরা দ্রাবিড় ভাষা থেকে পেয়েছি। এরকম দ্রাবিড় ভাষা থেকে পাওয়া ভাষা রীতির আর একটি উদাহরণ হলো একটি বাক্যের যে 'কর্ম' অর্থাৎ এর ক্রিয়াটি যার ওপর প্রযুক্ত হচ্ছে প্রকারান্তে সেই আবার বাক্যাটির 'কর্তা' হিসেবে কাজ করা। যেমন 'আমার কথা বিশ্বাস হয়না?' এই বাক্যে আমার কথাটি বলা হয় যাকে (কর্ম) সেই আবার বিশ্বাস করা না করার কর্তা হয়ে বসেছে। ঠিক এরকম বাক্য তামিল ভাষায় অহরহ ব্যবহৃত হয়, যেমন একটি উদাহরণ বাংলা অনুবাদে: 'তুমি কি এটি বুঝতে পারছো?' মূল বাক্যটিতে 'এটি তোমাকে বলা হয়েছে 'তুমি' তাই

কর্ম, কিন্তু বোঝার কাজটিতে সেই আবার কর্তা। এমন বাক্য সংস্কৃতে হয়না। এভাবে দেখা যায় মধ্য যুগের প্রাকৃত হয়ে আধুনিক উত্তর ভারতীয় ভাষাগুলোতে দ্রাবিড় শব্দ যদিও অপেক্ষাকৃত কম এসেছে, ভাষারীতি কিন্তু নেহাত কম আসেনি। আগন্তুক আর্য ভাষা থেকে অনেক শব্দ এবং স্থানীয় দ্রাবিড় ভাষার বেশ কিছু রীতি নিয়েই এসেছে মধ্য যুগের প্রাকৃত ও সেখান থেকে আজকের আধুনিক ভাষাগুলো।

মধ্য যুগে প্রমিত প্রাকৃতগুলোই ছিল পরিশীলিত নাগরিকের সাধারণ আনুষ্ঠানিক ভাষা। শব্দ ভাণ্ডারের দিক থেকে এর সঙ্গে সংস্কৃতের মিল ছিল। এই মিল সর্বত্র সমানভাবে ছিলনা– যেমন উত্তর ভারতের সৌরসেনী প্রাকৃততে সংস্কৃত শব্দ যত ছিল, পূর্ব ভারতের মাগধী প্রাকৃততে অতটা ছিলনা। সংস্কৃত-ঘেঁষা এই প্রমিত প্রাকৃত ভাষাগুলো পণ্ডিতদের যথেষ্ট মনোযোগ পেতো। বাংলার সাক্ষাত পূর্বসূরি মাগধী প্রাকৃত অবশ্য রাজকীয় মনোযোগ অপেক্ষাকৃত বেশি পেয়েছে কারণ ব্যাপক প্রভাবশালী মৌর্য সাম্রাজ্যের এবং পরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রেই (বর্তমান ভারতের বিহারের পাটনা) এর বিকাশ হচ্ছিল বেশি। মগধ রাজ্যের এই কেন্দ্র ভূমি হয়ে ওঠেছিলো সাহিত্য, নাটক ইত্যাদিরও সৃষ্টি কেন্দ্র। ৫০০ খৃষ্টাব্দের দিকে এখানে কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্য ও নাটককে অত্যন্ত উচ্চ মানে নিয়ে যান। বিশেষ করে তাঁর নাটকগুলো সংস্কৃত এবং একাধিক প্রাকৃত ভাষায় রচিত হয়েছে– একই নাটকে বিভিন্ন ভাষার সন্নিবেশও ঘটেছে, যেমন শকুন্তলা নাটকে। সংস্কৃত আসলে কোন মানুষের মুখের ভাষা না হলেও নাটকে কিন্তু দেখা যায় উচ্চ বংশীয় অভিজাত পরিবারের পুরুষরা সংস্কৃত ভাষায় কথা বল্‌ছে, এর নিচে সমাজে যারা উচ্চ পদে আছে কিন্তু অভিজাত নয়, সেই পুরুষরা কথা বল্‌ছে মাগধী প্রাকৃততে, আর সেই সঙ্গে উচ্চ বংশীয় অভিজাত পরিবারের নারীরাও কথা বল্‌ছে মাগধী প্রাকৃত ভাষায়। এতে স্পষ্ট দেখা যায় যে দেবভাষা সংস্কৃতে অধিকার হলো সর্বোচ্চ শ্রেণীর পুরুষদের, কিন্তু ওই সর্বোচ্চ শ্রেণীর হয়েও নারীদের কিন্তু সে অধিকার নেই। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুরুষতান্ত্রিকতাটি এখানে কাজ করছে। সর্বোচ্চ শ্রেণীর নারীরাও চলে আসছে দ্বিতীয় কাতারে মাগধী প্রাকৃততে কথা বলায়। এই প্রাকৃতও কিন্তু প্রমিত, পরিশীলিত ভাষা- সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা নয়। নাটকে সাধারণ মানুষরা, বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষরা কথা বল্‌ছে কোন না কোন মুখের ভাষায়, পরে যা অপভ্রংশ নামে গুরুত্ব পেয়েছে, প্রমিতও হয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে ওই উচ্চ মর্যাদার মানুষরা, যারা সংস্কৃতে বা প্রাকৃততে কথা বল্‌ছে, তারাই আবার যখন

শোক ইত্যাদিতে কাতর হয়ে সম্বিতহারা হচ্ছে তখন অপভ্রংশে কথা বল্‌ছে। পরে দেখবো এই অপভ্রংশ থেকেই বাংলার মত আধুনিক ভাষার জন্ম হয়েছে।

মুখের ভাষা না হলেও, মুখের ভাষার কাছাকাছি প্রমিত প্রাকৃত ভাষাগুলো থাকলেও, সংস্কৃত কিন্তু শুধু ধর্মীয় শাস্ত্রের কাজে নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার কাজেও ব্যবহৃত হতো– ইউরোপে যেরকম এক কালে সব জ্ঞান বিজ্ঞান ল্যাটিন ভাষায় রচিত হতো অনেকটা সে ভাবে। গুপ্তযুগ ও গুপ্তত্তোর যুগের ভারতে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ইত্যাদির উৎকর্ষ অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলতে গেলে এখানেই ভিত রচিত হচ্ছিলো আধুনিক সংখ্যা রীতি ও পাটি গণিত, অ্যালজেব্রা, ত্রিকোণমিতি ইত্যাদির– এ সংক্রান্ত বিখ্যাত সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে সংস্কৃতে, এবং তাও গদ্যে নয়। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করতে গেলে সংস্কৃত শিখেই তা করতে হতো, নাগরিকদের ব্যবহৃত পরিশীলিত প্রাকৃত ভাষাতেও তা সম্ভব হতোনা।

একটি প্রাকৃতের উদাহরণঃ

উত্তর ভারতের সৌরসেনী প্রাকৃতের সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্কটি ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। আসলে এর মাধ্যমে মধ্য যুগের সংস্কৃততেও প্রচুর পরিবর্তন এসেছে। আজ আমরা ভারতের যে অঞ্চলকে হিন্দি বলয় বলি সেখানকার আধুনিক ভাষাগুলোর বিবর্তন ঘটেছে সৌরসেনী প্রাকৃত থেকে। অন্যদিকে মাগধী প্রাকৃত তার সংস্কৃত ঐতিহ্য সত্ত্বেও ওই বলয়ের বাইরে সংস্কৃত ছাড়াও অন্যান্য নানা প্রভাবেও সিক্ত হয়ে বিহার, ঝাড়খণ্ড, বাংলা, আসাম, উড়িষ্যার অনেক আধুনিক ভাষার সৃষ্টি করেছে– শুধু বাংলা বা আসামীর (অহোমিয়া) মত প্রমিত ভাষা নয় মৈথিলি, ভোজপুরি, সদরি, চাটগেঁয়ে, সিলেটির মত অত্যন্ত বৈশিষ্টময় ব্যাপক ইন্দোইউরোপীয় আধুনিক ভাষার জন্ম দিয়েছে। আমরা এখানে হিন্দি বলয়ের ভাষাগুলোর পূর্বসূরি হিসেবে সৌরসেনী প্রাকৃতের কথা কিছুটা উল্লেখ করতে পারি, যাতে তার সঙ্গে সংস্কৃতের বিশেষ সম্পর্কটিও বোঝা যাবে। আগেকার সৌরসেনা রাজ্যটি বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের মধ্যাঞ্চল (মথুরা-বৃন্দাবন যেখানে রয়েছে) জুড়ে ছিলো। তৃতীয় থেকে দশম খৃষ্টাব্দের মধ্যে এখানে সৌরসেনী প্রাকৃত ভাষা বিকশিত হয়েছিলো। তারও আগে খৃষ্টপূর্ব ২য় অব্দের দিকে এখানকার নানা মুখের ভাষা মধ্য যুগের শুরুর দিক থেকেই সংস্কৃত ভাষাতে যথেষ্ট পরিবর্তন আনতে শুরু করেছিলো, যার কারণে এটি আগন্তক আর্যদের সৃষ্টি করা ঋগবেদের ভাষা থেকে একান্তই ভারতীয় রূপ লাভ করে

তাতেই স্থিত হয়েছিলো। কাজেই সৌরসেনী প্রাকৃততে সংস্কৃত প্রভাব বেশি থাকাটি এক-পাক্ষিক ছিলনা, সংস্কৃত ভাষার ওপরও আদি সৌরসেনী মানুষের মুখের ভাষাগুলোর (যার মধ্যে আদি-দ্রাবিড়েরও রেশ তখনো হয়তো প্রচুর ছিল) যথেষ্ট ছাপ পড়েছিলো। ওই একই মুখের ভাষাগুলোই প্রমিত হয়ে সৌরসেনী প্রাকৃত তৈরি হয়েছিলো। অন্যদিকে ওই মুখের ভাষাগুলোর নিজের পরিবর্তনও কিন্তু থেমে থাকেনি– আর তারই ধারাবাহিকতায় ওই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের আজকের নানা মৌখিক ভাষায় পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে একটু পূর্বের দিকের নানা স্থানে এভাবে সৃষ্টি হয়েছে আওয়াধি, ছত্তিশগড়ি এবং বাগেলি ভাষা, এবং পশ্চিমের জায়গাগুলিতে খারিবোলি, বানাশ্রু, ব্রজভাষা, বুন্দেলি, কনৌজি ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকটি এক একটি বিরাট অঞ্চলের ভাষা, যেখানে স্থানীয় বৈচিত্র সত্ত্বেও সবাই এই ভাষা বুঝতে পারে কিছুটা নিজস্ব ভঙ্গিতে বলতে পারে। আরো বড় কথা এই প্রত্যেকটি ভাষাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠেছে নিজের নিজের বৈশিষ্ট ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে স্পষ্ট আলাদা লোকজ সাহিত্য ও সংস্কৃতি। ওই অঞ্চলের সঙ্গে পরিচিত যে কেউ বলে দিতে পারবে এর প্রত্যেকটি ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজ সংস্কৃতির কোন্‌টি কোথাকার।

ওই মুখের ভাষাগুলোর মধ্যে খারিবোলি ভাষার (নামের অর্থ উচ্চ ভাষা) দিল্লীর কাছে মিরাট অঞ্চলের রূপটিকে হিন্দুস্থানিও বলা হয়। ওই মৌখিক ভাষাগুলোর মধ্যে বিশেষ করে খারিবোলি ও হিন্দুস্তানির মধ্যে মুসলিম শাসন ও মুসলিম জনগোষ্ঠির প্রভাবে প্রচুর ফারসি শব্দ স্থান পেয়েছে। এ সময়েই হিন্দুস্তানিকে মূল ধরে নিয়ে একটি প্রমিত ভাষা তৈরি হয়ে গিয়েছিলো যাকে এখন হিন্দি বলা হয়। হিন্দুস্তানিটিই মুখের ভাষা, হিন্দি প্রমিত ভাষা। প্রমিত হবার ফলে আরো বড় অঞ্চলের মানুষ হিন্দিকেই কাজের ভাষায় পরিণত করতে পেরেছ প্রধানত ওই পুরো হিন্দি বলয়ের মানুষ। কাজের ভাষা হিন্দি হলেও মুখের ভাষা যে সমৃদ্ধ সব আলাদা নানা ভাষা, তা আমরা দেখেছি। পরে ভারতের জাতীয় ভাষা হিসেবে গৃহীত হবার পর এতে আরো বেশি বেশি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের রীতি গড়ে ওঠে। ফলে এটি মূল মুখের ভাষা হিন্দুস্তানি থেকে আরো কিছু ভিন্ন হয়ে পড়ে। আসলে উর্দূ ভাষাটিও ওই একই সময়ে হিন্দুস্তানির আর একটি প্রমিত ভাষা হিসেবে গড়ে ওঠেছিল। বিশেষ করে মোগল রাজদরবারে এবং সেনাবাহিনীতে প্রমিত ও আনুষ্ঠানিক কাজের জন্য গুরুত্ব পাওয়ার কারণে এটিও সারা উত্তর ও পশ্চিম ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হিসেবে গড়ে ওঠে- যার প্রমিতকরণের সময় ফারসি শব্দই গ্রহণ করা হয়েছে বেশি। সামরিক ব্যবহারের থেকেই উর্দূ তার

নামটি পেয়েছে সামরিক পোষাক বা উর্দি থেকে। তবে মোগল শাসনের পরেও উত্তর ও পশ্চিম ভারতের এবং ভারতের অন্যান্য অংশেও অসংখ্য মানুষের এটি নিত্য ব্যবহৃত প্রমিত ভাষা হিসেবে থেকে গেছে। এমনি ব্যাপক ব্যবহার হলেও হিন্দি এবং উর্দূ উভয় ভাষার জন্ম কিন্তু দিল্লীর কাছের সীমিত মানুষের মুখের ভাষা খারিবোলি বা হিন্দুস্তানি থেকে। আসলে পৃথিবীর অধিকাংশ আনুষ্ঠানিক ভাষাগুলোর ইতিহাস দেখলেই আমরা দেখবো মূলত তার জন্ম কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় মৌখিক ভাষাকে কেন্দ্র করে তার প্রমিতকরণের ফলে– বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়।

প্রমিত বাংলা ভাষা

সেদিনের মুখের ভাষা ও প্রমিত ভাষাগুলো:

যারা বাংলা ভাষাকে সবার নিজেদের ভাষা বলে মনে করে, অর্থাৎ নিজেদের প্রমিত ভাষা মনে করে এমন পুরো জনগোষ্ঠির দিকে যদি আজকে তাকাই তাহলে সেখানে অনেক রকমের মুখের ভাষা দেখি যাদের পরস্পরের মধ্যে অমিল যথেষ্ট। পশ্চিমে ঝাড়খণ্ড সীমান্তের যে বাংলাভাষী মানুষ তার মুখের ভাষা কাছের ঝাড়খণ্ডের মুখের ভাষার খুব কাছাকাছি। তার সঙ্গে যদি একেবারে পূর্বের সিলেটী বা চাটগেঁয়ের তুলনা করি তাহলে বুঝবো মুখের ভাষার বৈচিত্র্য কী জিনিস। একই ভাবে উত্তরে কার্সিয়াং-দার্জিলিঙের যারা একই অর্থে বাংলা ভাষী তাদের মুখের ভাষার সঙ্গে সুন্দরবন উপকূলে যারা ঢেউয়ের তালে তালে মাছ ধরছে তাদের মুখের কথাগুলোও মিলিয়ে দেখা যায়। এই পুরো এলাকায় যদি একের কাছে অন্যটি একেবারেই অদ্ভুত শোনায় এমন ভাষাগুলোকেও হিসেবে আনি তাও অনেকগুলো ভাষা পাওয়া যাবে। এর প্রত্যেকটি দীর্ঘকাল ধরে বিবর্তিত হয়ে আজকের অবস্থায় এসেছে; আজকে যেভাবে তাদের মুখে শুনছি, কয়েক শ' বছর আগে ওটি ঠিক ওরকম ছিলনা, আরো কয়েক শ' বছর আগে আরো অন্য রকম ছিল। প্রত্যেকটির নিজস্ব ইতিহাস আছে। অথচ সবার প্রমিত ভাষাটি, বাংলা ভাষাটিরও আলাদা করে ইতিহাস আছে, ওটি প্রমিত ভাষার ইতিহাস– পণ্ডিতদের হাতে ঘটেছে, সাহিত্যিকদের হাতে ঘটেছে, আনুষ্ঠানিক ব্যবহারকারীদের হাতে ঘটেছে; সাধারণ মানুষের মুখে মুখে কথোপকথনে নয়। কিন্তু ওই মুখের ভাষাগুলো থেকে কখনো সেটি বিচ্ছিন্ন থাকেনি– সজীব একটি ভাষা হবার জন্য প্রত্যেক সময়ে এই প্রমিত ভাষাকে সেই সময়ের ওই সবগুলো মুখের ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকতে হয়েছে, তাদের ওপর ভর করেই সেই প্রমিত ভাষাকে

দাঁড়াতে হয়েছে। প্রমিত ভাষাতেই কেউ কেউ কথোপকথন করতে পারে যদি তারা শিশুকালে প্রমিত ভাষা শুনেই বড় হয়ে থাকে তবে, অথবা যদি তারা পরে প্রমিত ভাষায় কথা বলাটি শিখে নিয়ে থাকে। সাহিত্যের কথোপকথন তো প্রমিত ভাষায় হতেই পারে। যদি অনেক অনেক পিছিয়ে গিয়ে আমরা ষষ্ঠ শতাব্দীতে কালিদাসের কর্মস্থল পাটলিপুত্রে চলে যাই তা হলে তাঁর নাটকে সংস্কৃত, মাগধী প্রাকৃত, অন্যান্য প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ এই বিভিন্ন ভাষার কথোপকথন শুনতে পাই।

পাটলিপুত্র বর্তমান ভারতের বিহার রাজ্যের রাজধানী পাটনা হলেও কালিদাসের কালে এটি আরো অনেক বিস্তৃত মগধ রাজ্যের রাজধানী ছিল– পূর্ব ভারতের বড় অঞ্চল বিহার, বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম জুড়ে সে রাজ্যের আওতা অথবা প্রভাব ছিল। তবে দীর্ঘকাল ধরে পাটলিপুত্র ও তার আশপাশের অঞ্চলটির গুরুত্বের কারণে আমরা ধরে নিতে পারি যে সেদিনের এখানকার প্রধান প্রাকৃত ভাষা মাগধী ওখানকার মুখের ভাষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠেছিলো– যদিও মাগধী ছিল আনুষ্ঠানিক একটি প্রমিত ভাষা, পরিশীলিত ভাষা, যার সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক মুখের ভাষার থেকে অনেক বেশি ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সেই দিনগুলোতে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীয় কাজে ও রাজকার্যে সংস্কৃতের প্রভাব খুবই বেশি ছিল ফলে ওই সাম্রাজ্যের বাকি গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিক কাজ চল্‌তো যে ক'টি প্রমিত ভাষায় তার মধ্যে প্রধানটি মাগধী প্রাকৃত হবে, তা আশা করা যায়। এই মাগধী পরে আরেকটি প্রাকৃত ভাষার জন্ম দিয়েছিলো অর্ধ মাগধী, যার সঙ্গে সে সময়ের ও অঞ্চলের মুখের ভাষার সম্পর্ক আরো বেশি ছিল। কালিদাসের নাটকে অপভ্রংশের যে পূর্বসূরি ভাষার সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি তা একেবারে সাধারণ মানুষ, সমাজের নিচুতলার মানুষের মুখের ভাষা মাগধী থেকে অনেক দূরের।

কিন্তু ধীরে ধীরে ওই সাধারণের মুখের ভাষাগুলো আরো বিকশিত হয়েছে, সমাজে আরো গুরুত্ব পেয়েছে, সাহিত্যেও। তা এতই ব্যাপ্তি পেয়েছিলো, এতই বিকশিত হয়েছিলো যে তার মধ্যে থেকেও প্রমিত ভাষার সৃষ্টি হয়েছে- বিভিন্ন এলাকার সাধারণ জনগোষ্ঠির জন্য এক একটি প্রমিত ভাষা; এদেরকেই বলা হয়েছে অপভ্রংশ। অর্ধ মাগধী ইত্যাদি প্রমিত ভাষাও ছিল– কিন্তু সেগুলো অনেক বেশি আনুষ্ঠানিক, সাধারণের মুখের ভাষা থেকে অনেক দূরে; সেগুলো গড়ে ওঠেছিলো এবং বিকশিত হয়েছিলো সমসাময়িক উচ্চ মহলের মানুষের কথাবার্তাকে ভিত্তি করে। অন্যদিকে অনেক বেশি মানুষকে স্পর্শ করা ব্যাপক প্রমিত ভাষা হয়ে উঠছিলো এই অপভ্রংশ। প্রাকৃত ভাষাগুলো সংস্কৃত থেকে বেশি

দূরে ছিলনা– সেখানে সংস্কৃত শব্দ অনেক বেশি, সামান্য পরিবর্তিত রূপে হলেও। কিন্তু অপভ্রংশে অধিকাংশ সংস্কৃত শব্দ এমন বদলে গেছে যে তাদের চেনা দায়। অপভ্রংশ যখন প্রমিত হচ্ছে তখনো সব শাস্ত্রেই পণ্ডিত মানেই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে পণ্ডিত– ভাষা বিচারের ক্ষেত্রেও তাই। তাঁরা কোন ভাষার গুণ ও তার কৌলীন্য বিচার করতেন সংস্কৃত ভাষাকে সেটি কতটা কীভাবে ধারণ করে তার নিরিখে। তাঁদের মনে হয়েছে অপভ্রংশে সংস্কৃত থেকে আসা শব্দ প্রচুর আছে বটে তবে সেগুলো ভয়ানক ভাবে বিকৃত, তাই তাঁরা এসব ভাষাকে বলেছেন অপভ্রংশ অর্থাৎ বিকৃত ভাষা। যেহেতু প্রমিত ভাষা নিয়ে তাঁদের কারবার, তাঁরা মনে করেছেন সংস্কৃতের মত আদর্শ ভাবে প্রমিত হতে গিয়ে হতে না পেরেই এগুলো সংস্কৃতের বিকৃত অনুকরণ হয়েছে; এ ভাষা যে মানুষের মুখের ভাষার থেকে উঠে এসেছে সেভাবে তাঁরা ভাবেননি। খোদ্ সংস্কৃতও যে এক সময় মানুষের মুখের ভাষা থেকেই প্রমিত হয়েছে তা তাঁরা কখনো ভাবেননি– তাঁদের কাছে ওটি ছিল দেব ভাষা, দৈব ভাবে এসেছে।

প্রমিত অপভ্রংশ ভাষাগুলো পরিবর্তিত হয়েছে অঞ্চলগুলোর মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে তাল রেখে। ওভাবেই নানা ধাপ পেরিয়ে এগুলোই পরবর্তীকালে পূর্ব ভারতের নানা আধুনিক ভাষায় পরিণত হয়েছে। আরো সঠিক ভাবে বলতে গেলে যে মুখের ভাষাগুলো নানা সময়ের নানা প্রমিত অপভ্রংশ গড়েছিলো সেই মুখের ভাষাগুলোই ধাপে ধাপে আমাদের এখনকার নানা মুখের ভাষায় পরিণত হয়েছে, সেই সঙ্গে এসব মুখের ভাষার প্রমিত রূপগুলোও সমসাময়িক মুর্খের ভাষার সঙ্গে তাল রেখে আজকের আধুনিক প্রমিত ভাষায় পরিণত হয়েছে। আজকের বাংলা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রমিত ভাষা যার সীমারেখাগুলো একটু আগেই আমরা দেখেছি। কিন্তু ওই আগের সময়ে বাংলার পূর্বসূরি ভাষা যতটুকুই প্রমিত থাকুক না কেন তা কিন্তু সম্পর্কিত ছিল আরো বৃহত্তর অঞ্চলের যাবতীয় মুখের ভাষার সঙ্গে। সেই অঞ্চলের অপভ্রংশগুলোকে বলা হতো পূরবী অপভ্রংশ আর মৌখিক ভাষা অঞ্চলটির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল মোটামুটি আজকের দক্ষিণ নেপাল, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, বাংলা, আসাম। কিছু স্থানীয় বৈচিত্র নিয়ে ওই অপভ্রংশগুলো আজকের এই বড় অঞ্চলের সব ভাষারই পূর্বসূরি হবার দাবী করতে পারে। দশম একাদশ খৃষ্টাব্দের দিকের ওই পূরবী অপভ্রংশের মধ্যে একাকার হয়ে আছে শুধু আজকের প্রমিত বাংলা ভাষার অতীত নয়, বরং একই সঙ্গে আজকের নেপালের নেওয়ারি, বিহার ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের মৈথিলি, অঙ্গিকা, ভোজপুরি, মগাহী, উড়িষ্যার অনেকগুলো এবং সিলেটি ও চাটগেঁয়ের মত খুবই ভিন্ন-রূপীগুলো সহ

বাংলার সব মৌখিক ভাষার অতীত। তারপর যতই দিন গেছে ততই এর পূর্ব শাখাটি বাংলা, আসাম, উড়িষ্যার ভাষাগুলোর যে সাধারণ পূর্বসূরি তা এর পশ্চিম শাখা নেওয়ারি, মৈথিলি, অঙ্গিকা, ভোজপুরি ইত্যাদির পূর্বসুরির থেকে ভিন্ন হয়ে গেছে– যদিও এখনো অতীত সূত্রে তাদের মধ্যে মিল যে খুঁজে পাওয়া যায়না তা নয়। আরো পরে ওই পূর্বের শাখার মধ্য থেকে অহোমিয়া ও উড়িয়া বাংলার সঙ্গে তাদের বন্ধন কাটিয়ে ক্রমে ভিন্ন ভাষায় পরিণত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই তিনটির মধ্যে, বিশেষ করে বাংলা আর অহোমিয়ার মধ্যে মিলগুলো খুবই প্রচুর। ওই তিন অঞ্চলেরই তিন প্রমিত ভাষার জন্য এ যেমন সত্য, তেমনি এখানকার সব মৌখিক ভাষা সম্পর্কেও ওই একীভূত অতীতের কথাটি সত্য, মিলগুলোও যথেষ্ট স্পষ্ট।

পূর্ব ও পশ্চিম শাখার একীভূত অতীতের ফল যা হয়েছে বাংলার ভাষার বর্তমান রূপ ছেড়ে যতই আমরা অতীতের রূপের দিকে যাব ততই তা মৈথিলি, নেপালি, ভোজপুরি, মাগাহী, উড়িয়ার সঙ্গে তা একাকার হতে থাকে। তাই বিংশ শতাব্দী প্রথম দিকে বাঙালী ভাষাবিদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যখন নেপাল রাজ দরবার লাইব্রেরীতে আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীতে তালপাতায় লেখা কিছু প্রাচীন পাণ্ডুলিপিকে প্রথম যুগের বাংলা ভাষা বলে সনাক্ত করলেন, তখন একই সময়ে নানা দিক থেকে দাবী উঠলো এটি প্রথম যুগের নেপালি, প্রথম যুগের উড়িয়া, মৈথিলি, কামরূপী (অহোমিয়া) ইত্যাদি আলাদা আলাদা ভাবে। যাঁরা দাবী করলেন তাঁরা সবাই ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত– প্রত্যেকেরই যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি ছিল চর্যাপদ নামক নানা লেখকের নানা কবিতার সংগ্রহ নিয়ে, যাতে সে সময়ের তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের কিছু রহস্যময় গূঢ় বক্তব্য যেমন আছে তেমনি তখনকার সমাজের কোন কোন অংশের দৈনন্দিন জীবনের ছবিও আছে। একই সঙ্গে এতগুলো ভাষার আদি রূপ কেন তাতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে সেটি এখন স্পষ্ট, এই সব ভাষার অতীতই যে ইতিহাসের ওই সাধারণ পূরবী অপভ্রংশের মধ্যে রয়ে গেছে।

পূরবী অপভ্রংশের যে পূর্ব শাখা ক্রমে বাংলা-অহোমিয়া-উড়িয়ার মত হয়ে উঠ্ছিল তাকে গৌড়ীয় শাখাও বলা হয়। একে প্রাক-বাংলাও বলা যায়। এই সব পরিবর্তনগুলো ঘটছিলো স্থানীয় ভাবে, মানুষের মুখের ভাষায়। চর্যাপদের মত কিছু সাহিত্য কর্ম আবিষ্কার থেকে মনে হয় ও অঞ্চলের কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ জায়গার মুখের ভাষাকে সাধারণ কাজে ও সাহিত্যে একটু ব্যাপক-বোধ্য ভাবে ব্যবহারের জন্য একে প্রমিত করার প্রয়াস শুরু হয়েছিলো তখনই। গৌড় ছিল

অনেকদিনের বাংলা ও বৃহত্তর পূর্ব ভারতের গুরুত্বপর্ণ রাজ্য ও সাম্রাজ্যগুলোর রাজধানী। হয়তো সেখানকার মুখের ভাষাটিই গুরুত্ব পেয়েছিলো এই কাজে, অথবা যখন যারা যেখানে নিজেদের সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে প্রাক-বাংলাকে প্রমিত করার অবদান রেখেছেন তাঁরা সেখানকার মানুষের মুখের ভাষাকে সে কাজে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তবে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘকাল যে পাল ও সেন বংশীয় রাজারা, এবং কোথাও কখনো কখনো অন্য বংশীয়রা রাজত্ব করেছেন তাঁরা কি এই প্রমিত প্রাক-বাংলার কোন ব্যবহার রাজকার্যে বা আনুষ্ঠানিক অন্য কাজে করেছেন, না এর উদীয়মান সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন? সেরকম করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। তাঁরা বরং রাজকীয় গাম্ভীর্যে ও কৌলীন্যে প্রধানত সংস্কৃত, আর কখনো পূর্বভারতীয় প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করেছেন– যার সবই মানুষের মুখের ভাষা থেকে একেবারেই দূরের, আলাদা করে তুলে রাখা অতি আনুষ্ঠানিক ভাষা। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতাও গেছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং কখনো কখনো সংগঠিত বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্র চর্চাকারীদের দিকে; যাঁদের কাজই ছিল প্রথম ক্ষেত্রে সংস্কৃতের মাধ্যমে ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পালি-প্রাকৃতের মাধ্যমে শাস্ত্র চর্চা করা। রাজকার্যে যে সব দলিল, দানপত্র, নথিপত্রকে তামার পাতে উৎকীর্ণ করা অবস্থায় এ অঞ্চলের অনেকগুলো জায়গায় পাওয়া গেছে তার প্রায় সব ক'টি সংস্কৃতে অথবা প্রাকৃততে রচিত। এর থেকেই শাসন কাজের ভাষাটি বোঝা যায়, অধিকাংশ দানের গ্রহীতাদেরকেও চেনা যায়। প্রাক-বাংলা থেকে আমাদের চেনা বাংলায় রূপ পাওয়ার ব্যাপারটি এবং ধর্মীয় চিন্তা থেকে শুরু করে আরো নানা আন্দোলনে ও সাহিত্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রথম কিছুটা বড় আকারে চোখে পড়ে চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলায় মুসলিম শাসন বেশ খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর থেকে। ততদিনে রাজকার্যের অনেক আদেশ-নির্দেশ ফারসিতে জারি করার নিয়ম চালু হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, তাদেরকে উদ্দীপ্ত করতে, এবং এ কাজে কবি-সাহিত্যিক-ভাবুক-ধর্ম ভক্তদেরকে সহায়তা দিতে বাংলা ভাষার প্রতি এক রকম রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতারও সৃষ্টি হয়েছিলো বলে মনে হয। এর প্রধান সাক্ষ্যগুলো আসে সাহিত্য থেকে, আর এই সাহিত্যের দুই একটি নমুনা দেখে আমরা সেই প্রাক-বাংলা থেকে শুরু করে আজ থেকে দেড়-দু'শ বছর আগের পর্যন্ত বাংলা ভাষার চেহারা সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করতে পারি। এই সঙ্গে সঙ্গে আমরা কল্পনা করে নিতে পারি প্রমিত বাংলার যখন এরকম চেহারা, তখন অন্তত বাংলাভাষী কিছু কিছু অঞ্চলের মুখের ভাষার মধ্যে পরিবর্তনগুলো কোনদিকে যাচ্ছিলো।

উনবিংশ শতাব্দীর আগে এ সাহিত্যে গদ্যই রচিত হয়নি, এ সাহিত্যে যা দেখা যায় তা প্রধানত ধর্মীয় ভক্তি, প্রেম ভাব ইত্যাদি নিয়ে কাব্য রস; বাস্তব কাজকর্ম নিয়ে এ ভাষার কোন কিছু অন্তত সাহিত্যে দেখা যায়না, দৈনন্দিন জীবনে তা কী ভাবে ব্যবহৃত হতো বলা মুশ্‌কিল। আর উনবিংশ শতাব্দীর আগে এ ভাষার জন্য কোন ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়নি। আনুষ্ঠানিক কাজ, ব্যাকরণ, এসব সংস্কৃত বা ফারসির জন্য তোলা ছিল। বাংলা খুব সম্ভব ছিল শুধু মনের কাছের ভাষা, মুখেরও কাছে।

প্রথমে আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর চর্যাপদ থেকে দু'একটি নমুনা নেয়া যাক, যাকে বাংলা না হলেও প্রাক-বাংলাতো বলাই যায়। কবি লুই পাদের লেখা কয়েকটি চরণ এরকম:

কা আ তরুবর পঞ্চবি ডাল
চঞ্চল চিত্র পৈঠো কাল।
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ
লুই ভনই গুরু পুচ্ছি অ জান।।
সঅন সমাহি অ কাহি করি অই
সুখ দুখেতে নিচিত মরি অই।।

এই প্রাক-বাংলার সব কিছু আমাদের কাছে বোধগম্য নাও হতে পারে, তাই বর্তমান বাংলায় একটি অনুবাদ সংযোজন প্রয়োজন।

শরীর রূপী গাছে পাঁচখানি ডাল
চঞ্চল মনে ঢুকে পড়ে কাল
দৃঢ় করি মন মহাসুখ পাও
লুই বলে গুরুকে জিজ্ঞেস করে জান।।
সব সময় যে ধ্যানে সমাহিত থাকে
সুখে দুঃখে সেওতো নিশ্চিত মরে।।

চর্যাপদেরই আরেকজন কবি তেগুন পাদের দুটি চরণ দারিদ্রের একটি বর্ণনা দিয়ে:

তালত্ মোর ঘর নাহি পরবেষী
হাড়িত্ ভাত নাহি নিতি আবেশী।

বর্তমান বাংলায় এর অনুবাদ:

ঘরে অতিথি সমাগম হচ্ছে
নিত্য দিনে হাঁড়িতে ভাত নেই।

তেগুন পাদেরই অন্য দুটি চরণ অবশ্য সুখের দিন নিয়ে। কঙ্গাচিনা নামের সুস্বাদু ধান পেকেছে, তাই শবর আর শবরী আনন্দে মেতেছে (শবর চর্যাপদে বহু উল্লেখিত জনগোষ্ঠি)।

কঙ্গাচিনা পক্লারে
শবর শবরী মাতেল।

বাংলা যে ছিল মনের কাছের ভাষা তা দেবদেবীর কথা বলতে গিয়ে নিজেদের মানুষের তুলনা টানার মধ্যেই বোঝা যায়– যেমন ১৪০০ শতকে কবি চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে রাধাকে সমসাময়িক একজন বাঙালী বধু হিসেবে দেখার মধ্যেই বোঝা যায়:

বহুদিন পর বধূয়া এলে
দেখা না হইত পরাণ গেলে
এতেক সহিল অবলা বলে
ফটিয়া যাইত পাষাণ হলে।

এটি একেবারে আমাদের পরিচিত নির্ভেজাল বাংলা। কিন্তু এই ১৪০০ শতকেই কবি বিদ্যাপতির অনেক কবিতায় স্পষ্ট বাংলা হয়েও তাতে মৈথিলি ও উড়িয়ার ছায়া দেখা যায়। যেমন তাঁর ভাবোল্লাস নামের কবিতায়:

কি কহব রে সখি আনন্দ ওরে
চিরদিন মাধব মন্দির মোরে
পাপ সুধাকর যত দুঃখ দেল
পিয়ামুখ দরশনে তত সুখ ভেল।

তাঁর আর একটি কবিতায় ওই ছায়া আরো বেশি:

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত
ধাওল অলিকুল মাধবি পন্থ।

১৫০০ শতকে রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর কবি কৃষ্ণদাসের ভাষায়ও সে ছায়া উঁকিঝুকি দেয়- কিছু মিশ্র ভাষায়:

যত পারিষদ ব্যথিত সকল ধৈরজ ধরিতে নারি
কাহা পহু গেল অলখিত ভেল কিভাবে উদয় করি
গৌর কিশোর নিজ রসে ভোর বিরাজে জাহ্নবি কূলে
রাধা গুণগান করে অবিশ্রাম জড়াইয়ে তরুর মূলে।

এর কিছু সময় আগে কবি কীর্তিবাস ওঝা রামায়ন মহাকাব্য বাংলায় অনুবাদ করেন– বাল্মীকীর সংস্কৃত মহাকাব্যটির হুবহু অনুবাদ নয়, বরং বাঙালী পাঠকের

উপযুক্ত করে এবং কিছুটা যোগ-বিয়োগের মাধ্যমে তাদের মনোগ্রাহী করে। নিঃসন্দেহে এই রামায়ন পাঠ তখন ঘরে ঘরে অসংখ্য সাধারণ নরনারীকে উদ্বেলিত করেছিলো– কারণ তা ছিল তাদের মনের ও মুখের ভাষার খুব কাছের। ১৬০০ শতকের শুরু থেকে মুসলিম কবিরা বাংলা সাহিত্যে নিজেদের একটি বড় পরিসর তৈরি করেছিলো প্রধানত পুঁথির ভঙ্গিতে কবিতা রচনার মাধ্যমে। ঠিক ওই সময়টিতে বিশেষ করে বাংলা পূর্বাঞ্চলে কৃষক কূলের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায় এসব পুঁথিপাঠের আসর হয়তো তাদের অনেক রাত্রিকে ভরপূর করে রাখতো।

এ সময় থেকে একেবারে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যকে মোটের ওপর তিন রকমের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে প্রথমটি কাহিনী কাব্যে– একদিকে যেমন কীর্তিবাসী রামায়নের মত, অন্যদিকে কারবালার কাহিনী নিয়ে জঙ্গনামার পুঁথি। দ্বিতীয়টি বৈষ্ণব ও সুফী ধারার ভক্তি-ভালবাসার কবিতা ও গান যেমন রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে এর নমুনা ওপরে দেখেছি। তৃতীয় ধারাটি হলো মঙ্গল কাব্য– দীর্ঘ বর্ণনামূলক কবিতা যা স্থানীয় জনপ্রিয় দেবদেবীর প্রশংসায় ও পূজায় নিবেদিত– যেমন বিজয়গুপ্তের মনসা মঙ্গল (চতুর্দশ শতাব্দীর একেবারে শেষে), মুকুন্দ দাসের চণ্ডী মঙ্গল (ষোড়শ শতাব্দী) বিভিন্ন শীতলা মঙ্গল (সপ্তদশ শতাব্দী), এবং আধুনিকতর ভাষায় ভারতচন্দ্রের আনন্দ মঙ্গল (মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দী)। এই ধারায় মুসলিম কবিরা লিখেছেন বিভিন্ন বীর গাঁথা– যেমন আমীর হামযার পুঁথি।

১৬০০ শতকের নমুনাতে যদি ফেরৎ যাই সিলেটের হবিগঞ্জের বাসিন্দা সৈয়দ সুলতানের নবী বংশের কথায় যাওয়া যায় এই কাহিনী কাব্যের উদাহরণ হিসেবে:

প্রথমে প্রণামি প্রভু অনাদি নিধান
নিমিষে সৃজিছে যেই এই চৌদ্দ ভূবন
আদি অন্ত নাহি তার নাহি স্থান স্থিত
খণ্ডন বর্জিত রূপে সর্বত্র ব্যাপিত।

প্রায় একই সময়ের কবি দৌলত কাজীর জন্ম চট্টগ্রামের রাউজানে, কিন্তু তাঁর সাহিত্য কর্মের একটি বড় অংশ রচিত হয়েছে আরাকানে, আরাকান রাজার আশ্রয়ে। আরাকান রাজের বন্দনা দিয়ে কবিতা শুরু করাতেই তার প্রমাণ মেলে:

কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী
রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ অবতারী
তাহাতে মগধ বংশ ক্রম যুদ্ধচার

নাম শ্রী থুধম্মা রাজা ধন অবতার
প্রতাপ প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভূবন
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন।

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের আক্রমণে প্রাণভয়ে ভীত তাঁর ভাই বাংলার মোগল সুবাদার শাহ সুজা সুবার রাজধানী ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে আরাকানে আশ্রয় নিয়েছিলেন এই রাজা থুধম্মার কাছে। চট্টগ্রাম তখন কখনো মোগল প্রভাবে, কখনো আরাকানী প্রভাবে; বহুদিন আগে থেকেই তার ভাগ্য আরাকানের সঙ্গে গ্রথিত ছিল। এখনো আরাকানে বড় মুসলিম জনসংখ্যা ওই রোসাঙ নগরীতে। আজও ওখানকার রোসাইঙ্গা অর্থাৎ রোহিঙ্গা মুসলিমদের ভাষা চাটগেঁয়ে– সেদিনও আরাকানী শাসনে চট্টগ্রাম ও আরাকান উভয় জায়গায় যে ভাষা বিকশিত হয়েছিলো।

১৬০০ শতকের শেষের দিকে পদ্মাবতী-খ্যাত কবি আলাওল দৌলত কাজীর মত একই পথ অনুসরণ করে তাঁর কবি জীবনের একটি বড় অংশ আরাকানে কাটিয়েছেন। তাঁর বাড়ি ফরিদপুর হলেও তাঁর প্রথম সাহিত্যিক বিকাশ চট্টগ্রামে, বাকিটা আরাকানে– আরাকান রাজের পৃষ্ঠপোষকতায়। তাঁর কবিতার ভাষা:

অবগত পাইয়া শাস্ত্র পুস্তকেতা
ভাঙ্গিয়া কহিব সব বুঝহ পণ্ডিত
রচিলুমা এই কথা আদ্যে লেখা পাঠ
দীন আলাওল কহে শুন গুণীজন
উত্তরেরো প্রদুত্তর শুনহ এখন।

১৭০০ সালে কোন কোন কবির হাতে বাংলা একেবারেই আধুনিক ও সাচ্ছন্দ গতি লাভ করেছিলো, তার মধ্যে ভারতচন্দ্রের এমন কিছু পংক্তি রয়েছে যা এখনো মানুষ তাঁদের রচনায় কোন কোন বিষয় খোলাসা করার জন্য ব্যবহার করে থাকেন। এমনি কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন স্মরণীয় পংক্তি:

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'।
'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'।
'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ'।
'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন'।

কবিতার মাধ্যমে বাংলা যখন আধুনিক কালের দ্বারপ্রান্তে তখনো তার সাহিত্যে গদ্যের কোন দেখা ছিলনা। ব্যক্তিগত কথাবার্তায় যদি প্রমিত ভাষা ব্যবহার করতে হতো সর্বজনীনতার কারণে– তখন হয়তো এক রকম গদ্য ব্যবহৃত হতো; অথবা চিঠিপত্র লেখার সময়েও হয়তো তা হতো অথবা খুব আনুষ্ঠানিক নয় এমন লেখাজোকায়। কেউ কেউ অনেকটা স্থানীয় মুখের ভাষাতে লিখেও এমন যোগাযোগ করতো। তবে সাহিত্যে গদ্য ছিলনা। আর অতি আনুষ্ঠানিক কাজে তো বরাবরের মত সংস্কৃত, প্রাকৃত, ফারসি ইত্যাদিই বরাদ্দ ছিল; অথবা অত্যন্ত সংস্কৃত আকীর্ণ বাংলা গদ্য যাকে বাংলা বলে চেনার উপায় থাকতোনা।

সত্যিকার প্রমিত বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হয়েছে একেবারে আধুনিক কালে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায়; অনেকটা কলকাতার ফের্টে উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে। বাইবেল বাংলায় অনুবাদের লক্ষ্যে কলকাতার কাছে শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারীরাও এতে হাত বাড়ান– বাংলা ব্যাকরণ সৃষ্টি, বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মাধ্যমে। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপধ্যায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই গদ্য রচনার অগ্রণীদের একজন ছিলেন। সাহিত্যে এবং আনুষ্ঠানিক কাজের জন্য এভাবে যে বাংলা গদ্য রীতি চালু হয় তাকে বলা হয় সাধু ভাষা। সাধারণ কথোপকথন চল্‌তো আগের মতো আটপৌরে এক রকম কথ্য ভাষায়, কিন্তু সাহিত্যিক গদ্য ও আনুষ্ঠানিক গদ্য হতো সাধু ভাষায়। বক্তৃতা দেয়া হোক, আনুষ্ঠানিক কিছু লেখা হোক, দলিল রচনা করা হোক– সবই সাধু ভাষায়। প্রমিত কথ্য ভাষার থেকে এর তফাৎ ছিল ক্রিয়া পদকে কথার মত না রেখে আনুষ্ঠানিক একটি দীর্ঘতর শব্দে পরিণত করা যেমন করেছি হতো করিয়াছি। তবে এটিই একমাত্র তফাৎ ছিলনা– সাধু ভাষায় সংস্কৃত শব্দ অনেক বেশি ব্যবহৃত হতো, আর তার মধ্যে তৎসম শব্দের ব্যবহার ছিল বেশি (যে শব্দগুলো সংস্কৃতের সমরূপে থাকতো– তাই তৎসম)। যেমন সাধারণ কথ্য ভাষায় চাঁদ কথাটি যখন বলা হতো তা সংস্কৃত শব্দ চন্দ্র থেকে আসলেও পরিবর্তিত রূপে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু সাধু ভাষায় হুবহু চন্দ্র বলাটিই অধিক প্রচলিত ছিল– 'চাঁদ দেখ্‌ছি' না বলে 'চন্দ্র অবলোকন করিতেছি' বলাটাই ছিল সাধু ভাষা। তাছাড়া সংস্কৃতে দুটি শব্দকে একত্র করে যে সন্ধিবদ্ধ শব্দ তৈরির আধিক্য আছে বাংলা সাধু ভাষাতেও তা অনুসরণ করা হতো। যেমন নতুন বিবাহিতাকে নব ও পরিণীতা এই দুই শব্দ যোগ করে নবোপরিণীতা বলা।

সে সময়ের যে সব চিন্তাবিদ সাধু ভাষায় শুধু সাহিত্য সৃষ্টি করেননি, বরং অনেক জ্ঞানগর্ভ রচনা লিখে গেছেন যেমন বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপধ্যায়, রাজা রামমোহন

রায়– তাঁরা সবাই আরবী ফারসি ভাষা এবং ইংরেজি ভাষায় খুবই দক্ষ ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সাধু ভাষার রচনায় এই সব ভাষা থেকে ধার করা শব্দ কম ব্যবহৃত হতো– বরং সংস্কৃত থেকে শব্দ আনাটাই রীতি ছিল। অথচ তখনো কথ্য বাংলা ভাষায় এই সব নানা ভাষার শব্দ অহরহ ব্যবহৃত হতো। সাধু বা বিশুদ্ধ করতে গিয়ে বিদেশি শব্দ যেমন আসতোনা, আসতোনা মুখে মুখে নিত্য ব্যবহৃত অনেক দেশি শব্দও। পরে যখন সাধু ভাষা বাদ দিয়ে ওই কথ্য ভাষাই আনুষ্ঠানিক ও সাহিত্যিক বাংলা গদ্যের মূল ধারা হয়ে ওঠে তখন সেই সব নানা শব্দও চলে আসে– সেভাবেই এখনো রয়েছে। বঙ্কিম চন্দ্রের কপাল কুণ্ডলা উপন্যাস থেকে তখনকার সাধু ভাষার কিছু উদ্বৃতি দেয়া যাক। মনে রাখতে হবে সাধু ভাষা হওয়া সত্ত্বেও এটি একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় উপন্যাসের ভাষা, বাংলাভাষী শিক্ষিত মানুষ মাত্রই এ ভাষাতেই সাহিত্যিক গদ্য আস্বাদন করতো; এটি মোটেও পণ্ডিতের ভাষা ছিলনা।

> সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রি শেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমণ করিতেছিলো। পর্ত্তুগিস নাবিক দস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়ত করাই তৎকালের প্রথা ছিল, কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গীহীন। তাহার কারণ এই যে রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্জটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকরা দিক নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল।

কিন্তু সাধু ভাষার এই প্রতাপ চিরস্থায়ী হয়নি- প্রমিত বাংলা, সাহিত্যের বাংলা, এমনকি শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক বাংলাও মুখের কথার কাছাকাছি ফেরৎ গিয়েছে, অন্তত একটি অঞ্চলের মুখের কথাকে এর ভিত্তি ধরে নিয়ে। একে বলা হলো চল্‌তি ভাষা। সেই অঞ্চলটি হলো কলকাতার কাছে নদীয়া শান্তিপুর এলাকার ভাষা– যে কারণেই হোক সেটি রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও অন্যান্য শক্তিশালী লেখকের সাহিত্যে চমৎকার ভাবে ব্যবহার হয়েছিলো, এবং তাঁদের মত প্রভাবশালীদের বক্তৃতা, আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ইত্যাদিতেও– সেই থেকে চল্‌তি বাংলা ভাষার ব্যাপকত্ব লাভ। একবার এটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই অঞ্চলের মুখের ভাষাই দেশে দেশে সব বাংলাভাষীর চলিত প্রমিত ভাষার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ালো, এখনো সবার কাছে তাই আছে। কিন্তু সত্যিকার আনুষ্ঠানিক জগত, দলিল পত্রের জগত ইত্যাদিতে সাধু ভাষায় প্রতিপত্তি বহুদিন আগের মতই রয়ে গিয়েছিলো, অনেকে সাধারণ রচনায় বা সাহিত্যেও এর ব্যবহার অব্যাহত

রেখেছিলেন। তখন কেউ যদি একই লেখায় সাধু আর চল্‌তি মিশিয়ে ফেল্‌তো তাকে গুরুচণ্ডালী বলে সমালোচনা করা হতো। অর্থাৎ কিনা ভাবখানা এমন যেন সাধু মানে গুরুর ভাষা, চল্‌তি মানে চণ্ডালের ভাষা– মুখের ভাষার প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে এক কালে যেমন গুরুত্বপূর্ণ কাজে সংস্কৃত ব্যবহার করতো মনোভাবটি অনেকটা সে রকম। সাধু ভাষার এই দিকটি তুলনামূলক ভাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে; এমনকি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সরকারী কাজে ও আইন, দলিলপত্র ইত্যাদিতে বাংলা ভাষা ব্যবহার শুরু হলে তা তখন সাধু ভাষাতেই হয়েছিলো। কোন কোন পত্রিকা আজ অবধি সম্পাদকীয়টি শুধু সাধু ভাষায় লেখে হয়তো তাকে গুরু গম্ভীর করে তুলতে চায় বলে। কিন্তু সাধু ভাষার দিন আসলে শেষ হয়ে গিয়েছিলো বেশ কিছু দিন ধরে– এখন বল্‌তে গেলে কেউই এটি ব্যবহার করেনা।

প্রমিত বাংলা, আনুষ্ঠানিক কাজের বাংলা, এমনকি দলিল-পত্রের ভাষাও এখন মুখের কথার অনেক কাছাকাছি সেই চলিত রূপে। কাজের সুবিধার জন্য দৈনন্দিন কথোপকথনেও এই প্রমিত চলিত কথাই ব্যবহৃত হয়, অন্তত আংশিক ভাবে। তবে মনে রাখতে হবে এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখের ভাষা নয়, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে প্রায় সর্বত্র সেই স্থানীয় মুখের ভাষা অক্ষুণ্ন রয়েছে। অক্ষুণ্ন না থাকলে বাংলা ভাষা তার শিকড় থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত যে ঝরঝরে বাংলা আমাদের প্রমিত ভাষা হয়েছে তাতে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ (অর্থাৎ তৎসম) অনেক কমে গেছে, তবে পরিবর্তিত রূপে সংস্কৃত শব্দই এখনো বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ শব্দ; এদিক থেকে অবশ্য এটি খুবই ইন্দো ইউরোপীয়। এভাবে সংস্কৃত থেকে বদলে গিয়ে আসা শব্দকে বলা হয় তদ্ভব (তার থেকে অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে যার উদ্ভব)। এগুলোর প্রাধান্য আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সব মুখের ভাষাতেও রয়েছে– অতীতে সংস্কৃত শব্দবহুল ভাষা ভাষীদের কথোপকথনে যা বদলাতে বদলাতে অনেকটা পরিবর্তিত রূপে এসব ভাষায় এসেছে। ওভাবেই মুখের শব্দ থেকে এগুলো প্রমিত বাংলাতেও ঢুকেছে। যেমন রাত্রি এই সংস্কৃত শব্দটি কোথাও ছিল রাত, কোথাও রাইত, কোথাও রাতিয়া– সবই তদ্ভব শব্দ। নদীয়া-শান্তিপুরের মুখের ভাষায় রাত ছিল বলে আজ প্রমিত বাংলায়ও রাত হয়েছে। প্রমিত বাংলার একটি জরিপে দেখা গেছে যে এতে তদ্ভব সংখ্যাই প্রায় ৬০%। তৎসম অর্থাৎ হুবহু সংস্কৃত শব্দ এখনো ২৫%। বাকি ১৫% দেশি ও বিদেশি। দেশি মানে আর্য ভাষা আসার আগেই যে সব শব্দ ছিল সেগুলো (তখন শত ভাগ শব্দই দেশি ছিল)– আদি অস্ট্রোএশিয়াটিক, সিনোটিবেটান, আদি-

দ্রাবিড় ইত্যাদি। খুব অন্তরঙ্গ কিছু শব্দ ও কৃষি-সম্পর্কিত একম দেশি কিছু শব্দ আমরা দেখেছি। এমনি অনেক দেশি শব্দ আমরা সব সময় ব্যবহার করছি– বাংলার সব মুখের ভাষায় এবং প্রমিত বাংলায়- বোধ হয তুলনামূলক ভাবে মুখের ভাষাগুলোতেই বেশি। এগুলো ব্যবহারের সময় আমরা ভেবে দেখিনা যে এগুলো আমাদের সঙ্গে সবচেয়ে প্রাচীন কাল থেকে আছে: এক রাশ এরকম শব্দ নেয়া যাক– টোপর, কড়ি, ঝিঙা, কয়লা, কাকা, খাতা, কামড়, ঢোক, নেড়া, চোঙা, ছাল, চিল, কানা বোবা, ঝাঁটা, খোঁজ, বাদুর, তেঁতুল, গাঁদা, আলু, কুড়ি, খোকা, খুকি, খোঁচা, ঝোল, ঠ্যাং, ঢোল, পেট, মাঠ, মুড়ি, শিকড়, খেয়া, লাঠি, ঝাপসা, কাচ, যাঁতা, খড় এমনি রাশি রাশি শব্দ।

বিদেশি শব্দগুলো বিভিন্ন সময় আমাদের ভাষায় ঢুকেছে– যে সব বিদেশি মানুষ আমাদের দেশে সাময়িক ভাবে বড় ভূমিকা পালন করে গেছে, অথবা আমাদের মধ্যে এসে আমাদেরই মানুষ হয়ে গেছে তাদের মাধ্যমে। যারা যখন এসেছে বা প্রভাব রেখেছে তাদের শব্দগুলো তখনই ঢুকেছে। এও ঢুকেছে মুখের ভাষায়– সেখান থেকে কিছু কিছু প্রমিত ভাষায়ও চলে গেছে। কিছু শব্দে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এটি বিদেশি– যখন চেয়ার শব্দটি বলি তখন ঠিকই জানি এর বিকল্প যে কোন শব্দের থেকে এটিই আমাদের সব চেয়ে নিজস্ব ব্যবহারের শব্দ, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটিও জানি যে এটি ইংরেজি শব্দ। একই কথা কাউকে সালাম দেবার ক্ষেত্রেও সত্য– খুবই আপন শব্দ কিন্তু জানি এটি আরবী শব্দ। কিন্তু আরো অনেক শব্দের ক্ষেত্রে আমরা মনেই রাখিনা, বা হয়তো জানিই না যে এটি বিদেশি শব্দ; অবলীলাক্রমে সেটি অন্য দশটা শব্দের মত ব্যবহার করে যাচ্ছি। ঠিক এরকম বেশ কিছু শব্দের নমুনা দেখতে পারি। আরবী ফারসি শব্দগুলোই সবার আগে এসেছে, এর মধ্যে আক্কেল, আলাদা, আসল, নকল, ওজন, খেয়াল, গরিব, জবাব, জমা, জিনিস, তারিখ, দুনিয়া, কাগজ, ফকির, হিসাব, মশলা, খালাস, বদল, কবর, খবর, খালি, সাহেব, বাকি, কলম, এসব শব্দকে ব্যবহার করার সময় কি মনে হয় যে আমরা আরবী শব্দ ব্যবহার করছি? আবার আওয়াজ, আন্দাজ, আয়না, আরাম, আস্তে, খারাপ, খুব, গরম, চশমা, কারবার, আশকারা, চাদর, আতশবাজি, আবগারি, আবাদ, আমেজ, কম, কামাই, কারসাজি, কারিগর, কিনারা, কুস্তি, শিশি, হাঙ্গামা, হামানদিস্তা, হেস্ত নেস্তকে- কে বল্‌বে এগুলো আসলে ফারসি শব্দ? এমনিভাবে বাবা, দাদা, নানি, বাবুর্চি, কাচি, লাশ এসব শব্দ যে তুর্কি এবং কামরা, জানালা, গামলা, বালতি, বোতল, আলমারি,

বাসন, আলপিন, পাঁউরুটি, পিরিচ, ফিতা, সাবান, তোয়ালে, আনারস, নিলাম, ফালতু, মিস্ত্রি, কার্তুজ, আলকাতরা, জুয়া এসব যে পর্তুগীজ শব্দ কতজন জানে? যেই পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে অন্যত্র আমরা নাইজা বা টক পিসিনের মত মিশ্র ভাষা সৃষ্টি হতে দেখেছি অনেকটা সে পদ্ধতিতেই প্রাচীনতর কালে আমাদের আদি ভাষায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সংস্কৃত শব্দ স্বরূপে বা রূপ পরিবর্তন করে চলে এসেছে– যাতে ওই নাইজা বা টক পিসিনের মতই আমাদের মুখের ভাষাগুলো যথেষ্ট বদলে গিয়েছিলো। তারপরও কিন্তু প্রত্যেকটি থেমে ছিলোনা– অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিমাণে নতুন নতুন প্রভাবশালী ভাষার শব্দ সব সময় এসে আমাদের মুখের ভাষায় একাকার হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুখের ভাষা থেকে প্রমিত ভাষায় যেতেও দেরি হয়নি। এখনো প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রয়েছে।

গন্তব্যে মুখের ভাষা: চাটগেঁয়ে

এই বইয়ের জন্য যে গন্তব্যটি বাছাই করা হয়েছে শুধু সেখানকার নয়, চাটগেঁয়ে একটি বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের সাধারণ মুখের ভাষা– বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের এবং বার্মার রাখাইন প্রদেশের ও রেঙ্গুন (বর্তমানে ইয়াঙ্গন) নগর ও আশপাশের আরো কিছু জায়গায় সব মিলে বিরাট জনগোষ্ঠি এই ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলে। যেহেতু শিশুরা প্রথম কথা বলার সময় বাবা-মা বা অন্য যত্নকারীর সঙ্গে এ ভাষাতেই কথোপকথন করে এসেছে, এটিই অন্যান্য সব প্রথম ভাষার মত এদের মস্তিষ্কে স্থান পায় যার প্রভাব সারা জীবন থাকে। এখানকার শিক্ষিত পরিবারগুলোর মধ্যে বাড়িতে প্রমিত বাংলা বলার বা শিশুর সঙ্গে তা বলার রেওয়াজটি খুবই সাম্প্রতিক কালের, এবং এখনো সেটি সীমিত সংখ্যক পরিবারে। চট্টগ্রামের মানুষরা আশপাশের মুখের ভাষার থেকে যথেষ্ট স্বতন্ত্র বৈশিষ্টময় এই ভাষাটিকে হাজার বছর ধরে বিকশিত করে আসছে– যদিও কখনো সে ভাবে এটি প্রমিত হয়নি, বা লেখায়ও ব্যবহৃত হয়নি। মাত্র ৫০ বছর আগেও যারা দেশ বা বিদেশ থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে গিয়ে সেখানে দীর্ঘ সময় থেকেছেন তাঁরাও ভাষাটি শিখে নিয়েছেন– কারণ এখানকার মানুষের সঙ্গে মেশার এটিই ছিল উপায়। যেমন বিংশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের বিখ্যাত মিশনারী স্কুলে শিক্ষকতা করতে ওই সময় কানাডা বা আমেরিকা থেকে যে সব যাজক শিক্ষক আসতেন তাঁরা ইংরেজির বাইরে আর একটি ভাষাতেই অনর্গল কথা বলতে পারতেন– তা হলো চাটগেঁয়ে ভাষা।

যেহেতু এটি মুখের ভাষা, কখনো প্রমিত হয়নি, তাই যে কোন জায়গা থেকে যে কোন দিকে ভ্রমণ করলে ২৫-৩০ কিলোমিটার দূরে দূরের স্থানে ভাষাটির শব্দ, টান, বাচন ভঙ্গি কিছুটা হলেও বোঝা যাওয়ার মত বদলে যায়। এই ব্যাপারটি মুখের ভাষা মাত্রেই যে ঘটে তা আমরা ভাষার ঢেউ-চিত্র আলোচনার সময় দেখেছি। চাটগেঁয়ে ভাষাটি তার ব্যতিক্রম নয়; তবে এর ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের প্রকৃতিটি দেখে ফেলা অপেক্ষাকৃত সহজ; কারণ প্রধানত যেখানে এ ভাষার চল্ সেই চট্টগ্রামটি লম্বা একফালি সমতল ভূমি এক পাশে বঙ্গোপসাগর আর অন্য পাশে পাহাড়ের শ্রেণীর মাঝখানে– কাজেই ওরকম দূরত্ব সৃষ্টির জন্য ভাল উপায় হলো উত্তরে ফেনী নদীর পর থেকে মানুষের ভাষা শুনতে শুনতে একেবারে এই ভূমির শেষ প্রান্ত টেকনাফে পৌছে যাওয়া, এবং আরো ভাল হয় নাফনদী পার হয়ে বার্মার রাখাইন রাজ্যে রাজধানী সিৎওয়ে পর্যন্ত। বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর বন্দর নগরী চট্টগ্রাম যখন পাব সেখান থেকে একটিই রাস্তা যার নাম আরাকান রোড– ওই একেবারে সিৎওয়ে পর্যন্ত মধ্য যুগে এ রাস্তা যখন তৈরি হয় তখন অবশ্য শহরটির নাম সিৎওয়ে ছিলনা, ছিল আকিয়াব, আর রাখাইনকেও চট্টগ্রামের মানুষ জানতো আরাকান হিসেবে– আর ওই নামগুলো সেভাবেই সাম্প্রতিক কালেও ছিলো। ফেনী নদী পার হলে যে ভাষা কানে আসবে তাকে পুরোপুরি চাটগেঁয়ে কেউ বলবেনা, নোয়াখ্যাইল্যার ভাবটিই বেশি। তবে মিরসরাইর পরে এটি একেবারে চেনা চাটগাঁইয়া ভাষা। কর্ণফুলি মোহনার যত কাছাকাছি আসা যাবে ততই এই ভাষার মূল কেন্দ্রভূমিও এগিয়ে আসে– যেখানে বন্দরে নানাভাষী মানুষ এসে একদিন এই ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিলো। চাটগেঁয়ে ভাষার পরিচিত গানে যাদের কথা বলা হয়েছে– 'আরবী, ফরতুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, মগ, ইংরাজ; লেখি গেইয়ে চাটিগাঁইয়ার খত ইতিহাস'।

মিরসরাই থেকে নগরীতে আসতে আসতে যথারীতি কিছু দূর পর পর ভাষার সামান্য পরিবর্তনটি বোঝা যাচ্ছিল, তেমনি পূর্ব দিকে কাছেই পাহাড় পার হয়ে ওদিককার রাউজান-রাঙ্গুনিয়ার দিকে গেলেও অন্য ভাবে ভাষা বদলটি লক্ষ্য করা যায়। আসলে পরিবর্তন সামান্য হলেও তাতেই এভাষার সঙ্গে ভাল পরিচিত যে কেউ বুঝতে পারে কে কোন্ দিক্কার মানুষ। নগরীর ভেতরে বহুদিনের পুরানো বসতগুলো যেখানে যেখানে আছে সেখানে অবশ্য ভাষাটি মনে হয় হঠাৎ একটু বেশি বদলে গেল– সবার মধ্যে নয়, বহু পুরুষ ধরে যারা এখানে থাকছে তাদের মধ্যে। স্পষ্টত এর কারণ বন্দরের উপস্থিতি এবং দূর দূর থেকে মানুষরা এসে এক সময় এখানে বসত করেছিলো বলে। বিভিন্ন এলাকা পাঠানটুলি, ফিরিঙ্গি

বাজার নাম থেকে বোঝা যায়। একেবারেই চাটগেঁয়ে ভাষা, কিন্তু কাছাকাছি গ্রামের সঙ্গে তার স্পষ্ট তফাৎ; সবাই কথা শুনেই বলে এটি শউরগা (শহুরে) কথা। শব্দের একটি উদাহরণ হলো চাটগেঁয়েতে প্রায় সর্বত্র পিপড়াকে বলা হয় ফ্যেরা। কিন্তু শহুরে ভাষায় এটি চ্যুডি খুব সম্ভব আগন্তুক হিন্দুস্তানি ভাষার চিঁওটির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বদলে গেছে। নগর থেকে আরাকান রোড ধরে এগিয়ে কর্ণফুলি নদী পার হবার পর আগের ধারাতেই ভাষা আবার বদলাতে থাকে। কর্ণফুলির উত্তর পারে বাসিন্দারা অর্থাৎ শহরের দিকের মানুষরা ওদিককার ভাষাকে বলে দইনকুইল্যা (দক্ষিণ কূলের)– খুব সামান্য টানের পার্থক্য, কিন্তু সবাই স্পষ্ট বোঝে যে এই কথা দইনকুইল্যা। পটিয়া হয়ে চন্দনাইশে শঙ্খ নদীর যত কাছাকাছি যাওয়া যায় উত্তরের সঙ্গে কথার পার্থক্যটি তত স্পষ্ট হয়– অথচ এসব জায়গার কোনটি চট্টগ্রাম নগর থেকে বেশি দূরে নয়। পার্থক্য কথার টানে, শব্দের উচ্চারণে, এমনকি খানিকটা বাক্য গঠনেও, কিন্তু এক শব্দকে অন্য শব্দে পরিবর্তন তেমন চোখে পড়েনা।

শঙ্খ নদী পার হয়ে সাতকানিয়ায় পৌঁছে গেলে কিন্তু শব্দেরও পরিবর্তন ঘটে উত্তর চট্টগ্রামের সঙ্গে, অন্য পরিবর্তন তো আছেই। যেমন এর আগের পুরো সব জায়গাতে আবার কথাটি বোঝাতে বলা হয় আবার অথবা আব্বার। কিন্তু এখন এটি হয়ে গেলো আমত্তা। আরো দক্ষিণে এগিয়ে মাতামুহুরি পাড়ে চকরিয়া পৌঁছলে ভাষার ক্ষেত্রে কক্সবাজার-মুখী পরিবর্তনগুলো শুরু হয়ে যায়, যার পরিপূর্ণ রূপ পেতে হলে কক্সবাজার, উখিয়া, টেকনাফ পর্যন্ত যেতে হবে। সত্যিকার রোহিঙ্গ্যা ভাষার সাক্ষাত পেতে হলে নাফ নদী পার হয়ে রাখাইনের মংডু, ভূতিদং ইত্যাদি জায়গায় যেতে হবে। কিন্তু উত্তরের এমনকি শঙ্খ পারের মানুষরাও কক্সবাজারের ভাষাকে এতটাই ভিন্ন টানের, ভিন্ন শব্দ ব্যবহারের ভাষা মনে করে যে মজা করে তাকে বহু কাল আগেও রোহিঙ্গ্যা ভাষা বলতো। বলার ভঙ্গির পার্থক্য ছাড়া শব্দের অর্থ ব্যবহারেও খুব সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে। যেমন অন্যত্র গুলা বলতে খুব ছোট ফল বোঝানো হয় অনেক সময় তা ফলের নামের সঙ্গে লাগানো থাকে– জামগুলা, বেতগুলা ইত্যাদি। কক্সবাজারের ভাষায় ফল মাত্রই গুলা, যেমন সেখানকার বিখ্যাত তরমুজও এক রকম গুলা। বার্মার ওই রোহিঙ্গ্যার সঙ্গে অবশ্য চাটগেঁয়ের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই– যদিও পরিবর্তন বেশ স্পষ্ট। এই পরিবর্তন অবশ্য রাজনৈতিক সীমানা বা রাজনৈতিক ইতিহাস অনুসরণ করে হয়নি– ওই যে ২০-৩০ কিলোমিটার পর পর মুখের ভাষা একটু একটু বদলায় সেই ধারাবাহিকতায় হয়েছে। কিন্তু প্রমিত ভাষার ক্ষেত্রে সে কথা

বলা যায়না, সেটি দেশের সীমান্তে এসে হঠাৎ করে বদলে যায়। যেমন সীমান্তের এপারের মানুষের প্রমিত ভাষা বাংলা, আর ওপারের মানুষের তা বার্মিজ। সকল পরিবর্তন সত্ত্বেও অবশ্য চাটগেঁয়ে ভাষা ওই ফেনী নদী থেকে রাখাইন কিংবা রেঙ্গুন পর্যন্ত একই ভাষা– এ ভাষার মৌলিক নিয়মগুলো এর সর্বত্র প্রযোজ্য- এটি একটি ঐতিহাসিক ও ব্যাপক অঞ্চলের মুখের ভাষা, যেখানে বিভিন্ন স্থানীয় পরিবর্তন সত্ত্বেও সবাই সবার কথা বোঝে।

এ অঞ্চলের অন্যান্য ভাষা যে ভাবে আদি অস্ট্রোএশিয়াটিক, সিনোটিবেটান এবং আদি-দ্রাবিড় ইত্যাদির মাধ্যমে হাজার হাজার বছর ধরে বিবর্তিত হয়েছে চাটগেঁয়েও সে ভাবে হয়েছে; এবং সেগুলোর অধিকাংশের মত প্রায় একই সময়ে আর্যভাষা থেকে আসা প্রচুর শব্দ এতে এসেছে, যদিও খুবই পরিবর্তিত রূপে। যেমন সংস্কৃত পিপীলিকা যখন কাছাকাছি অন্য ভাষায় পিপড়া হিসেবে ঢুকেছে, চাটগেঁয়েতে তা ঢুকেছে ফোঁরা হিসেবে! তারপর বন্দরের কারণে অন্যগুলোর তুলনায়ও অনেক বেশি নানা বিদেশি শব্দ এতে ঢুকেছে, কিন্তু ওই বদলে যাওয়া আর্য শব্দই এতে তারপরও সংখ্যাগরিষ্ঠ, ভারতবর্ষের অন্য ভাষাগুলোর মতই। কিন্তু একটি বিষয়ে চাটগেঁয়ে কিন্তু অনন্য– তা হলো এর ওপর সিনোটিবেটান ভাষা-পরিবারের প্রভাব। চাটগেঁয়ে ভাষা যে জায়গা জুড়ে গড়ে ওঠছিলো তার একটি অংশ সেই বার্মার অন্তর্গত– যা সিনোটিবেটান ভাষাভাষী একটি প্রধান দেশ, তাছাড়া প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে আরাকান আর চট্টগ্রাম যে দীর্ঘকালে একাকার ছিলো তাও ভুললে চলবেনা। কাজেই এটিই স্বাভাবিক ভাবে হবার কথা। এই দক্ষিণ পূর্ব এশীয় অঞ্চলের কিছু শব্দ এর অঙ্গীভূত হয়েছে– যেমন সাম্পান, এই যে শব্দটি আর যেই নৌকাটি চট্টগ্রামে আছে তা এই নামেই সারা দক্ষিণ পূর্ব এবং পূর্ব এশিয়ায় আছে, একেবারে জাপান পর্যন্ত। কিন্তু তার চেয়েও বড় প্রভাব হলো চাটগেঁয়ে ভাষাতে সিনোটিবেটানের মত টোনালিটি থাকাটি; যেটি আশপাশের অন্য কোন ব্যাপক ব্যবহৃত ভাষায় নেই। এর অর্থ চীনা, ভিয়েৎনামিজ বা বার্মিজ ভাষার মত এতেও একই শব্দে খাদের ওঠানামার ফলে বিভিন্ন অর্থ বোঝানো হয়। ইন্দোইউরোপিয়ান ভাষায় এমন টোনালিটি একেবারেই দুর্লভ। চট্টগ্রাম যেমন সাম্পান অধ্যুষিত ও সাম্পানবিহীন নৌকা জগতের ঠিক মাঝখানে আছে, সে রকম টোনালিটিযুক্ত ভাষা সমূহ আর টোনালিটিহীন ভাষা সমূহের ঠিক মাঝামাঝি রয়েছে। কারণ এর ঠিক পূর্ব পাশে বার্মা থেকেই টোনাল ভাষার জগত শুরু হয়ে যায়।

চাটগেঁয়ের টোনালিটির কিছু উদাহরণ নেয়া যাক। এতে 'ফইর' শব্দটি পুকুর, ফকির, পালক (পাখির ডানায় থাকা) এই তিনটি অর্থই বোঝাতে পারে শুধু খাদের ওঠানামা এবং সেটি শব্দের কোন্ অংশে ঘট্ছে তা অনুযায়ী। অঁলা শব্দটির অঁ অংশটি নিম্ন খাদে রাখলে তার মানে হয় আঙ্গিনা আর ওইটুকুকে উচ্চ খাদে নিয়ে গেলে তা হয় বিয়ের সময় গাওয়া মেয়েলি গান। মই শব্দটিতে ম কে নিম্ন খাদে রাখলে তা প্রমিত বাংলার মত উচ্চারণেই ওপরে ওঠার অথবা কৃষি জমিতে মাটির ডেলা ভাঙ্গার সরঞ্জাম বোঝায়, কিন্তু ম কে উচ্চ খাদে নিলে সেটি ভাই বা বোনের শাশুড়িকে বোঝায়। চা'কে নিম্ন খাদে রাখলে আঁচা শব্দটি ইংরেজি শেইভ করার অর্থে, কিন্তু উচ্চ খাদে নিলে এর অর্থ সত্যি। বাইচ্চা মানে সন্তান, কিন্তু একই বাইচচাতে বা এর খাদ উঁচু করলে সেটি হয়ে পড়ে নানা জিনিস বাদ দিয়ে বাছাই করা বস্তু– যেমন ডাক্তারের আদেশে বিশেষ খাবার। এমনি ভাবে অসংখ্য শব্দকে শুধু খাদ (টোন) ওঠানামা করিয়ে নানা অর্থ দেয়া হয় চাটগেঁয়েতে। এই টোনালিটির একটি প্রভাব পড়ে পুরো বাক্যের ওপর বিশেষ করে ওপর ক্রিয়াপদের কালের ওপর। যেমন ন যাই, এতে ন এর খাদ উঁচু হলে বোঝা যায় যে আমি অতীতে যাইনি। কিন্তু খাদ নিচু হলে বুঝতে হবে আমি সাধারণত যাইনা– অর্থাৎ বর্তমানে। কিন্তু এই টোনালিটি চাটগেঁয়ের শুধু একটি্ অনন্য বৈশিষ্ট মাত্র– আরো বেশ কিছু বৈশিষ্টে এটি সমৃদ্ধ তবে তার আগে তার শব্দ ভাণ্ডারের বৈচিত্রটি দেখা যাক– এমন কিছু শব্দের উদাহরণ রয়েছে যেগুলো যে কোন্ উৎস থেকে এসেছে তা জানার জন্য এখনো প্রচুর গবেষণা প্রয়োজন। তবে এটি সত্যি যে এগুলো একান্ত চাটগেঁয়ে শব্দ– এমন একান্ত নিজস্ব শব্দ চাটগেঁয়েতে অনেক আছে।

গ্রামের একটি বাড়ির নানা অংশের নাম দিয়ে শুরু করা যাক। মনে করি সামনের দিক থেকে বাড়িতে ঢুক্ছি তা হলে অঁলা (আঙ্গিনা) পার হয়ে যে ঢুকতে হবে তা আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি, বাড়ির যে প্রথম কামরায় ঢুক্বো সেটি আতিনা, তারপর মাঝের ঘর সেটি ফিরা, তার পেছনে বস্খানা (রান্নাঘর), সেদিকেও একটি দরজা আছে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য সেটি বাইন্দুয়ার (পেছনের দরজা) তারপর পেছনের খোলা জায়গায় কিছু লতা গুল্ম জমা জায়গাতো থাকেই সেটি বারিস। এবার নেয়া যাক এখান ওখান থেকে এমনি আরো কিছু শব্দ– ওঁয়ারে (সঙ্গে), বস্সু (বাচ্চাদের মিষ্টি খাবার), লোলা (ঝুমঝুমি), গম (ভাল) চদর ভদর (আগোছালো), হাব্বিস (চিহ্নিত জায়গা), ফঁইশ (জুতা), বেরাইজ্জা (যাযাবর), ভারম্বত্তি (গাম্ভীর্য), ভগিজগি (বিভ্রান্তি),

উজর (চিৎকার), কুইল্যা (সেজ ভাই), গুন্নি (ছোট ভাই) কূজারা (গুণ্ডা প্রকৃতির মানুষ), ফিঁদিজ্জ্যা (হিংসুটে), গোঁরা (মোহরমের তাজিয়া), ফরখেলা (দাড়িয়া বান্ধা খেলা), খত্তি (পোড়ামাটির বদনা), মউজা (ঢেউ), রারি (বিধবা), মইচালি (সবকিছু এলোমেলো করে দিয়ে চলা), ইঁজানা (সিদ্ধ), আল্লুয়া (আতপ), খচালো (ঘাঁটাঘাঁটি কর)। এমনি ভাবে চাটগেঁয়েতে কিছু কথাবার্তা চল্লেই দেখা যায় যে এক একটি শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে যা একান্তই চাটগেঁয়ে; তার অন্য কোন উৎস এমনকি অস্ট্রোএশিয়াটিক দেশি শব্দে বা সিনোটিবেটানে, কিংবা আদি-দ্রাবিড়ে খুঁজে পাওয়া যায়না, আর্য ভাষায় তো নয়ই।

তবে আগেই বলেছি এতে আর্যভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত-প্রাকৃত থেকে আসা শব্দই সংখ্যাগরিষ্ঠ, অবশ্য নিজের মত করে বদলিয়ে– কোনটি চিন্‌তে কষ্ট হয়, আবার কোনটিকে তেমন কষ্ট হয়না যেমন কুব্জটিকা হয়ে যায় খোয়া (কুয়াশা) অগ্নি হয় অউন, ভূমিকম্প হয় ভূজাল ইত্যাদি। সন্ধ্যা থেকে সাঁঝ বা আঁজ না হয়ে আজইন্যা কেন হলো এবং তার বিপরীতে প্রভাত থেকে বেয়াইন্যা (ভোর) কেন হলো তা বোঝা দুরূহ। নিশ্চয়ই এই পরিবর্তন বহু প্রজন্ম ধরে বহু অন্তর্বর্তী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়ে এই রূপ লাভ করেছে। অনেক বিদেশি শব্দ চাটগেঁয়েতে এসেছে যেগুলো এখানকার অন্য ভাষাতে আসতে দেখা যায়না, প্রমিত বাংলাতেও না; যেমন আরবী থেকে এখানে এসেছে খসম (স্বামী), বদা (ডিম), কুইজ্জা (খড়ের গাদা), খোয়াইশ (আরাম), আউয়ালাখেরে (প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, সর্বোতভাবে বুঝাতে), ফারসি থেকে এসেছে বয়ার (বায়ুপ্রবাহ), ইংরেজি থেকে ঠাডা (বজ্র, থানডার থেকে), লেড (শোও, লে ডাউন থেকে) ইত্যাদি।

বিভিন্ন ভাষা থেকে আসা চাটগেঁয়ে শব্দকে না জানা থাকলে চিনতে না পারার একটি কারণ হলো শব্দকে সংক্ষিপ্তকরণের এর একটি অদ্ভুত ক্ষমতা অতিমাত্রায় সংকোচন শব্দের চেহারা এখানে একেবারে বদলে ফেলেছে, বিশেষ করে মাঝখানের স্বরবর্ণ তো বটেই এমনকি ব্যঞ্জন বর্ণকেও বেমালুম গায়েব করে ফেলার এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট। এখানে কাগজ হযে গেছে খচ্, কাপড় হয়ে গেছে খর্, পাগল হয়ে গেছে ফল, ছাগল হয়ে গেছে ছল। মামার মত ছোট্ট শব্দকেও হতে হয়েছে মৌ, আর বাবাকে বা। আসলে আমরা যে ভাবে বল্‌ছি, বা যেমনটি সবার মনে হতে পারে ব্যাপারটি সে ভাবে হয়তো হয়নি। চাটগেঁয়ে ভাষায় খর্ শব্দটি হয়তো কাপড় থেকে আদৌ আসেনি। কাপড় শব্দের চিন্তা কখনো তার মধ্যে ছিলইনা যে সেটিকে সংকোচন করে খর করতে হবে, আসলে প্রভাবটি

এসেছিলো সংস্কৃত বা প্রাকৃত কার্পাস থেকে সেটি ওই কথোপকথনে আত্মস্থ করার প্রক্রিয়াতেই এটি খর হয়ে গেছে কারণ এই পক্ষের একটি প্রবণতা ছিল সংকোচিত ভাবে শোনা বা গ্রহণ করা। তাই আরবী ভাষীদের থেকে কাগজ শব্দটি গ্রহণের সময় সেই একই প্রবণতায় সেটি খচ্ হয়েছে। তাই মামা অর্থে মৌ সরাসরি মাতুল থেকে, বাবা অর্থে বা ফারসি শব্দ বাবা থেকে। কিছু শব্দ অবশ্য আশপাশের মুখের ভাষা থেকেও এসেছে, আধুনিকতর কালে সেখান থেকেই পাগল হয়তো ফল্ হয়েছে। কখনো দুটি শব্দকে জোড়া দিয়ে উভয়ের কিছু অংশ বিলোপ করা হয়। যেমন 'বাবার দিনের' এই অর্থ বোঝাতে (বাবার আমলে সম্পন্ন) বাবার ও দিনের দুই শব্দকে জোড়া দিয়ে করা হয়েছে বদ্দিন্না। সংকোচনের প্রবল প্রবণতাটি যে আছে তা বোঝা যায় যখন মানুষের নাম, জায়গার নাম ইত্যাদিকেও সংকোচন করতে দ্বিধা করা হয়না, বিশেষ করে প্রকৃত নামটি যখন সবার বেশ জানা থাকে। তাই মোহসীন আলী লোকমুখে হয়ে যান মসনালি। তবে কোন রকম তুচ্ছ করার বা বিকৃত করার উদ্দেশ্য কারো থাকেনা– স্বাভাবিক ভাবেই নাম এরকম হয়ে যায়। এর প্রমাণ হলো শেরে বাংলা ফজলুল হককে চিরকাল চাটগেঁয়েরা অত্যন্ত ভক্তি ভরেই ফজলক সাব বলে এসেছে। বিনা কারণে অনেক ঘোরা পথে কোথাও যাওয়াকে চাটগেঁয়েতে ঠাট্টা করে বলা হয় রইন্যাদি শরৎ যওন (রাঙ্গুনিয়া দিয়ে শহরে যাওয়া)– এখানে রাঙ্গুনিয়া আর শহরের সংকোচনটি লক্ষ্যণীয়।

সংকোচনের আরো সুযোগ সৃষ্টি করে চাটগেঁয়েতে নাকি উচ্চারণ ব্যবহারের প্রবণতাটি, অনেক সময় টোনালিটি সহ। যেমন তুমি শব্দটি নাকি উচ্চারণে সংকোচন করা হয়েছে 'তুঁই'তে। নাকি উচ্চারণ বাদ দিলে ও খাদ নামিয়ে আনলে সেটি অবশ্য আরো অন্তরঙ্গ ও তুচ্ছার্থে 'তুই'তে পরিণত হয়। সংকোচনে নাকি উচ্চারণের ব্যবহারের অসংখ্য উদাহরণ আছে যেমন আঁই (আমি), তেঁই (তিনি), টঁশা (তামাশা), তৌ (তামাক), খোঁর (কোমর), খঁত্তে (কখন), যেঁত্তে (যখন), ওঁত্তে (তখন)। এমন নাকি সংকোচন থেকে খুব সংস্কৃত শব্দও বাদ যায়না যেমন রাত্রির শেষ প্রহর বোঝাতে ফৈঁত্তা (প্রহর-রাতিয়া) বিশেষ ভাবে রমজান মাসে সেহরির সময় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

টোনালিটি, সংকোচন, নাকি উচ্চারণ এগুলো চাটগেঁয়ে অনন্য বৈশিষ্ট। প্রমিত বাংলা সহ এখানকার বিভিন্ন মুখের ভাষায় মুসলিমদের কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি আরবী অথবা হিন্দুস্তানি শব্দ ব্যবহার এবং হিন্দুদের বেশি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের প্রবণতাটি চাটগেঁয়েতেও রয়েছে, যেমন পানি বা জল এই দুরকম শব্দ ব্যবহারের

মত। কিন্তু সেই সংস্কৃতকেও চাটগেঁয়ে নিজস্ব প্রবণতা থেকে মুক্ত রাখা হয়নি। যেমন মুসলিমরা কিছু ধুয়ে ফেল কথাটিকে ধুই ফেল বল্‌লেও হিন্দুরা তাকে বলে ফালি ফেল এই ফালি কথাটি এসেছে প্রক্ষালন থেকে, যেমন গোসলের বিপরীতে এসেছে সিয়ান (স্নান)। তাছাড়া মুসলিমদের আইয়ুন (আসুন), বইয়ুন (বসুন), ইত্যাদির বিপরীতে হিন্দুদের ব্যবহৃত আস্তক্ (আসুন), বস্তক্ (বসুন) ইত্যাদি খুব সম্ভব সংস্কৃত ধ্বনির কাছাকাছি থাকার চেষ্টা – উল্লেখযোগ্য যে এটি শুধু সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়, অন্যত্র এটি উভয়ের এই রূপ যেমন যাদেরকে তুমি সম্বোধন করা হয় তাদেরকে আইয়ো, বইয়ো আর যাদেরকে তুই সম্বোধন করা হয় তাদেরকে আয়, বয় সেখানে কোন সম্প্রদায়গত পার্থক্য নেই। এ প্রসঙ্গে, চাটগেঁয়ে ভাষায় সম্বোধনের সময় সম্মান দেখাবার জন্য আলাদা শব্দ থাকলেও তার ব্যবহার কম মনে হয়। হয়তো সেটি সবাইকে আপন করে নেবার প্রবণতা থেকে– আপনি বলা উচিত এমন জায়গায়ও তুঁই (তুমি) শব্দটি নির্ভয়ে ব্যবহার করা যায়– রাস্তাঘাটে বা বাজারে অচেনা মানুষকেও, স্পষ্টত বেশ পরিপাটি, ধনী, গুরুজন বা শিক্ষিত মানুষকেও। বিশাল দোকানের মালিক যাকে খুব সম্মান করে সদাগর সাহেব ডাকছি তাকেই আবার অনুরোধ করছি 'ওবা দাম্‌মান খম রাইখ্‌খো' (ওবা, দামটি কম রাখবে)। এই ওবা ডাকটিও অনন্য, কারণ এর মানে ও ভাই নয়, বাবার বয়সী মানুষকেও বলা যায়, আবার নাতির বয়সী শিশুকেও ডাকা যায়- এটি একটি অন্তরঙ্গ ডাক, ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা। এই প্রসঙ্গে 'ইবা' শব্দটির ব্যবহার দেখা যাক। এর সাধারণ ব্যবহার হলো বস্তুবাচক যেমন 'ইবা নইদ্দো উইবা দ' (এটি দিওনা ওটি দাও)। সেই বস্তুবাচক শব্দটিকেও অবলীলাক্রমে বাবা বা দাদার বয়সী মানুষ বা খুব সম্মানিত মানুষের প্রতি ব্যবহার করা হয় অহরহ– বিশেষ করে হঠাৎ দেখা হলে উচ্ছাসের সঙ্গে 'ইবা খন্?' (এটি কে) বলে ওঠার সময়। তাছাড়া অন্যের কাছে বর্ণনা করার সময় বলা যায়– 'আঁর জেডা আঁরারে ফাইল্‌লে, ইবা বেয়াক ভাইয়র বর' (আমার জেঠা আমাদেরকে প্রতিপালন করেছেন, 'এটি' সব ভাইয়ের বড়)। এখানে এটি শব্দের ব্যবহার কৃতজ্ঞচিত্তে অন্তরঙ্গতা বোঝাতেই বলা। খুবই আদব কায়দার পরিবেশেও চাটগেঁয়ে ভাষার এই অন্তরঙ্গ সারল্যকে এ ভাষার সঙ্গে যারা অপরিচিত তারা ভুল বুঝতে পারেন। এ ক্ষেত্রে প্রমিত বাংলার সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য।

আর একটি বৈশিষ্টের কথা বলে চাটগেঁয়ে ভাষার অনন্যতার কথা শেষ করা যাক– সেটি হলো না বাচক ক্রিয়ার না সূচক কথাটি আগে ব্যবহার করা। এটি

ক্রিয়ার যে কোন কালের জন্য প্রযোজ্য– যেমন বর্তমান কালে 'ন যাই' (যাইনা), 'ন যাইর' (যাচ্ছিনা)। একে অতীত কালে নিয়ে যেতে চাইলে অবশ্য ন'তে টোনালিটির সুযোগ নিতে হবে একে উচ্চ খাদে নিয়ে গিয়ে 'ন' যাই' মানে হলো যাইনি। ভবিষ্যৎ কালে অবশ্য ন এর খাদ আবার নামিয়ে আনতে হয় 'ন যাইয়ম' (যাবনা)। ভবিষ্যত কালের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম হলো এতে না সূচক কথাটিকে ক্রিয়ার আগে যেমন ব্যবহার করা যায় তেমনি অর্থের কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে পরেও ব্যবহার করা যায়, যেমন 'ন যাইয়ম' আর 'যাইতাম ন' উভয়ের মানে হলো যাবনা।

দৌলত কাজী, আলাওল, নবীন সেন বাংলা ভাষার বিখ্যাত কবি– তাঁরা সবাই চাটগেঁয়ে ভাষায়ও যে কথা বলতেন সেটি অনুমান করা যায়, কেউ কেউ চট্টগ্রামে এবং আরাকানে উভয় জায়গায়, কারণ ষাট-সত্তর বছর আগেও ওই দুই জায়গাতে কোথাও আনুষ্ঠানিক কাজের বাইরে প্রমিত বাংলা বলার প্রচলন ছিলনা। তাঁদের মুখের ভাষায় আরবী শব্দ কাগজ– খচ্ হলেও, এবং সংস্কৃত শব্দ প্রক্ষালন ফালি হলেও, তাঁরা তাঁদের বাংলা কবিতায় মূল শব্দ বা তার কাছাকাছি শব্দই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ওভাবে তাঁরা এখানকার সীমিত সংখ্যক শিক্ষিত মানুষকেই শুধু স্পর্শ করতে পেরেছেন। সেই তুলনায় এখানকার বহু সংখ্যক স্বভাব কবি ও গীতিকাররা চাটগেঁয়ে ভাষায় কবিতা, পুঁথি, গান রচনা করে প্রায় সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিলেন– আধুনিক কালে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বিখ্যাত কবিয়াল রমেশ শীল, ফণী বড়ুয়াদের মধ্যে দেখা গেছে। এসব লোকজ সাহিত্য এ ভাষার অনন্যতার গুণে এখনো পুরো উপমহাদেশ জুড়ে অসংখ্য মানুষের প্রিয়। 'মাল্কা বানুর বার মাসের' মত গীতিকাব্য এখনো চট্টগ্রামের পল্লীতে বিয়ের অঁলা (মেয়েলি গান) হিসেবে গীত হয়। একটি ছড়া ও একটি কিচ্ছার মাধ্যমে এ ভাষার খানিকটা নমুনা দেয়া যাক। যে কালে চাটগাঁর মানুষের রঙীন স্বপ্ন হতো রেঙ্গুন যাওয়া নিয়ে, ছড়াটি সে সময়ের। একটি শিশু কন্যার মনেও যে রেঙ্গুনের (চাটগেঁয়ে ভাষার রঙ্গুম) স্বপ্ন ঝিলিক দেয় তাই নিয়ে ছড়া।

ইক্কিনি মনার গুর্গুরি ঠ্যাং
কেনে সে মনা রঙ্গুম গেল্।
হাতর খারু ফেলাই গেল্
মা বাফরে খাঁদাই গেল্।

পরিচিত গল্পের কিছুটা তুলে দিলে চাটগেঁয়ে ভাষার ধারাটি হয়তো কিছুটা বোঝা যাবে। গল্পের নাম উগ্‌গা ফিঁদিজ্জ্যা বুইজ্জ্যার কিস্তা (এক হিংসুটে বুড়োর গল্প):

> মরণর অক্তত্ এক ফিঁদিজ্জ্যা বুইজ্জ্যা তার সাত ফোয়ারে ডাকি খইল্– অবাজি, আঁই তোরারে কিচু দিত্ ন ফারি। তোরার মাল্লাই এখ্খান রঙ্গুইম্মা থামি আর গর্ খর্ আনাইবার অঁউস আচিল, ইয়ানো ন ফারি। তোরার বব্বুর বিয়াত্ এক চরা সোনার খষ্ঠা বানাই দি লাম– আর কিছু দিত্ ন ফারি। আরা জীবন যা খামাই, বেয়াগ্গিন মেডিত্ তলাত্ গাঁরি রাখ্খি তোরাল্লাই– তোরা মেডি খুঁরি তোয়াই লইচ্।

মরণের সময় এক হিংসুটে বুড়ো তার সাত ছেলেকে ডেকে বল্‌লো– বাবাজিরা আমি তোদেরকে কিছু দিতে পারিনি। তোদের মায়ের জন্য রেঙ্গুন খ্যাত থামি আর গায়ের কাপড় (চট্টগ্রামের মহিলাদের বর্মী পোষাক– পরনে লুঙ্গির মত থামি, আর গায়ের ফুলেল কাপড়) আনানোর খুব সখ ছিল, সেটিও পারিনি। তোদের বুবুর বিয়েতে এক ছরা সোনার কণ্ঠা (কারুকার্য করা বড় বড় পুতির মালা) গড়ে দিয়েছিলাম- আর কিছু দিতে পারিনি। সারা জীবন যা কামাই করেছি তার সব তোদের জন্য মাটির তলায় গেড়ে রেখেছি। তোরা মাটি খুঁড়ে সেটি খোঁজ করে নিস্।

পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন

মুখের ভাষা লিপিতে এলো

টোকেন থেকে লিপিঃ

ভাষা মানুষের প্রায় সমবয়সী; অন্তত ৭০ হাজার বছর ধরে সেই মন-পাগলের বিপ্লবের দিন থেকে প্রায় আজকের ভাষার মতই পরিপূর্ণ ভাষা মানুষের মুখে মুখে রয়েছে। কিন্তু সেটি বরাবর মুখে মুখেই ছিল, একে কোন ভাবে স্থায়ী করার কোন ব্যবস্থা কোথাও ছিলনা। সেটি প্রথম সম্ভব হয়েছে মাত্র হাজার পাঁচেক বছর আগে লিপি আবিষ্কারের পর থেকে। দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকাতে কোন কোন জায়গায় আরো পরের সময়ের কিছু চিহ্ন এমন ভাবে পাওয়া গেছে যা দেখ্‌লে লিপির মত মনে হয়; কিন্তু বহু বছর ধরে চেষ্টা করেও তার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলে তা আদৌ লিপি কিনা প্রমাণ করা যায়নি। পাঁচ হাজার বছর আগে থেকে শুরু হয়ে বহুদিন লিপি মধ্যপ্রাচ্যের নানা অংশে সীমাবদ্ধ ছিল এবং সেখানকার কোন কোন লিপি ধারাবাহিক ভাবে পরিবর্তিত রূপে আজ পর্যন্ত চলে এসেছে। লিপির ইতিহাস আমাদেরকে সেখান থেকেই অনুসরণ করতে হবে। অবশ্য এর পর পর চীনা লিপিটিও একই রকম ধারাবাহিকতায় এখন পর্যন্ত চলে এসেছে। আমাদের দেশে লিপি এসেছে এর অনেক পরে, এবং তা খুব সম্ভব মধ্যপ্রাচ্যে শুরু হওয়া লিপির হাত ধরেই।

মন-পাগলের বিপ্লব যেমন মানুষের মুখের ভাষাকে পরিপূর্ণতা দিয়েছিলো, তেমনি সে ভাষার জন্য লিপির সুযোগ করে দিয়েছিলো মানুষের জীবনে আর একটি বিপ্লব– কৃষি ও নগরজীবনের বিপ্লব। ওটি মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম দেখা দিয়েছিলো বলেই হয়তো লিপিও প্রথম সেখানে এসেছিলো। কৃষি জীবিকার ও নাগরিক জীবনের জটিলতাগুলো এমন যে সেখানে প্রায়ই হিসেব রাখার দরকার হয় প্রধানত লেনদেনের বিষয়গুলো স্পষ্ট রাখার জন্য। নানা পেশা গড়ে ওঠাতে পারস্পরিক বিনিময়ের লেনদেন তো রয়েছেই, তাছাড়া যেহেতু এরকম জটিল ও জনবহুল একটি সমাজের জন্য নিয়ম শৃঙ্খলা ও প্রশাসনের প্রয়োজনে একদিকে বেতন ও পারিশ্রমিকের হিসেব, অন্যদিকে কর আদায়ের হিসেব, এত জনের এমনি সব তথ্য মুখে মুখে রাখা খুব কঠিন। তাই অনেকটা দাগ দেয়ার মত করে হিসেবটি রাখতে হতো। এর প্রথম স্পষ্ট পরিচয় মিলেছে মেসোপোটেমিয়ায়

(বর্তমান ইরাক) টাইগ্রীস-ইউফ্রেটিস নদীর তীরে গড়ে ওঠা নগরীগুলোতে– উর, উরুক, ব্যাবিলন ইত্যাদিতে। এখানে বড় সাম্রাজ্য যেমন গড়ে ওঠেছে, তেমনি ওসময় ওখানেই প্রথম বিমূর্ত সংখ্যা ব্যবস্থা ও গণিতের উদ্ভাবন ঘটেছিলো। এসব তাই হিসেব রাখার ব্যাপারটিকে অনিবার্য করে তুলেছিলো।

ওভাবে দাগ দিয়ে হিসেব রাখার জন্য ওখানে সহজ উপায় মনে হয়েছিলো কাদার ওপর দাগ দেয়া- যে কাদা নদীর পারে প্রচুর পাওয়া যেতো। ওই কাদা দিয়ে ছোট ছোট পাতলা টিকেটের আয়তনের পিঠা বা পাটা তৈরি করে ওরা ওতে কিছু চিহ্নের সীল মারতো ছোট ছোট সীল দিয়ে। নরম কাদার ওপর সেই ছাপগুলো রোদে শুকালে বহনের ও বিনিময়ের উপযুক্ত হতো। একে বলা যায় এক রকম টোকেন। যেমন যাদুঘরে সংরক্ষিত এমনি টোকেনে দেখা যাচ্ছে যে কোন কর্মক্ষেত্রে বেতন হিসেবে কত দেয়া হয়েছে তা বিয়ার মদ রাখার কতটি পাত্রের আকৃতির সীল পাশাপাশি মারা হয়েছে তার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সে সময় অনেক বেতন এই মদের দ্বারাই ওখানে দেয়া হতো। এভাবে দীর্ঘকাল কাদার টোকেন ব্যবহারের মাধ্যমে চিহ্নগুলো আরো বিকশিত হয়ে আরো কিছু দরকারী ভাব প্রকাশের বাহন হয়ে উঠলো। তখন ওই ব্যাবিলন ইত্যাদি রাজ্যে ওই টোকেনে মতই কিন্তু আর একটু বড় কাদার পাটায় সীল মেরে কোন কোন বক্তব্য প্রকাশের ব্যবস্থা হলো। ওই পাটাগুলো হাতের তালুতে রাখার মত প্রায় ওই তালুর আয়তনের, যাতে হাতে রেখে সীল মারতে ও পড়তে সুবিধা হয়। পরে এ পাটাকে বলা হয়েছে ট্যাবলেট– কাদার ট্যাবলেট। চিহ্নগুলোও সহজ হয়ে এলো শুধু তীরের মুখ বা ছেনির আকৃতির ছোট একটি সীল– সেই ছেনি বা ছুরি যা কাঠমিস্ত্রি পিটিয়ে পিটিয়ে কাঠে ঢোকায়। ছেনির সরু দিকটি কোন্‌দিকে রাখা হবে তা দিয়ে এবং পর পর কতবার ব্যবহার হবে তা দিয়ে নানা বৈচিত্র সৃষ্টি করা হতো ওই বক্তব্যের লিপিতে। ল্যাটিন ভাষায় ছেনিকে বলা হয় কিউনি তাই এটি যে ছেনি আকৃতির একথা বুঝিয়ে পরে ওই লিপিকে বলা হলো কিউনিফরম।

প্রথম প্রথম কিউনিফরম লিপি তার সঙ্গে উদ্ভাবিত নানা চিহ্নের অর্থ দিয়ে সংক্ষিপ্ত বার্তা লিপিবদ্ধ করতে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু পরে মেসোপোটেমিয়ার ভাষা সমূহ সেই আক্কাডিয়ান, ব্যাবিলনিয়ান ইত্যাদিকে এই লিপিতে লেখার বিস্তারিত পদ্ধতি উদ্ভাবিত হলো– ফলে ওই ভাষা ক'টির লিখিত রূপ সম্ভব হলো। ওই ভাষা এবং ওই লিখিত রূপ পাঠ শুধু ওসময় ওদেশে নয় পরবর্তীকালে, আধুনিক কালেও অন্যান্য দেশের অনেক বিশেষজ্ঞ মানুষ আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। সে সময়ের অনেক কাদার ট্যাবলেট মিলে এক একটি বইয়ের মত নানা লিপিবদ্ধ

বিষয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে প্রশাসনিক বিষয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়, এমনকি প্রাচীন উপাখ্যানও রয়েছে, যেমন গিলগামেশের কাহিনী। তাছাড়া মন্দিরের বা প্রাসাদের গায়ে, রাজকীয় ফরমানেও এরকম কিউনিফর্ম লিপির অনেক নমুনা রয়েছে। পাঁচ হাজার বছর আগে টোকেনের আকারে শুরু হয়ে এর পরে আরো হাজার দুয়েক বছর এই কিউনিফর্ম লিপি ওখানে তার অস্থিত্ব বজায় রেখেছিলো। সেই সময়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদান স্থানীয় ভাষায় এই কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা অবস্থায় আজকের গবেষকদের জন্য সংরক্ষিত হয়ে আছে। এর দুটি উদাহরণ দেয়া যাক। হামুরাব্বি ছিলেন খৃষ্টপূর্ব ১৭৭৫ অব্দের দিকে ব্যাবিলনের প্রতাপশালী সম্রাট। তাঁর সাম্রাজ্য আজকের ইরাক ছাড়িয়ে একদিকে সিরিয়া অন্য দিকে ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু তিনি আজ যতটা না বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হিসেবে, তার থেকেও বেশি সেই সময়ে দেয়া তাঁর জারি করা কিছু আইনের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন– কারণ এই আইনগুলো কিউনিফর্মে সুন্দর ভাবে লিখিত হয়ে জারি হয়েছিলো এবং আজ অবধি তা সেদিন তাঁর বা তাঁর মত অন্য মানুষদের কাছে কোন্‌টি ন্যায়, কোন্‌টি অন্যায়, কোন্ অপরাধের কী শাস্তি হওয়া উচিত, সুশাসন ও সুবিচার কী জিনিস ইত্যাদির ধারণাগুলো আমাদেরকে জান্‌তে দিচ্ছে। এর আগের মানুষের নৈতিকতা বোধের কোন স্পষ্ট আলেখ্য আমাদের কাছে পৌছেনি– 'হামুরাব্বি কোড' নামে খ্যাত তাঁর লিপিবদ্ধ আইনী অনুশাসনগুলো তাই এত মূল্যবান। ধারণা করা যায় যে এই এত বড় সাম্রাজ্যের সর্বত্র সে সময় তা অনুসরণ করা হতো, অন্তত অনুসরণের হুকুম জারি করা হয়েছিলো এবং লিখিত ভাবে সবাইকে পৌঁছে দেয়া হয়েছিলো এমনটি অনুমান করতে পারি। এর দুই একটি আইনের নমুনা দেখলেই বুঝবো আজকের নৈতিকতার মানদণ্ডে দেখলে হামুরাব্বির সব আইনকে ঠিক ন্যায় বিচার হিসেবে বিবেচনা করা যাবেনা, কিন্তু তবুও তাতে সাম্রাজ্যের অসংখ্য প্রজার জন্য আইনের শাসনের একটি অঙ্গীকার অন্তত ছিলো। হামুরাব্বি কোডের ১৯৬ ধারায় বলা হয়েছে: একজন অভিজাত মানুষ যদি আরেকজন অভিজাত মানুষের একটি চোখ অন্ধ করে দেয়, তাহলে তার শাস্তি হবে তারও সেই চোখ অন্ধ করে দেয়া। ১৯৭ ধারায় বলা হয়েছে একজন অভিজাত মানুষ যদি আরেক জন অভিজাত মানুষের একটি হাড় ভেঙ্গে দেয় তাহলে তার শাস্তি হবে তারও ঠিক সেই হাড়টি ভেঙ্গে দেয়া। কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলা হয়েছে যে একজন অভিজাত মানুষ যদি একজন সাধারণ মানুষের একটি চোখ অন্ধ করে দেয় অথবা একটি হাড় ভেঙ্গে দেয়, তাহলে তার শাস্তি

হবে ওই সাধারণ মানুষটিকে ৬০ শেকেল রৌপ্য ওজন করে দিয়ে দেয়া। এমনি আরো অনেকগুলো ধারায় ন্যায় বিচারের আমাদের ধারণা হোঁচট খাবে।

কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা অন্য আর একটি নমুনা উল্লেখ করতে চাই তা পরিচিত ভেনাস ট্যাবলেট নামে, কারণ ভেনাস বা শুক্র গ্রহের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের বিবরণী এখানে কিউনিফর্ম লিপিতে ৯০টি কাদার পাটায় (ট্যাবলেট) সংরক্ষিত রয়েছে। একুশ বছর ধরে বিভিন্ন রাতে জ্যোতির্বিজ্ঞানী আকাশে এই গ্রহটিকে পর্যবেক্ষণ করে রাতের বিভিন্ন সময়ে তার অবস্থান পরিমাপ করেছেন এবং তা লিপিবদ্ধ করেছেন। এর জন্য উপযুক্ত পরিমাপ যন্ত্র তাঁদের ছিলো, উপযুক্ত গণিতও ছিলো। শুক্র গ্রহের এই গতিবিধি কী গুরুত্ব বহন করে তাও তাঁরা জানতেন। তাঁদের বিজ্ঞান চর্চা যে এতখানি এগিয়ে গিয়েছিলো তা আমরা আজ ভেনাস ট্যাবলেটের মত লিপি থেকে জানি। শুধু তাই নয় এর মতো লিপিবদ্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো অনুসরণ করেই সেদিনের ও পরবর্তী ব্যাবিলনীয় ও অন্যান্য বিজ্ঞানী পরবর্তী গবেষণায় এগিয়ে যেতে পেরেছেন যার ধারাবাহিকতা আমরা প্রাচীন বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমনি ভাবেই জানতে পারছি।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আরো নানা দিক থেকে সেদিনও ব্যাবিলনীয়দের প্রতিবেশী এবং সহযাত্রী ছিল প্রাচীন মিশরীয়রা। তারাও ওখানে একই সময় একটি লিপি উদ্ভাবন করেছিলো যাকে বলা হয় হীরোগ্লিফিক বা ছবি-লিপি কারণ নানা জিনিসের ছবির মত প্রতীক দিয়ে ওরা এক একটি জিনিস বা ভাবের জন্য এক একটি শব্দ বুঝিয়ে এই লিপি গড়ে তুলেছিলো আর এটি লিখিত হতো প্যাপিরাস নামক বেত জাতীয় উদ্ভিদের ছিল্‌কা জোড়া দিয়ে দিয়ে তৈরি একরকম কাগজের ওপর। সে সময় ওই লিপিতে লেখা বহু বই একই ভাবে মিশরীয় সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে দিচ্ছে– এগুলোকে প্যাপিরাস বলা হয়, কিউনিফর্মের ট্যাবলেটের মতো। সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের অন্যান্য সভ্যতার যেমন গ্রীক, ভারতীয়, চীনা সভ্যতার জ্ঞানী গুণীরা এই ট্যাবলেট ও এই প্যাপিরাসের লিপির অনুবাদ থেকেই মানব অবদানের ধারাবাহিকতা অনেক সহজে বজায় রাখতে পেরেছেন। সেই লিপির পাঠোদ্ধার অবশ্য আধুনিক কালের বিশেষজ্ঞদেরকে নতুন ভাবে সম্ভব করতে হয়েছে, যাতে এসব লিপির নতুন আবিষ্কৃত আরো নমুনার মর্ম তাঁরা উদ্ধার করতে পারেন।

মানুষের প্রথম বর্ণমালা;

প্রথম দিককার লিপি যে নানা চিহ্ন বা ছবিকে এক বা একাধিক পর পর সংখ্যায় অথবা বিভিন্ন দিকে মুখ করে ব্যবহার করে নানা শব্দ বোঝানো হতো সেটি আমরা দেখেছি। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের দিকে এসে নতুন এক প্রকার লিপি উদ্ভাবিত হলো– এতে মানুষের কথার মধ্যে যে সব আলাদা আলাদা ধ্বনি থাকে সেগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে অল্প কিছু চিহ্ন বা অক্ষর বা বর্ণ তৈরি করা হলো। এই অক্ষর পর পর লিখলে ওই ধ্বনিগুলো পর পর মুখে উচ্চারণ করে কোন মুখের ভাষায় ব্যবহৃত এক একটি শব্দের মত আওয়াজ তোলা যায় – অর্থাৎ লিপিটি পড়ে গেলে ওই মুখের ভাষার মতই শোনায়। এ যেন ওই মুখের কথাকেই রেকর্ড করে রাখা– অন্তত মুখের কথার যত কাছাকাছি তা পারা যায়। সবগুলো বর্ণকে একত্রে বলা হলো বর্ণমালা। লিপির জগতে এটি একটি বিশাল উদ্ভাবন। সেই প্রথম বর্ণমালাটি উদ্ভাবন করার কৃতিত্বটি হলো প্যালেস্টাইন, লেবানন, সিরিয়া উপকূলের সে যুগের একটি জনগোষ্ঠির যাদেরকে বলা হতো ফীনিশীয়– তাদের ছিল শক্তিশালী রাজ্য যার প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ভূমধ্যসাগরের চারদিকে উপকূলের অনেকগুলো জায়গায় ছিল– যেমন উত্তর আফ্রিকার, ইতালীর ও গ্রীসের উপকূলে। আর তাদের ছিল একটি শক্তিশালী ভাষা ফীনিশীয় যাকে লেখার জন্য মূলত ওরা ওই বর্ণমালা উদ্ভাবন করেছিলো।

ওটি মানুষের একেবারে আদি বর্ণমালা হলেও এই ফীনিশীয় বর্ণমালার মধ্যে আমরা আমাদের পরিচিত অনেক কিছু খুঁজে পাবো। এর কারণ এই বর্ণমালার থেকে উদ্ভূত অন্তত দুটি বর্ণমালা আমাদের অনেকের পরিচিত– গ্রীক এবং আরবী। গ্রীক বর্ণমালা সরাসরি এর উত্তরসূরি; এবং আর একটি উত্তরসূরি হলো মেসোপোটেমিয়া অঞ্চলের আক্কাডিয়ান, ব্যাবিলনিয়ান ইত্যাদির পরবর্তী রূপ আরামাইক ভাষা লেখায় ব্যবহৃত আরামাইক বর্ণমালা। এই আরামাইক বর্ণমালা থেকেই এসেছে হিব্রু আর আরবী বর্ণমালা। এদের সব ক'টির পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট মিল-অমিল আছে, তবে বর্ণের চেহারার আর নামের মিলগুলো বেশ স্পষ্ট। ফীনিশীয় বর্ণমালাকেও অনেকে মনে করেন তার ঠিক পূর্ববর্তী সিরীয় হিত্তাইত নামক আরো কিছু পুরানো বর্ণমালা অনুসরণ করে তৈরি হয়েছে– এবং সে হিসেবে সেটিই বরং দুনিয়ার আদি বর্ণমালা। তবে এই উভয়টিই আসলে প্রাচীন মিশরীয় লিপি হীরোগ্লিফিক থেকে তার অক্ষরের আকৃতিগুলো ধার করেছে। সেদিক থেকে প্রাচীনতম বর্ণমালারও আরো প্রাচীন লিপি-রূপ রয়েছে– যদিও তা বর্ণমালা নয়।

বর্ণমালায় এই প্রথম আমরা দেখতে পেলাম যে লিপি জিনিসটি সুনির্দিষ্ট একটি দিকে বিস্তৃত হয়। এর আগের কিউনিফর্ম, হীরোগ্লিফিক ইত্যাদি লিপি ইচ্ছেমত যে কোন দিকে ডানে-বামে, কোণাকুণি, ওপরে নিচে নানা দিকে সুবিধামত লেখা হতো। বর্ণমালায় সেটি অনেক সংযত ও সুশৃঙ্খল হলো। ফীনিশীয় লিপি লেখার নিয়ম ডান থেকে বাম দিকে। ওই সিরীয় হিত্তাইত বর্ণমালাও লেখা হতো ডান থেকে বামে। ফীনিশীয় প্রভাবিত হয়ে আরামাইক এবং তার থেকে আসা হিব্রু ও আরবীও একই ভাবে ডান থেকে বামে লেখা হয়। অবশ্য ফীনিশীয় প্রভাবিত গ্রীক বর্ণমালা বাম থেকে ডানেই লেখা হতো। কিন্তু এসব প্রভাবিত বর্ণমালার অনেকগুলোর সঙ্গে ফীনিশীয় বর্ণমালার একটি বড় পার্থক্য ছিল। তা হলো ২২টি অক্ষরে গড়া ফীনিশীয়তে শুধুই ব্যঞ্জন বর্ণ ছিল, কোন স্বর বর্ণ ছিলনা। ব্যঞ্জন বর্ণ দিয়েই সব শব্দ গঠিত হতো স্বর ধ্বনিগুলো নিজ থেকে বুঝে নিতে হতো, শব্দের পরিচিতি থেকে। এরকম স্বরবর্ণহীন লিপি কিন্তু এখনো বেশ কিছু আছে। ফীনিশীয় বর্ণমালা দিয়ে সরাসরি প্রভাবিত গ্রীক লিপিতে ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বরবর্ণ থাকার ক্ষেত্রেও তা ফীনিশীয়ের সঙ্গে মেলেনা।

তবে বর্ণের আকৃতি এবং নামের দিক থেকে ফীনিশীয়ের প্রভাব যে আশ্চর্য রকম ব্যাপক তা আমরা এখন দেখতে পাব। এই বর্ণমালাটি পড়ে গেলেই বর্ণের বেশ কিছু কিছু নাম পরিচিত ঠেক্‌বে। সিরীয়-হিত্তাইত বর্ণমালার বর্ণগুলোর নামও অনেকটা একই ছিল: আলেপ, বেট, জিমল, ডালেট, হে, ওয়াও, জাইন, হেট, টেট, ইয়দ, কাপ, লামেদ, মেম, নুন, সামেক, আইন, পে, সাদে, কোপ, রেস, সিল, তাও। আরবী বর্ণমালার সঙ্গে আমাদের পরিচিতির কারণেই এর অনেকগুলো নামকে বেশ চেনা চেনা মনে হচ্ছে। ফীনিশীয় থেকে আরামাইক হয়ে আরবীতে আসার সময় এ সব বর্ণ নামে শুধু নয় তার অনেকগুলো আকৃতিতেও উভয় ক্ষেত্রে কাছাকাছি রকম থাকার প্রবণতা রয়ে গেছে। যারা গ্রীক বর্ণের সঙ্গে পরিচিত তাদের কাছেও নাম এবং আকৃতি অনেকটা চেনা চেনা মনে হবে– গ্রীক বর্ণমালার আলফা, বীটা, ডেলটা, কাপ্পা, মিউ, নিউ, তাউ ইত্যাদির কারণে। বিজ্ঞানে এবং গণিতে নানা কিছু বোঝাতে এই গ্রীক বর্ণগুলো হরদম ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ ফীনিশীয় বর্ণমালা পরবর্তী অনেক বর্ণমালায় খুবই প্রতিফলিত। কিন্তু তার পূর্ববর্তী লিপির সঙ্গেও ফীনিশীয় বর্ণমালার মিলটিও লক্ষ্য করার মত। ফীনিশীয়রা ইচ্ছেমত নাম বা ইচ্ছে মত আকৃতি বর্ণকে দেয়নি– ওরা এক একটি ব্যঞ্জন ধ্বনির জন্য মিশরীয় হীরোগ্লিফিক ছবি-লিপিতে এক একটি চিহ্ন বেছে নিয়েছে। সেই চিহ্ন দিয়ে যা বোঝানো হয় তাকে প্রকাশকারী শব্দটার

শুরুর ধ্বনিটি ওই ব্যঞ্জন ধ্বনি। যেমন হীরোগ্লিফিকে 'গরুর শিং' শব্দটি বোঝাবার জন্য গরুর শিং এর ছবির মত (অনেকটা সরলীকৃত) একটি চিহ্ন আছে, আর প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় গরুর শিংকে বলা হতো আলেপ। আলেপের শুরুর ধ্বনি আ ধ্বনিটি তোলার জন্য ফীনিশীয় বর্ণমালার একটি বর্ণকে বলা হলো আলেপ, এবং তার প্রচলিত ছবি-চিহ্ন দিয়েই এই বর্ণের আকৃতি দেয়া হলো– যে ছবি চিহ্নে আছে একটি খাড়া রেখা ভেদ করে একই বিন্দু থেকে দুটি রেখা শিঙের মত সামনের দুই কোণাকূণিকে বিস্তৃত হয়েছে (A অক্ষরটির তলাটি ডান দিকে ঘুরিয়ে দিলে যা দাঁড়ায়)। ওই চিহ্ন নতুন কিছু নয়, মিশরীয় হীরোগ্লিফিক থেকে এসেছে। এমনি ভাবে মিশরীয়তে বেট মানে হলো ঘর, বর্ণমালায় ব ধ্বনির জন্য তাই ঘরের মত দেখতে একটি চিহ্ন ব্যবহার করা হলো যা হীরোগ্লিফিকে ঘর বোঝাবার ছবিচিহ্ন। এমনি ভাবে গিমেল মানে উট (উটের একটি কূঁজের মত), ডালেট মানে মাছ (ত্রিভূজাকৃতি মাছের মত), হে মানে জানালা (জানালার কয়েকটি শিকের মত), ওয়াও মানে সাঁড়োশি (Y অক্ষরের মত), হেট মানে উঠান (দুটি আয়তক্ষেত্র একটির নিচে আরেকটি, খুব সম্ভব একটি বাড়ি ও একটি তার সামনের উঠান), টেট মানে চাকা (একটি বৃত্ত যাতে চাকার স্পোক আছে), মেম মানে পানি (ঢেউয়ের মত), নুন মানে সাপ (সাপের মত তিনবার বেঁকে যাওয়া রেখা), আইন মানে চোখ (একটি বৃত্ত), পে মানে ঠোঁট (বক্র রেখা), কপ মানে সূঁচের ছিদ্র (একটি বৃত্তের ভেতর সূতার মত রেখা), সিন মানে দাঁত (করাতের দুটি দাঁত), তাউ মানে মার্কা (× চিহ্ন)। প্রাচীন মিশরীয় ছবি-লিপি থেকে এই যে বর্ণের চিহ্ন এবং ছবি-লিপির উচ্চারিত শব্দ থেকে এই যে বর্ণের নাম তা কিছু কিছু বিবর্তিত রূপে এখান থেকেই অনেকগুলো বর্ণমালায় চলে এসেছে– হিব্রু, আরবী, গ্রীক, রোমান (যা আদি গ্রীক বর্ণমালার আদলেই সৃষ্ট); এমনকি বাংলা বর্ণমালার পূর্বসূরি ব্রাহ্মীর ক্ষেত্রেও যা আমরা দেখবো। মানব শিকড়ে প্রবাহগুলো এমন নিরবিচ্ছিন্ন যে, বিশেষ করে ভাষার প্রবাহটি এমন ধারাবাহিক ভাবে এগিয়েছে যে, তাতে বর্ণমালার এই সাযুজ্যতে অবাক হবার কিছু নেই। প্রাচীন মিশরীয় ছবি-লিপি থেকে ফীনিশীয় বর্ণমালায়, ফীনিশীয় থেকে আরামাইকে, সেখান থেকে ব্রাহ্মীতে, সেখান থেকে বাংলায়, প্রত্যেক ধাপে ধাপে লেগেছে শত শত বছর এমনকি হাজার বছর।

ভারতবর্ষের আদি লিপি

অশোক-বাণীর লিপিঃ

খৃষ্টপূর্ব ২৩০ অব্দের আগে ভাতবর্ষের কোথাও কোন ভাষার কোন লিখিত রূপ ছিল এমন তথ্য জানা নেই। অথচ এর প্রায় ২,৮০০ বছর আগে থেকে মধ্য প্রাচ্যে লিপির ব্যবহার হচ্ছিলো, আর প্রায় ৮০০ বছর ধরে প্রথমে ফীনিশীয় এবং তারপর গ্রীক, আরামাইক, হিব্রু, আরবী ইত্যাদি বর্ণমালা নিয়মিত এখান থেকে পশ্চিমের বিশাল অঞ্চলে ব্যবহৃত হচ্ছিলো। আরামাইক লিপির অঞ্চল কাছেই ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত থাকলেও কোন ভারতীয় ভাষায় কোন লেখাজোকা ভারতের ভেতরে বা বাইরে কোথাও দেখা যায়নি। সেদিক থেকে এখানকার এত কুলীন ভাষা সংস্কৃতও পৃথিবীর উল্লিখিত লিখিত ভাষা থেকে পিছিয়ে ছিলো, সংস্কৃতের প্রথম যুগটি এ ভাষার পণ্ডিত গুরু-শিষ্যের মুখে মুখে শুনে মুখস্থ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; আর প্রাকৃত ভাষাগুলোও মানুষের মুখে মুখেই শুধু ব্যবহৃত হতো। এর অবসানের প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় খৃষ্টপূর্ব ২৩০ অব্দ থেকে লিখিত হওয়া অশোক-বাণীগুলো ভারতবর্ষের বহু স্থানে আবিষ্কারের পর। অশোক ছিলেন সমসাময়িক ভারতের বিশাল অংশ জোড়া মৌর্য সাম্রাজ্যের সম্রাট। তাঁর রাজত্বের শুরুতে তিনি অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী ছিলেন; কিন্তু এর এক পর্যায়ে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিয়ে নিজের জীবনকে সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তিত করে ফেলেন। মনে রাখতে হবে এর প্রায় আড়াইশ' বছর আগে ভারতের এই অংশেই গৌতম বুদ্ধ আবির্ভূত হয়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন– অহিংসার বাণী নিয়ে। ইতোমধ্যে একটি সংগঠিত ধর্ম হিসেবে ভারতের ভেতরে ও বাইরে বৌদ্ধ সংঘগুলো ধর্ম প্রচার ও দীক্ষা দানের কাজ করছিলো। সম্রাট অশোক তাঁর এই নতুন জীবনের কথা সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রজাদেরকে জানাতে এবং তাদেরকেও দীক্ষা নেবার আহবান জানাতে চাচ্ছিলেন। এই কাজে অদ্ভুত ভাবে বলতে গেলে প্রথম বারের মত লিখিত বাণী তিনি ব্যবহার করলেন। দেশের যেই অংশের মানুষ যেই প্রমিত প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করছিলো সেই ভাষাতেই তিনি সেখানে তা পাথরে খোদাই করে স্থায়ী ভাবে লিখে রাখার ব্যবস্থা করলেন। এটি কোথাও করা হলো স্তম্ভ নির্মাণ করে (অশোক স্তম্ভ), কোথাও পাহাড়ের শিলা-দেয়ালের ওপর, কোথাও অপেক্ষাকৃত ছোট পাথর ফলকের ওপর। এগুলোই অশোক-বাণী নামে আজও বিখ্যাত হয়ে আছে।

কিন্তু যেই দেশে কোন ভাষারই কোন লিপি ছিলনা সেখানে অশোক তাঁর বাণীগুলো লেখার ব্যবস্থা করলেন কী ভাবে? এতে মনে হয় অশোকের কিছু আগে থেকেই একটি লিপি এখানে ছিলো যা কিনা একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণমালা। কারণ অশোকের ইচ্ছা পূরণের জন্য হঠাৎ করে ভারতীয় ভাষা লেখার একটি বর্ণমালা তৈরি হয়ে গিয়েছিলো এমন প্রমাণ নেই। বরং অশোকের কালের আগে থেকেই সংস্কৃত ও বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা লেখার উপযুক্ত একটি লিপি এখানে গড়ে উঠেছিলো– যার কোন নমুনা পরবর্তী কালের জন্য সংরক্ষিত হয়নি এমন হবার সম্ভাবনাই বেশি। অনেকে মনে করেন খৃষ্ঠপূর্ব ৫০০ অব্দে পাণিনি যখন সংস্কৃত ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন তা তিনি লিখিত ভাবেই তৈরি করেছিলেন– এই লিপি তখনো ছিল। তাঁর ব্যাকরণের এমন সব জটিল নিয়ম শৃঙ্খলার সব কিছু মুখে মুখে রচিত হয়েছে ও অন্যরা শুনে মুখস্থ করে নিয়েছেন এমন কাজ কঠিন হবার কথা বলেই তাঁরা এরকম মনে করেন, যদিও তখনকার লিখিত কোন কিছুই সংরক্ষিত হয়নি। মৌর্য সাম্রাজ্যের একেবারে পশ্চিম সীমান্ত ছাড়া (যা ভারতেরও পশ্চিম সীমান্ত) অধিকাংশ জায়গায় আশোক-বাণী লেখা হয়েছে যে লিপিতে তার নাম ব্রাহ্মী লিপি; অশোক-বাণীর মাধ্যমেই এই লিপিটির প্রথম নমুনা আমাদের কাছে এসেছে। কিন্তু এরপর এই লিপির অনেক বিকাশ ঘটেছে– ভারতের নানা অঞ্চলে তো বটেই দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ারও নানা দেশে দেশে, যার যার ভাষাকে লিখিত রূপ দেবার জন্য।

ভারতের নানা জায়গাতেই অশোক-বাণীর জন্য ব্রাহ্মী লিপি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু তার সব একই ভাষায় নয়; বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা একই ব্রাহ্মীতে লেখা হয়েছে। ওই রকম একটি নৈতিক ধর্মীয় বাণী স্বাভাবিক সংস্কৃত ভাষায় না দিয়ে প্রাকৃততে দেবার কারণ হলো এক এক প্রাকৃত ছিল এক এক স্থানের মানুষের প্রমিত হওয়া মুখের ভাষা, সংস্কৃত ছিল শুধু পণ্ডিতদের ভাষা। অশোক চেয়েছিলোন তাঁর বাণী যত বেশি সম্ভব মানুষ বুঝতে পারুক– অন্তত কেউ পড়ে পড়ে মুখে বল্‌লে অন্যরা বুঝতে পারুক। তাই তিনি প্রত্যেক স্থানে চল্‌তি প্রাকৃত ভাষাতেই লেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু কী ছিল তাঁর বাণীতে?

এসব বাণীতে অশোক বক্তা হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন দেবম্প্রিয় এই নামে– অর্থাৎ ভগবানের প্রিয়। নানা স্থানের অশোক লিপিতে কথার কিছু কমবেশি থাকলেও মোটামুটি বাণীটি সব জায়গায় একই। এতে বর্ণনা আছে ধর্ম কী– করুণা, দান, সত্যনিষ্ঠতা, নিষ্কলুষতা, বিনয় ইত্যাদির ওপর জোর দেয়া ধর্মের জয়গান। এতে বৌদ্ধ সংঘে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়েছে এবং

অন্যের প্রতি দয়া দেখাবার আহ্বান, এমনকি মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামীর প্রতিও – যেমন পরজন্মে ভাল হতে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দিতে। তিনি নিজেও কিছু রাজকীয় ঘোষণা দিয়েছেন সব মানুষের প্রতি ও সর্বজীবে দয়া দেখাবার, রাজকীয় শিকার বন্ধ করা বা কমিয়ে ফেলার, রাস্তার পাশে পাশে ছায়ার জন্য বটবৃক্ষ রোপনের, এবং পানীয় জলের জন্য কূপ খননের। একটি ছোট নমুনা হিসেবে দিল্লী নগরের দক্ষিণ অংশে শ্রী নিবাসপুরে থাকা অশোক স্তম্ভের ওপর উৎকীর্ণ বাণীটি দেখা যাক:

> "আমি দেবম্প্রিয় বল্‌ছি– আড়াই বছর হয়ে গেলো আমি একজন সাধারণ ভক্ততে পরিণত হয়েছি। প্রথম দিকে (ধর্ম কর্মে) খুব একটা সচেষ্ট হইনি। কিন্তু গত এক বছর ধরে ক্রমে বৌদ্ধ সংঘের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছি এবং অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অন্যদের মত ভগবান-সান্নিধ্য পেতে সচেষ্ট হয়েছি। শুধু বড় মানুষরাই এরকম চেষ্টা করতে পারে তা নয়, সাধারণ বিনীত মানুষরাও চেষ্টা করলে মোক্ষ লাভ করতে পারে। এখানে আমার ঘোষণাটির উদ্দেশ্য হলো– বড়ই হোক কি ছোটই হোক সবাই যেন (ধর্মকর্মে) সচেষ্ট হয়; রাজ্যের সীমানার বাইরে যারা বাস করে তাদেরকেও যেন এটি জানিয়ে দেয়া যায়, (ধর্মে) সচেষ্ট হওয়াটি যেন চিরস্থায়ী হয় এবং এর বাণী যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে দেড়গুণ বৃদ্ধি পায়"।

এই বাণীতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে অশোক বিশেষ ভাবে চাচ্ছিলেন তাঁর বক্তব্য যেন তাঁর রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে পাশের দেশেও বিস্তৃত হয়। এই কারণে মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে অশোক লিপি সহ শিলাস্তম্ভ ইত্যাদি বেশি দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ আফগানিস্তানে (কান্দাহার), পাকিস্তানের পাঞ্জাবে ও সীমান্ত প্রদেশ খাইবার পাখতুন খোয়াতে (শাহবাজগারি, মান সাবরা), নেপালে (লুম্বিনি), ভারতের গুজরাটে (গিমার), অন্ধ্র প্রদেশে (ইয়ারাগুদি), উড়িষ্যায় (জাউগাদা, ধাউলি), এসব জায়গার নাম করা যেতে পারে। অবশ্য শুধু সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চল বা তার বাইরে নয় মৌর্য সাম্রাজ্যের একেবারে মর্মস্থল বলে যাকে উল্লেখ করা যায় সেই বর্তমান ভারতের বিহারে (সারনাথ, সাসারাম, সাঁচি) এবং উত্তর প্রদেশে (এলাহাবাদ, মীরাট, খালসি) এর কমতি ছিলনা, যেমন ছিলনা দিল্লীতে, মহারাষ্ট্রে (সোপারা), এবং আরো অনেক

জায়গায়। ভারতবর্ষে লিপি প্রবর্তনের একেবারে শুরুতে লিপির এমন ব্যাপক ও মহৎ ব্যবহার করে অশোক এই ক্ষেত্রেও নিজের নামকে অক্ষয় করে গেছেন।

অশোক লিপির ভাষা এক এক জায়গায় এক এক রকম– বিহারে, উড়িষ্যায়ও পূর্ব উত্তর প্রদেশে এই ভাষা মাগধী প্রাকৃতের আদি রূপ, পশ্চিমাঞ্চলে গুজরাট-মহারাষ্ট্র এটি মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত, পশ্চিম উত্তর প্রদেশ ও দিল্লীতে সৌরসেনী প্রাকৃতের আদি রূপ ইত্যাদি। সব চেয়ে ব্যতিক্রমী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে; আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী অশোক লিপিগুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে দুটি ভাষা– গ্রীক ও আরামাইক – দুটিই ওখানে সীমান্ত পারের ভাষা। মনে রাখতে হবে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ ঘটে গিয়েছে এর কিছু সময় আগে এবং ওই সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে গ্রীক শাসন প্রবর্তন হয়েছে। আবার একই সঙ্গে ইরান-পাকিস্তান সীমানায় প্রাচীন ব্যবিলনীয় ভাষা আরামাইক ভাষা তখনো বেশ সজীব। এই অঞ্চলের অশোক লিপিগুলো শুধু ভাষার ক্ষেত্রেই নয় লিপির ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রমী– এখানে শুধু ব্রাহ্মী লিপি ব্যবহৃত হয়নি, আরো তিন ধরণের লিপি ব্যবহৃত হয়েছে– গ্রীক, আরামাইক এবং খারোষ্ঠি লিপি। গ্রীক ও আরামাইক লিপির সঙ্গে ইতোমধ্যে আমাদের সাক্ষাত হয়েছে, যথারীতি গ্রীক ও আরামাইক ভাষায় লিখতে এই লিপি দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। খারোষ্ঠি লিপিটি ওই পাকিস্তান-আফগানিস্তান অঞ্চলেরই একটি স্থানীয় ভারতীয় লিপি যা ওখানকার সমসাময়িক গান্ধারা সভ্যতার মধ্যে উদ্ভাবিত হয়েছিলো। ব্রাহ্মীর মত অশোক লিপিতেই একে প্রথম দেখা যায়– পরে গান্ধারী প্রাকৃত নামের স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃত লিখতে এর ব্যবহার হতে দেখা গেছে। আরামাইক লিপি থেকেই এটি এসেছে মনে করা হয় এবং আরামাইকের মতই ডান থেকে বাম দিকে লেখা হতো। তৃতীয় খৃষ্টাব্দের দিকে এই লিপি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পাকিস্তান-আফগানিস্তানে কিছু অশোক লিপিতে ভাষা হিসেবে গান্ধারী প্রাকৃত ব্যবহার করে তা খারোষ্ঠি লিপিতে লেখা হয়েছে, পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে স্থানীয় প্রাকৃত ভাষার অশোক লিপি ব্রাহ্মী লিপিতেই লেখা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে অশোক ভাষা ও লিপির দিক থেকে কোন বৈচিত্র বাদ দেননি; উদ্দেশ্য একটাই, এর বাণী জানা থেকে কেউ যেন বাদ না পড়ে। এর ব্যতিক্রম ঘটছে শুধু একটি জায়গায়, তা হলো দক্ষিণাঞ্চলে অন্ধ্র প্রদেশ ও কর্নাটকে– এখানকার মানুষের ভাষা দ্রাবিড় ভাষাগুলো হলেও অশোক লিপিতে সেখানে উত্তর দেশে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাই ব্যবহার করা হয়েছে।

ব্রাহ্মী লিপিই বাংলা লিপির আদি রূপঃ

ব্রাহ্মী লিপি কোথা থেকে এসেছে এ নিয়ে অন্য কিছু অনুমান থাকলেও যেটি মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত তা হলো যেই আরামাইক লিপি তখন ভারত সীমান্তেই ছিল, ভারতীয় পণ্ডিতরা এখানকার সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাগুলো লেখার জন্য তার আদলেই নিজেদের এই লিপিটি তৈরি করে নিয়েছিলেন। অশোক লিপির আগে থেকেই বেশ কিছু সময় ধরে ধীরে ধীরে এটি গড়ে ওঠেছিলো। ব্রহ্ম দেবের নামেই হোক কিংবা ওই পণ্ডিতরা ব্রাহ্মণ ছিলেন বলেই হোক এটি ব্রাহ্মী লিপি হিসেবেই পরিচিত হয়েছে। পরবর্তী প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে এটি ক্রমে নানা দিকে পরিবর্তিত হয়ে হয়ে এক সময় আমাদের বাংলা বর্ণমালায় পরিণত হয়েছে, এবং একই সময়ে পরিণত হয়েছে উত্তর ভারতের অধিকাংশ প্রধান আধুনিক ভাষার লিপিতে। ওই প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপিটিই আবার চলে যায় তিব্বত, নেপাল, সিংহল, বার্মা, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া এবং লাওস পর্যন্ত। বৌদ্ধ ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম বেশ প্রাচীন কাল থেকেই এই সব দেশে প্রভাব বিস্তার করেছিলো– আজকের থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া ইত্যাদি দেশের সংস্কৃতি, ভাষা, নাম ইত্যাদি লক্ষ্য করলেও তা দেখতে পাই। এসব দেশের প্রত্যেকটির ভাষার লিপি মূলত ব্রাহ্মী থেকে এসেছে এবং একটু ঘনিষ্ঠভাবে দেখলেও আমরা বাংলার সঙ্গেও এগুলোর প্রত্যেকটির অনেক মিল দেখবো। এর কারণ সেই ব্রাহ্মী লিপিই ওই সময় ওসব দেশে গিয়ে সেখানে আলাদা আলাদা ভাবে বিকশিত হয়ে ওখানকার আধুনিক লিপির রূপ ধারণ করেছে।

এতগুলো আধুনিক লিপির মূল উৎস হিসেবে এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্রাহ্মী লিপির বৈশিষ্টগুলোর দিকে তাকানো যাক্, এবং একদিকে তার উৎসের সঙ্গে এবং অন্যদিকে তার একটি আধুনিকতম রূপ বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে তার মিল-অমিলগুলো লক্ষ্য করা যাক্। ব্রাহ্মী বর্ণমালা প্রায় হুবহু আজকের বাংলা বর্ণমালার স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ ক্রমের অনুরূপ ছিল– স্বরবর্ণে অ, আ, ই, ঈ, এ, ঐ, ও ঔ। ব্যঞ্জন বর্ণে ক, খ, গ, ঘ, ঙ এভাবে ক বর্গ; তারপর চ বর্গঃ চ, ছ, জ, ঝ, ণ– এমনি ভাবে বর্গের পর বর্গ একেবারে শেষ বর্ণ য় পর্যন্ত। অক্ষরের নামগুলোও মোটামুটি বাংলায় যে ভাবে বলি সেভাবেই। তবে অক্ষরের চেহারা কিন্তু খুবই আলাদা– এর চেহারা বাংলা অক্ষরের মত মোটেই নয় বরং তার থেকে অনেক সরল, একেবারেই কিছু জ্যামিতিক টানে গড়া, বলতে গেলে অনেকটা যেই ফীনিশীয় অক্ষরগুলোর বিবরণ আগে দিয়েছি সেগুলোর মত। এটিই স্বাভাবিক, কারণ ব্রাহ্মী তৈরি হয়েছিলো আরামাইক লিপির আদলে, আর

আরামাইক তৈরি হয়েছে ফীনিশীয় লিপির আদলে। সেই ফীনিশীয় আবার জন্ম দিয়েছিলো গ্রীক, ও সেখান থেকে রোমান বর্ণমালার। কাজেই প্রাচীন ব্রাহ্মীর অক্ষরগুলোর চেহারা বর্ণনায় আমাদের অতি পরিচিত রোমান অক্ষরের (ইরেজি অক্ষর) অদল বদল, উল্টানো পাল্টানো রূপটাই যেন বেশি দেখতে পাই। ওই ফীনিশীয় লিপি নিজের চিহ্নগুলো ধার করেছিলো মিশরীয় হীরোগ্লিফিক ছবি-লিপির থেকে যেখানে সত্যিকার ছবির সরলীকৃত জ্যামিতিক রূপটি ব্যবহৃত হতো। তাই এর মধ্যে এক অদ্ভুত ধারাবাহিকতা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের শিকড় যে কত গভীরে গ্রোথিত তা লিপির দিক থেকেও জানতে পারি।

আরামাইক নিজে সেমিটিক লিপি; আজকের দুটি পরিচিত সেমিটিক লিপি আরবী ও হিব্রুর জন্মও যার থেকে। সেমিটিকের কিছু বৈশিষ্ট ব্রাহ্মীতে এসেছে, কিছু আসেনি। অক্ষরের চেহারার সারল্যের দিক থেকে কিছুটা মিল এসেছে; স্বর বর্ণের কম গুরুত্বের দিক থেকেও কিছুটা এসেছে। ফীনিশীয়তে স্বর বর্ণ বলেই কিছু ছিলনা, স্বর চিহ্নও ছিলনা। আরামাইক, আরবী ইত্যাদিতে স্বর বর্ণ আছে, কিন্তু খুব কম ব্যবহৃত হয়, বরং স্বর চিহ্ন হিসেবে কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একেবারেই ব্যবহৃত হয়না। ব্রাহ্মীতে স্বরবর্ণ রয়েছে, তবে বর্ণ হিসেবে ব্যবহার সীমিত- যেমন শব্দের প্রথম বর্ণ হিসেবে প্রয়োজন হলে, যেভাবে বাংলায় 'একদিন' লিখতে 'এ'কে প্রয়োজন হয়, আরো কোন কোন বিরল ক্ষেত্রে যেমন বাংলায় 'মই' লিখতে। আর অ স্বরবর্ণটি অনেক শব্দের শেষে ব্যঞ্জনের পর উহ্য থাকে, লেখা হয়না– তবে ক্ষেত্র বিশেষ উচ্চারিত হয় যেমন বাংলায় 'বড়' শব্দটিতে। এছাড়া ব্রাহ্মী লিপিতে স্বর ধ্বনি যোগ করা হয় স্বরচিহ্ন হিসেবে প্রত্যেক ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে এরকম স্বরচিহ্ন যোগ করে কা, কি, কী, কু, কূ, কে ইত্যাদির প্রত্যেকটি একটি একক ধ্বনি উপাদান (সিলেবল) হিসেবে ব্যবহৃত হয় যার সমন্বয়ে শব্দ গঠিত হয়– যেমন বাংলায় কোকিলা শব্দটিতে কো, কি, ও লা এই তিনটি উপাদানে গঠিত ঠিক সেভাবে। সেমিটিক লিপির মত ব্রাহ্মীতে স্বরচিহ্ন ব্যবহার করা না করার স্বাধীনতা নেই– এটি ব্যবহার করতেই হয়। ফলে এর পুরো উচ্চারণ ধ্বনি তুলতে কোন ফাঁক রাখা হয়নি, যা মুখে বলা হয় তাই হুবহু লেখা হয়, যাকে বলা হয় ফোনেটিক লিপি। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা লেখার জন্য এই গুণটি প্রয়োজন ছিল। বিভিন্ন ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে একই ব্যঞ্জনের অল্প প্রাণ ও মহা প্রাণ দুটি রূপ থাকা যেমন ট ও ঠ, তেমনি হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘ স্বরের ব্যবস্থা থাকা যেমন ই ও ঈ; এসবও ওই একই কারণে প্রয়োজন ছিল। এসব আরামাইকে বা অন্য কোন সেমিটিক লিপিতে নেই, ওই একই ফীনিশীয় থেকে

আসা গ্রীক বা রোমান লিপিতেও নেই। এগুলো একান্তই ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপির; আর এর সঙ্গেই এই সব বৈশিষ্ট দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আরো নানা লিপিতে চলে গেছে। বাম থেকে ডান দিকে লেখার ব্যাপারেও ব্রাহ্মী ফীনিশীয় বা তার উদ্ভূত সেমিটিক লিপিগুলোর মতো নয়, বরং ফীনিশীয় থেকে উদ্ভূত অন্য লিপি গ্রীক ও রোমানের মতে।

ব্রাহ্মী অক্ষরগুলোর চেহারা দেখা যাক্। একদিকে বিশ্বের আদি বর্ণমালার সঙ্গে সম্পর্কের কারণে, এবং অন্যদিকে আমাদের ভাষা সহ দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বহু বর্ণমালার আদি রূপ হবার কারণে, এর চেহারা সম্পর্কে ঔৎসুক্য থাকা স্বাভাবিক। অশোক লিপি ও তার পরের অনেক লিপির এটিই চেহারা। স্বরবর্ণ দিয়ে শুরু করা যাক। আয়নায় দেখলে K ইংরেজি বড় হাতের অক্ষরটি যেমন বাম দিকে ঘোরানো মনে হয় অ অক্ষরটি ঠিক সে রকম। আ'র জন্য ওই অ অক্ষরটির ওপরে একটি অর্ধ মাত্রা দিতে হয়। ই হলো ত্রিভুজের আকৃতিতে সাজানো তিনটি বিন্দু, আর ঈ হচ্ছে বর্গক্ষেত্রের আকারে সাজানো চারটি বিন্দু। উ ইংরেজি বড় হাতের L অক্ষরের আকৃতি আর ঊ তে এই L এর খাড়া রেখাটির মাঝ বরাবর ডান দিকে যাওয়া বেঁটে রেখা যোগ হয়। এ একটি ছোট ত্রিভুজ আর ঐ তে ওই ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুতে একটি ছোট মাত্রা যোগ হয়। ও অক্ষরটিতে একটি খাড়া রেখার ওপরের প্রান্ত থেকে বামে এবং নিচের প্রান্ত থেকে ডানে ছোট রেখা। ঔ অক্ষরটি আদি ব্রাহ্মীতে ছিলনা।

এবার ব্যঞ্জন বর্ণে আসা যাক। ক একটি যোগ চিহ্ন +। খ একটি খাড়া রেখার ওপরের প্রান্ত থেকে লাঠির হাতলের মত বাম দিকে বাঁকা। গ তে ইংরেজি V অক্ষরটিকে যেন ওপর-নিচ উল্টে দেয়া হয়েছে। ঘ একটি খাড়া রেখার নিচের প্রান্ত থেকে ডান দিকে পর পর দুটি ইংরেজি U অক্ষর পরস্পর সংলগ্ন। ঙ স্কোয়ার ব্র্যাকেটের শুরুর অংশ [। চ একটি ছোট হাতের ইংরেজি d অক্ষর। ছ তে একটি খাড়া রেখা এর নিচের দিকে একটি ছোট বৃত্তকে মাঝখান দিয়ে ভেদ করে বৃত্তের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গিয়েছে। জ একটির নিচে আর একটি পরস্পর সংলগ্ন দুটি ইংরেজি C অক্ষর। ঝ ওপর-নিচ উল্টানো একটি ইংরেজি ছোট হাতের h অক্ষর। ঞ ইংরেজি ছোট হাতের h অক্ষর। ট বড় হাতের ইংরেজি C অক্ষর। ঠ বড় হাতের ইংরেজি O অক্ষর। ড ওপর-নিচ উলটানো ইংরেজি L অক্ষর, যার ওপরে ডানে যাওয়া রেখাটি শেষ প্রান্ত থেকে ছোট্ট একটি খাড়া রেখা ওপরের দিকে গেছে। ঢ বাংলা ৩ সংখ্যাটির আকৃতি। ণ ইংরেজি বড় হাতের I, তবে ওপর ও নিচের আড়াআড়ি রেখা দুটি স্পষ্ট ও দীর্ঘ। ত ওপর-নিচ উল্টানো

ইংরেজি বড় হাতের Y অক্ষর। থ একটি ছোট বৃত্তের কেন্দ্রে একটি বিন্দু। দ স্কোয়ার ব্র্যাকেটের শেষের অংশ, তবে ওপরের আড়াআড়ি রেখার বাম প্রান্ত থেকে একটি ছোট রেখা খাড়া ওপরে উঠেছে ও নিচের আড়াআড়ি রেখার বাম প্রান্ত থেকে একটি ছোট রেখা খাড়া নিচে নেমেছে। ধ বড় হাতের ইংরেজি D অক্ষর। ন ওপর-নিচ উল্টানো ইংরেজি T অক্ষর। প একটি খাড়া রেখার নিচের প্রান্ত থেকে ডান দিকে ইংরেজি বড় হাতের U অক্ষরের মত ঘুরে ওপরে খানিকটা উঠেছে। প এর জন্য যেই আকৃতি তার বাঁকা অংশের শেষ প্রান্তে ছোট্ট একটি বৃত্ত দিলে সেটি ফ হয়। ব একটি ছোট বর্গক্ষেত্র। ভ গ্রীক অক্ষর ও গণিতে ব্যবহৃত π এর মত। ম ইংরেজি বড় হাতের U অক্ষরের তলায় বাইরে এর সঙ্গে সংলগ্ন একটি ছোট বৃত্ত। য একটি খাড়া রেখার নিচের প্রান্ত থেকে ডান দিকে ইংরেজি U অক্ষরের মত ঘুরে গিয়ে খানিকটা উঠবে, এবং বাম দিকেও একই ভাবে U এর মত খানিকটা উঠবে– পুরোটা দেখতে একটি নোঙ্গরের আকৃতি। র একটি খাড়া রেখার ওপরের প্রান্তে বাংলা ঋফলা >, ঋ ফলার নিম্নতম প্রান্ত বিন্দুটি খাড়া রেখার প্রান্ত স্পর্শ করে। ল একটি খাড়া রেখার নিচের প্রান্ত থেকে বাম দিকে ইংরেজি U অক্ষরের মত বেঁকে গিয়ে খানিকটা ওপরে উঠবে। ব (উচ্চারণ ওয়) একটি খাড়া রেখার নিচের প্রান্তে সংলগ্ন ছোট বৃত্ত। শ একটি খাড়া রেখার ওপরের প্রান্ত থেকে ডানে নিচের দিকে কোণাকুণি একটি রেখা এবং বামে নিচের দিকে কোণাকুণি একটি রেখা নেমে আসে– তিনটি রেখা মিলে একটি তিন-পেয়ে ট্রাইপডের আকৃতি। ষ ইংরেজি ছোট হাতের t অক্ষর। স একটি খাড়া রেখার নিচের প্রান্ত থেকে ডানে ইংরেজি U অক্ষরের মত বাঁকা হয়ে কিছুটা উঠবে, আবার খাড়া রেখার ওই নিচের প্রান্ত থেকেই বামে সংলগ্ন হবে একটি ওপর-নিচ উল্টা U অক্ষর। হ একটি খাড়া রেখার নিচের প্রান্ত থেকে বেঁকে ডানে ইংরেজি U অক্ষরের খানিকটা উঠে তার থেকে ডান দিকে একটি ছোট রেখা। য় একটি খাড়া রেখা ইংরেজি U অক্ষরের খোলা মুখ দিয়ে এর মধ্যে ঢুকে পড়ে তার তলা স্পর্শ করে।

এবার স্বরচিহ্নগুলো দেখা যাক, যেগুলো বিভিন্ন ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। আ-কার বর্ণের ওপরের প্রান্ত থেকে ডান দিকে ছোট একটি রেখা। হ্রস্ব-ই-কার বর্ণের ওপরের প্রান্ত থেকে ডানে ছোট একটি ছোট রেখা এবং তার প্রান্ত থেকে খাড়া ওপরের দিকে একটি ছোট রেখা। দীর্ঘ-ঈ-কার বর্ণের ওপরের প্রান্ত থেকে ডানদিক একটি ছোট রেখা এবং তার প্রান্ত থেকে পাশাপাশি খাড়া ওপরের দিকে

দুটি ছোট রেখা। হস্ব-উ-কার বর্ণের নিচের প্রান্ত থেকে ডান দিকে ছোট রেখা। দীর্ঘ-ঊ-কার বর্ণের নিচের প্রান্ত থেকে ডান দিকে একের নিচে এক দুটি ছোট রেখা। এ-কার বর্ণের ওপরের প্রান্ত থেকে বামে একটি ছোট রেখা। ঐ-কার বর্ণের ওপরের প্রান্ত থেকে বামে একের ওপর এক দুটি ছোট রেখা। ঋ-ফলা বর্ণের নিচের প্রান্ত থেকে বাম দিকে U অক্ষরের মত বাঁকা হয়ে খানিকটা ওপরে ওঠা। অনুস্বার বর্ণের ওপরের প্রান্তের মাঝামাঝি জায়গায় ওপরের দিকে খাড়া ছোট রেখা।

সব মিলে ব্রাহ্মী বর্ণমালার যে আকৃতিগুলো আমরা পেলাম তার সবই খুব সরল জ্যামিতিক আকৃতি এবং অনেকগুলো হুবহু রোমান (ইংরেজি) অক্ষরের আকৃতির বা তার ওলটপালট ও বর্ধিত রূপ। স্বর চিহ্নগুলোও খুব সরল ছোট টানে বর্ণের ওপরে বা নিচে, বাম দিকে বা ডান দিকে বা খাড়া। কিন্তু এই লিপি পরে নানা ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং তখন তার এই সারল্য খুব একটা টিকে থাকেনি। এর থেকে অন্য যে সব লিপি ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে তাতে অক্ষরগুলো আরো জটিলতর পূর্ণতা পেয়েছে, গোটা গোটা ভাব ধারণ করেছে– বাংলা বর্ণমালা তার অন্যতম।

আদি ব্রাহ্মী থেকে বাংলা– দেড় হাজার বছরের বিবর্তনঃ

অশোক লিপিতে যে ব্রাহ্মী বর্ণমালার সাক্ষাত পাই তা আদি ব্রাহ্মী। ভারতবর্ষের যে অনেকগুলো জায়গার অশোক লিপিতে ব্রাহ্মী বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়েছে, তার সবই এই একই রকম। কিন্তু তারপর যতই দিন গিয়েছে তা আর এই রূপ থাকেনি, পরিবর্তিত হয়েছে– এক এক জায়গায় এক এক ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। অশোকের মত পুরো সাম্রাজ্য জুড়ে লিপির এমন দীর্ঘস্থায়ী নমুনা কেউ আর রেখে যায়নি। তবে নানা রাজ্য-সাম্রাজ্যের আনুষ্ঠানিক কাজে, বিশেষ করে দানপত্রের দলিলে লিপিগুলো তামার পাতে খোদাই করার নিয়ম প্রচলিত ছিল। পরবর্তী নানা সময়ে কোথাও কোথাও এরকম তামার পাতের দলিল আবিষ্কৃত হয়েছে যার থেকে সমসাময়িক লিপির পরিচয় পাওয়া গেছে– যা কিনা ব্রাহ্মী লিপিরই বিবর্তনের নানা রূপ। বোঝা যায় যে আগের কোন লিপিকারের অক্ষর ও নিয়ম অনুসরণ করে পরের প্রজন্মের কোন লিপিকার তা যখন খোদাই করেছে তাতে কিছু কিছু পরিবর্তন এতে ঢুকে গেছে। অল্প সময়ের ব্যবধানে সে পরিবর্তন সামান্য হলেও দীর্ঘ মেয়াদে তা যথেষ্ট বদলে গেছে। প্রায় পুরোটা উত্তর ভারতের সর্বত্র লক্ষ্য করা গেছে যে এরকম অধিকাংশ তামার পাতের দলিল সংস্কৃত

ভাষাতেই রচিত হয়েছে, যদিও কচিৎ মাঝে মাঝে স্থানীয় প্রাকৃত ভাষার দলিলও দেখা গেছে। এই সংস্কৃত প্রাধান্য থেকে মগধ সাম্রাজ্য এবং পরবর্তীতে পাল, সেন ইত্যাদি বড় বড় রাজ্যগুলোও ব্যতিক্রম নয়, যার মধ্যে বাংলা এলাকাও পড়ে। অথচ ব্রাহ্মী লিপির প্রথম ব্যবহারটিই হয়েছিলো অশোক লিপিতে একেবারে মুখের ভাষায় ব্যবহৃত প্রাকৃততে। পরবর্তী সময়ে দেখা যাচ্ছে যে এ লিপির বড় ব্যবহারটি ছিল সংস্কৃত লেখার জন্য; দৈনন্দিন আটপৌরে ভাষায় কিছু লেখা হয়ে থাকলেও তার বেশি নমুনা স্থায়ী হয়নি। ব্রাহ্মী লিপির পরিবর্তনগুলো প্রায় সব জায়গাতেই তাই সংস্কৃত লেখার আরো একটু উপযুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। হ্যাঁ, সংস্কৃত সাহিত্যের পাশাপাশি জনপ্রিয় প্রাকৃত সাহিত্যও ছিল– কিন্তু অন্তত ৫০০ খৃষ্টাব্দ অবধি তার লিখিত রূপ বড় একটি পাওয়া যায়নি। ওসময় কালিদাস প্রমুখের নাটকে সংস্কৃত সংলাপে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সংলাপও ছিল। কিন্তু সে সময়ের ওই নাটকের লিখিত রূপ দুর্লভ।

এখন আমরা যে অঞ্চলকে বাংলাভাষী অঞ্চল বলে চিহ্নিত করি তার প্রায় পুরোটাই পঞ্চম শতাব্দীতে এই অঞ্চলের অদূরের পাটলিপুত্রকে (পাটনা) রাজধানী করা বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। এ সময়ের কিছু কিছু তামার পাতের লিপি আমাদের অঞ্চলে পাওয়া গেছে– বেশির ভাগ উত্তর বঙ্গে, তবে অন্তত দুটি কুমিল্লায়। এগুলো থেকে সে সময়ের ব্রাহ্মীর কিছু পরিচয় মেলে। ব্রাহ্মীর এই রূপটিকে গুপ্ত লিপিও বলা হয়। তখনো বাংলা ও বাংলার বাইরের গুপ্ত সাম্রাজ্যের এই লিপির মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু কিছু পরে গুপ্ত পরবর্তী সময়ে ষষ্ঠ শতাব্দীতে এমন পার্থক্যের সূচনা হয়েছে। তখন ওই পাটলিপুত্র-কেন্দ্রিক উত্তর ভারতে ও পূর্ব ভারতে নাগরী নাম নিয়ে লিপি বেশ কিছুটা পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করেছিলো– অনেকটা গোটা গোটা বর্গাকার রূপ নিয়েছিলো অক্ষরগুলো, ওই বর্গাকার জায়গার ভেতরে দেখা দিয়েছিলো আরো জটিল কৌণিক বাঁক এবং খানিকটা বক্রতাও; আদি ব্রাহ্মীর অক্ষরগুলোর যে বর্ণনা আমরা ওপরে দেখেছি তার থেকে এগুলো বেশ বদলে গিয়েছিলো। নাগরী শব্দটি এসেছে নাগরিক থেকে; দাবী করা হয়েছে যে এই লিপি পরিশীলিত নাগরিক পণ্ডিতদের সংস্কৃত ভাষায় রাজকীয়, ধর্মীয়ও সাহিত্যিক চর্চায় আরো বেশি উপযুক্ত হবে।

নাগরীর একটি রূপ সপ্তম শতাব্দী থেকে দেব নাগরী নামে পরিচিত হয়; দেব ভাষা সংস্কৃত লেখার আরো একটু বেশি উপযোগী দাবী করাতেই নামের সঙ্গে এই সংযোজন। এই লিপিতে সংস্কৃত ও স্থানীয় প্রাকৃত উভয়েই লেখা শুরু হয়।

এরই পরিবর্তিত রূপ আধুনিক সময়ে হিন্দি ও আরো কিছু উত্তর ভারতীয় ভাষার লিপি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একই সময়ে বেশি পূর্বের অঞ্চলে বিহারে ও বাংলায় নাগরীমুখী পরিবর্তন ধারায় ব্রাহ্মী লিপি আরো একটি পৃথক ভঙ্গির পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হয়, যাকে বলা হয়েছে সিদ্ধ মাতৃকা ভঙ্গি। সিদ্ধ মাতৃকা ভঙ্গির এই নতুন পরিবর্তন ব্রাহ্মী লিপিকে বাংলা ও সমগোত্রীয় আরো কিছু লিপির দিকে নিয়ে এসেছে। পরিচিত বাংলা লিপিতে আসার আগে এর একটি পর্যায়কে বলা হয়েছে কুটিল লিপি। কুটিল কথাটি বলা হয়েছে এতে বহু ভঙ্গ ও বাঁকানো রেখার আধিক্য বোঝাতে। উদাহরণ স্বরূপ ত্রিভুজ আকৃতির অক্ষরগুলো যেমন ব, র, ঝ, য, ফ, থ, ঘ, এরকম কয়েক বাঁকের অক্ষর। কোন কোন অক্ষরে এরকম কৌণিকতার সঙ্গে বাঁকানো লেজের মত অংশ থাকে যেমন ক, খ, ধ। এসবের সঙ্গে আবার অধিকাংশ বর্ণে ওপরে মাত্রা ইত্যাদি একে কুটিল নামের যোগ্য করে তুলেছে। এই রীতিটি দশম-একাদশ শতাব্দীতে গৌড়ীয় কুটিল লিপি নামে পরিচিত হয়ে আরো বিশিষ্টতা লাভ করে এবং আরো দু'এক শ' বছরের মধ্যে অনেকটা আধুনিক বাংলা ও অহোমিয়া লিপির আদলে চলে আসে।

ও সময় বাংলা লিপির এই পূর্বসূরিকে প্রধানত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা লেখার কাজেই ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও একটি প্রাক-বাংলা ভাষা তখনো ছিল সেটি কখনো লেখা হচ্ছে এমনটি কোন নমুনায় দেখা যায়নি। এই গৌড়ীয় কুটিলের সৃষ্টির পেছনেও বড় উদ্দেশ্যটাই ছিল সংস্কৃত লেখা, সেভাবেই এর নানা দিকের বিকাশ ঘটানো হয়েছে। দেব নাগরী যে আলাদা ভাবে সংস্কৃত লেখার জন্য বিশেষ ভাবে উপযোগিতার দাবী করতো অন্তত এই অঞ্চলে তার তেমন গুরুত্ব ছিলনা। একেবারে আধুনিক বাংলা লিপি পর্যন্ত সব রূপেই বাংলা বর্ণমালা সংস্কৃত ভাষার কাজে দেব নাগরীর মতই উপযুক্ত ছিল এবং এই অঞ্চলে নিয়মিত সংস্কৃত লেখার কাজে ব্যবহৃত হতো। বল্‌তে গেলে শুধু সাম্প্রতিক কালেই বরং সংস্কৃত পণ্ডিতরা তাঁদের চর্চার জন্য ইতোমধ্যে এ কাজে ব্যবহৃত প্রধান ভাষাগুলোর মধ্য কেন জানি দেব নাগরীকেই বেছে নিয়েছেন। বাংলা লিপি যে সংস্কৃত লেখার জন্য গড়ে ওঠেছিলো তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ধর্মীয় প্রয়োজনে, আনুষ্ঠানিক কাজে এবং সংস্কৃত সাহিত্যের কারণে ভারতবর্ষের সর্বত্রই সংস্কৃত লেখার একটি বড় চাহিদা ছিল, এবং স্থানীয় লিপিকেই তার উপযুক্ত করে গড়া স্বাভাবিক। এমনকি দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠি অঞ্চলেও সংস্কৃতের চাহিদা ছিল– প্রধানত প্রভাবশালী তামিল ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণদের সংস্কৃত চর্চার কারণে। ইতোমধ্যে ব্রাহ্মী লিপি দক্ষিণ ভারতে গিয়ে সেখানে তামিল,

তেলেগু, মালায়লাম ইত্যাদি লিপিতে বিবর্তিত হয়েছে। বেশ কিছু সংস্কৃত শব্দ আত্মীকৃত করা ছাড়া তামিল ও অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষায় সংস্কৃত প্রভাব তেমন ছিলনা, যে কারণে ওই লিপিগুলোতে সংস্কৃত সব ধ্বনি লেখার ভাল সুবিধা ছিলনা। সে জন্য পরে শুধু ওই সংস্কৃত ধ্বনিগুলোকেও অন্তর্ভূক্ত করার জন্য গ্রন্থ বর্ণ নামে কিছু অতিরিক্ত বর্ণ তামিল বর্ণমালায় যোগ করা হয়, যার ফলে আরো পরে ভাট্টি লুট্টু নামে তামিলের একটি নতুন রূপই সৃষ্টি হয়েছিলো; একই রকম বিকাশ অন্য প্রধান দ্রাবিড় লিপিগুলোতেও ঘটেছে। সেক্ষেত্রে আদি বাংলা সহ আর্য ভাষা প্রভাবিত ভাষা অঞ্চলগুলোতে লিপিগুলো সংস্কৃত লেখার উপযুক্ত হবে ও সে কাজে ব্যবহৃত হবে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাল রাজাদের শাসন কালে বাংলার পশ্চিমাঞ্চল, বিহার ও ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী অঞ্চলে গৌড়ীয় কুটিল রীতির বর্ণমালায় লেখা বেশ কিছু তামার পাত পাওয়া গেছে। তখনকার লিপিতে কোন কোন বিশেষজ্ঞ আরো একটু পশ্চিমাঞ্চলে ও বিহার এলাকায় তখন ব্যবহৃত নাগরীর সঙ্গে এই গৌড়ীয় লিপির কিছু মিল দেখতে পান। হয়তো একই পাল সাম্রাজ্যের অধীনে থাকাতে উভয় লিপির মধ্যে এক রকম উপরিপাতন ছিল। কিন্তু একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পশ্চিম দিনাজপুরের রামগঞ্জে পাওয়া তামার পাতের লিপিতে যে বর্ণমালা দেখা যায় তাতে বাংলা লিপির সকল বৈশিষ্ট চলে এসেছে। তারপর দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষণ যেন ও বিজয় সেনের রাজত্ব কালে পাওয়া কিছু তামার পাতের লিপিকে নিখাদ বাংলা লিপি না বলে উপায় নেই। এয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিম সুলতানদের আমলে সাধারণ-পাঠ্য সাহিত্যে বাংলা ভাষা আদৃত হতে শুরু করলে তারপর থেকে তামার পাত নয়, নানা ভাবে লেখা ও নকল করা বইয়েই আমরা বাংলা লিপির সাক্ষাত পাই। সে সময়কার সংস্কৃত ও বাংলা উভয় সাহিত্যের বইই এই প্রায় আধুনিক বাংলা লিপিতে পাওয়ার সৌভাগ্য বর্তমান কালের গবেষকদের হয়েছে। এরপরও নানা খুঁটিনাটিতে বাংলা লিপির কিছু পরিবর্তন যে হয়নি তা নয়, তবে ১৭০০ শতকে ছাপাখানা এসে যাওয়ার পর সীসার অক্ষরে আবদ্ধ হয়ে বাংলা বর্ণমালা কি প্রযুক্তিতে, কি নান্দনিকতায়, একটি চূড়ান্ত রূপে পৌঁছতে পেরেছিলো– যেভাবে একে এখন আমরা পাচ্ছি।

তবে এটি এখনো প্রায় সেই বর্ণমালাই রয়ে গেছে যা সংস্কৃত ও প্রাকৃত লেখার উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠেছিলো। সাধু ভাষা বিদায় হবার পর এই লিপি ব্যবহারে কিছু সারল্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আজকের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার বাহন

হয়ে যে ঝরঝরে বাংলা প্রমিত হয়েছে তার লিপি আরো অনেক বাহুল্য বর্জিত হতে পারতো; এখনো তা হতে পারে, এবং তার জন্য অতীতের বিকাশের মত আরো শত শত বছর অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই। এভাবে লিপি যে দ্রুত সংস্কার হতে পারে, এমনকি সম্পূর্ণ নতুন লিপিও সৃষ্টি হতে পারে, তার কিছু উদাহরণ দেখা যাক।

ঝটপট সৃষ্ট ফরমায়েশি লিপি

আজকের অনেক সুপরিচিত লিপি যেমন হাজার বছর ধরে বিবর্তিত হয়েছে, তেমনি অন্তত কিছু কিছু পরিচিত লিপি প্রয়োজনের তাগিদে ঝটপট তৈরি হয়ে গেছে– এর মধ্যে এমনো লিপি আছে যা আগের কোন লিপির ওপর একেবারেই নির্ভর না করে সম্পূর্ণ নতুন নীতি ও নতুন অক্ষর-চিত্র ব্যবহার করে অল্প কিছুদিনের মধ্যে তৈরি হয়েছে। তারপর শত শত বছর ধরে বহু কোটি মানুষ নিজেদের সর্বজনীন ভাষা লেখার জন্য এমনি ঝটপট ভাবে সৃষ্টি হওয়া লিপি ব্যবহারও করে আসছে। ভাষার ক্ষেত্রে কিছু মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে অথবা প্রভাবশালী কেউ ফরমায়েশ দিয়ে রাতারাতি একটি ভাষা সৃষ্টি করতে পারেনা, করলেও সেটি মানুষের মুখে স্থান পায়না। কিন্তু লিপির ক্ষেত্রে তা বেশ সাফল্যের সঙ্গেই করতে দেখা গেছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি দেখা যাক।

ফরমায়েশি লিপি অল্প সময়ে সৃষ্টির প্রথম উদাহরণ হিসেবে আমরা সিরিলিক লিপিকে নিতে পারি। ইউরোপের একটি অত্যন্ত বড় জনগোষ্ঠির জাতিসত্তাও পরিচয় হলো স্লাভ হিসেবে– রাশিয়ার বিশাল জনগোষ্ঠি ছাড়াও ইউক্রেন, বেলারুশ, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, শ্লোভেনিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভেনিয়া, এবং চেক রিপাবলিক ও শ্লোভাকিয়ার মানুষের একটি বড় অংশ এই গোষ্ঠির মানুষ। এই স্লাভদের ব্যবহৃত সকল ভাষার মধ্যে পরস্পর অনেক মিল আছে এবং এগুলো স্লাভোনিক ভাষা গোষ্ঠির অন্তর্গত। পোলিশ ক্রোয়েট, বসনিয়ান, চেক, শ্লোভাক এরকম দু'একটি অপেক্ষাকৃত ছোট জাতি বাদ দিলে স্লাভদের বাকি সবাই তাদের ভাষার জন্য একটি লিপি ব্যবহার করে যার নাম সিরিলিক– রাশিয়ান ভাষার লিপিতে যা আমরা প্রায়ই দেখে থাকি। পাশাপাশি আরো একটি ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে স্লাভদের যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সিরিলিক লিপি ব্যবহার করে তারা খৃষ্টান ধর্মের একটি প্রাচীন ধারা অর্থোডক্স ধর্মাবলম্বী; স্লাভদের মধ্যে যারা অর্থোডক্স ধর্মীয় নয়, তারা সিরিলিক লিপি ব্যবহার করেনা–

বরং অধিকাংশই রোমান লিপি ব্যবহার করে, কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত চিহ্ন যোগ করে।

সিরিলিক লিপিটি দ্রুত কী ভাবে সৃষ্টি হলো তা দেখা যাক্। নবম খৃষ্টাব্দে বুলগেরিয়ান জার প্রথম বোরিস ও তাঁর ছেলে জার প্রথম সাইমনের কালে (সাইমন দি গ্রেট) তৎকালীন বুলগেরিয়া সাম্রাজ্যের ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য এবং স্লাভোনিক অর্থোডক্স চার্চের স্বাতন্ত্র্যের ওপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় এবং স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির জন্য এসবে অনেক পরিবর্তন আনা হয়। ওই সময় পর্যন্ত ওখানে প্রাচীনতর বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের নীতি ও গ্রীক ভাষার অনুসরণে গ্রীক লিপিকেই নিজেদের ভাষা ও স্লাভোনিক অর্থোডক্স চার্চের কাজে ব্যবহার করা হতো। ওই ধর্মের মন্ত্র-উচ্চারণ ইত্যাদি কাজে এমন কিছু ধ্বনি ছিল যা গ্রীক বর্ণমালায় উচ্চারণ করার কোন সুযোগ ছিলনা। তাই জার সাইমন সিদ্ধান্ত নিলেন যে স্লাভ ভাষাগুলো ও স্লাভোনিক অর্থোডক্স ধর্মের জন্য একটি পৃথক বর্ণমালা থাকা উচিত। যেই ভাবা, সেই এতে কাজে নামা– তিনি এই বর্ণমালা সৃষ্টির উদ্যোগ নিলেন।

নতুন উপযুক্ত একটি বর্ণমালা তৈরির জন্য জার সাইমন কয়েকজন পণ্ডিতকে দায়িত্ব দিলেন। এ পণ্ডিতরা মূলত ছিলেন সিরিল ভাইয়েরা নামে পরিচিত দু'জন গুরুর শিষ্য। এই দুই ভাই সিরিল ও মেথোডিয়াস নিজেরা এ ধরণের একটি উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ভাবছিলেন এবং এ সম্পর্কে তাঁদের কিছু কিছু আইডিয়াও দিয়েছিলেন। জার সাইমনের গঠন করা 'পণ্ডিত কমিটি' অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের নতুন বর্ণমালা জারকে উপহার দিলেন, আর এ কাজের পথিকৃৎ ওই সিরিল ভাইদের নামে বর্ণমালার নাম দিলেন সিরিলিক লিপি। এতে ইতোপূর্বে তাঁদের ব্যবহৃত গ্রীক বর্ণমালার বেশ কিছু অক্ষর রইলো, কিন্তু কোন কোনটির উচ্চারণ বদ্‌লে গেলো, কোন কোনটি আকৃতি অনেকটাই বদ্‌লে গেলো। রাশিয়ান ভাষার লিপি যথেষ্ট সুপরিচিত হওয়াতে এই পরিবর্তনগুলো আজো সবার চোখের সামনে রয়েছে। ৮৯৩ সালে জার সাইমন তাঁর সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় লিপি হিসেবে সিরিলিককে ঘোষণা করেন। সেই থেকে আজ অবধি এটিই অধিকাংশ স্লাভোনিক ভাষার লিপি– ওই পণ্ডিতরা যা ঠিক করে দিয়েছিলেন দু'একটি ছোটখাট পরিবর্তন ছাড়া মোটামুটি সেই একই লিপি।

ফরমায়েশি লিপির আরো দুর্দান্ত একটি উদাহরণ হলো আজকের কোরিয়ান ভাষার লিপি যাকে বলা হয় হাঙ্গুল। এটি দুর্দান্ত এই অর্থে যে আগের কোন বর্ণমালার থেকে কোন সাহায্য না নিয়ে এটি সম্পূর্ণ নতুন ভাবে চিন্তা করে

উদ্ভাবিত অত্যন্ত সহজ একটি লিপি যা কোরিয়ার সাধারণ মানুষকে দ্রুত সাক্ষর করতে সাহায্য করেছিলো। আর যিনি এই উদ্ভাবনটি করেছিলেন তিনি কোরিয়ার ইতিহাসের বিখ্যাত একজন রাজা– তাঁরই সিদ্ধান্ত, তারই উদ্ভাবন, এবং তাঁরই ফরমান বলে শুরু হয়ে আজ অবধি এটি উভয় কোরিয়ায় কোরিয়ান ভাষার লিপি। লিপিটি এতই সহজ যে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষও যখন ওদেশে কাজ করতে যাওয়ার জন্য কোরিয়ান ভাষা শেখে– তাদের জন্যও কাজটি খুব সহজ হয়।

প্রাচীন কালে কোরিয়ার ওপর চীন সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব অত্যন্ত বেশি ছিল। ১৪০০ শতক পর্যন্ত কোরিয়ান ভাষা লেখা হতো চীনা লিপিতে যা কিনা বর্ণমালার ধ্বনি ভিত্তিক লিপি নয় বরং ছবি-লিপি থেকে হাজার হাজার চিহ্ন ব্যবহার করে তৈরি– এক এক শব্দের জন্য এক এক চিহ্ন! বলাবাহুল্য চীনা ভাষার মতই কোরিয়ান ভাষা লেখা ও পড়া ছিল অত্যন্ত কঠিন, দীর্ঘ শিক্ষা-সাপেক্ষ কাজ। কোরিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় রাজা সেজোনির চিন্তা ছিল বর্ণমালা ভিত্তিক এমন একটি সহজ লিপি উদ্ভাবন করা যাতে কোরিয়ান ভাষার শব্দগুলোর ধ্বনি অনুসরণ করে যে কেউ অতি সহজে লিখতে পারবে। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের সব মানুষকে দ্রুত সাক্ষর করে তোলা। এমন একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার অন্য কাউকে না দিয়ে তিনি নিজেই গ্রহণ করলেন এবং ১৪৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দের বছরটির মাত্র কয়েকটি মাস এতে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করে তাঁর ইচ্ছা পূরণের বর্ণমালাটি উদ্ভাবন করলেন। তিনি এর নাম দিলেন হাঙ্গুল; কোরিয়ান ভাষায় হান মানে মহান, আর গুল মানে লিপি; এটি সেই মহান লিপি। অথচ জটিল কিছুই এতে নেই কয়েকটি ছোট বৃত্ত আর সরল রেখার সমন্বয়ে গড়া এই বর্ণমালা দিয়ে কোরিয়ান ভাষার সব শব্দ সহজে হুবহু উচ্চারণ করা যায়।

বলতে গেলে এটি পৃথিবীর সরলতম লিপিগুলোর একটি। এটি একেবারেই নিয়মবদ্ধ একটি লিপি, নিয়মগুলো সহজ অথচ নিয়মের বাইরে মুখস্ত করার বা অভ্যাস করে করে মনে রাখার কিছু নেই। হাঙ্গুলের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে– কেউ কেউ মনে করেন রাজা সেজোনি এতে নেতৃত্ব দিয়েছেন বটে, কিন্তু এর পেছনে আরো কিছু প্রতিভাবান মাথা কাজ করেছিলো।

এই বড় বড় উদাহরণগুলো প্রমাণ করে যে নতুন লিপি ভেবেচিন্তে অল্প কিছুদিনের মধ্যে তৈরি করা যায়, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারেও লাগিয়ে দেয়া যায়। সবাই গ্রহণ করলে অল্প দিনেই এতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া যায়, এর আগে হাজার

বছর ধরে একেবারেই ভিন্ন অভ্যাস সত্ত্বেও। এটি সম্পূর্ণ নতুন লিপির ক্ষেত্রে যেমন সম্ভব, আগের থেকে রয়েছে এমন লিপির সংস্কারের মাধ্যমেও সম্ভব। কামাল আতাতুর্ক যখন তুরস্কে বিপ্লব ঘটিয়ে দেশটিকে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করলেন, তখন তাঁর সংস্কার কাজের একটি ছিল আরবী বর্ণমালার বদলে তুর্কী ভাষাকে রোমান বর্ণমালায় লেখা। এটি করতে গিয়ে তুর্কী ভাষার কিছু বিশেষ ধ্বনি প্রকাশ করার জন্য রোমান অক্ষরের সঙ্গে কিছু চিহ্ন যোগ করতে হয়েছে। অনেকে ভেবেছিলেন এতে অভ্যস্ত হতে বোধ হয় সময় লাগবে– তা কিন্তু লাগেনি, খুব স্বাভাবিক ভাবেই তুর্কী ভাষা রোমান বর্ণ মালায় লেখা হয়ে আসছে; এখন কেউ ভাবতেও পারবেনা এক শত বছরেরও কম সময় আগে তুর্কী লিপি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। আমাদের বাংলা বর্ণমালা মূলত সংস্কৃত ও প্রাকৃত লেখার জন্যই বিকশিত হয়েছিলো– পাশাপাশি বাংলা ভাষা থাকলেও তা খুব একটা লেখা হতোনা। পরে যখন লেখা হলো তখন খুবই সংস্কৃত-প্রভাবিত বাংলা লেখা হতো বলে ওই লিপিরই প্রয়োজন ছিল, বাংলা ব্যাকরণ হুবহু সংস্কৃত ব্যাকরণেরই অনুসরণে সৃষ্ট ছিল– অন্তত কাগজে কলমে উচ্চারণ রীতিও একই হওয়াতে নত্ব বিধান, ষত্ব বিধানের প্রয়োজন হয়েছিলো। এই সবের প্রধান উদ্দেশ্য বাংলার মধ্যে তৎসম শব্দ অর্থাৎ বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দগুলো সঠিক ভাবে উচ্চারণ করা।

গত একশ' বছরে যে বাংলা ভাষা বিকশিত হয়েছে তাতে তৎসম শব্দের ব্যবহার একেবারেই কমে গেছে। তাই আমাদের বর্ণমালার পক্ষে ওই দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয়তাও কমে গেছে। বরং যেটি প্রয়োজন সেটি হলো সাক্ষরতাকে সহজ করা, কঠিন রাখা নয়, দেশের সবাইকে সত্যিকার অর্থে সাক্ষর করে তোলা। লিপির সংক্ষিপ্ত সংস্কারেই তা করা সম্ভব। যেসব ক্ষেত্রে কার্যত একাধিক ন, জ, স, হ্রস্ব, দীর্ঘ ইত্যাদি উচ্চারণের প্রচলন নেই, থাকলেও পার্থক্য এতই সূক্ষ্ম যে উচ্চারণে আসলে তার কোন প্রতিফলন নেই, তাকে লেখার মধ্যেও মেনে নেয়ার ব্যবস্থা করা যায়। আগের রচিত সাহিত্য আস্বাদনের সময় সে সময়কার ব্যবহৃত সব অক্ষরও শিখে নিলেই হবে, উচ্চারণে যেহেতু উল্লেখযোগ্য তফাত নেই।

কাছের জীবন ও দূরের বাণিজ্য

দৈনন্দিন জীবনের ছবি

বাঙালীর চিরন্তন রসনাঃ

মানুষের আটপৌরে দৈনন্দিন জীবনের কথা ভাবলে প্রথমেই ওঠে খাবার কথা। যদি অন্ন-ব্যঞ্জনের বিস্তারিত সহ আগেকার দিনের খাবারের কথা জানতে চাই তাহলে সমসাময়িক সাহিত্যের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। কাজেই লিখিত সাহিত্য সৃষ্টির আগের দিনের কথা উহ্য থেকে যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য ধর্মীয় উপাখ্যান ইত্যাদি নিয়েই বেশি ব্যস্ত ছিল, সেখানে রসনার মত মামুলি বিষয়ের স্থান বেশি হয়নি। মধ্যযুগে এসে সেটি কিছুটা হয়েছে– যেমন এয়োদশ শতাব্দীর প্রাকৃত পৈঙ্গল নামক কাব্যে প্রাকৃত ভাষায় বর্ণনা রয়েছে:

ওগরূ ভত্তা রম্ভা ওপত্তা, গাইকা ঘিত্তা দুগ্ধ সযুত্তা
মৈলি মচ্ছা নালিত গচ্ছা দিজ্জৈ কান্তা খাই পুনবন্তা।।

বাংলা অনুবাদে:

সেই সৌভাগ্যবান যার স্ত্রী, দুধসহ গরম ভাতে ঘি
মৌরলা মাছ ও ভাজা পাট শাক কলাপাতায় খেতে দেয়।

প্রায় একই সময়ের কেদার ভট্ট রচিত 'বৃত্তরত্নাকার' নামক সংস্কৃত কাব্যে আরো সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন খাবারের বর্ণনা এরকম:

তরুনং সর্ষপ শাকং নবোদিনানি পিচ্ছিলানি চ দধিনী
অল্প ব্যয়েন সুন্দরী গ্রাম্য-জনো মিষ্টম্ অশ্নাতি।।

বাংলায় অনুবাদে:

কচি সর্ষে শাক নতুন ধানের ভাত আর দৈ
স্বল্প ব্যয়ে সুন্দর চলা গ্রামীন মানুষের সুস্বাদু খাবার।

আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্রী হর্ষ রচিত 'নৈষধ চরিত্র' সংস্কৃত কাব্যে নল ও দয়মন্তীর বিয়ে উপলক্ষে যে ভোজ হয়েছিলো তার একটি বর্ণনা আছে। নল ও দয়মন্তীর কাহিনীটি একটি পৌরানিক কাহিনী সেখানে দয়মন্তী স্বয়ংবরা হয়েছিলেন নলের গলায় মালা দিয়ে এবং তাতে চার দেবতা উপস্থিত ছিলেন। নৈষধ চরিত্রে তাদের বিয়ের ভোজটিকে একটি সমসাময়িক বাঙালী ভোজ

হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে। এতে খাবারের কী কী পদ ছিল তা লক্ষ্যণীয়। এতে ছিল সব্জীর তরকারি, মাছ, পাঠার মাংস, শরবত পানীয়, এবং সব শেষে পান– খুব বাহুল্য নেই, তবে ভোজের সব পদই আছে। একই শতাব্দীতে রচিত 'কালবিবেক' নামক কাব্যে তেলে ভাজা ইলিশ মাছকে বাঙালীর সব চেয়ে প্রিয় খাদ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে আটশ' নয়শ' বছরেও আমরা একটু খানিও বদলাইনি, অন্তত এই দিকটিতে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে এসে একেবারে বাংলা কবিতাতেই আমরা জিহ্বার পানি আসার মত সবিস্তার বর্ণনা পাই মুকুন্দ রামের চন্ডীমঙ্গলে। শুধু নিরামিষ পদগুলোর কথা বল্‌তে গেলে এতে আছে শুক্তো, শিম, চাল কুমড়া, বেগুন, ঘিয়ে ভাজা পাট শাক, ডালের বড়ি, চাল্‌তার ঝোল, পুঁই শাক। আমিষের পদ শুধু দুটি– চিংড়ি আর সর্ষের তেলে ভাজা চিতল মাছ। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেরই আরেক অংশে ফুল্লরা কালকেতুর জন্য কী কী রান্না করেছিলো সেখান থেকে আরো কয়েকটি পদের খাবার পাই– ভাঙ্গা চালের জাউ ভাত, ডাল দেয়া চাল কুমড়ার তরকারি, ওল, আর বাংলা আলুর তরকারি, কচু আর আমড়ার তরকারি, এবং অম্বল। খাওয়া শেষে মুখে হরিতকি দেয়ার কথা আছে। চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরা আর কালকেতুর উপাখ্যানে স্বর্গের দুই বাসিন্দাকে স্বর্গ থেকে বিদায় করায় মর্ত্যে এসে সাধারণ মানুষ ফুল্লরা আর কালকেতু হিসেবে তাদেরকে জন্মাতে হয়েছিলো। সেই ফুল্লরা এখানে রান্না করেছে একেবারেই বাঙালী খাবার।

আমাদের কালের শুধু আড়াইশ' বছর আগে কবি ভারত চন্দ্রকে আনন্দমঙ্গল কাব্যে আরো দারুণ সব খাবারের বর্ণনা দিতে দেখি। সেখানে দেবী অন্নপূর্ণা ২৩ পদের খাবার তৈরি করছিলেন। এর কয়েকটিতে লোভ সামলানো আজকের যে কোন বাঙালীর কঠিন হবে– নানা তরকারির ঘন্ট, বুটের ডালের ঝোল, বাঁশের ফুল, নারকেল ভাজা, শুক্তোনি, চিনি দিয়ে রাঁধা কাঠালের বিচি। মাছের অনেকগুলো পদ রয়েছে কাতলা, কই, মাগুর, শোল এগুলোর ঝোল, আর চিতল মাছ ভাজা। মাংসের একটি পদকে বলা হয়েছে শিক্ পোড়া, আড়াইশ' বছর পরে এখন হলে আমরা হয়তো বলতাম শিস্ কাবাব।

ভারতচন্দ্রের আমলের আগেই মুসলিম তুর্কি-ইরানিদের আনা খাবার বাঙালীর রসনায় চলে এসেছিলো– তবে এই আসাটি সহজ হয়নি। এয়োদশ শতাব্দী থেকে মুসলিম শাসকদের সঙ্গে দহরম মহরম করা হিন্দু অভিজাতরা এ খাবার চেখে দেখেছে বটে কিন্তু সে সময় ওই পোলাও, বিরিয়ানি, কাবাব, কোফতা, কালিয়া ইত্যাদি বর্ণ হিন্দুরা বর্জন করেছে। এর গন্ধ শুঁকলেও ব্রাহ্মণের জাত

যাবে এমন বিধানও দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু নিম্ন বর্ণের মধ্যে বহুদিন ধরে জনপ্রিয়তার পর এগুলো উচ্চ বর্ণেও গ্রহণযোগ্য হয়। পেঁয়াজ ও রসুন ওই তুর্কি-ইরানি খাবারের সঙ্গেই এসেছিলো, বেশ কিছু নতুন ফলও– তরমুজ আর আনার তার অন্যতম। পরে পর্তুগীজরা ব্রাজিল থেকে আরো কিছু নতুন ফল এখানে জনপ্রিয় করেছে সেটি আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি। অন্য ইউরোপীয় সব্জিগুলো আরো পরে এসেছে– আলু, টম্যাটো, ঢেড়স, ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি। দুগ্ধজাত খাবার প্রাচীন কাল থেকে নানা রকমের থাকলেও পনির জিনিসটি ইউরোপীয়রাই এনেছে।

গেরস্থালি, কাজ, উৎসবঃ

প্রাচীন কালের কথা যদি বলি তা হলে সম্পন্ন নাগরিকদের গেরস্থালির বর্ণনাটি সংস্কৃত সাহিত্যে বেশ খানিকটা এসেছে, সাধারণ মানুষেরটি তেমন আসেনি। আনুমানিক তৃতীয় শতাব্দীতে বাৎস্যায়নের লেখা সংস্কৃত গ্রন্থ কামসূত্রে বিলাসী নাগরিক বাড়ির বহির্ঘরের আসবাবের একটি বর্ণনা রয়েছে এরকম:

"বাইরের ঘরের যে বিছানাটি তা বেশ নরোম– মাঝের অংশটি নিচু দুই পাশে উঁচু তাকিয়া, তা সাদা চাদরে ঢাকা। তাছাড়া বসার একটি সোফাও রয়েছে। বিছানার মাথার দিকে একটি তাক আছে যাতে রাখা আছে গত রাতে তোলা ফুলের মালা, তেল, মোম, সুগন্ধি, লেবুর ছাল, আর সুপারি। হাতির দাঁতে তৈরি হাতল থেকে (সুর তোলার জন্য) একটি বাঁশি ঝুলছে, ছবি আঁকার জন্য একটি ইজেল আছে, আর পাশা খেলার বোর্ড।" বর্ণনাটি ঠিক বাংলা অঞ্চলের নয়, তবে কাছের– কারণ বাৎসায়ন খুব সম্ভব পাটলিপুত্র নগরেই বাস করতেন।

১১৪৯ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একটি তামার পাতের (ভাটেরা তামার পাত) ভাষ্য অনুযায়ী একটি ধনী গৃহে আছে অন্দরমহল (বস্তি), বাইরের ঘর (বার গৃহ), রান্নাঘর (পাকাদি গৃহ) এবং গোয়াল ঘর (গো-গৃহ)। একই সময়ের প্রান্তিক মানুষের বাড়ির যেটুকু বর্ণনা চর্যাপদে দেখা গেছে তাতে সেই বাড়ি নেহাৎ একটি ঝুপড়ি মাত্র। শুধু তাই নয়, তাদেরকে থাকতে হয় ইঁদুরের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে, যে ইঁদুর তার আহারের ধান খেয়ে ফেলে বলে চর্যাপদে সে ইঁদুরের কাছে মিনতি করে,

নিসিও আঁধারি মুসা চতারা
আমিও ভোখোয়া মুসা করও আহার।

আজকের বাংলায়:

রাতের আঁধারে মুষিক তুমি দেখা দাও
আমাকে ভুখা করে তুমি আহার কর।

বাংলার নানা যুগের মন্দির, বৌদ্ধ বিহার ইত্যাদিতে যে প্রচুর পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে তার চিত্রায়নে সমসাময়িক কালের দৈনন্দিন জীবন অনেক ক্ষেত্রে ফুটে ওঠেছে। এমন ফলক খৃষ্টীয় যুগের একেবারে প্রথম থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ের পাওয়া গেছে। যেমন দ্বিতীয় শতাব্দীতে তৈরি চন্দ্রকেতু গড়ের একটি ফলকে দেখা যাচ্ছে তিন জন কারিগর পাশাপাশি কাজ করছে। তারা আঁশ জাতীয় কিছু পাকিয়ে দড়ি তৈরি করছে এবং তা স্তূপাকারে সামনে মেঝেতে জড়ো করছে। একই সময়ের আরেকটি ফলকে দেখা যাচ্ছে যে খুব পরিপাটি সাজা গৃহকত্রীর সঙ্গে কয়েকজন পরিচারিকা তারাও খুব পরিপাটি করে সাজা– শুধু তাদের অপেক্ষাকৃত ছোট আকার দেখে মনে করা যায় যে ওরা পরিচারিকা।

উৎসবের দৃশ্য পেতে চাইলে বেশি প্রাচীন কালে শুধু পোড়ামাটির ফলকের ওপর নির্ভর করতে হয়। বাজনা বাদক, গায়ক-গায়িকা, নর্তক-নর্তকীদের মিছিল বিভিন্ন কালের ফলকে দেখা যায়। দ্বিতীয় শতাব্দীর চন্দ্রকেতু গড়ের ফলকে এরকম যেমন আছে তেমনি অষ্টম শতাব্দীর নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে সোমপুর বিহারের ফলকেও আছে। কিছু ফলকে খেলাধূলার ছবিও দেখা যায় বিশেষ করে বাইরের খেলায় কুস্তি ও লাঠি খেলা, আর ঘরের খেলায় দাবা ও সতরঞ্জ।

মধ্য যুগ থেকে ফলকের পাশাপাশি সাহিত্যেও উৎসবের বর্ণনা মেলে। গীত গোবিন্দের বর্ণনায় সখীদের সঙ্গে রাধার নৃত্য নিয়ে রামলীলা উৎসবটি ফুটে ওঠেছে। এরকম নানা বর্ণনা থেকে বোঝা গেছে রামলীলায় ধর্মীয় শোভাযাত্রা হতো যাতে রাধা আর সখিদের এই নাচের দৃশ্যটি নিয়মিত অভিনীত হতো। এমন শোভাযাত্রায় রামায়ন-মহাভারতের নানা দৃশ্যও নাচ-গানের সঙ্গে অভিনীত হতো। মধ্য যুগের শেষের দিকের সাহিত্যে নানা উৎসব উপলক্ষে এমনি শোভাযাত্রায় ধর্মীয় উপাখ্যানের দৃশ্যের সঙ্গে বহু স্থানে স্থানীয় জনপ্রিয় প্রেম কাহিনীর দৃশ্যও অভিনীত হতো। তখন এর সবগুলোকে 'যাত্রা' বলা শুরু হলো– শোভাযাত্রায় অভিনীত হয় বলে। যেমন বেহুলা আর লখিন্দরের যাত্রা সে সময়ের একটি জনপ্রিয় যাত্রা। আরো পরে স্থির কেন্দ্রীয় মঞ্চে এর অভিনয় শুরু হল দর্শকরা মঞ্চকে ঘিরে চারিদিককে বসে যাত্রা দেখতো। এরকম মঞ্চের যাত্রার শুরুটি হয়েছে খুব সম্ভব ১৫০০ খৃষ্টাব্দের দিকে শ্রী চৈতন্যের প্রভাবে। তাঁর নিজের অংশ গ্রহণের রাধা-কৃষ্ণের যাত্রার কথা সাহিত্যের বিবরণীতে রয়েছে।

পোড়া মাটির ফলকের চিত্রণ থেকেই জানা যাচ্ছে যে খৃষ্টীয় কালের শুরু থেকে একেবারে আধুনিক কাল পর্যন্ত সাধারণ মানুষের চলাচলের বাহন ছিল স্থলে গরুর গাড়ি আর পানিতে নৌকা। খুব অভিজাতদের ক্ষেত্রে পালকিতে বা ঘোড়ায় চড়ে যাবার দৃশ্য আছে, তবে তা বিরল। অভিজাতদের নৌকা হতো পান্‌সি, বজরা, আর বাকিদের জন্য ডিঙ্গি অথবা ডোঙ্গা।

পোষাকঃ

পোড়া মাটির ফলকে অন্য যে কোন দৃশ্য দেখাতে স্ত্রী বা পুরুষকে যখন দেখানো হয়েছে অনেকগুলোতে পোষাকটি স্পষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয় শতাব্দীর চন্দ্রকেতু গড় ফলকে পুরুষদের পোষাকে দেখা যায় মাথায় পাগড়ি, গায়ে উত্তরীয় এবং পরনে খাটো ধূতি। স্ত্রী পোষাক প্রায় অভিন্ন। গায়ক গায়িকা উভয়ের অলঙ্কারও কম নয়– কানে কুন্তল, গলায় হাঁসুলি, হাতে বালা। নর্তকীর কোমরে কোমরবন্দ বেশ জমকালো। বিভিন্ন কালের পোড়ামাটির ফলকে এমনিই প্রায় দেখা যায়– যেমন অষ্টম শতাব্দীর শুরু থেকে বৌদ্ধ বিহারগুলোতে ফলকে। পোষাকের বড় পরিবর্তন ঘটেছে মুসলিম শাসকরা আসার পর– তখন হিন্দু-বৌদ্ধ অভিজাতরাও মুসলিমদের মত পোষাক পরতে আরম্ভ করেছে– পুরুষদের পাজামা, লম্বা কোর্তা, মাথায় পাগড়ি, পায়ে সুদৃশ্য জুতা; আর মহিলাদের সালোয়ার, কামিজ, ওড়না। সাহিত্যের বর্ণনা থেকে এসব আরো ভাল জানা যায়। মধ্যবিত্ত হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম সবাইও এরকম পোষাকই পরতো যদিও মহিলাদের মধ্যে শাড়িও দেখা যায়। নিম্নবিত্ত পোষাক প্রায় আগের মতই পুরুষরা ধূতি ও জামা, মহিলারা শাড়ি যা প্রায়ই জামা ছাড়া, যদিও কেউ কেউ ব্লাউজের মত খাটো জামা পরা। গরিব মুসলিম পুরুষের মধ্যে ফতুয়া-লুঙ্গির প্রচলনও দেখা যায়, কখনো মাথায় টুপি।

সাহিত্যে যেখানে চট্টগ্রাম অঞ্চলের পোষাকের বর্ণনা পাওয়া গেছে সেখানে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা গেছে। এখানে ধনী গরিব সব মুসলিম মহিলাদের লুঙ্গির মত থামির প্রচলন ছিলো। উর্ধাঙ্গে তারা সুদৃশ্য চাদর পরতো। বৌদ্ধ মহিলাদেরকে বর্মীদের মত এরকম থামির সঙ্গে খাটো ব্লাউজ পরতে দেখা যেতো।

বাণিজ্যের মাধ্যমে বিশ্ব যোগাযোগ

আমদানী রফ্‌তানীঃ

বাংলার দূর বাণিজ্যের প্রাচীনতম খবর পাওয়া যায় পরোক্ষ ভাবে রোমান ঐতিহাসিকদের বর্ণনায়। এতে মনে হয় খৃষ্টীয় যুগের আগে আগে এখানে দক্ষিণ

পূর্ব এশিয়া থেকে (মালয়) টিন আমদানী করা হতো ব্রোঞ্জ তৈরির জন্য। ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল থেকে ঘোড়া আমদানী করা হতো যার এক অংশ আবার বাইরে রফতানী হয়ে যেতো। আর নিজের পণ্যের মধ্যে রফতানী হতো ধান আর কার্পাস বস্ত্র। এর পরের শতাব্দীগুলোতে বহির্বাণিজ্যের বাড়তি সাক্ষ্য পাওয়া গেছে বড় গোল সীল মোহর আকৃতির পোড়া মাটির ফলকের কিছু চিত্রে। এতে দেখা যায় মাস্তুলসহ জাহাজ, তার ওপর ঘোড়া, অথবা ঘোড়ায় চড়া মানুষ– মনে হয় জাহাজে ঘোড়া পরিবহনের ব্যাপারটিই বোঝানো হয়েছে। মুদ্রার প্রাপ্তিও এক্ষেত্রে একটি ভাল সাক্ষ্য। বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর গ্রীক-ব্যাকটরীয় রাজ্যের সোনার ও রূপার মুদ্রা পাওয়া গেছে। এই রাজ্য ভারতের একেবারে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পর তাঁর সেনাপতিদের স্থাপিত। এর পরের শতাব্দীতে ওই অঞ্চল ও আফগানিস্তানের খানিকটা নিয়ে যে কুষাণ সাম্রাজ্য তার সোনার, রূপার ও তামার মুদ্রা বাংলায় প্রচুর পাওয়া গেছে। এগুলো ওই অঞ্চলের সঙ্গে নিয়মিত আমদানী-রফতানীর সম্পর্কের লক্ষণ। এ বাণিজ্য স্থল পথে চলেছে, তবে বেশির ভাগ বহির্বাণিজ্য ছিল সমুদ্র পথে। আর এর জন্য প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত সমুদ্র-বন্দরের।

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে ফাসিয়েন, য়ূয়ান জাং এবং ইজিং এর তিনজন চীনা পরিব্রাজক বাংলায় এসেছেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই সে সময়ের এখানকার ব্যস্ত বন্দর তাম্রলিপ্তির (বর্তমান পশ্চিম বঙ্গে তমলুক) কথা উল্লেখ করেছেন। মনে হয় এই নদী বন্দরটি সে সময় সাগরের সঙ্গে খুব ভালভাবে সংযুক্ত ছিল। কিন্তু ওই সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই বাংলার একেবারে পূর্বের অঞ্চলের একটি বন্দরের কথার উল্লেখ পাওয়া গেছে চীনা বর্ণনায় হোলাইকালো নামে। খুব সম্ভব শব্দটি হরিকেল, এবং তখনকার হরিকেল রাজ্যের চট্টগ্রামকে বোঝাতে চেয়েছে। প্রায় ওসময় থেকেই চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে পড়েছিলো বিশ্বের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগের দূয়ার। সমুদ্র বন্দর হিসেবে তাম্রলিপ্তির গুরুত্ব তখন দ্রুত হ্রাস পায়।

চট্টগ্রাম বন্দরের উত্থান:

সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত তাম্রলিপ্তি এবং তার পর থেকে চট্টগ্রাম দিয়ে এই যে সামুদ্রিক বহির্বাণিজ্য তার ওঠানামা সম্পর্কে একটি আন্দাজ পাওয়া যায় বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত হয়েছে এমন মুদ্রার প্রাপ্তির থেকে। সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত এমন মুদ্রার পরিমাণ সারা বাংলায় খুব উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে

গিয়েছিলো- যা ওসময় বহির্বাণিজ্য হ্রাসের একটি লক্ষণ হতে পারে। বাংলার ও আশপাশের নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য অবশ্য প্রধানত চলতো সরাসরি পণ্য বিনিময় আর কড়ির মাধ্যমে। সেই কড়ি আবার আসতো মালদ্বীপ থেকে। পাল ও পরে সেন রাজত্বেই মুদ্রার এই কমতি দেখা যায়, অথচ তার আগে সেই গ্রীক-ব্যাকটেরীয় আর কুষাণ মুদ্রার কাল থেকে শুরু করে নানা সময়ের বহু মুদ্রা বাংলার নানা অঞ্চলে পাওয়া গেছে; এমন মুদ্রার হুবহু অনুকরণ করে সোনা ও রূপার মুদ্রা এখানকার টাকশালেও তৈরি হয়েছে। আরাকানের চন্দ্র বংশীয় রাজাদের মুদ্রাও পূর্বাঞ্চলে সমতট ও হরিকেলে পাওয়া গেছে, আরো আগের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর গুপ্ত সাম্রাজ্যের মুদ্রা এবং গুপ্ত যুগের অবসানে বাংলার স্বাধীন রাজা শশাঙ্কের নামাঙ্কিত মুদ্রাও। সাধারণ ভাবে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় হরিকেলে ওসব মুদ্রা বেশি পাওয়া যাওয়াতে মনে করা হয় সপ্তম শতাব্দীর আগে উল্লেখ না পাওয়া গেলেও চট্টগ্রাম বন্দর তখনো সক্রিয় ছিল। সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীতে পাল রাজত্বে মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতার সময়ে হরিকেল-সমতটে তা অপেক্ষাকৃত বেশি পাওয়া গেছে। দশম শতাব্দী থেকে প্রধানত আরবী ও ফারসি ভাষায় লেখা সমসাময়িক ইতিহাস বর্ণনা থেকে মনে হয় বহির্বাণিজ্যের ওই মন্দা কেটে গিয়েছিলো। এর মধ্যে ১১৬০ সালের দিকের আল ইদ্রিসের লেখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ও অন্যান্য লেখকদের থেকে জানা যায় যে খুবই উচ্চ মানের কার্পাস বস্ত্র ও যুদ্ধের ঘোড়া তখন চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে প্রচুর রফতানী হয়েছে। তা ছাড়া আর তিনটি অদ্ভুত পণ্য রফতানীর কথা উল্লেখ আছে- গণ্ডারের খড়্গ, সুগন্ধি অগুরু কাঠ, এবং চমরি গাইয়ের লেজের লোম দিয়ে তৈরি চামর (বাতাস করার জন্য বড় পাখা)। এর মধ্যে মিহি কার্পাস বস্ত্র ছাড়া বাকি সবই বাইরে থেকে এনে রফতানী করা। শেষের তিনটি বিলাস সামগ্রীর পর্যায়ে পড়ে। গণ্ডারের খড়্গ খুব সম্ভব আসাম ও কামরূপ অঞ্চল থেকে আসতো– এটি পুরুষত্ব বৃদ্ধিকারী এমন ধারণার কারণে বহু দেশে খুবই মূল্যবান ছিল। চমরি গাই মূলত তিব্বতের প্রাণী– উত্তর পূর্ব ভারত হয়ে চট্টগ্রামে আসতো। অগুরু কাঠ আসাম থেকে নদীতে ভাসিয়ে আনা হতো। ও সময়ে বহির্বাণিজ্যের বড় অংশটাই হতো আরব বণিকদের মাধ্যমে– তাই চট্টগ্রাম বন্দরে ছিল তাদের প্রচুর আনাগোনা। আরবদের জাহাজ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মালাক্কা-সুমাত্রা থেকে সিংহল, ভারতীয় উপকূল ও মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ইউরোপে পর্যন্ত যাতায়াত করতো। এই পথে চট্টগ্রাম ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য।

দশম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে আরব বণিকদের মাধ্যমে আমদানী রফ্তানীর যে খতিয়ান পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় যে এটি শুধু বাংলার জন্য নয় ভারতবর্ষের ও তার বাইরেরও একটি বড় অঞ্চলের জন্য বন্দর হিসেবে কাজ করছে– যার বাণিজ্য-পণ্যগুলো অধিকাংশ বাইরে থেকে এখানে আনা হয়েছে শুধু বন্দর সুবিধা পাওয়ার জন্য– অনেকটা আজকের সিঙ্গাপুরের মত। এখানে আরবদের এই একচেটিয়া সমুদ্র বাণিজ্যে অন্যের ভাগ পড়েছিলো আরাকান রাজের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে পর্তুগীজরা এখানে আসার পর থেকে। আরব ও পর্তুগীজ উভয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল মালয়-ইন্দোনেশিয়া থেকে আসা মশলার বাণিজ্য আর বাংলার ধান ও মিহি কার্পাস বস্ত্রের। এসব পণ্য মধ্যপ্রাচ্য আর ইউরোপে নেয়া ছিল একটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। মনে রাখতে হবে সেদিনের পালতোলা জাহাজে এই দীর্ঘ সমুদ্র পথ পাড়ি দেয়া জাহাজ নির্মাণে ও চালনায় অত্যন্ত অভিজ্ঞদের পক্ষেই শুধু সম্ভব ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামে মোগল রাজত্ব চূড়ান্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার আগে পর্যন্ত বেশ কিছুটা সময় এই বন্দরকে একটি বড় কলঙ্ক বহন করতে হয়েছে, তা হলো দাস ব্যবসার জন্য এটি ব্যবহৃত হওয়া। পর্তুগীজ ও আরাকানী জলদস্যুরা বাংলার পুরো উপকূল এলাকার যে কোন জায়গায় ইচ্ছেমত হানা দিয়ে অসহায় গ্রামবাসী নারী-পুরুষ-শিশুদেরকে ধরে এনে দাস হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয় করতো। এই জঘন্য কাজের সামনের দিকে জলদস্যুরা থাকলেও এর ব্যবসার পেছনে ছিল পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ ও ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, যারা তখন আরাকানী শাসকদের সহায়তায় চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ন্ত্রণ করতো।

সংঘাতে সন্ধিতে চট্টগ্রাম

আদি শাসকরা

খৃষ্টজন্মের কয়েক শত বছর আগে মৌর্যরা যখন প্রায় পুরো উত্তর ভারত নিজেদের দখলে এনেছিলো তার ভেতর চট্টগ্রাম ও তার আশপাশের অঞ্চল ছিলনা। একই ভাবে খৃষ্টজন্মের কয়েকশত বছর পর গুপ্ত সাম্রাজ্য যখন প্রায় একই জায়গায় বিশাল শক্তিশালী সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলো চট্টগ্রাম খুব সম্ভব তার মধ্যেও ছিলনা। আসলে খুব মোটা দাগে বর্তমান ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের সঙ্গে কুমিল্লা-নোয়াখালীকে নিলে যা দাঁড়ায় তা তখন ছিলো সমতট রাজ্য, আর চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম পুরোটা নিয়ে ছিলো তখনকার হরিকেল রাজ্য। ওই ভারতীয় বিশাল সাম্রাজ্যগুলোর জন্য সমতট ও হরিকেল উভয়েই ছিল প্রত্যন্ত দুর্গম জায়গা– দখলে রাখা কঠিন। তাই মৌর্য সম্রাট অশোকের বাণী উৎকীর্ণ করার লিপিকাররা এখান পর্যন্ত আসেননি; আর গুপ্ত সম্রাটদের নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা ঢাকায়, কোটালিপাড়ায়, কুমিল্লায়, চান্দিনায় পাওয়া গেলেও এ জায়গা বড় জোর গুপ্তদের প্রান্তিক করদ রাজ্য ছিল– হরিকেল হয়তো তাও ছিলনা। যা বোঝা যায় সমতট আর হরিকেল তখন থেকেই মোটামুটি স্বাধীন রাজাদের শাসনেই ছিল; আর গুপ্ত সাম্রাজ্যের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোর প্রতিষ্ঠাও খুব সম্ভব এখানে বেশি কার্যকর হয়নি। সমতটে সপ্তম শতাব্দীতে খড়্গ বংশীয় রাজারা শাসন করেছেন প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা করে, তারপর থেকে রাত, নাথ, দেব, এবং চন্দ্র বংশীয়রা এখানে শাসন করেন। ওই দেবদের শাসন প্রসঙ্গেই প্রথম হরিকেলের কথাটি উঠে আসে, এবং চট্টগ্রামের উল্লেখ ইতিহাসে আসে। এর কারণ দেব বংশীয় কয়েকজন রাজা হরিকেল জয় করে তা শাসন করেন। এ ইতিহাসের শুরুতে শুধু এইটুকু প্রতিষ্ঠিত যে এখানে তখনকার রাজারা বৌদ্ধ ধর্মকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন– যে রকম সমতটেও দেব বংশ ও চন্দ্র বংশের রাজারা দিয়েছিলেন। চীনা পরিব্রাজকদের লেখায় সপ্তম শতাব্দীতে এসময়েই হরিকেল নাম দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের কথাটিও প্রথম দেখা যায়।

এরপর দশম শতাব্দী নাগাদ হরিকেলের শাসন চলে যায় আকর বংশীয় রাজাদের হাতে যারা একদিকে আরাকান ও অন্যদিকে ত্রিপুরা (বাংলাদেশের কুমিল্লা ও ভারতের ত্রিপুরা নিয়ে) পর্যন্ত পুরো ভূখন্ড এক শাসনে এনেছিলেন। আরাকানের

সঙ্গে চট্টগ্রামের একত্র শাসন অবশ্য এই প্রথম নয়। পরিব্রাজকদের বর্ণনায় উভয়কে এক সঙ্গে উল্লেখ করা, হরিকেলের মুদ্রার লেখার সঙ্গে আরাকানের একটি আলেখ্যের অক্ষর শৈলীর মিল, ইত্যাদি সাক্ষ্য-প্রমাণে এর আগেও উভয়ের একত্র শাসনের দিকে ইঙ্গিত করে। যেটি মোটামুটি স্পষ্ট তা হলো অন্তত সপ্তম শতাব্দী থেকেই চট্টগ্রাম কখনো আরাকানের রাজার কর্তৃত্বের প্রভাবের, আবার কখনো হরিকেল-ত্রিপুরা-সিলেট অঞ্চলে কর্তৃত্ব বিস্তারকারী রাজাদের প্রভাবের মধ্যে ছিলো। নবম শতাব্দীর তিব্বতী লেখক লামা তারানাথ চট্টগ্রামে তখন একটি স্বাধীন পৃথক বৌদ্ধ রাজত্বের বর্ণনা দিয়েছেন, যার রাজার নাম ছিল গোপীচন্দ্র।

বাংলায় সেন শাসকরা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠলে তখন অল্প কিছুদিনের জন্য তাঁদের রাজত্ব হরিকেল পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং এখানেও সেনদের ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য অল্প কিছুদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু সেটি বেশি স্থায়ী হয়নি। বখতিয়ার খিলজির বাংলা আক্রমণের পর থেকে এয়োদশ শতাব্দীতে গৌড়ে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা ক্রমে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও বিস্তার পায়– বাংলায় সুলতানী আমল শুরু হয়ে যায়। এক সময় ঢাকার কাছে সোনাগাঁওকে রাজধানী করে স্বাধীন মুসলিম সুলতানরা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তখনো সে শাসন চট্টগ্রামে পৌঁছতে পারেনি। মুসলিম শাসন দেরিতে পৌঁছলেও মুসলিম প্রভাব ও মুসলিম জনসংখ্যা যে চট্টগ্রামে অনেক আগে থেকে ছিল, এবং তা আরাকানেও যে ছিল, সেটি আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি।

আরাকান রাজের সুলতানী ভাব

১৩৪০ সালে সোনারগাঁওয়ের স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ চট্টগ্রাম দখল করেন। তিনি রাজধানী থেকে চট্টগ্রাম শাসন সহজ করার জন্য চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রামে রাস্তা নির্মাণ করান। নদী বন্দর চাঁদপুরের সঙ্গে সোনারগাঁওয়ের সহজ নৌ-যোগাযোগ ছিল। এ সময় থেকে চট্টগ্রামে সুলতানী স্থাপত্যের মসজিদ সহ নানা সুলতানী নিদর্শন সৃষ্টি শুরু হয়। কিন্তু সুলতানদের পক্ষে চট্টগ্রাম শাসনের কাজটি মসৃণ হয়নি, একটানা সত্যিকার অর্থে সম্ভবও হয়নি। এর কারণ আরাকান রাজ্যের প্রভাব।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের সময়টি ছিল আরাকান রাজের নিজের জন্য অস্থিত্ব রক্ষার সংগ্রামের কাল। তবে একই সঙ্গে তাকে চট্টগ্রামের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার লক্ষ্যে এখানে একটি সীমান্তবর্তী লড়াই সব সময় চালিয়ে যেতে

হচ্ছিলো। অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপারটি ছিলো বার্মায় তখন প্রতাপশালী দুটি রাজ্য ছিল আভা এবং পেগু। উভয়েই চাচ্ছিলো যে আরাকান সহ পুরো বার্মা জুড়ে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করবে। দুই রাজ্যের লোলুপ দৃষ্টি তাই আরাকানের ওপর ছিল। আরাকান নিজে কিন্তু বার্মার মূলস্রোতের বর্মী ঐতিহ্যের কোন অঞ্চল ছিলনা– আরাকানের ছিল নিজস্ব ভাষাগত ও নৃতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র; ধর্মের দিক থেকে বৌদ্ধ প্রধান হলেও স্থানীয় ঐতিহ্যের মুসলিমরাও তার জনগোষ্ঠির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আর তাদের অধিকাংশের ভাষা ছিল রোহিঙ্গ্যা বৈশিষ্টময় চাটগেঁয়ে।

সীমান্তবর্তী সংগ্রামটি ছিল একদিকে বাংলার সুলতানী শাসকের সঙ্গে অন্যদিকে স্থানীয় কিছু ভূস্বামী ছোট রাজাদের সঙ্গে। আরাকান-রাজ ও সুলতানের মধ্যে সার্বক্ষণিক সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে ত্রিপুরা, কামরূপ, যশোরের ভূস্বামী রাজারা অনেক সময় নিজেদের মধ্যে নানা রকম সমীকরণ সৃষ্টি করে চট্টগ্রামকে অস্থির করে রাখছিলেন। এজন্য একটি দীর্ঘ সময় চট্টগ্রাম হয়ে পড়েছিলো এই অস্থির দড়ি টানাটানির লক্ষ্য। এর ফলশ্রুতি হয়েছিলো এমন যে সুলতান বা আরাকান রাজ কেউ সত্যিকার অর্থে চট্টগ্রাম শাসন করতে পারছিলেন না। তবে ১৪২৬ সালের মধ্যে আরাকান রাজ নরোমেখলা আভা ও পেগু উভয় রাজ্যকে পর্যদস্ত করে আরাকানের স্বাধীনতা চূড়ান্ত ভাবে রক্ষা করতে সমর্থ হন, এবং চট্টগ্রামেও এরপর থেকে প্রধান প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন। তিনি বাংলার সুলতানের সঙ্গে আপাতত চট্টগ্রাম বিষয়ে রফা করলেন সুলতানের মুখরক্ষার ব্যবস্থা করে। চট্টগ্রাম থেকে কিছু দূরে উপকূলের কিছু অংশ ছেড়ে দিয়ে সুলতানের সঙ্গে সন্ধি করা হলো। আরাকান রাজ নিজেকে নামেমাত্র সুলতানের করদ রাজ্য শুধু ঘোষণা করলেননা, বরং নিজেও যথেষ্ট সুলতানী ও ইসলামী কায়দা গ্রহণ করলেন। কিন্তু এর বেশির ভাগই ছিল উপরিকাঠামোর বিষয়– কার্যত চট্টগ্রামের নিয়ন্ত্রণ রইলো আরাকান রাজ্যের কাছে, যার বৌদ্ধ সংস্কৃতি অব্যাহত ছিল।

আরাকানের মুসলিম ঐতিহ্য, মুসলিম জনগোষ্ঠি আগে থেকেই ছিলো। এখন আরাকান রাজ নিজে সেই ব্যাপারটিকে আনুষ্ঠানিক মর্যাদা দিলেন। নরোমেখলার পরের রাজারাও তাই করে গেলেন– নিজেরা একটি বাড়তি মুসলিম সুলতানী নাম নিলেন, নিজেদের মুদ্রায় নামাঙ্কিত করলেন এক পিঠে আরাকানী-বর্মী লিপিতে আর অন্য পিঠে আরবী ও বাংলা লিপিতে। এভাবে আরাকান রাজ মিন শও মোনের অন্য নাম হলো সুলাইমান শাহ। আর এক রাজা সলিম শাহ তাঁর মুদ্রার এক পাশে আরবী লিপিতে উৎকীর্ণ করলেন– 'মালিক উল আদিম সলিম শাহ

সুলতান', আর বাংলা লিপিতে 'ধবল গজেশ্বর শ্রী শ্রী সলিম শাহ'। বাংলায় তিনি নিজেকে এভাবে সাদা হাতীর অধিপতি বলে পরিচয় দিলেন। এভাবে পরপর রাজারা নাম গ্রহণ করলেন ইলিয়াস শাহ সুলতান (১৫২৩-২৫), আলী শাহ (১৫২৫-৩১), সিকান্দার শাহ (১৫৭১-৯৩), হোসাইন শাহ (১৬১২-২০); এমনকি একজন আরাকান রাজ তাঁর মুদ্রায় কলেমা লিপিবদ্ধ করে কলেমা শাহ বলেও পরিচিত হলেন। আরাকান রাজসভায় চট্টগ্রামের বাংলা সাহিত্যিকরা স্থান পেলেন, বাংলা সাহিত্য রীতিমত রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা পেলে কোন কোন বাংলা সাহিত্যিক তাঁদের পুরো সাহিত্যিক জীবন ওখানেই কাটালেন। চট্টগ্রাম থেকে যাওয়া অনেক শিক্ষিত মুসলিম আরাকান রাজ সভায় নানা পদে অধিষ্ঠিতও হলেন। কিন্তু এর কারণে চট্টগ্রামে আরাকানী নিয়ন্ত্রণের কোন কম্‌তি হলোনা, পুরো চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চল বিশেষ করে বন্দর ও উপকূলীয় সকল অংশের ভাগ্য নিয়ন্তা হিসেবে কার্যত আরাকানীরাই রইলো। অথচ এখানে যে আরাকানী ও বর্মী জলদস্যুবৃত্তি দুঃসহ হয়ে ওঠেছিলো তার দমনের কোন চেষ্টা তাদের দিক থেকে দেখা গেলোনা– বরং অনেক সময় আরাকানী শাসন ও দস্যুবৃত্তি একাকার হয়ে যাওয়ার প্রবণতাটাই বেশি দেখা গেলো।

রাজা নরোমেখলা তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন মারুক-উ শহরে যা পরবর্তী রাজধানী আকিয়াবের (বর্তমান সিৎওয়ে) খুব কাছে। এর প্রায় দুশ' বছর পর ১৬৩৫ সালে বিখ্যাত আরাকান রাজ থুধাম্মার সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে এ শহরে যে উৎসব হয়েছিলো তাতে যোগদান করেছিলেন ইউরোপীয় পরিব্রাজক সেবাস্টিয়ান আনরিক। তিনি শহরটির সৌন্দর্যের ভূয়ষী প্রশংসা করে লিখে গেছেন। এই সেই রাজা থুধাম্মা যাঁর প্রশস্তি গেয়ে কবি সৈয়দ সুলতানের কবিতা আমরা দেখেছি। আজও এ শহরের ধ্বংসাবশেষ বিশেষ করে এর প্যাগোডাগুলোর সৌন্দর্য দেখার জন্য প্রচুর পর্যটক ওখানে যান। বোঝা যাচ্ছে স্বাধীন সত্তা নিশ্চিত করা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের কর্তৃত্ব অর্জন আরাকানকে বেশ সমৃদ্ধশালী করে তুলেছিলো।

বাংলার সুলতানদের সঙ্গে তাঁদের সন্ধিটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত টেকেনি। নরোমেখলার কিছু পরের আরাকান রাজ বাসাওপিউ ১৪৬০ সালে চট্টগ্রামের ওপর তাঁর একক কর্তৃত্ব স্থাপন করেন, এবং তার পর পাকা দুশ' বছর এটি কার্যত আরাকানের শাসনেই ছিল– কখনো কখনো বাংলার সুলতান ও অন্যরা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করলেও। সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগেই এটি সম্ভব

হয়েছিলো। এই কর্তৃত্ব প্রায় একটানা বজায় থাকে ১৬৬৬ সালে মোগলরা অবশেষে চট্টগ্রাম দখল করতে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত।

সুলতানের করদ রাজ্য নামে মাত্রও না হবার সুযোগে আরাকান রাজের সুলতানী ভাব, বা আরাকান রাজ্যের বৌদ্ধ-মুসলিম মিশ্র সংস্কৃতি কি বদলে গিয়েছিলো? না, তা মোটেই হয়নি, বরং চট্টগ্রামের কারণে সেটি আরো বেড়েছে। আরাকান রাজ দরবার একই সঙ্গে বৌদ্ধ, বাঙালী মুসলিম এবং পারসিক এই তিনটি সংস্কৃতি এক সঙ্গে ধারণ করে গেছে। অবশ্য এই সাংস্কৃতিক মিশ্রণ, এবং একক কর্তৃত্ব দুইয়ের কোনটাই চট্টগ্রামে এবং তার সংলগ্ন দক্ষিণ বাংলার উপকূল অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখতে পারেনি। এতে কখনো আরাকান রাজ সুলতানকে নস্যাৎ করতে পারতেন, আবার কখনো তা না পেরে সাময়িক ভাবে সুলতানের করদ বলে নিজেকে ঘোষণা করতেন। এই অশান্তিতে আরাকান রাজ আর বাংলার সুলতানই শুধু প্রতিপক্ষ ছিলেননা। শক্তিশালী বর্মী রাজারা এবং ত্রিপুরার হিন্দু রাজারাও এই সংঘর্ষে সুযোগ পেলেই যোগ দিতেন এবং এই সব পক্ষের মধ্যে পরিবর্তনশীল নানা রকম সন্ধি-বিচ্ছেদ হতো। যেমন এরকম একটি সংঘর্ষে বর্মী রাজা ও ত্রিপুরার রাজা এক জোট হয়ে চট্টগ্রাম আক্রমণ করেছিলেন। বর্মী রাজা দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে বর্তমান টেকনাফ-কক্সবাজার হয়ে রামু পর্যন্ত পৌছেছিলেন, আর ত্রিপুরার রাজা সরাসরি চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে। কিন্তু আরাকান রাজ মিনবিন এই দুই সৈন্যবাহিনীকেই পরাজিত করে চট্টগ্রাম ত্যাগে বাধ্য করেছিলেন।

এসব সংঘর্ষ-সন্ধির মধ্যে সুশাসনের অভাব, দস্যুবৃত্তি এবং অস্থিরতা যখন নিত্য ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছিলো, এই সুযোগে আরেকটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের শক্তি এর ভেতর যোগদান করার মাধ্যমে পরিস্থিতিকে আরো ভয়াবহ এবং ঘোলাটে অবস্থার মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলো– তারা হলো পর্তুগীজ।

চট্টগ্রামে পর্তুগীজ

আরবী ফর্তুগীজ ওলন্দাজ ফরাসী মগ ইংরাজ
লেখি গেইয়ে চাডিগাঁইয়ার খত ইতিহাস।

এটি চট্টগ্রামের লোকগীতির দুটি ছত্র। যাদের কথা বলা হয়েছে তারা সবাই ইতিহাস না লিখলেও চট্টগ্রামের ইতিহাস গড়াতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ হাত আছে। আরবীরা গোড়ার দিকে এসে এখানকার ধর্মে ও জিন-সমগ্রে নতুন মিশ্রণ এনেছে, বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে চট্টগ্রামকে দাঁড় করিয়েছে। আরাকানী

অর্থে মগরা সব সময় ছিলো– এখানে কর্তৃত্ব করেছে, এখানকার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে অনেকটা অবদান রেখেছে, অন্য বেশ নিয়ে জলদস্যু হিসেবে উপকূলের ত্রাস হয়েছে। পর্তুগীজরা উল্কার মত এসে ১৫০০ থেকে ১৬৬৬ সাল এই দেড় শত বছরের মত এতসব কিছু প্রতিষ্ঠা করেছে যে চট্টগ্রাম ও উপকূলীয় দক্ষিণ বাংলার ওপর তাদের নানা সমৃদ্ধ চিহ্ন রেখে গেছে, আবার এমন সব ক্ষত রেখে গেছে যা শুকাতে বহুদিন লেগে গিয়েছে। পর্তুগীজদের আনুষ্ঠানিক পরিচয় এখানে বণিক ও জাহাজি আগন্তক হলেও তারা কিন্তু নানা পর্যায়ে এখানে শাসনও করেছে, কিছুটা অস্থায়ী ভাবে হলেও সন্দ্বীপ দ্বীপ, উপকূলীয় নানা স্থান ইত্যাদি কিছু কিছু জায়গায় অন্য রাজাদের মতই। চট্টগ্রাম বন্দর দীর্ঘকাল কার্যত তাদেরই কর্তৃত্বে ছিল। আর ওলন্দাজরা (ডাচ, হল্যান্ডের অধিবাসী) প্রায় একই সময় তাদের দোসর ও বাণিজ্য-প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে একই রকম কাজ করে গেছে, যদিও তারা ছিল নেহাত ছোট শরিক। লোকগীতিতে বলা হলেও ফরাসীদের অবশ্য তেমন ভূমিকা এদিকটায় দেখা যায়নি– যদিও বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে ও ভারতের অন্যত্র ছিল। ইংরেজরা দেখা দিয়েছে আরো বহু পরে।

চট্টগ্রামের দিক থেকে আরাকানীদের পরেই পর্তুগীজদের কার্যকলাপই সব থেকে বেশি ভূমিকা রেখে গেছে। ইউরোপের একেবারে দক্ষিণ পশ্চিমে স্পেনের অবস্থান যে আইবেরিয়া উপদ্বীপে তার একাংশে ছোট্ট একটি দেশ পর্তুগাল। কিন্তু প্রধানত নৌ-বিজ্ঞানে তাদের দক্ষতা এবং দুঃসাহসী সমুদ্র অভিযাত্রায় তাদের অভিজ্ঞতার কারণে এর বাসিন্দা পর্তুগীজরা ইউরোপের অন্যতম শক্তি ও উপনিবেশ স্থাপনকারী হয়ে দাঁড়িয়েছিলো মধ্য যুগে। ১৪৯২ সালে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর পর তারা দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে বিশাল উপনিবেশ স্থাপন করে এবং পৃথিবীর আরো অনেক জায়গায় পর্যায়ক্রমে তাই করে; আর এসবের মাধ্যমে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ অভিযাত্রী ভাস্কো ডা গামা পর্তুগাল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণতম প্রান্ত উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ছুঁয়ে উত্তর পূর্ব দিকে দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে পৌঁছে যান। এভাবে তিনি ভারতে আসার নিয়মিত সমুদ্র পথ আবিষ্কার করেন এবং ভারতের পশ্চিম উপকূলের খুব কাছে গোয়া এবং আরো কয়েকটি দ্বীপে পর্তুগীজ উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই উপনিবেশে এবং ভারতের অন্য কিছু বন্দর ও সিংহলে শক্তিশালী নৌসেনা উপস্থিতি এই পুরো অঞ্চলে পর্তুগীজদের একটি শক্তিজাল গড়ে তোলে– যার ফলে চট্টগ্রাম ও বাংলা উপকূলে কর্তৃত্ব করা তাদের

পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো। তাছাড়া এই শক্তি বলেই তারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মালাক্কা, সুমাত্রা, ও অন্যান্য নানা দ্বীপাঞ্চলের অত্যন্ত লাভজনক মশলার বাণিজ্য আরবদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় এবং ভারত মহাসাগরীয় অন্যান্য বাণিজ্যেও তাদের প্রাধান্য বিস্তার করে। এই অবস্থাতেই চট্টগ্রাম তাদের জন্য একটি খুবই সুবিধাজনক বন্দর ঘাঁটি হয়ে ওঠে, এবং চট্টগ্রাম, আরাকান, দক্ষিণ বাংলা উপকূল এবং বার্মা উপকূল তাদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে উঠ্‌তে পারে।

এই পুরো জায়গায় সাধারণ মানুষের কাছে পর্তুগীজরা পরিচিত হয়েছিলো হার্মাদ নামে, যা তাদের কাছে ছিল জলদস্যুর নামান্তর। হার্মাদ শব্দটি এসেছে পর্তুগীজ শব্দ আর্মাডা থেকে যার অর্থ নৌবহর। যদিও গোয়ায় এবং অন্যত্র পর্তুগীজ শাসনের একটি কর্তৃপক্ষ ছিল, এখানে পর্তুগীজরা দেখা দিয়েছিলো প্রধানত যুদ্ধবাজ নানা নৌ-কাপ্তানের নিজস্ব বাহিনী হিসেবে ও নিজস্ব বহর নিয়ে খেয়াল খুশির আক্রমণকারী হিসেবে– যখন যেখানে যেই রূপে সেই আক্রমণ সুবিধাজনক হয়। ওদের কেউ কেউ এখানে কাজ করেছে ভাড়াটিয়া নৌসেনা হিসেবে– যেই সব সর্বক্ষণিক যুদ্ধবিগ্রহ এখানে চল্‌ছিলো তার কখনো এপক্ষে কখনো ওপক্ষে যোগ দিয়ে। প্রয়োজনে অবশ্য পর্তুগীজ রাজকীয় নৌবাহিনীর সাহায্যও তারা গ্রহণ করেছে, যেখানে সম্ভব। অন্যরা একেবারেই জলদস্যুর মতই আচরণ করেছে– উপকূলের নিরীহ মানুষের ওপর লুটতরাজ, হত্যা, অপহরণ ইত্যাদিই ছিল যার প্রধান কাজ। ওই ভাড়াটিয়া নৌবাহিনী ও জলদস্যু হিসেবে হামলাবাজি করে অনেক সময় এক এক জায়গায় কিছু সময়ের জন্য তারা শাসকও হয়ে বসেছিলো।

এর একটি উদাহরণ দেয়া যাক। আরাকান রাজ মিনিয়াজাগে নিজের শক্তিতে এতটাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি খোদ পেগুর বার্মা রাজকে আক্রমণ করে বসেছিলেন ১৫৯৭ সালে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এভাবে আক্রমণের ওপর থাকলে বার্মা রাজ তাঁর স্বাধীনতা হরণ করার চেষ্টা নিতে ভয় পাবেন। এত বড় দুঃসাহসী কাজ করতে গিয়ে তিনি পর্তুগীজ ভাড়াটিয়া নৌ-শক্তির সাহায্য নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে মনে করলেন। এ কাজে তিনি ভাড়া করলেন একজন পরিচিত হামলাবাজ নৌ-কাপ্তান ফেলিপো দ্য ব্রিতোর বাহিনীকে। এ কাজে দ্য ব্রিতো বেশ সফল হওয়াতে তাঁর আকাঙ্খা বেড়ে গিয়েছিলো, তিনি এরপর তাঁর মিত্র আরাকান রাজের রাজত্বে থাকা অঞ্চলগুলোতে হামলা চালিয়ে লুটতরাজ শুরু করলেন। চট্টগ্রামের উপকূলের কাছের সন্দ্বীপ দ্বীপটি দখলই করে নিলেন। এবার আরাকান রাজের টনক নড়ে, কিন্তু দ্য ব্রিতো তখন যথেষ্ট

শক্তিশালী। তিন বছরের ক্রমাগত চেষ্টার পর আরাকান রাজ মিনিয়াজাগে দ্য ব্রিতোকে সন্দ্বীপ থেকে বিতাড়িত করতে পেরেছিলেন।

পর্তুগীজদের আরেকটি অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য চেহারা অবশ্য চট্টগ্রাম ও আনুসঙ্গিক অঞ্চলে ছিল– সেটি হলো বণিক রূপে এবং বৈধ একটি বিদেশি কর্তৃপক্ষ ও তার নানা সংস্থা হিসেবে। আরাকান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতায় ক্রমেই এটি চট্টগ্রাম বন্দরের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিলো এবং এখানে তাদের বড় ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপন করে। সে সময় পালতোলা জাহাজের যে নৌ-প্রযুক্তি তাতে পর্তুগীজদের দখল ছিল সব চেয়ে বেশি। আরবদের থেকে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য তাদের হাতে চলে আসার পর এখানকার বিপুল সংখ্যক বাণিজ্য জাহাজ তখন পর্তুগীজ জাহাজ। আসলে স্রেফ বাণিজ্য জাহাজ বলে তখন কিছু ছিলনা, প্রত্যেক জাহাজের সঙ্গে নৌসেনা, অস্ত্রশস্ত্র, এবং জাহাজের খোলের দুপাশে সারিবদ্ধ ছিদ্রের ভেতর দিয়ে বের করা কামানের সারি থাকতো, প্রত্যেক জাহাজে। জাহাজের নিরাপত্তার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। সামুদ্রিক আইন কানুনের বালাই ছিলনা বলে সমুদ্রের গহীনে যে কোন শত্রু দেশের বা প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের বাণিজ্য জাহাজ মুহূর্তের মধ্যে জলদস্যুর জাহাজ হিসেবে আচরণ করতে পারে; তাছাড়া আগাগোড়া সর্বত্র নির্ভেজাল জলদস্যুদের জাহাজ, নৌকা ইত্যাদিতো ছিলই। এরা যে কোন বাণিজ্য জাহাজ আক্রমণ করে, তার নাবিকদের হত্যা করে, সব মালামাল লুটে নিতে পারে, সে জাহাজ ডুবিয়ে দিতে বা জ্বালিয়ে দিতে পারে। কাজেই নিরাপত্তার খাতিরে এক একটি বাণিজ্য জাহাজ এক একটি যুদ্ধ জাহাজও ছিল বটে।

ফলে প্রধান নৌ-বাণিজ্য পর্তুগীজদের হবার মানে হলো নৌ-শক্তিও তাদের হাতেই ছিল। চট্টগ্রাম বন্দর তাই কার্যত পর্তুগীজ নৌসেনাদের দখলে ছিল। সেই সঙ্গে অবশ্য বিদেশি নৌ-বাণিজ্যের অন্য শরিক ওলন্দাজ কিছু জাহাজও সব সময় আসা যাওয়া করতো। কাছাকাছি সমুদ্র পথে ওলন্দাজ ও ইংরাজরা তখন অন্যতম প্রধান নৌ-শক্তি। ডাচ্ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে তখন ইন্দোনেশিয়ায় তাদের উপনিবেশের সুবাদে ওখানকার মশলা বাণিজ্যের প্রধান অংশ। এই কোম্পানী ভারত মহাসাগরের তীরের অন্যান্য বহু জায়গার সঙ্গেও বাণিজ্যে রত– ভারতীয় উপকূল, সিংহল ইত্যাদিসহ। পরে ইংরাজরাও একটি নৌ-শক্তি হিসেবে ক্রমেই এই অঞ্চলের বাণিজ্যে প্রবেশ করছিলো। তবে তখনই চট্টগ্রামে পর্তুগীজদের বাণিজ্য কেন্দ্রের পাশাপাশি ছোট শরিক হিসেবে ওলন্দাজদেরও বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। ব্যস্ত বন্দরে এই বিশাল সব পাল তোলা

জাহাজ থামানো, ভেড়ানো, নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা, অন্য জাহাজকে ধাক্কা না দিয়ে আসা বা যাওয়া, মাল ওঠানামা করা ইত্যাদির জন্য যেই প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন তা পর্তুগীজদের ছিল বলেই নিজগুণে ওরা বন্দরের দখল পেয়েছিলো– তাছাড়া অধিকাংশ জাহাজ তো তাদের ও ওলন্দাজদের। আরাকানী কর্তৃপক্ষের সাধ্য ছিলনা যে তারা নিজেরা একাজ করে বা পর্তুগীজদেরকে ক্ষমতা দেয়া থেকে বিরত থাকে। বন্দর কর্তৃপক্ষ হিসেবে পর্তুগীজদের অনুমতিক্রমেই দেশি বিদেশি সব জাহাজকে বন্দর ব্যবহার করতে হতো– এ জন্য বন্দর-করগুলো তাদেরকেই দিতে হতো।

চট্টগ্রাম বন্দরে যে একচেটিয়া তাদের কর্তৃত্ব এটি এখানে আসা সকল নৌযানের জন্য পর্তুগীজ কার্তেজ পদ্ধতি চালু থাকার মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। পর্তুগীজ নৌ-আধিপত্যের স্বীকৃতি হিসেবে ভারত মহাসাগরে চলাচল- কারী যে কোন জাহাজের এই কার্তেজ নামক লাইসেন্সিং পত্র বা অনুমতি পত্র থাকতে হতো যা গোয়ায় নৌ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে অর্থের বিনিময়ে দেয়া হতো। কার্তেজ শব্দটি এসেছে পর্তুগীজ শব্দ কার্তা বা পত্র থেকে। বিশেষ করে আরব, ভারতীয়, মালয়ী ইত্যাদি জাহাজের এই কার্তেজ থাকতেই হতো; সমুদ্রে পর্তুগীজ জাহাজের সাক্ষাতে এটি না দেখাতে পারলে জাহাজের মাল ক্রোক করা থেকে শুরু করে এটি ডুবিয়ে দেয়া পর্যন্ত সব সম্ভব ছিলো। যদিও বলা হতো যে এর বিনিময়ে ওই জাহাজকে জলদস্যুদের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা দেয়া হচ্ছে, চলাচলের পথে সুবিধা সৃষ্টি করা হচ্ছে– ওসব ছিল কথার কথা। আসলে এটি পর্তুগীজদের একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারকে জবরদস্তি ভাবে স্বীকার করানো ছাড়া আর কিছু নয়। কার্তেজধারী ওই জাহাজকে তার বাণিজ্যলব্ধ লাভের ২০% পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষকে দিতে হতো। বিশেষ করে পর্তুগীজ কর্তৃত্বে থাকা বন্দরে আসার সময় এই কর আদায় করা হতো কার্তেজ পদ্ধতিতে। চট্টগ্রাম বন্দরে এটি থাকার মানেই হলো এই বন্দরও পর্তুগীজ শক্তির সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের মধ্যে ছিল।

চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর পর্তুগীজ কর্তৃত্বের একটি সুফল হয়েছিলো যে এটি সমসাময়িক দৃষ্টিতে একটি আধুনিক বন্দর হিসেবে গড়ে উঠতে পেরেছিলো। এখানে এবং পুরো চট্টগ্রাম উপকূল ও নোয়াখালী উপকূল পর্যন্ত পর্তুগীজ জাহাজের আনাগোনায় এখানে একটি জাহাজি সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। বন্দরে পর্তুগীজ জাহাজে কাজ করার সুযোগ ঘটায় এখানকার মানুষের মধ্যে সমুদ্রে যাওয়ার একটি নেশা গড়ে ওঠে ও সক্ষমতা তৈরি হয়। এর ফলে তখন ও পরবর্তী কালে এই অঞ্চলের মানুষ বিশ্বের অসংখ্য পালতোলা জাহাজে কাজ করে

নাবিক হিসেবে সুনাম অর্জন করে। সংখ্যাগত ও গুণগত উভয় বিচারে এরপর চারশ বছর ধরে তাদের এ সুনাম অক্ষুণ্ন থাকে।

এই বন্দর, তার কর্তৃপক্ষ ও পর্তুগীজ বাণিজ্য কেন্দ্রকে রক্ষার জন্য শহরে বেশ কয়েকটি পর্তুগীজ দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছিলো তার সমস্ত বাহিনী মজুদ রাখার জন্য। চট্টগ্রাম নগরে এখনো সে রকম দুর্গ রয়ে গেছে। এর মধ্যে প্রধানটি হলো চট্টগ্রাম কলেজের কাছে উচ্চ পাহাড়ের ওপর তাদের প্রধান দুর্গ– যা এখন মোহসীন কলেজ হিসেবে ব্যবহৃত। তাছাড়া নগরের আরো মাঝখানে অনুচ্চ পাহাড়ের ওপর এখন যেখানে মুসলিম হাই স্কুল সেখানেও একটি দুর্গ ছিল। এর কোনটিই বন্দরের থেকে দূরে বা তার দৃষ্টি সীমারও দূরে নয়। চট্টগ্রাম নগরের যে ব্যবসা কেন্দ্র সেটিই প্রধান পর্তুগীজ কেন্দ্র হলেও পুরো চট্টগ্রাম উপকূল ও দক্ষিণ বাংলা উপকূল জুড়ে অনেক জায়গায় পর্তুগীজ ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। সেখানেও প্রয়োজন মত নৌ-শক্তির যোগান রাখা হতো।

পর্তুগীজরা দুনিয়ার যেখানেই গিয়েছে সেখানেই সেনা পাহারা সহ ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপন ছাড়াও আরেকটি কাজ অবশ্যই করেছে, তা হলো তাদের অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ক্যাথোলিক ধর্মীয় সংস্থার (চার্চ) একটি মিশনারি বা ধর্ম প্রচার কেন্দ্র সেখানে স্থাপন করেছে। মূল মিশনারি ও চার্চকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ছোট ছোট শহর ও গ্রামে আরো নানা কেন্দ্র গড়া হয় একটি সংঘবদ্ধ ও পরস্পর সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে। ধর্ম প্রচার ও ধর্ম চর্চা প্রধান কাজ হলেও এর সঙ্গে শিক্ষাদান এবং দরিদ্র ও অনাথ সেবা সহ নানা জনহিতকর কাজেরও কিছু কিছু ব্যবস্থা থাকতো। এই উপলক্ষে প্রচুর পর্তুগীজ পাদরি ও তরুণতর ধর্ম প্রচারক এখানে আসতো। যদিও আপাত দৃষ্টিতে ব্যবসা কেন্দ্র, নৌ-শক্তি কেন্দ্র, শাসন কর্তৃপক্ষ ইত্যাদির বিপরীতে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, কিন্তু প্রায় দেখা যেতো যে এই মিশনারি ব্যবস্থাও স্থানীয় রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়তো এবং শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ, নৌ-শক্তি ও মিশনারি ইত্যাদির মধ্যে ব্যবধানটুকু খুবই কমে গিয়ে এগুলো একাকার হয়ে যেতো এবং একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে যেতো। তবে স্থানীয় সাধারণ মানুষের সঙ্গে পর্তুগীজ আগন্তুকদের যোগাযোগের একটি বড় ক্ষেত্র ছিল এই মিশনারি কাজগুলো।

চট্টগ্রামেও এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি। নগরীতে এবং অন্যান্য সব ব্যবসা কেন্দ্রের সঙ্গে পর্তুগীজ মিশনারিও ছিল। মিশনারি কাজে জড়িত পর্তুগীজ, এবং বাণিজ্যের বা প্রতিরক্ষার কাজে কিছুটা স্থায়ী ভাবে থাকা পর্তুগীজদের সঙ্গে এখানে স্থানীয়দের বিয়েশাদীও হয়েছে, ফলে বেশ বড় একটি মিশ্র জাতীয়তার

জনগোষ্ঠি সৃষ্টি হয়েছিলো। সমসাময়িক একটি বর্ণনায় দেখা যায় যে ১৫৯৮ সালে চট্টগ্রাম অঞ্চলে পর্তুগীজ ও এরকম মিশ্র জাতীয়তার মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় আড়াই হাজারের মত। তাদের প্রায় সবাই ক্যাথোলিক ধর্মাবলম্বী ছিলো। তা ছাড়া অন্য ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত ক্যাথোলিকদের সংখ্যাও ছিল বেশ বড়, পরে বংশানুক্রমে তাদের সংখ্যা অনেক বেড়েছিলো। আরো পরে মোগল আমল থেকে পর্তুগীজ প্রভাব কমে গেলেও পর্তুগীজ জিনধারী মানুষ ও ক্যাথোলিক ধর্মীয় অনেকে এখনো আছে। চট্টগ্রাম নগরীতে এখন তাদের অনেকের বাস পাথরঘাটা এলাকায় ফিরিঙ্গি বাজারে মূল ক্যাথোলিক চার্চের কাছাকাছি জায়গায়। ফারসি শব্দ ফারাঙ্গ মানে ইউরোপীয়, সেখান থেকে যে কোন ইউরোপীয় বোঝাতে ফিরিঙ্গি কথাটি ব্যবহার হয়। একই ভাবে উপকূলীয় অন্যান্য পর্তুগীজ কেন্দ্রের কাছেও মিশ্র পর্তুগীজ-বাঙালীর এক একটি ছোট ছোট জনগোষ্ঠি রয়েছে– স্থানীয় চার্চকে কেন্দ্র করে। লক্ষ্যণীয় যে তাদের অনেকেরই পারিবারিক নাম পর্তুগীজ– যেমন রোজারিও, দেকোস্টা, প্যারাইরা ইত্যাদি। প্রায় সাড়ে তিন শ' বছর আগে পর্তুগীজ উপস্থিতি শেষ হয়ে গেলেও বহু মানুষের নামে, ধর্মে, ও জীবন-ধারায় এখনো তার স্মৃতি সংরক্ষিত হয়ে চলেছে।

চট্টগ্রাম ও উপকূলীয় দক্ষিণ বাংলার জন্য পর্তুগীজ অধ্যায়ের সব চেয়ে বেদনাদায়ক স্মৃতি হলো তাদের দাস ব্যবসা। সেজন্য পর্তুগীজ প্রসঙ্গটি এখনো মানুষের কাছে হার্মাদের কাহিনী হিসেবেই রয়েছে বেশি, যেমন মগ শব্দটির সঙ্গে এখন জড়িত হয়ে গিয়েছিলো দস্যুবৃত্তি গ্রহণকারী আরাকানের কিছু বাসিন্দার সঙ্গে। দাস ব্যবসা ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে একটি সহযোগিতাও লক্ষ্য করা গেছে। উভয় প্রকার জলদস্যুরা উপকূলের কাছাকাছি অঞ্চলের গ্রামগুলোর ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে বাড়িঘর জ্বালিয়ে লুটতরাজ করতো এবং নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে মানুষকে হত্যা করে বিভীষিকা সৃষ্টির মাধ্যমে অনেককে ধরে আন্‌তো। এটি বন্ধ করার ক্ষমতা আরাকান রাজের বা বাংলার সুলতানের এবং প্রথম দিকের মোগল সুবাদারদের ছিলনা। সমগ্র উপকূল জুড়ে অজ্ঞাত স্থানে এই দাস সংগ্রহের ও জড়ো করার বেশ কিছু কেন্দ্র ছিল। এখান থেকে তাদেরকে চট্টগ্রাম উপকূলে ও আরাকান উপকূলের কয়েকটি ছোট বন্দরের কাছে বিশেষ বিশেষ দাস বাজারে নিয়ে যাওয়া হতো। এসব কাজে আরাকানী ও পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষীয় সমর্থন ও সহযোগিতা মিলতো। চট্টগ্রামে আরাকানী ও পর্তুগীজ শাসন তখন সত্যিসত্যি 'মগের মুলুকে' পরিণত হয়েছিলো। এই পুরো প্রক্রিয়ার পেছনে ছিল আরো সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী আন্তর্জাতিক চক্র। এদের গোড়া ছিল

গোয়া-সিংহল বিস্তৃত পর্তুগীজ দাস-ব্যবসা সংগঠনের শাখা সমূহে এবং ডাচ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে। তাদের প্রতিনিধিরা ওই বাজার থেকেই দাসদের কিনে চাহিদার দেশগুলোতে সরবরাহ করতো। ওলন্দাজ ব্যবসায়ীরা একই ভাবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তাদের উপনিবেশের সুবাদে ওখানকার নানা দ্বীপ ও উপকূল থেকে দাস সংগ্রহ করতো। মোগলরা চট্টগ্রাম দখল করার পর এখানকার আরাকানী ও পর্তুগীজরা উচ্ছেদ হলে অন্তত বাংলার উপকূলে এই পুরো দাস ব্যবসার পাল থেকে হাওয়া সরে যায়। একই সময়ে আরাকান রাজ্যের নিজের শক্তিও খুব হ্রাস পায় এবং মোগলদের পক্ষে চট্টগ্রাম ও দক্ষিণ বাংলার উপকূলের শান্তি ও নিরাপত্তা অনেকখানিই ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। ধীরে ধীরে হার্মাদ আর মগ জলদস্যুর হামলা অতীতের কাহিনীতে পরিণত হয়।

মোগলদের চট্টগ্রাম বিজয়

বাংলার স্বাধীন সুলতানরা এমনিতেই এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলো যে চট্টগ্রামে বা দক্ষিণ উপকূলে যা ঘট্‌ছিলো তাতে বাধা দেয়ার ক্ষমতা তাদের ছিলনা। দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্যের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় সুলতানদের দিন ফুরিয়ে এসেছিলো। মোগল সম্রাট আকবরই বাংলা দখল করে একে একটি মোগল সুবায় (প্রদেশে) পরিণত করেছিলেন। বাংলায় আসার পর থেকে মোগলরা বুঝতে পারছিলো আরাকান আর পর্তুগীজের হাত থেকে চট্টগ্রামকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে না পারলে এই সুবার পূর্বাঞ্চল কখনোই নিরাপদ হবেনা, বাংলার মোগল কর্তৃত্ব স্থাপন কখনোই সম্পূর্ণ হবেনা। এই দুটির জোরই ছিল প্রধানত নৌ-শক্তি। ও সময় বাংলার বার ভূঁইয়া নামে পরিচিত ছোট ছোট ভূস্বামী রাজারা মোগল শাসনকে বাধা দিয়ে চল্‌ছিলেন। পর্তুগীজরা সন্দ্বীপের দখল রাখা সহজ রাখার জন্য তাঁদের মধ্যে শ্রীপুরের কেদার রায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলে। পর্তুগীজ মিশনারিদের চিঠিতে দেখা যায় কেমন করে কেদার রায়, যশোরের প্রতাপাদিত্য, বরিশালের রামচন্দ্র রায় মোগলদের বিরুদ্ধে পর্তুগীজদেরকে সহায়তা দিয়েছেন। মোগল নৌ-শক্তির উন্নয়ন করেই শুধু বাংলার পূর্বাঞ্চলের নদী-নালার দেশের মধ্য দিয়ে শত্রু ঠেকানো সম্ভব ছিলো। আর প্রধান নদীপথগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হলে পূর্ব বাংলা থেকেই শাসন পরিচালনা করতে হবে। প্রধানত এই উদ্দেশ্যেই সম্রাট জাহাঙ্গীরের বাংলার সুবাদার ইসলাম খাঁ সুবার রাজধানী ১৬১০ সালে পশ্চিমে রাজমহল থেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। রাজমহল হলো বর্তমান ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যে রাজমহল পাহাড় আর গঙ্গার

তীরের কাছে– তখনকার বাংলা সুবার একেবারে পশ্চিম প্রান্তে। এই রাজধানী স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় বাংলায় মোগলের রাজনৈতিক আকাঙ্খা কী ছিল। এ আকাঙ্খার বাস্তবায়নের চেষ্টা তখন থেকেই শুরু হয়েছিলো- কিন্তু তারপরও মোগলদের পক্ষে সত্যি সত্যি চট্টগ্রাম বিজয় করতে আরো ৫০ বছরের বেশি সময় লেগে গিয়েছিলো।

এর মধ্যে মোগল নৌ-শক্তির উন্নয়ন করা হয়েছে, বাংলার পূর্বাঞ্চলের নদী জালের মধ্যে বিশেষ বিশেষ স্থানে কৌশলগত দুর্গ ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে, শত্রু নৌ-শক্তি থেকে রাজধানী ঢাকা ও আশপাশকে রক্ষা করার জন্য। বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন যুদ্ধে আরাকানী ও পর্তুগীজ নৌ-শক্তিকে পরাজিতও করা গেছে– কিন্তু চট্টগ্রাম তখনো দূর লক্ষ্য রয়ে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ ১৬১৬ সালে একজন মোগল নৌ-সেনাপতি দিলাওয়ার খান আরাকানী শাসন থেকে সন্দ্বীপ দ্বীপ দখল করেন, এবং দীর্ঘ সময় দখলে রাখেন। চট্টগ্রাম বন্দরে শক্তিশালী পর্তুগীজ নৌবহরের নাকের ডগায় এটি করতে পারা কম সাফল্যের কথা নয়। কিন্তু তখন কাছাকাছি মোগল শাসন এমন সংগঠিত ছিলনা যে সন্দ্বীপকে সুবার অন্তর্ভুক্ত করে সেখান থেকে আক্রমণ গড়ে তুলতে পারে। বরং একটি বিচ্ছিন্ন সাফল্য হিসেবে সেনাপতি দিলাওয়ার খান ওখানে একটি ব্যক্তিগত রাজত্ব স্থাপন করে রেখেছিলেন। এতে আরাকান কর্তৃপক্ষ বিব্রত হলেও তাদের তেমন কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি ঘটেনি। এর মধ্যে ঢাকার মোগল সুবাদার দুই দুইবার চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন, দুই বারই আক্রমণ ব্যর্থ হয়। ও সময় হার্মাদ ও মগরা মোগল সুবার উপকূলীয় অঞ্চলে যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলো এবং যে হারে মানুষকে দাস হিসেবে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো তা মোগল কর্তৃপক্ষকে অত্যন্ত চিন্তিত করে তোলে। সম্রাট শাহজাহান স্বয়ং মন্তব্য করেছিলেন যে পর্তুগীজদেরকে না থামাতে পারলে বাংলার দক্ষিণাঞ্চল শিগ্‌গির জনশূন্য হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি তাঁর মেজ ছেলে শাহ সুজাকে বাংলার সুবাদার করে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কেন জানি শাহ সুজা ঢাকা থেকে মূল শত্রুর মোকাবেলা না করে রাজধানী আবার রাজমহলে নিয়ে গেলেন এবং ১৬৩৯ থেকে ১৬৬০ সাল পর্যন্ত ওখান থেকেই বাংলা সুবা শাসন করলেন– সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে। এই শাহ সুজার সঙ্গে আরাকান রাজের সম্পর্কটিও কিছুটা রহস্যময়।

সম্রাট শাহজাহানের বার্ধ্যক্যের সময় তাঁর উত্তরসূরি কে হবেন এই নিয়ে তাঁর পুত্রদের মধ্যে যুদ্ধ লেগে যায় এবং তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব এতে বিজয়ী হয়ে সম্রাটকে নজরবন্দী করে নিজেই সম্রাট হয়ে বসেন। সেটি ১৬৬০ সাল, শাহ

সুজা তখনো বাংলায়, আওরঙ্গজেবকে বাধা দেবার জন্য তিনি নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করে দিল্লীর দিকে এগোবার পথে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলার হাতে পরাজিত হয়ে ঢাকায় পালিয়ে আসেন। মীর জুমলার সেনা দলের অগ্রগতির মুখে তিনি ঢাকা থেকে নোয়াখালীর ভুলুয়ায় চলে আসেন, ওখানে আরাকান রাজের পাঠানো জাহাজে সপরিবারে ও সপারিষদ ওঠার জন্য। এই জাহাজ তাঁদেরকে চট্টগ্রামে নিয়ে আসে এবং এখান থেকে তাঁরা সবাই স্থল পথে আরাকান চলে যান। যেই পথ ধরে গিয়েছিলেন সেটি আজও আরাকান রোড বা সুজা রোড বলে পরিচিত– বর্তমান চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ রোড। আরাকানের রাজধানী মারুক-উতে তাঁরা আরাকান রাজ থুধাম্মার রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেন। কিন্তু পরের বছরেই ১৬৬১ সালে কোন রহস্যময় কারণে থুধাম্মার সঙ্গে সম্পর্কের এমন অবনতি হয় যে আরাকান রাজ তাঁকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণ এবং সকল পারিষদ সহ হত্যা করে। একটি ঐতিহাসিক মত হলো এই নৃশংস ঘটনা সম্রাট আওরঙ্গজেবকে এতটাই ক্রুদ্ধ করেছিলো যে তিনি সমস্ত শক্তি দিয়ে চট্টগ্রাম দখল করতে এবং আরাকান রাজকে ধ্বংস করতে তাঁর সুবাদারকে নির্দেশ প্রদান করেন।

সুজার পর মোগল সুবার রাজধানী আবার ঢাকায় ফেরৎ এসেছিলো- এবং ১৬৬৬ সালের মধ্যে মোগলরা এখানে আবার চট্টগ্রাম আক্রমণের জন্য নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করতে পেরেছিলো। সুবাদার শায়েস্তা খান তাঁর ছেলে বুজর্গ উমেদ খানকে এই আক্রমণের নেতার দায়িত্ব দিলেন এবং সঙ্গে দিলেন বিচক্ষণ নৌ-সেনাপতি ফরহাদ খানকে। খুব ভাল করে পরিকল্পনা করে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছিলো– বিশেষ করে চট্টগ্রাম বন্দরের আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষাকে এতে আমলে নেয়া হয়েছে। ঠিক হয়েছিলো এটি হবে যুগপৎ স্থলে ও জলে সাঁড়াশি আক্রমণ। মোট ৬৫০০ জন সৈন্যকে স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীতে ভাগ করে দেয়া হয়েছিলো– জাহাজের সংখ্যা ছিল ২৮৮টি। নৌপথে সমুদ্রের দিক থেকে ও স্থল পথে উত্তর দিক থেকে একই সঙ্গে আক্রমণ চালিয়ে বন্দরের নৌবহরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার চেষ্টা হয়। প্রায় ২০০ জাহাজের আরাকানী ও পর্তুগীজ বহর বন্দরে ভেতরের দিকে সরে যায় এবং বন্দরের তীরে স্থাপিত কামান-সন্নিবেশ থেকে ও জাহাজ থেকে মোগল বহরের ওপর গোলা বর্ষণ করে। শহরে দুর্গগুলো থেকেও তা করা হয়। কিন্তু মোগলদের যুগপৎ আক্রমণের মুখে প্রতিরক্ষা চেষ্টা ব্যর্থ হয়, অধিকাংশ আরাকানী জাহাজ ধ্বংস বা দখল হয়। দু'দিনের মধ্যে শহরের আরাকানী সৈন্যরা পালিয়ে যায়। ও সময়ের ইউরোপীয় লেখকরা উভয় পক্ষের

মোট প্রায় ৫০০ জাহাজ ও ২০ হাজার স্থল ও নৌসেনার এই চট্টগ্রাম বিজয়ের যুদ্ধকে সে আমলের যে কোন জায়গার যৌথ স্থল ও নৌ যুদ্ধের ইতিহাসে একটি প্রধান মাইল ফলক বলে উল্লেখ করেছেন। আরাকানী সৈন্যরা চট্টগ্রাম ছেড়ে আরাকানে চলে যাবার চেষ্টা করলে তাড়া করে তাদেরকে পথেই ধ্বংস করা হয়। সেই থেকে চট্টগ্রামের ওপর আরাকানী প্রভাব শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। পুরো ইতিহাসে এই সেই মুহূর্ত সৃষ্টি হলো যখন থেকে চট্টগ্রাম ও আরাকানের ভাগ্য চিরতরে ভিন্ন পথে এগিয়েছে। পর্তুগীজরা তখনো চট্টগ্রামে ছিল– কিন্তু মোগল শাসনের মধ্যেই ছিল। ধীরে ধীরে তাদের কর্তৃত্বের ও প্রভাবের জায়গাগুলো থেকে তাদেরকে অপসারিত করা হয়। চট্টগ্রামের কাছাকাছি নিরাপদ ডেরাগুলো থেকে বঞ্চিত হয়ে এবং প্রায়শ মোগল নৌ-শক্তির সম্মূখীন হয়ে হার্মাদি হামলাও আস্তে আস্তে কমে আসে, দাস ব্যবসার ঘাঁটিও উচ্ছেদ হয়ে যায়। আরাকান রাজ্যটি দ্রুত দুর্বল হয়ে যাওয়াতেও এই কাজগুলো করতে সুবিধা হয়েছিলো। পর্তুগীজ দস্যুবৃত্তি এ অঞ্চলে কমে গেলেও একটি নৌ-বাণিজ্যশক্তি ও নৌসেনা শক্তি হিসেবে পর্তুগীজরা আরো বহুদিন ভারত মহাসাগরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো। আর তাদের জাহাজের পরিচালনায় তখনো একটি প্রধান নাবিক শক্তি যুগিয়ে চলেছিলো চট্টগ্রাম-নোয়াখালীর খালাসিরা।

শক্তিশালী রাজা থুধাম্মার পর আরাকানে সে রকম আর কেউ আসেনি। নানা অন্তর্কলহে জড়িয়ে পড়ে পরবর্তী রাজারা। থুধাম্মার পর ১০০ বছরে ২৫ জন রাজা এসেছেন গেছেন, কিন্তু কেউ আরাকানের ভাগ্য ফেরাতে পারেননি। অবশেষে বার্মার রাজা বোদপায়া ১৭৮৫ সালে আরাকান দখল করে একে বার্মার অন্তর্ভুক্ত করে নিলে আরাকানের দীর্ঘ স্বাধীন অস্থিত্বের অবসান হয়।

পালতোলা চিরায়ত প্রবাহে আমাদের খালাসিরা

সমুদ্র যাত্রাতেও আদি প্রবাহ

পানির বাধা অতিক্রম যুগে যুগেঃ

এ পর্যন্ত আমরা যত ভাবে জিন, জীবন-ধারা আর ভাষার প্রবাহকে অনুসরণ করেছি সব ক্ষেত্রেই কোন না কোন ভাবে মানুষ নিজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে এ প্রবাহ চালু রেখেছে। এই প্রক্রিয়ায় নানা বাধার মধ্যে সমুদ্রের বাধাটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছিলো। শুরুতে এই বাধা মানুষকে পৃথিবীর কোন কোন গন্তব্যে পৌঁছাতে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। পরেও এটি পৃথিবীর নানা সংস্কৃতিকে এক করার পথে বাধা হয়েছে। পালতোলা জাহাজের সাফল্য প্রত্যেকবার এসব বাধা অতিক্রম করেছে। মধ্য যুগের অবসানে পালতোলা জাহাজ এতই উন্নত হয়েছিলো যে তা সারা বিশ্বকে একযোগে দেখতে পাওয়া সম্ভব করেছিলো– প্রথমে বিশ্ব-সমুদ্রের অভিযাত্রীদের পক্ষে, পরে যাবতীয় বণিক, পর্যটক, অভিবাসী সবার পক্ষে। ওই বহুকাল ধরে জাহাজগুলোকে দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় ঝড় ঝঞ্ঝায় চালু রাখা যারা সম্ভব করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিপুল সংখ্যায় ছিলেন আমাদেরই সাধারণ মানুষ- চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সিলেটের খালাসিরা – সারেং, টেন্ডল ও সুখানি হিসেবে নেতৃত্বেও দেখা গেছে তাঁদেরকে। খালাসি শব্দটি এসেছে আরবী খালাস থেকে যার অর্থ 'মুক্ত'। দেহ-মনে একান্ত ভাবে বাঁধনহারা হয়ে কেমন করে দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে হয় তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাঁরা। সমুদ্র-যাত্রা এখনো আছে, আছেন আমাদের নাবিকরাও; কিন্তু এর ক্ল্যাসিকাল বা চিরায়ত রূপ ছিলো সেই পালতোলা জাহাজে। আমাদের নাবিকদেরও সেটিই সোনালী যুগ। তাই পালতোলা এই চিরায়ত প্রবাহটিকে অনুসরণ করতে হলে আমাদেরকে খালাসি জীবনের পুরো রোমান্সটিকে এর সঙ্গে আলোচনায় আনতে হবে, বিশেষ করে যখন তাঁদের কাহিনী আমাদের শিকড়ের গন্তব্যের কাহিনীর সঙ্গে এক হয়ে আছে।

৭০ হাজার বছর আগের যে অভিবাসনে আফ্রিকা থেকে দক্ষিণাপথে মানুষ ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় গিয়েছিলো তা আর একবার মনে করে দেখি। ইন্দোনেশিয়ার শেষ প্রান্তে পৌঁছাবার পর মানুষ আর এগোতে পারেনি, এখানেই বহুকাল কাটিয়ে দিয়েছে। এর কারণ ওখান থেকে নিউগিণি ও অস্ট্রেলিয়ার

সমন্বয়ে গড়া (তখনকার দিনে) বিশাল মহাদেশে যেতে হলে মাত্র ৯০ কিলোমিটারের এক চিল্‌তে সমুদ্র পার হতে হতো। সেটিই ছিল সেদিনের মানুষের সামনে অসম্ভব একটি বাধা। কিন্তু সে ধীরে ধীরে আবিষ্কার করেছিলো কীভাবে ভাসমান গাছ বা ভেলা মানুষের ওজন নেয়ার পরও ভাসমান থাকতে পারে, এবং সেটিই তাকে ওই বাধা অতিক্রম করার সুযোগ করে দিয়েছিলো– তারা অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে পৌঁছেছিল। কালক্রমে সমুদ্রকে তারা আর বাধা হিসেবে দেখেনি, বরং জিন, জীবন-ধারা, ভাষার প্রবাহের একটি বড় সুযোগ হিসেবে দেখেছে। এভাবেই মানুষ আজ থেকে তিন চার হাজার বছর আগেই পৌঁছে গিয়েছিলো বিশাল সমুদ্র দিয়ে সব থেকে বিচ্ছিন্ন, মূল ভূখণ্ড থেকে বহু হাজার মাইল দূরে, হাওয়াই, তাহিতি, ইত্যাদি দ্বীপেও। এজন্য তারা খুব সম্ভব গাছের গুড়ি খোদাই করে নৌকা তৈরি করেছে, পাল ব্যবহার করে বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগিয়েছে, আকাশের তারা দেখে সে নৌকার দিক ঠিক রেখেছে। ওদের নৌকা সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেকটা অনুমান-নির্ভর হলেও ৬,৩০০ বছর আগের স্থানীয় নৌকার বিস্তারিত ছবি মিশরের মন্দিরের গায়ে আঁকা রয়েছে। আর তার সামান্য কিছু বছর পরের প্রায় একই রকম নৌকার হুবহু ছোট মডেল অবিকৃত ভাবে পাওয়া গেছে মিশরে একটি সমাধির মধ্যে।

উভয় ক্ষেত্রে বিস্তারিত যা দেখা যাচ্ছে তা প্রায় একই রকমের; অবাক হবার কথা হলো আমাদের বর্তমান একটি বড়সড় নৌকার সঙ্গে এর তেমন কোন পার্থক্য নেই, কোন দিক থেকেই। এটি তৈরি হয়েছে কাঠের তক্তা জোড়া লাগিয়ে লাগিয়ে এবং সরু দুই প্রান্তে গলুই উঁচু করে আমাদের পরিচিত নৌকার মতই। ছবিটিতে মাস্তুলকে আপাতত খুলে কাৎ করে রেখে দেয়া হয়েছে, কিন্তু মডেলটিতে মাস্তুল খাড়া রয়েছে এবং তাতে লাগানো বিশাল পাল বাতাস লেগে ফুলে আছে এমনই দেখানো হয়েছে। বসে দাঁড় টানছে মডেলে থাকা এমন মানুষের মূর্তির সংখ্যা থেকে আন্দাজ করা যায় যে মডেলের নৌকাটি প্রায় ১০০ ফুট লম্বা। পেছনে এক পাশে বড় দাঁড়ের মত তিনটি হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন মানুষ। তাদের পাশে আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে পানির মধ্যে আংশিক ডুবানো একটি লম্বা লগির মত জিনিস নিয়ে, খুব সম্ভব পানির গভীরতা মাপছে। নৌকার মাঝামাঝি একটি ছোট ঘর যার ছাদ সামনে পেছনে বাড়ানো; একটি তলায় ওই হালধারীরা দাঁড়িয়েছে অন্যটির নিচে ক্যাপ্টেনের জন্য একটি কেবিনের ব্যবস্থা হয়েছে। মিশরের নানা জায়গায় এরকম প্রাচীন নৌকার মডেল আরো পাওয়া গেছে– এগুলোর বেশির ভাগের প্রাপ্তি স্থান থেকে মনে হয় নীল

নদী দিয়ে মালপত্র পরিবহনের জন্য এমন নৌকা ব্যবহৃত হতো, তবে কোন কোনটিকে সাগরে চলার উপযুক্তও মনে হয়েছে। প্রাচীন মিশরে মানব সভ্যতার অনেক কিছুই প্রথম উদ্ভাবিত হয়েছিলো, এই নৌকাও তার ব্যতিক্রম নয়।

এর ঠিক পরবর্তী কালের যে সব জাহাজের কিছু চিত্র আমরা পাই সেগুলো ফীনিশীয় এবং গ্রীক। এর আঁকা ছবি মিশরীয়গুলোর মত বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায়নি– মার্বেলের ফুলদানির ওপর শিল্পীর আঁকা সুদৃশ্য মোটা দাগের ছবি থেকেই বুঝে নিতে হয়। তবে উভয় ক্ষেত্রে সাহিত্যের বর্ণনা থেকেও কিছু জানা গেছে। মূল ওই মিশরীয় ধাঁচেই তৈরি ফীনিশীয় ও গ্রীক বড় আকারের সামুদ্রিক জাহাজগুলো। ফীনিশীয়দের পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি তাদের ভাষার লিপি প্রসঙ্গে, যেই লিপিকে আজকের প্রধান সব বর্ণমালার মূল উৎস মনে করা হয়। পুরো ভূমধ্য সাগরের উপকূলে তাদের উপনিবেশ, বাণিজ্য ও প্রভাব ছিল– গ্রীস, ইতালী, আফ্রিকার উত্তর উপকূল সর্বত্র। যথেষ্ট ভাল জাহাজ ছাড়া এটি সম্ভব হতোনা। প্রথম যুগের গ্রীক জাহাজের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হোমারের লেখা অমর মহাকাব্য ওডিসী ও ইলিয়াড থেকে– যেখানে গ্রীকরা শত শত এরকম জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে ট্রয় আক্রমণ করে হেলেনকে উদ্ধারের জন্য। মহাকাব্যের দীর্ঘ কাহিনীর ভেতরে জাহাজের বর্ণনাও কম নেই; আর তেমনি ভাবে জাহাজের বর্ণনা পাওয়া যায় পরবর্তী গ্রীক সাহিত্যেও। আরো বড় কথা হলো পরবর্তী রোমান সাম্রাজ্যের জাহাজ ও আরো পরে ভূমধ্য সাগরের ও ইংল্যান্ড প্রভৃতি কিছু দেশের বহুল ব্যবহৃত জাহাজগুলোর আকার, আকৃতি ও নির্মাণ কৌশলের সঙ্গে এগুলোর মৌলিক নানা দিক থেকে মিল রয়েছে। গ্রীক ও রোমান জাহাজের বর্ণনা থেকে অন্যগুলোর সম্পর্কেও মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাবে।

গ্রীক জাহাজ দুই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো– যুদ্ধ জাহাজ হিসেবে ও বাণিজ্য জাহাজ হিসেবে। যুদ্ধ জাহাজ যুদ্ধের সময় প্রয়োজন মত যে কোন দিকে নিতে হতো বলে তাতে যথেষ্ট সংখ্যক দাঁড় টানার মানুষ প্রয়োজন হতো- যারা তাদের সর্দারের ইশারার তালে তালে দাঁড় টান্‌তো, দাঁড়ীদের সংখ্যা বাড়াবার জন্য জাহাজের খোলে নিচের থেকে ক্রমে ওপরে একের ওপর এক তাক বানিয়ে দেয়া হতো তাদের বসার জন্য– ডেক বলে কিছু ছিলনা। সৈন্যরা যুদ্ধও করতো এরকম তাকে দাঁড়িয়ে। তবে খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের দিকে গ্রীক বাণিজ্য জাহাজের যে ছবি পাওয়া যায় তাতে জাহাজের খোলের পুরোটা ঢাকা পাটাতন বা ডেক দেখা যায়। এর পরের রোমান ও ভূমধ্য সাগরের অন্যান্য জাহাজেও তা ছিল।

ডেকের তলায় খোলের মধ্যেই থাকতো অধিকাংশ পণ্য। অবশ্য এই ওপরের প্রধান ডেকের নিচে আরো ডেক থাকতে পারতো, নানা কাজের জন্য ও পণ্য রাখার জন্য। জাহাজের নির্মাণ কৌশল মোটামুটি বরাবর একই থেকেছে। একেবারে তলায় পুরু ভারি কাঠ জাহাজের লম্বালম্বি থেকে এর তলি হিসেবে কাজ করেছে। পুরো তলি হবার জন্য এই কাঠের ওপরে-নিচে ওভাবেই আরো কাঠ সংযুক্ত হয়ে এটি পানির ভেতরে বেশ খানিকটা খাড়া নিচে নেমে আসে; সেভাবে এটি জাহাজের এপাশ ওপাশ দোলাটিকে বাধা দেয়, আবার পাশের দিকে সরে যাওয়াকেও কমায়। এই তলিকে ভিত্তি করেই জাহাজের আড়াআড়ি বেষ্টনীতে অনেকগুলো ছোট বড় আধা-রিং আকৃতিতে বাঁকানো কাঠের বীম খোলের কাঠামো হবার জন্য একটি খাঁচা তৈরি করে। এটি যেন খোলের ফ্রেম– যার ওপর জাহাজের লম্বালম্বি তক্তাগুলো পরস্পর পাশাপাশি সংযুক্ত হলে খোলটি তৈরি হয়ে যায়। প্রত্যেকটি তক্তার পাশের কিনারায় একটু খাঁজ কেটে তা পাশের তক্তার ওপর সামান্য চড়িয়ে দেয়া হয়– যেভাবে ঘরের ছাদের একটি টালির নিচের কিনারা তার নিচের টালিটার গায়ের ওপর একটু চড়ানো থাকে, দুটির মাঝে ফাঁক না থাকার জন্য। জাহাজের খোলের তক্তায় ওভাবে চড়ানো জায়গাতেই লোহার বোল্ট বা পেরেক দিয়ে পাশাপাশি তক্তাগুলোকে জোড়া দেয়া হতো।

এতটা করার পরও দুই তক্তার মাঝে সূক্ষ্ম ফাঁক থেকে যায়- সেই ফাঁক ভরিয়ে রাখা শুধু নির্মাণের সময় নয়, সাগরে জাহাজ চলার সময়েরও একটি নিত্য কাজ। এক সময় ঝিনুক গুড়ার তৈরি প্যাস্ট এর মধ্যে ঢুকিয়ে এই ফাঁক ভরানো হতো। পরে সব সময় পাট বা ফ্ল্যাক্সের মত উদ্ভিদ আঁশ আলকাতরা মাখিয়ে মুগুর দিয়ে ঠুকে ঠুকে ফাঁক ভরানোর কাজ করা হয়েছে। তাছাড়া পুরো খোলের ওপর যখনই সুযোগ আসে ভাল করে আলকাতরা মাখানো হতো সূক্ষ্ম ছিদ্র বন্ধ করার জন্য, আর কাঠকে পঁচার হাত থেকে বাঁচাতে। সমুদ্রে পানির চাপে ও ঝড় ঝাপটায় খোল যেন চুপসে না যায়, আবার দুই পাশ দুই দিকে ছুটেও না যায় এ জন্য খোলের আড়াআড়ি সোজা কাঠের বেশ কিছু বীম দিয়ে দুই পাশ শক্ত করে আটকানো থাকে– এগুলোকে বলাও হয় বীম। মাঝখানের সব থেকে লম্বা বীমটিই জাহাজের প্রস্থ ঠিক করে দেয়। এর সামনের দিকের ও পেছনের দিকের বীমগুলো ক্রমাগত বেঁটে হয়। এসব বীমগুলোই প্রধান ডেক এবং নিচে যদি আরো ডেক থাকে, সেগুলো বসানোর ভিত্তি হিসেবেও কাজ করে। খোলের বাইরের দিকে কিছু শক্ত কাঠের বেস্টনী লম্বালম্বি ভাবে পুরো জাহাজ ঘুরে এসে

খোলটিকে আটসাট বেঁধে রখে। বেষ্টনীগুলো সামনের গলুইয়ের কাছে এসে ওখানে এমন ভাবে একত্র হয় যেন পুরো জাহাজের বাঁধুনিশক্তি ওই গলুইতে এসে কেন্দ্রীভূত হয়– এ কারণে গলুই খুবই শক্ত হয়; এর ওপরেই সব ধাক্কাগুলো লাগে বলে গলুইকে শক্ত করা খুব দরকার। তাছাড়া সেকালে যুদ্ধ জাহাজে এমনকি বাণিজ্য জাহাজেও শত্রু পক্ষকে ঘয়েল করার একটি প্রধান উপায় ছিল যথেষ্ট বেগে এসে তার জাহাজে গুতো দিয়ে সেটি ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করা। এজন্য ওই শক্ত গলুইয়ের সঙ্গে একীভূত হয়ে একটি মোটা লম্বা মুগুর থাকতো সোজা সামনের দিকে পানির নিচে অদৃশ্য অবস্থায়; বেগে চলা জাহাজ এটি দিয়ে অন্য জাহাজকে যুৎসইভাবে গুতো দিতে পারতো নিজে না ভেঙ্গে। পানির তলায় এমন লুকানো অস্ত্র হলেও পানির উপরটায় কিন্তু গলুই সুন্দর বাঁক নিয়ে ময়ূরপঙ্খীর লম্বা গলার মত কোণাকুণি ওপরের দিকে উঠে আসতো কখনো ময়ূরপঙ্খী, কখনো অন্য কোন রূপ নিয়ে– প্রায় ক্ষেত্রে ফুলেল, সুদৃশ্য এবং মনে ধরার মত করে।

জাহাজের মাস্তুল তৈরি হতো শক্ত, দৃঢ় কাঠের খুব দীর্ঘ স্তম্ভের আকারের, একই টুকরা কাঠ থেকে হলে ভাল, নইলে কয়েক টুকরা জোড়া দিয়ে। এর নিচের প্রান্ত বসানো হতো খোলের একেবারে নিচের দিকে তলির সঙ্গে সংযুক্ত কাঠের একটি ছিদ্রযুক্ত খাঁজের ভেতর। তারপর ডেক ফুঁড়ে এটি ওপরে আকাশের দিকে চলে যেতো। একে খাড়া রাখা হতো নানা দিকে দড়ির টানা দিয়ে, যে দড়ি ডেকের কাছে নানা অংশে আটকানো থাকতো। প্রয়োজনে এসব টানা খুলে একে নামিয়ে নেয়া যেতো সমুদ্রেই মেরামত ইত্যাদির জন্য। এই মাস্তুলেই লাগানো থাকতো বিশাল পাল– সাধারণত একটি পাল, কখনো একাধিক মাস্তুলে একাধিক পাল– মাস্তুলের সঙ্গে আড়াআড়ি থাকা আড়-দণ্ড থেকে ঝোলানো পাল। নিচের দিকে এর সঙ্গে আটকানো দড়ি দিয়ে নাবিকরা পালকে নিয়ন্ত্রণ করতো। প্রথম দিকের ফীনিশীয়, গ্রীক ইত্যাদি জাহাজে একেবারে সামনে দিকটায় এবং একেবারে পেছনে দিকটায় দুটি ঘর থাকতো, কেল্লা, কুঠি যাই বলিনা কেন– যা আসলে আলগা একটি ঘর, ওখানে শুধু বসিয়ে দেয়া হতো। পরের দিকে ব্যাপারটি সেরকম আর ছিলনা; সামনে ও পেছনে এমন ঘর জাহাজের গঠনের সঙ্গে একেবারে অঙ্গীভূত করেই তৈরি হতো, সর্বোত্তম ভাবে জায়গার ব্যবহার করে। এভাবে প্রধানত ডেকের নিচের জায়গা ব্যবহার করে তৈরি হতো সম্মুখ-কুঠি যেখানে সাধারণ নাবিকরা থাকতো। আবার পেছনে অনেকখানি জায়গা নিয়ে ডেকের ওপরে অনেকটা উঁচু হয়ে থাকা সুদৃশ্য খোলামেলা বড় কুঠি হতো

পশ্চাত-কুঠি, জাহাজের পুরো পেছনটা জুড়ে। এটিই জাহাজের সদর দপ্তর– ক্যাপ্টেন, মালিক, অফিসার, গুরুত্বপূর্ণ যাত্রী, সবার কেবিন এতে থাকতো। এরই বর্ধিত অংশ আরেকটি ছোট ডেক গঠন করতো, প্রধান ডেক থেকে উঁচুতে, যার নাম কোয়ার্টার ডেক– এটি ক্যাপ্টেন, অফিসার ও অন্যান্য গণমান্যদের খোলা জায়গায় কাজ করার ও বেড়াবার স্থান।

সেই মিশরীয় জাহাজে যেমন দেখেছি, পরের গ্রীক বা রোমান জাহাজেও এক বা একাধিক নাবিক পেছনে এক পাশে পানিতে লম্বা ও যথেষ্ট চওড়া দাঁড় ডুবিয়ে তা ধরে রাখতো– যেগুলো দাঁড় নয়, হাল; সে সময় এই হাল একাৎ ওকাৎ করে, অথবা খাড়া ধরে রেখে, জাহাজের দিক ঠিক রাখা হতো, বা দিক বদলানো হতো। বড় জাহাজে এ জন্য দড়ি দিয়ে ওগুলো ঝোলানো থাকতো একই ভাবে হাতে নিয়ন্ত্রণের জন্য। অনেক পরিশ্রম ও অনেকখানি জায়গা লাগতো এভাবে জাহাজকে ঘোরাতে– তবুও হাল ওরকমই ছিলো। বহু পরে চীনা নাবিকদের উদ্ভাবিত খাড়া পশ্চাৎ-হাল প্রথমে আরবরা, তারপর ইউরোপীয়রা, শিখে নিয়েছিলো, সেটি পরে দেখবো। এগুলো ছাড়া ওই প্রাচীন কালেই প্রাচ্যে চীনারা এবং উত্তর ইউরোপে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশের দ্বিগ্বীজয়ী ভাইকিংরা কিছুটা ভিন্ন রকম জাহাজ প্রবর্তিত করেছিলো। কিন্তু আমাদের আলোচ্য পরবর্তী কালের জাহাজগুলো ওপরে বর্ণিত গ্রীক-রোমান ঐতিহ্যের, যা পরে আরো উন্নত হয়েছিলো। এই উন্নতি দুদিক থেকেই হয়েছিলো যুদ্ধ জাহাজ হিসেবে এবং বাণিজ্য জাহাজ হিসেবে, অবশ্য প্রায়শ এই দুইয়ে তেমন পার্থক্য থাকতোনা। বিভিন্ন প্রতিযোগী নৌ-শক্তি যখন বিশ্ব-সমুদ্রে তাদের জাহাজ চালনা শুরু করেছে তখন বাণিজ্য জাহাজকেও জলদস্যুদের জাহাজ আর প্রতিযোগী শত্রুপক্ষের জাহাজের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হতো– যুদ্ধের কিছু প্রস্তুতি অন্তত রাখতে হতো। নৌ-শক্তি মানেই ছিল এভাবে যুদ্ধের শক্তি এবং বাণিজ্য শক্তি– উভয়ে।

বাতাসের অনুকূলে যাওয়ার পালঃ

বহু হাজার বছর আগের ওই মিশরীয় নৌকার মডেলের মধ্যে পাল্‌কে যে ভাবে দেখেছি, এখন থেকে মাত্র দেড় শ' বছর আগেও পালের যুগের শেষ অবধি পাল প্রধানত সেভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। এই ব্যবহার হলো বাতাসের ঠেলায় পাল যাতে জাহাজকে বাতাসের অনুকূল দিকে নিয়ে যেতে পারে সেই ব্যবস্থা করা। পালের এটিই সহজ ও সর্বোত্তম ব্যবহার; তবে তার জন্য অনুকূল বাতাস থাকা

চাই, যেদিকে যেতে চাচ্ছি সে দিকে। বাণিজ্য জাহাজকে এই অনুকূল বাতাসের জন্য অপেক্ষা করতে হতো, বা ঘোরা পথে গিয়ে অনুকূল বাতাস খুঁজে নিতে হতো। যুদ্ধ করার সময় সে উপায় নেই, তাই অতীতে যুদ্ধ জাহাজে দাঁড় টানারও ব্যবস্থা থাকতে হতো, প্রয়োজনে বাতাসের প্রতিকূলে শত্রুর দিকে যাওয়ার জন্য। দাঁড় টেনে দূরের গন্তব্যে যাওয়া সহজ নয়, তাই হোমারের গ্রীক মহাকাব্যে দেখি ট্রয়ে যাওয়ার সময় অনুকূল বাতাস না থাকাতে পুরো গ্রীক নৌবহরকে দীর্ঘ দিন জাহাজ থামিয়ে রাখতে হচ্ছে, দেবতার কাছে পশু বলি দিতে হচ্ছে অনুকূল বাতাসের প্রার্থনায়, এমনকি নরবলিও।

বাতাসের অনুকূলে যাওয়ার জন্য পাল খাটানোর সব থেকে ভাল উপায় হলো পালকে জাহাজের দৈর্ঘের সঙ্গে একেবারে আড়াআড়ি (সমকোণে) রাখা; তাহলে বাতাস যে দিকে যাচ্ছে (জাহাজটিও সেই একই দিকে যাচ্ছে) তার ঠিক সামনেই দেয়ালের মত থাকে পালটি। এভাবে থাকাকে 'স্কোয়ার' ভাবে থাকা বলে। তাই এভাবে খাটানো পালকে বলা হয় স্কোয়ার পাল। এমন পাল সাধারণত বর্গাকৃতি, আয়তাকৃতি বা তার কাছাকাছি কোন আকৃতির হয়। হুবহু বাতাস যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে যদি জাহাজ নাও যেতে চাইতো, এর সঙ্গে একটু কোণ করেও যেতে চাইতো, তাতেও ওই পালে কোন অসুবিধা হয়না; হাল ঘুরিয়ে ওদিকে গেলেই হলো। পালে লাগা বাতাসের শক্তি সেক্ষেত্রে দুটি উপাংশে ভাগ হয়ে একটি ওই কোণাকুণি দিকে জাহাজকে ঠেলে নিয়ে যাবে, অন্যটি জাহাজকে পাশের দিকে সরাতে চাইবে, যা খাড়া তলির বাধার কারণে খুব একটা পারবেনা। বাতাসের দিকের সঙ্গে একটু তেরচা থাকার ফলে এখন বাতাসটি পালের ওপর ঠিক সমকোণে আর পড়বেনা, তাই পালকে যদি স্কোয়ার অবস্থা থেকে অল্প ঘুরিয়ে বাতাসকে সমকোণে পড়তে দেয়া হয়, গতি কিছু বাড়বে। এতে পাল আর জাহাজের সঙ্গে আড়াআড়ি (সমকোণে) থাকবেনা, কিছুটা তার সঙ্গে লম্বালম্বি (সমকোণের ছোট) হবার দিকে চলে আসবে। এভাবে বাতাসের অনুকূলে একটু কোণ করে যেতেও কোন সমস্যা নেই। কিন্তু বাতাসের সঙ্গে একটু কোণ করে যাওয়া এক কথা, সেই কোণ যদি অনেক বড় হয়- যেমন বাতাস যদি জাহাজের পাশ থেকে আসে? তখনো বাতাসের শক্তির একটি ছোট উপাংশ একে সামনে এগুতে সাহায্য করবে বটে, কিন্তু তা বেশি নয়। পাল ঘুরিয়ে বাতাসের সমকোণে আনতে থাকলে তাকে জাহাজের সঙ্গে প্রায় লম্বালম্বি সমান্তরাল করতে হবে, আগে যে ভাবে ঠেলে নিয়ে যেতে পারতো জাহাজকে, তা পারবেনা। তাই পালকে এতটা ঘোরানো হবেনা। বলতে গেলে এ অবস্থায় স্কোয়ার পালের

ব্যবহারে সুবিধাটি খুব বড় হবেনা, যদিও এখনো সেটি কিছুটা কাজ করবে, যেহেতু এখনো বাতাস অনুকূলেই আছে বলতে হয়।

স্কোয়ার পালের ব্যবহারকে আমরা প্যারাসুটের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। প্যারাসুট নিচে নামার সময় ওপরের দিকে যাওয়া বাতাস তার ওপর খাড়া গিয়ে পড়ে স্কোয়ার পালের মত, একে ফুলিয়ে ফেলে। এতে দুটি কাজ হয়। প্রথমটি হলো বাতাস চেষ্টা করে প্যারাসুটকে ওপরের দিকে ঠেলে নিতে, কিন্তু জিনিসটি পৃথিবীর টানে নিচে পড়ছে বলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা পারেনা; কিন্তু জাহাজের ক্ষেত্রে তা পারে, সামনের দিকে ঠেলে সেদিকে নিয়ে যেতে পারে। প্যারাসুটে দ্বিতীয় যে কাজটি হয় তা হলো ওপরের দিকে যাওয়া বাতাস এতে বাধা পায়, তাই যেই গতিতে পৃথিবীর টানে পড়ছিলো সেই গতিতে পড়তে পারেনা; বাতাসকে এই বাধা স্কোয়ার পালও দেয়, বাধা দেয় বলেই তাতে বাতাস লাগে, বাধার কারণে বাতাসের সমান বেগ না পেলেও, জাহাজ সামনে যায়।

স্কোয়ার পালের এই প্যারাসুট জাতীয় ব্যবস্থায় কিন্তু বাতাসের বিপরীত দিকে যাবার কোন উপায় নেই। বড় জোর বাতাস পাশ থেকে আসছে এমন অবস্থায় কিছুটা চলে, তা আমরা দেখলাম। কিন্তু বাতাস যদি পেছনের দিক থেকে তো নয়ই, পাশের দিক থেকেও না আসে, বরং সামনের দিক থেকে আসে, তখন এই পাল একেবারেই অচল। এমনকি সামনের দিক থেকে আসা বাতাসের গতিপথের সঙ্গে ৬০ ডিগ্রি পর্যন্ত কোণ করেও যদি যাই, তখনো অচল। তাই এ পর্যন্ত যে ইউরোপীয় ও ভূমধ্য সাগরীয় জাহাজের কথা বলেছি সেই সব শুধু বাতাসের দিকেই পালের সাহায্যে যেতে পারতো। বাতাসের বিপরীতে চলতে হলে দাঁড় টেনে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা, কিন্তু তার বহু আগে থেকেই প্রাচ্যের কোন কোন অঞ্চলে বাতাসের বিপরীতে যাওয়ার জন্যও নিয়মিত পালের ব্যবহার হচ্ছিলো। ওই যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপে তিন চার হাজার বছর আগে যারা দীর্ঘ পথ নৌকা নিয়ে যেতো, তারাও এরকম করেছে; এর পর জাংক নামে পরিচিত বড় বড় চীনা জাহাজও তা করে আসছে– অনেক দিন থেকে। এই বিদ্যা পরে ভূমধ্য সাগরে স্থানীয় ভাবে এক উপকূল থেকে অন্য উপকূলে যাওয়ার জন্য সেখানকার নাবিকরাও শিখে গিয়েছিলো। ওদের থেকে বাকি ইউরোপীয়রা শিখেছে বলে এরকম পালকে বলা হয় ল্যাটিন পাল, দক্ষিণ ইউরোপীয়দের সাধারণ নাম ল্যাটিন হওয়াতে।

বাতাসের বিপরীতে যাওয়ার পালঃ

ল্যাটিন পাল সাধারণ ত্রিভুজাকৃতির হয়, সামনের দিকটি সরু বিন্দু থেকে পেছনের দিকে বড়, আর এটি থাকে জাহাজের সঙ্গে লম্বালম্বি অর্থাৎ আগু-পিছু করে খাটানো। কাজেই ওখানে স্কোয়ার পালের মত সোজা বাতাসে লেগে প্যারাসুটের নিয়মে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। ল্যাটিন পাল ছাড়াও আগু-পিছু করে খাটানো আরো পাল আছে, যেগুলো এর মত ত্রিভুজাকার নয়। তবে ল্যাটিন পালের আলোচনা সেগুলোর জন্যও মোটামুটি প্রযোজ্য। স্কোয়ার পালের কাজকে যেমন প্যারাসুটের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তেমনি ল্যাটিন পালের কাজকে বলতে হবে পাখির বা বিমানের ডানার মত। ওই ডানার মতই বাতাস এখানে পালের গায়ের ওপর খাড়া এসে না পড়ে পালের কিনারা দিয়ে ঢুকে পালের দু'পাশ ঘেঁষে চলে যায়, কিন্তু পাল যদি বাতাসের সঙ্গে সঠিক পরিমাণে সামান্য তেরচা কিনারায় থাকে তা হলে এক পাশে যে দিকে এটি একটু ফুলানো থাকে সেই পাশ ঘেঁষে যাওয়ার সময় বেশি পথ ঘুরে যাওয়াতে তার চাপ কমে যায়, আর যেই পাশে বাটির গর্তের মতো থাকে সেই পাশ ঘেঁষে যাওয়ার সময় গর্তের ভেতর না ঢুকে বাতাস সোজা চলে যায় বলে চাপ বেড়ে যায়। দুই পাশে চাপের এই তারতম্যের কারণে যেদিকে চাপ কম সেদিকে অর্থাৎ ফুলানো দিকে, একটি গতির বল সৃষ্টি হয়। বিমানের ডানার ক্ষেত্রে এমনটিই হয়। ডানার ওপর দিকটা একটু ফুলানো বাঁকা থাকায় ও নিচের দিকটা সোজা সমতল থাকায়, সে ক্ষেত্রে ওপরের দিকে গতির বল সৃষ্টি হয় যা বিমানকে ভাসিয়ে রাখে; পাখির ডানার ক্ষেত্রেও এমনি হয়। ল্যাটিন পালের ক্ষেত্রে চাপের বলটি ওপরের দিকে না হয়ে ফোলা দিকে, অর্থাৎ পাশের দিকে হয়, এইটুকুই তফাত। পালের এক পাশের দিকে যাওয়ার এই বলের একটি উপাংশ জাহাজকে বাতাসের বিপরীত দিকের সঙ্গে ৩০ ডিগ্রির মত বা তার বেশি কোণ করে চলতে সক্ষম করে। এই পদ্ধতিতে পালের কাজকে ডানার মত কাজ বলা যেতে পারে। ল্যাটিন পাল সাধারণ জাহাজে আগু-পিছু ভাবে খাটানো থেকে এভাবে ডানার মতই কাজ করে। তবে এতেও বাতাস যেদিক থেকে আসছে তার ঠিক বিপরীত দিকে যাওয়া বা সেদিকের সঙ্গে ৩০ ডিগ্রির কম কোণ করে যাওয়া সম্ভব হয়না, কারণ সে ক্ষেত্রে ডানার মত কাজটি ঠিক ভাবে করা যায়না। জাহাজ বিপরীত বাতাসের ওই গতিপথের সঙ্গে আরো বড় কোণ, ৩০ থেকে ৪৫ ডিগ্রি কোণ করলে তবেই তা সম্ভব হয়; ওভাবে কোণ করেই বাতাসের প্রায় বিপরীত দিকে জাহাজ দিব্যি চলে যেতে পারে।

কিন্তু ধরা যাক্ জাহাজকে গন্তব্যের দিকে যেতে হলে বাতাসের ঠিক সোজা বিপরীত দিকে বা তার সঙ্গে ছোট কোণে যেতে হবে। যেহেতু সেটি সম্ভব নয়, কাজেই সেদিকে যাবার চেষ্টা না করে তার যে কোন একটি পাশের দিকে বরং বাতাসের সঙ্গে বড় কোণ করে গন্তব্যের থেকে দূরে একটু তেরচা চলে যায়। কিছু দূর গিয়ে এটি গতি পরিবর্তন করে ওই উল্টো বাতাসের অন্য পাশে চলে যায়, এবং এবার সেই পাশে একই রকম বড় কোণ করে সেদিকে কিছু দূর তেরচা চলে যায়। এরপর আবার গতি পরিবর্তন করে আগের পাশে চলে গিয়ে ওদিকে আগের মত কোণ করে যায়। এভাবে একবার এদিকে, একবার ওদিকে, কোণ করে গিয়ে গিয়ে এক রকম জিগ্-জাগ পথে চলে জাহাজ তার মূল গন্তব্যের দিকের কাছাকাছি থাকে, যদিও সোজা সেদিকে যেতে পারেনা। এই পদ্ধতিতে অনেকটা বাতাসের সোজা বিপরীত দিকে যাওয়াকে বলা হয় ট্যাকিং। শেষ পর্যন্ত সব জাহাজেই দু' একটি ল্যাটিন পাল থাকতো। এটি ব্যবহার করে, দরকার মত বাতাসের বিপরীত দিকেও অল্প দূর যাওয়ার ব্যবস্থা থাকতো ট্যাকিং করে, যদিও সেটি সহজ কাজ ছিলনা। তবে দূর সমুদ্র পাড়ি দেয়ার জন্য বেশির ভাগ জাহাজ বাতাসের অনুকূলেই যাওয়ার চেষ্টা করতো স্কোয়ার পাল ব্যবহার করে; যা প্যারাসুটের মত কাজ করে, ডানার মত নয়।

অবশ্য স্কোয়ার পালকে ঘুরিয়ে আগু-পিছু পালের অবস্থানে এনে তাকেই ল্যাটিন পাল হিসেবে ব্যবহার করা যায়, এবং এভাবে বাতাসের বিপরীতে কোণ করে যাওয়া যায়। অন্য দিকে ল্যাটিন পালকে ঘুরিয়ে জাহাজের সঙ্গে আড়াআড়ি অবস্থানে অর্থাৎ স্কোয়ার পালের অবস্থানে এনে বাতাসের অনুকূলে যাওয়াও সম্ভব হয়। তবে তা সত্ত্বেও স্কোয়ার পালই বাতাসের অনুকূলে যাওয়ার জন্য ভাল, আর ল্যাটিন পাল প্রতিকূলে যাওয়ার জন্য।

নানা পালে সাজানো জাহাজঃ

শুধু ল্যাটিন পাল নিয়েও জাহাজ চালানো সম্ভব– এবং বিভিন্ন সময়ে অপেক্ষাকৃত ছোট জাহাজ এভাবে চালানো হয়েছে। এর মধ্যে মধ্যযুগের আরব নাবিকদের ব্যবহৃত উদাহরণ একটু পরে আমরা দেখবো। তাছাড়া আরো পরে পালের জাহাজের উন্নত যুগেও শুনার, স্লুপ, কাটার ইত্যাদি নামের কিছু ছোট জাহাজ শুধু ল্যাটিন পালে সজ্জিত থেকেছে। তবে অধিকাংশ বড় জাহাজের প্রধান চালিকা শক্তি ছিলো স্কোয়ার পাল, আর তার চেষ্টা হলো সব সময় বাতাসের অনুকূলে চলা। এই স্কোয়ার পাল যত বড় হবে, তাতে তত বাতাস ধরবে, আর

ওটি তত বেশি বেগে জাহাজকে এগিয়ে নেবে। একেবারে শুরুতে খুব বড় একটি পাল ব্যবহারটাই নিয়ম ছিল। কিন্তু দেখা গেলো এতে মোট পালের আয়তনটি খুব বড় করা যাচ্ছেনা, তাছাড়া ঝুঁকিটিও বেশি, কামানের গোলায় অথবা ঝড়ে এটি ছিন্নভিন্ন হলে সব গেলো। তাই একটি বিশাল পালের বদলে কয়েকটি ছোট পালকে মাস্তুলে একের ওপর আরেক বিন্যাসের ব্যবস্থা করা হলো– যাতে একটি নষ্ট হলে ছোট একটি পালের অভাবই শুধু হবে আপাতত, বাকিগুলো অক্ষুণ্ন থাকবে। তাছাড়া গতি বাড়াতে অথবা ঝড়ের সময় আত্মরক্ষা করতে পাল বাড়ানো, পাল কমানো, পাল নিয়ন্ত্রণ করা এসবেও সুবিধা হয়। পালের মোট আয়তন আরো বাড়াবার জন্য একটির বদলে কয়েকটি মাস্তুলের ব্যবস্থা হলো, বড় জাহাজে অন্তত তিনটা– সামনের মাস্তুল, তার পেছনে প্রধান মাস্তুল, তারও পেছনে পেছনের মাস্তুল। তাছাড়া জাহাজের সামনের গলুই থেকে একটি লম্বা দণ্ড তেরচা মাস্তুলের মত সামনের দিকে কোণাকুণি অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়া হলো– যাকে বলা যায় সম্মুখ-দণ্ড (বোস্প্রিট); এও বাড়তি পাল খাটাতে কাজে লাগে।

প্রত্যেক মাস্তুলের সঙ্গে সমকোণে আড়াআড়ি থাকে কয়েকটি লম্বা দণ্ড মাস্তুলের বিভিন্ন উচ্চতায়; এগুলোকে বলা যায় আড়-দণ্ড (ইয়ার্ড)। এক একটি পাল এক একটি আড়-দণ্ড থেকে ঝুলানো থাকে। সব থেকে নিচের পালটি সব চেয়ে বড়– এর নাম 'বড় পাল' (কোর্স), এর ওপরেরটি একটু ছোট– 'উচুঁ পাল' (টপ), তার ওপরেরটি আরো ছোট– 'উঁচু-বীর পাল' (টপ-গ্যালান্ট), সবার ওপরে 'রাজা পাল' (রয়্যাল)। মনে রাখতে হবে ডেকের ওপরে প্রায় শ'খানেক ফুট লম্বা মাস্তুলের নিচের দিকের থেকে ওপরের দিকে বাতাসের বেগ বেশ খানিকটা বেশি, ওপরের পালকে সেই ধাক্কা নিতে হয়। প্রত্যেকটি পাল যার যার আড়-দণ্ড থেকে ঝোলানো থাকে, এবং তার ঠিক নিচের আড়দণ্ডে এই পালের কোনাগুলো আল্গা করে আটকানো থাকে। পালের মত তার আড়-দণ্ডেরও নাম থাকে। আড়-দণ্ডগুলো দড়ির বিশেষ বাঁধনে মাস্তুলের সঙ্গে এমন ভাবে আটকানো থাকে যে এগুলোকে ঘোরানো যায়, আর সেই সঙ্গে তার পালকেও; এভাবে পালকে ঘুরিয়ে স্কোয়ার অবস্থা থেকে (আড়াআড়ি) ল্যাটিন অবস্থায় (আগু-পিছু), অথবা যে কোন মাঝামাঝি অবস্থায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব। প্রত্যেক মাস্তুলের প্রত্যেক পালকে নিজস্ব নামে ক্যাপ্টেন থেকে শুরু করে খালাসি পর্যন্ত সবাই চিনতে পারে– যেটি দ্রুত নির্দেশ দেয়া ও পালনের জন্য জরুরি। যেমন সামনের মাস্তুলের উঁচু পালকে বলা হবে 'সামনের উঁচু' অথবা প্রধান মাস্তুলের রাজা পালকে বলা হবে 'প্রধান রাজা' ইত্যাদি।

স্কোয়ার পালের জাহাজেও প্রয়োজনের সময় বাতাসের বিপরীতে যাওয়ার কাজে সুবিধা পেতে কয়েকটি ল্যাটিন পালও থাকে। সাধারণত সামনের দিকে সামনের মাস্তুল থেকে সম্মুখ-দণ্ডে, অথবা প্রধান মাস্তুল থেকে সামনের মাস্তুলে খাটানো আগু-পিছু অবস্থানে এগুলো থাকে। এই পাল ত্রিভুজের আকৃতির বলে এটি ঝোলানোর আড়দণ্ডটি মাস্তুলের সঙ্গে সমকোণে থাকার বদলে সামনের দিকে তেরচা হয়ে নিচে নেমে আসে সমকোণী ত্রিভুজের অতিভূজের মত।

ল্যাটিন পাল যে রকম মূলত একটি চীনা উদ্ভাবন যা প্রথমে আরবে, দ্বাদশ শতাব্দীতে ভূমধ্য সাগরে এবং পরে পুরো ইউরোপে অনুকরণ করা হয়েছে, তেমনি আরো দুটি চীনা উদ্ভাবন মধ্য যুগের শেষের দিকে সর্বত্র চালু হয়ে সমুদ্র যাত্রাকে অনেক স্বচ্ছন্দ করেছিলো। এর একটি হলো চৌম্বক কম্পাস এবং অন্যটি খাড়া পশ্চাত-হাল। প্রাচীন কাল থেকে জাহাজ চালাতে দিক নির্ণয় করা হতো সূর্য তারা ইত্যাদির অবস্থান দেখে। চীনরাই প্রথম আবিষ্কার করে যে একটি চুম্বক শলাকা সব সময় উত্তর-দক্ষিণে থাকে এবং তা জাহাজে দিক নির্ণয়কে অনেক অনেক সহজ ও নিখুঁত করে। অন্য যে চীনা উদ্ভাবন সব জাহাজের চলাচলকে অনেক স্বচ্ছন্দ করেছিলো তা হলো পেছনের মাঝখানে স্থাপিত খাড়া হাল। এর আগে চওড়া দাঁড়ের মত হালকে পেছনের এক পাশে রেখে তাকে একাৎ ওকাৎ করে জাহাজকে ঘুরানো হতো– প্রাচীন কাল থেকে মধ্য যুগ পর্যন্ত এইই ছিল ব্যবস্থা। চীনাদের ওই নতুন উদ্ভাবন পেছনে মাঝখানের হাল (রাডার) একটি অপেক্ষাকৃত ছোট তক্তার মত জাহাজের পেছনে খাড়া আটকানো থাকে, যাতে তক্তাটি এপাশ-ওপাশ দরজার মত ঘোরানো যায় তার কব্জার ওপর। এই হালকে একটু এপাশ করলেই গতিশীল জাহাজে পানির স্রোতের চাপ তখন হালের ওপর লেগে তার সঙ্গে থাকা জাহাজের পেছন ভাগকে ওদিকে ঘোরায়– ফলে জাহাজের সম্মুখ ভাগ উল্টো দিকে অনেকখানি ঘুরে যায়। এতে খুব মসৃণ ভাবে অল্প জায়গার মধ্যে জাহাজকে অনেকখানি ঘুরিয়ে ফেলা যায়। আগের দাঁড়ের মত হাল দিয়ে জাহাজকে ঘোরাতে অনেক সময় ধরে অনেক বড় বৃত্তে জাহাজকে ঘুরিয়ে এনে তা করতে হতো। এই চীনা উদ্ভাবনটি সব ক্ষেত্রে চালু হবার পর প্রথম দিকে একটি লম্বা হাতল দিয়ে পেছনের খাড়া হালটিকে এদিক ওদিক করা হতো, নৌকায় এখনো করা হয়। কিন্তু পরে জাহাজে হালের দুপাশ আটকানো দড়িকে একটি স্টিয়ারিং হুইলের (দিক পরিবর্তনের চাকা) মধ্যে পেঁচানো হয়– যাকে জাহাজের 'হুইল' বলা হয়। সুখানি

এই হুইল ঘুরিয়ে হালকে এদিক ওদিক করতে পারেন। বহু কাল ধরে সমুদ্র যাত্রায় চীনাদের এসব অবদান একটি বড় ভূমিকা রেখেছে।

চট্টগ্রাম উপকূলে দূর সমুদ্রের হাতছানি

আরব 'ধও'য়ের আনাগোনাঃ

সেই নবম-দশম শতাব্দীতে চট্টগ্রাম বন্দরে যে সব আরব জাহাজের প্রথম আনাগোনা হয়েছিলো এবং এরপর কয়েক শত বছর ধরে যেগুলো এখানে প্রধান জাহাজ ছিলো, অনেকটাই ঠিক সে রকম জাহাজ ও নৌকা এখনো প্রচুর দেখা যায় ওমানে, দুবাইতে, ভারতের পশ্চিম উপকূলে যেমন কেরালায়, এবং পূর্ব আফ্রিকায় কেনিয়ার ও তানজানিয়ার উপকূলে। এই সব জায়গায় এগুলোর নাম 'ধও' যেটি একটি সোয়াহিলি শব্দ (পূর্ব আফ্রিকার প্রধান ভাষা)। আজ এগুলো স্থানীয় জেলেদের মাছ ধরার কাজে এবং পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়; আকারেও ছোট। কিন্তু একদিন বড় বড় ধও ভারত মহাসাগরে সমুদ্র পাড়ি দিতো, প্রধানত বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। এই আরব ধওয়েই নিয়ে এসেছিলো চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের জন্য সমুদ্র যাত্রার প্রথম রোমান্স। এই জাহাজগুলো ছিল ল্যাটিন পালে সাজানো, সাধারণত জাহাজে আগু-পিছু করে খাটানো। শুরুতে ধওগুলো ব্যস্ত থাকতো প্রধানত উপকূল ঘেঁষা বাণিজ্যে; যেমন চট্টগ্রাম থেকে বাংলা উপকূল, অন্ধ্র উপকূল হয়ে সিংহল ঘুরে ভারতের পশ্চিমে মালাবার উপকূল, তারপর পারস্য উপসাগরে দুবাই ইত্যাদি। পারস্য উপসাগর থেকে ধও যেতো কেনিয়ার মোম্বাসা ও এখনকার টানজানিয়ার দ্বীপ জাঞ্জিবারে। এই যাত্রাগুলো এখনো আছে, তবে এখন তা ইঞ্জিন চালিত; দুবাইয়ের বার দুবাই জাহাজ ঘাটে দাঁড়ালে দেখা যায় এগুলো নানা পণ্য নিয়ে কেরালার দিকে রওয়ানা হচ্ছে; চেহারা সেই অবিকল পুরানো ধওয়ের, কিন্তু পাল ছাড়া ধও হলো লবন ছাড়া তরকারির মতই বিস্বাদ। তার স্বর্ণযুগে পালতোলা ধও উপকূলীয় বাণিজ্য থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ভারত মহাসাগরে দূর-সমুদ্রে আরবদের একচেটিয়া বাণিজ্যের বাহন হয়েছিলো। একই সূত্রে গাঁথা এই দুই বাণিজ্য এক সঙ্গে চল্‌তো– উপকূলীয় বাণিজ্য এবং দূর-সমুদ্র বাণিজ্য। দূর-সমুদ্রে পাড়ি দেয়া বড় বড় ধওগুলো চট্টগ্রাম, আরাকান ছাড়িয়ে মালয়, সুমাত্রা, জাভা পর্যন্ত যেতো প্রধানত মশলা বাণিজ্যের জন্য। এই মশলা এবং প্রাচ্যের আরো সব কিংবদন্তী খ্যাত পণ্য নিয়ে ধও যেতো মধ্যপ্রাচ্যে; সেখান থেকে পূর্ব আফ্রিকা; এসব জায়গা থেকে কয়েক দফায় সমুদ্র-পাড়িতে ইউরোপের বাজারে। এভাবে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত

চলেছে, পর্তুগীজদের হাতে ভারত মহাসাগরীয় এই বাণিজ্য হারিয়ে ফেলার আগে পর্যন্ত। যদিও ধও জাহাজের এই বিস্তৃত বাণিজ্য আরবদের ছিল, জাহাজগুলোতে কিন্তু আরব অবদানের থেকেও বেশি অবদান ছিল ভারতের– জাহাজ নির্মাণ কৌশলে, জাহাজ নির্মাণে ব্যবহৃত কাঁচামালে, এবং সেই জাহাজের নাবিক যোগান দেয়াতে। এই শেষের কাজটিতেই চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের সমুদ্রে হাতেখড়ি হয়েছিলো– যেমন হয়েছিলো অন্ধ্র ও মালাবার উপকূলের এবং মালয়ের কিছু মানুষেরও। সেই যে হাতেখড়ি হয়েছিলো, আরবরা গিয়ে পর্তুগীজরা এলেও সে কাজের কোন ব্যত্যয় হয়নি।

ওভাবে আরবী জাহাজে শুরু হয়েছিলো বলেই হয়তো পরে চট্টগ্রাম-নোয়াখালী-সিলেটের, অন্ধ্র ও মালাবার উপকূলের, এবং মালয়ের সে অসংখ্য মানুষ দীর্ঘ কয়েকশত বছর ধরে পর্তুগীজ, ডাচ, ইংরেজ জাহাজের চালিকা শক্তি খালাসি হিসেবে কাজ করেছে, অদ্ভুত এক যোগাযোগে তাদের প্রায় শতভাগই মুসলিম ছিলো। ওই সব জায়গায় ইসলাম যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ ছিল আরব বণিক ও ধর্ম প্রচারক সুফী দরবেশদের যাওয়া– ওই ধওয়ে করেই। একটি নাবিক-ঐতিহ্য তখনই ওদের মধ্যে গড়ে ওঠেছিলো, যা শেষ পর্যন্ত বজায় ছিলো। সে সময় চট্টগ্রামে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম ছিলনা, মালয়েও নয়, ভারতীয় উপকূলে তো নয়ই। কিন্তু নাবিক ঐতিহ্যটি ছিল তাদেরকে নিয়ে। খালাসি শব্দটিই আরবী; এটি অবশ্য এই নাবিকরা নিজেরা নিজেদেরকে বোঝাতে ব্যবহার করতো। পরবর্তী সময়ে জাহাজের মালিক ইউরোপীয়রা তাদেরকে বোঝাতো অন্য একটি শব্দ 'লস্কর' দিয়ে, যার অর্থ সেনা বা নৌবাহিনীর সাধারণ সৈন্য। শব্দটি ফারসি হলেও ওই পর্তুগীজ, ডাচ, ইংরেজ মালিকদের ব্যবহারে এটি এসেছে পর্তুগীজ ভাষা হয়ে, কারণ ওই ভাষায় এর অর্থ দাঁড়িয়েছিলো 'পূর্ব দেশের নাবিক'। তাদেরকে ইউরোপীয় নাবিকদের থেকে আলাদা করে ওরা তাই লস্কর শব্দটাই বরাবর ব্যবহার করেছে; কিন্তু নিজেদের কাছে তারা খালাসি– মুক্ত। নিজেদের নেতৃত্বও তাদের নিজের মধ্য থেকেই এসেছে– সারেং, টেন্ডল, সুখানিরা; সে কথায় পরে আসা যাবে।

ধও জাহাজগুলোর কী রকম ছিল? ল্যাটিন দেশগুলোতে চালু হবার বহু আগেই এটি ল্যাটিন পাল ব্যবহার করেছে, খুব সম্ভব চীনা জাহাজ থেকে শিখে; এবং এখনো শুধুই ওই ত্রিভুজাকৃতি সাধারণত আগু-পিছু অবস্থানে থাকা ল্যাটিন পালই ধওতে ব্যবহৃত হয়। ধও কখনো খুব অতিরিক্ত বড় ছিলনা, তাই ল্যাটিন পালের সহজ নমনীয়তা এর উপযুক্ত ছিল– অনুকূল বাতাসে তাকে আড়াআড়ি করে

স্কোয়ার পালের মত ব্যবহার করা যেতো, আবার বাতাসের বিপরীতে যেতে এটি যে বিশেষ উপযোগী তাতো আমরা দেখেছিই। এই জাহাজের আরো বৈশিষ্ট ছিল তার নির্মাণে। এতেও তক্তা পাশাপাশি জুড়ে জুড়ে জাহাজের খোল তৈরি হতো, কিন্তু একটি তক্তার কিনারায় খাঁজ কেটে পাশের তক্তার ওপর চড়িয়ে দেয়ার বদলে একটি অন্যটির সঙ্গে একেবারে গায়ে গায়ে লেগে পাশাপাশি থাকতো। এতে লোহার পেরেক বা বোল্ট কিছুই ব্যবহার করা হতোনা– লোহা ব্যবহার করে মরিচা ধরার কোন সম্ভাবনাই এতে রাখা হয়নি; বরং তক্তাগুলো জোড়া দেয়া হয়েছে নারকেলের ছোবড়া দিয়ে তৈরি দড়ি দিয়ে বেঁধে। প্রত্যেক তক্তার মধ্যে ছিদ্র করে তার ভেতর দিয়ে ওই দড়িটি চালান করা হয়। এর মানে এখানে তক্তাগুলো পেরেক মেরে নয়, বরং 'সেলাই' করে জোড়া লাগানো হতো। এতে সমস্যা হলো তক্তাগুলোর মধ্যে সরু ফাঁক থাকার সুযোগ বেশি– তাই নারকেল ছোবড়ার আঁশ দিয়ে ফাঁক ভরাট করার কাজটি বেশ বড় হতো। অন্যদিকে লোহা ব্যবহার না করতে হওয়া ছাড়াও সেলাই করা তক্তার আর একটি সুবিধা ছিল খোলের খানিকটা নমনীয়তা। জাহাজ যদি পাথরে আঘাত পেয়ে বা চরায় আটকিয়ে ভাঙ্গার উপক্রম হতো তখন তক্তাগুলোর পরস্পরের মধ্যে বাঁধনের নমনীয়তা তাকে না ভেঙ্গে বরং কিছুটা দুমড়ে গিয়ে আঘাত সামলে নেবার সুযোগ দিতো। একাধিক মাস্তুলে একাধিক ল্যাটিন পাল, সেগুলোকে কয়েক জন নাবিক দড়ি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করছে, লম্বা হাতল দিয়ে পেছনের খাড়া হাল নিয়ন্ত্রণ করছে সুখানি– এই ছিল ধওয়ের সাধারণ দৃশ্য। প্রথম দিকে দাঁড়ের মত হাল দিয়ে এ কাজ করলেও ইউরোপীয়দের অনেক আগেই আরবরা ধওতে চীনা উদ্ভাবিত পেছনের খাড়া হাল প্রবর্তন করেছিলো।

ভারত মহাসাগরে ধওয়ের সমুদ্র যাত্রা আর এই অঞ্চলে মৌসুমি বায়ু এই দুটি জিনিস যেন একাকার হয়ে ছিলো– কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধও চলতো এই মৌসুমি বায়ুকে সম্বল করে। গ্রীষ্মকালের দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত মৌসুমি বায়ুর সঙ্গে চলে ধও সহজেই পূর্ব আফ্রিকা থেকে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূল (কেরালা ইত্যাদি), সিংহল হয়ে অন্ধ্র উপকূল, চট্টগ্রাম, বার্মা উপকূলে চলে যেতে পারতো, এবং তারপর মালয় ইন্দোনেশিয়াতে। এই পথের অধিকাংশ যাত্রায় ধও তার পাল্‌কে স্কোয়ার পালের মত আড়াআড়ি ব্যবহার করে অনুকূল বায়ুর পূর্ণ সুবিধা নিতে পারতো, আবার প্রয়োজনে কখনো যদি অল্প জায়গা প্রতিকূল বায়ুকে যেতে হতো তা হলে ল্যাটিন পালের মত আগু-পিছু করে খাটিয়ে তাও পারতো, এর জন্য কখনো বা গন্তব্য

দিকের এপাশ ওপাশ জিগ-জাগ পথে ট্যাকিং করে। এর মানে অবশ্য শুধু গ্রীষ্ম কালেই ধও ওই দিকে যেতো– পূর্ব আফ্রিকা থেকে ভারত, বাংলা হয়ে মালয়ে এবং মশলার দ্বীপগুলোতে (জীবনানন্দের সেই দারুচিনি দ্বীপের ভেতর)। কিন্তু সেখান থেকে আবার ভারতে, পারস্য উপসাগরে, পূর্ব আফ্রিকার মোম্বাসা বা জাঞ্জিবারে ফেরার উপায় কী হবে?

ফেরার জন্য ধওগুলোকে শীতকাল অবধি অপেক্ষা করতে হতো, শীতের শুরুতে বাতাস যখন ঘুরে যায়, উত্তর পূর্ব দিকে থেকে ঠাণ্ডা মহাদেশীয় মৌসুমি বায়ু যখন বইতে শুরু করতো, তখনই সময় হতো ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলো থেকে মালয়, ভারত হয়ে আবার পূর্ব আফ্রিকা; মাঝখানে পারস্য উপসাগরে ওমানে দুবাইতে ঘুরে যাওয়া যেতো। এভাবে গ্রীষ্মের মৌসুমিতে যাওয়া, এবং শীতের আরেক মৌসুমিতে ফেরা। এজন্য দরকার হলে গন্তব্য স্থলে গিয়ে সেখানে অপেক্ষা করতে হতো– পরের মৌসুম না আসা পর্যন্ত; কলম্বোতে, কিংবা চট্টগ্রামে, কিংবা মালাক্কায়; অন্যদিকে মোম্বাসায়, কিংবা দুবাইতে। আরব বণিকদের জন্য, এবং আমাদের খালাসিদের জন্য এভাবেই কাট্‌তো এক একটি বছর।

পর্তুগীজ 'নাও', বিশ্ব-প্রদক্ষিণের জাহাজঃ

পর্তুগীজ জাহাজ যখন চট্টগ্রামে প্রথম এসেছে সেই ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে পর্তুগাল পৃথিবীর একটি বড় নৌ-শক্তি। তাদের অভিযাত্রী জাহাজগুলো বিশ্বের বিভিন্ন নতুন নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কার করছে, তাদের যুদ্ধ জাহাজ আমেরিকায়, এশিয়ায়, আফ্রিকায় নতুন নতুন উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তার করছে, তাদের বাণিজ্য জাহাজ কোন কোন সমুদ্রে রীতিমত একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে শুধু নৌ-কৌশল ও নৌসেনাদের বলে। এই সব কাজে তারা প্রধানত যে বড় জাহাজ ব্যবহার করতো তাকে সবাই বল্‌তো কারাক, কিন্তু পর্তুগীজরা নিজেরা সেগুলোকে বল্‌তো 'নাও'। পর্তুগীজ ভাষায় নাও মানে হলো নৌকা অথবা জাহাজ। একটি বিশেষ ধরণের জাহাজকে পর্তুগীজরা জাহাজ বলতো কেন? এর কারণ ওটিই ছিল দীর্ঘ সময় ধরে পর্তুগীজ নৌ-শক্তির প্রধান গৌরব, তাদের নৌবহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাহাজ। মধ্য যুগের শেষে এসে ইউরোপের বিভিন্ন নৌ-শক্তি পর্তুগীজ, স্প্যানিশ, ইংরেজ এবং ফরাসীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে উন্নততর জাহাজ নির্মাণের যে চেষ্টা তারই একটি উৎকৃষ্ট নমুনা ছিল এই নাও। আমরা আগে গ্রীক-রোমান জাহাজ নির্মাণের এবং পরবর্তী ইউরোপীয় জাহাজের পাল ও পাল-বিন্যাসের যে বর্ণনা দিয়েছি অনেকটা সেই

ধারাতেই নাও গড়া হতো। চট্টগ্রাম বন্দরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে সব পর্তুগীজ জাহাজ দেখা দিতো এবং এখানকার খালাসিরা আরো কয়েক শত বছর ধরে যে সব জাহাজের বড় চালিকা শক্তি ছিলো, এই নাও সেগুলোর মধ্যে অত্যন্ত বিশিষ্ট।

আরবী ধওয়ে কিংবা পর্তুগীজ নাওয়ে আমাদের খালাসিদের সম্পর্কে তথ্য আমরা সরাসরি কোন উৎস থেকে পাইনা। কিন্তু পরবর্তীকালে ডাচ (ওলন্দাজ) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অনুরূপ পালের জাহাজে তাদের কাজের প্রচুর বর্ণনা রয়েছে– এবং সেখান থেকেই এই খালাসিদের সঙ্গে পর্তুগীজদের সম্পর্কেরও কিছু হদিশ পাওয়া যায়। ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মূল নথির ওপর ভিত্তি করে এক গবেষণা প্রতিবেদনে ১৭৭৪ সালের এপ্রিলের শেষের দিকে বাটাভিয়ায় (বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা) ঘটা একটি ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে (বন্ধনীর ভেতরের কথাগুলো ব্যাখ্যামূলক, প্রতিবেদনের অংশ নয়):

> "গাছের পাতায় বোনা একটি মাদুরের ওপর একজন ভারতীয় নাবিকের মৃতদেহ শুইয়ে রেখেছে তার সহকর্মীরা। মৃত ওই ব্যক্তিকে এখানে সবাই জাইন্ত্যে বলে ডাকতো– তিনি ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দাঁড়-টানা বিভাগের একজন কর্মী ছিলেন, বাটাভিয়ার সমুদ্র তীরেই থাকতেন। তাঁর বাড়ি বেঙ্গল অঞ্চলে (চট্টগ্রাম-নোয়াখালী অঞ্চল তখন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভূক্ত)। সহকর্মীরা ইচ্ছে করেই জাইন্ত্যের মৃতদেহটি সবার কাছে খোলামেলা প্রদর্শন করছিলো, কারণ তারা ছিল শোকে ক্ষুব্ধ। জাইন্ত্যে মারা যাওয়ার আগের দিন তিনি সহ এই বিভাগের কয়েকজন কর্মীকে কয়েকটি জাহাজ দাঁড় বেয়ে বাটাভিয়ার বন্দর থেকে খোলা সমুদ্রে নিয়ে যাওয়ার, এবং আরো কয়েকটি জাহাজকে একই ভাবে বন্দরে নিয়ে আসার, কাজ দেয়া হয়েছিলো।... অস্থায়ী কোয়ার্টার মাস্টার লীনডার্ট ওই এই মূরদের তদারকির দায়িত্বে ছিলেন। ক্যাথোলিক হোক বা মুসলিম হোক ভারতীয় নাবিকদেরকে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভাষায় মুর বলা হতো (আসলে ক্যাথোলিক কয়েকজন ছিল পর্তুগীজদের দ্বারা ধর্মান্তরিত চট্টগ্রাম ও আশপাশের বাসিন্দা, বাকি সবাই ছিল মুসলিম)। লীনডার্টের বক্তব্য হলো এর আগে কখনো এই নাবিকরা তাঁর বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর আচরণের কোন অভিযোগ আনেনি; হ্যাঁ কখনো কখনো বেশি অপরাধের জন্য তিনি

কাঠের লাঠি দিয়ে শাস্তি দিয়েছেন, কিন্তু তা সংযত ভাবেই। অন্য দিকে খালাসি লরেন, সারেং ক্যালে, টেন্ডল নাসির, ও টেন্ডল রহিমের বক্তব্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সারেং ও টেন্ডলদের পদমর্যাদা নৌবাহিনীর পেটি অফিসার আর বাণিজ্য জাহাজের কোয়ার্টার মাস্টার বা নৌকাধ্যক্ষের সমান। এই সারেং আর টেন্ডলদের হাতেই খালাসিদের তদারকির ভার থাকে। মূল দায়িত্ব সারেং পালন করেন, টেন্ডলরা তাঁকে সাহায্য করেন। এই বিচারের পুরো বর্ণনা ফৌজদারি আদালতের নথিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং বাটাভিয়া থেকে হল্যান্ডে পাঠানো হয়েছে। এ নথি ডাচ ভাষায় লিখিত হলেও ওই ভারতীয় নাবিকরা তাঁদের বক্তব্য দিয়েছেন পর্তুগীজ ভাষায়, অথবা অনুবাদকের মাধ্যমে। (তবে প্রতিবেদনের সঙ্গে দেয়া নোট অনুযায়ী নিয়ম ছিল অনুবাদকের মাধ্যমে দিলে বাধ্যতামূলক ভাবে নথিতে মূল ভাষা ও অনুবাদকের নাম লেখা থাকতে হয়, সেরকম কিছু লেখা নেই। সে জন্য পর্তুগীজ ভাষায় তাঁরা জবানবন্দী দিয়েছেন ধরে নিতে হবে।) পেটি অফিসার ক'জন– ক্যালে, নাসির ও রহিম– মুসলিম ধর্মীয় মতে শপথ বাক্য পাঠ করেন, আর খালাসি লরেন ক্যাথোলিক মতে; শেষ করেছেন পর্তুগীজ ভাষায় ইশ্বর আমার সহায় থেকে বলে।.. তাঁরা সবাই বলেন দেরিতে কাজে হাজির হবার জন্য লীনডার্ট জাইন্ত্যেকে দাঁড় দিয়ে বুকে ও অন্যান্য জায়গায় আঘাত করেন যে কারণে তাঁর মৃত্যু হয়।"

এই মামলায় লীনডার্টের জেল হয়েছিলো। যেটি লক্ষ্য করার বিষয় তাহলো সারেং- টেন্ডলদের জবানবন্দীর গুরুত্ব এবং পর্তুগীজ ভাষায় বক্তব্য দানের ক্ষমতা। ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পাশাপাশি তখনো পর্তুগীজ বাণিজ্য বহর এ অঞ্চলে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল- আর ওখানেই তারা নাবিক-অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলো বলেই অন্য সব বহরেও সম্মানের আসনে যেতে পেরেছিলেন। প্রক্রিয়াটি স্পষ্টত শুরু হয়েছিলো আরো আগে, যখন চট্টগ্রামের পর্তুগীজ প্রভাব তার তুঙ্গে, আর সেই বন্দরে নোঙ্গর করা নাওয়ের সারিগুলো দেখার মত ছিল।

নাও সম্পর্কে একটি ভাল বর্ণনা পেতে হলে অপেক্ষাকৃত ছোট দুটি বিখ্যাত জাহাজের বর্ণনার দিকে তাকাতে হবে, কারণ এরা তাদের ইতিহাস-খ্যাত সফল অভিযাত্রার কারণে সারা দুনিয়ার মানুষের কৌতুহলের কারণ হয়েছে যুগ যুগ ধরে। এর একটি হলো কলম্বাসের ১৪৯২ সালের আমেরিকা আবিষ্কারের যাত্রায় প্রধান জাহাজ 'সান্তা মারিয়া' এবং অন্যটি হলো ১৪৯৭-৯৯ সালের ভাস্কো দা গামার ভারতে আসার সমুদ্র পথ আবিষ্কারের যাত্রায় প্রধান জাহাজ 'সান

গ্রেব্রাইল'। এদের মধ্যে সান্তা মারিয়া পর্তুগীজ জাহাজ ছিলনা, এটি ছিল স্প্যানিশ, অভিযাত্রাটিও ছিল স্পেনের পক্ষ থেকে; তবে এই জাহাজ নাওয়ের থেকে মোটেও খুব একটা ভিন্ন ছিলনা, যদিও আকারে অনেক ছোট।

আগের বর্ণিত ইউরোপীয় জাহাজের থেকে নাওয়ের যুগে আসতে যে প্রধান পরিবর্তনগুলো হয়েছে তা ঘটেছে জাহাজের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বাড়ার ফলে। এখন যুদ্ধ জাহাজই হোক আর বাণিজ্য জাহাজই হোক, যথেষ্ট সংখ্যক ভারী কামান বহন করা ছাড়া তারা নিরাপদে দীর্ঘ সমুদ্র পাড়ি দিতে পারেনা। বিভিন্ন ডেকের দুই পাশে সারিবদ্ধ ভাবে এ কামান থাকতো। কামানের ও নাবিকের বর্ম হিসেবে জাহাজের খোলের দুই পাশকে পানির ওপরে আরো যথেষ্ট উঁচু করতে হয়েছে, ফলে বাইরে থেকে কেউ সহজে উঠে ডেকে ঢুকতে পারতোনা। এর ভেতর সারি সারি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে কামানের মুখ বের হয়ে থাকতো। দুপাশে কামানের ওজনের কারণে খোলের দুই পাশের ওপর বাইরের দিকে বাড়তি চাপে তা মধ্যভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার প্রবণতা দেখা দিতে পারে; তাই জাহাজকে নিচের দিকে অনেক চওড়া করে ওপরে ডেকের কাছে ক্রমে প্রস্থটি একটু ছোট করে আনা হয়েছে, যাতে ওখানে দুপাশে কামানের ওজনের চাপটি বাইরের মুখী না হয়ে ভেতরের মুখী হয়। এর ফলে দৈর্ঘের হিসেবে প্রস্থ বড় হয়ে নাওকে একটু গোলগাল আকৃতি দিতো। এতে এর ভেতরে অনেকটা খোলাসা জায়গারও সৃষ্টি হয়েছে। আগের মতই তিন বা চারটি মাস্তুলে সেই রকম নানা স্কোয়ার পালের বিন্যাস এতে থাকতো, এবং সামনে কয়েকটি ল্যাটিন পালেরও।

নাওয়ের সম্মুখ-কুঠিটিও পশ্চাত-কুঠির মতই ডেকের ওপরে উঁচু হয়ে থাকতো, পুরো জাহাজটি তাই সামনে-পেছনে অনেকটা ইংরেজি U অক্ষরের আকৃতি ধারণ করতো। অধিক নাবিক ও অধিক সৈন্যের স্বচ্ছন্দ বসবাসের জন্যই এটি করা হতো– কিন্তু এতে সামনের মাস্তুল, সম্মুখ-দণ্ড, ইত্যাদির সঠিক স্থাপনায় সমস্যাও সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে বাতাসের বিপরীতে চলাটি ভারী জাহাজ নাওয়ের পক্ষে আরো কঠিন হয়ে পড়েছিলো। ভাস্কো দা গামার ভারতে আসার সমুদ্র পথ আবিষ্কারের বড় গুরুত্ব ছিল যে সথাসম্ভব অনুকূল বাতাসে পর্তুগাল থেকে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল হয়ে আফ্রিকার দক্ষিণ বিন্দু উত্তমাশা অন্তরীপে (কেইপ অফ গুড হোপ, বর্তমানে কেপটউন) পৌঁছে যাওয়া। এই অন্তরীপ ঘুরে গিয়ে এবার দক্ষিণ দিক থেকে আসা অনুকূল বায়ুতে জাহাজ পূর্ব আফ্রিকার বন্দরগুলোতে গিয়ে সেখানে অপেক্ষা করতে পারতো যতক্ষণ পর্যন্ত না

গ্রীষ্মকালীন মৌসুমির দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে আসা বাতাস তাকে ভারতে নিয়ে যেতে পারে– ঠিক যেভাবে ধওগুলো যেতো। ভারত আসার এই পথ ভাস্কো দা গামাকে ভারতের পশ্চিম উপকূল গোয়া দ্বীপ ও সন্নিহিত কিছু অঞ্চল দখল করে সেখানে শক্তিশালী পর্তুগীজ উপনিবেশ স্থাপনে সমর্থ করেছিলো। গোয়ার নৌ-শক্তি কেন্দ্র থেকেই পর্তুগীজরা সিংহল, চট্টগ্রাম, মালয় হয়ে চীন-জাপান পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিলো, যেই প্রভাব তাদেরকে একটি দীর্ঘ সময় ভারত মহাসাগরে একচেটিয়া বাণিজ্য বজায় রাখতে সক্ষম করেছিলো, ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শুরু থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত। তারপরও অন্যান্য নৌ-শক্তির সঙ্গে এখানে তাদের অবস্থান বজায় ছিলো।

সান্তা মারিয়া ও সান গ্রেব্রাইল উভয় জাহাজ বাণিজ্যের কাজে নয়, নতুন দেশে অভিযাত্রার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে বলে সেগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট ছিল। তবুও সান গ্রেব্রাইল ২০টি কামান রাখতে সক্ষম হয়েছে– সবই ওপরের ডেকে। কিন্তু এরপর যে সব নাও ভারত মহাসাগরে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো এর থেকে ৫-৭ গুণ বড় ও ভারী এবং সেগুলোর একের নিচে এক কয়েকটি ডেক থাকতো– দ্বিতীয় ডেকটি সাধারণত কামান ডেক হিসেবে ব্যবহৃত হতো, তবে প্রধান ডেক এবং নিচের অন্য ডেকেও কিছু কামান থাকতো। বাকি নিচের সবগুলো ডেক ব্যবহৃত হতো পণ্য রাখার জন্য। এত ভারী জাহাজকে গতিশীল রাখার জন্য যত বেশি সম্ভব স্কোয়ার পাল থাকতো তিন-চারটি মাস্তুলে, এমনকি সম্মুখ-দণ্ডতেও। এর পুরো যাত্রা নির্ভর করতো অনুকূল বাতাসের ওপর। কেমন করে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ধরে পর্তুগীজ জাহাজ ভারত আসতো, এবং দূর প্রাচ্যের দিকে আরো এগিয়ে যেতো, তা আমরা দেখেছি। ফেরাটি তেমন নির্ভর করতো শীত কালীন উত্তর পূর্ব মৌসুমির ওপর, প্রায় একই পথে বিপরীত দিকে। এভাবে গ্রীস্মে গিয়ে, শীতে ফিরে পর্তুগালের লিসবন থেকে বছরে একবার পর্তুগীজ বাণিজ্য বহরের 'ভারত যাত্রা' ঘটতো। কিন্তু ব্যাপারটি সব সময় এত মসৃণ ভাবে হবার উপায় ছিলনা, নানা কারণে কোথাও যদি দেরি হতো, তা হলে সব হিসেব ওলটপালট হয়ে যেতো, আর সমুদ্র স্রোত ও বাতাসের নানা অনিশ্চতার জন্য তেমন বিলম্ব প্রাকৃতিক কারণেও হতেই পারতো।

পর্তুগাল থেকে উত্তমাশাতে পৌঁছানোটি ছিল একটি বিড়ম্বনার কাজ। জাহাজ যদি সোজা পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল ঘেঁষে কেইপ ভের্দে ইত্যাদি হয়ে আসতে চাইতো তা হলে ওখানে এখানে ওখানে এমন কিছু সমুদ্র এলাকা পেতো যেখানে বাতাস কোথাও অত্যন্ত ঝড়ো, আবার কোথাও একেবারেই গতিহীন। এই সব

অগম্য সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে একটি পথ খুঁজে নেয়া যায় বটে তবে তাতে এদিক ওদিক কিছু জায়গায় বাতাসের বিপরীতেও যেতে হয় ট্যাকিং করে– যেটি এরকম একটি ভারী স্কোয়ার পালের জাহাজের জন্য অত্যন্ত কঠিন, এবং বিপজ্জনকও বটে। তাই সোজাপথে দক্ষিণে উত্তমাশায় না গিয়ে অনেকে বরং উল্টো পশ্চিমে সুদূর ব্রাজিলের দিকে চলে যেতো– সেদিকে এক টানা অনুকূল বাতাস থাকতো বলে, এবং সেখানে ব্রাজিলে না থেমে (ব্রাজিল পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের অংশ ছিল) আরেকটি অনুকূল বাতাস ও পানির স্রোতের সুবিধা নিয়ে সোজা দক্ষিণে গিয়ে উত্তমাশার বরাবর অক্ষাংশে পৌঁছতো, এবং সেখান থেকে পশ্চিম থেকে পূর্বে যাওয়া বিখ্যাত 'বাণিজ্য বায়ু' ধরে উত্তমাশায় চলে আসতো। পৃথিবীর আবর্তনের কারণে দক্ষিণ গোলার্ধে এই বাণিজ্য বায়ু সৃষ্টি হয় ও সারা বছর থাকে। এভাবে অনুকূল বায়ু পাওয়ার জন্য বিশাল পথ ঘুরে আসতেও জাহাজের কোন আপত্তি ছিলনা। এত ঘোরা পথে এসেও যদি মধ্য জুনের ভেতরে উত্তমাশায় পৌঁছতে পারতো তা হলে ওখানে ঘুরে গিয়ে উত্তর দিকে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল আর মাদাগাস্কার দ্বীপের মাঝখানের প্রণালী দিয়ে পূর্ব আফ্রিকার নানা বন্দরে যেতে পারতো– মৌসুমি বায়ু ধরার জন্য। কিন্তু মধ্য জুনের পরে যদি উত্তমাশায় পৌঁছাতো তাহলে মৌসুমি ধরার সময় আর থাকতোনা– ওই বছরটি পূর্ব আফ্রিকায় কাটিয়ে পরের গ্রীষ্মে এই মৌসুমি ধরা ছাড়া উপায় থাকতোনা। তেমন দুর্গতি এড়াবার জন্য অনেকে ওই পথের আশা বাদ দিতো। উত্তমাশা থেকে আদৌ উত্তরে না গিয়ে তারা বরং যেমনি বাণিজ্য বায়ুতে পূর্বে যাচ্ছিলো তেমনি আরো যেতে থেকে ভারত বরাবর দ্রাঘিমা রেখায় পৌঁছাত; তারপর সেখান থেকে উত্তরে আরেক অনুকূল বায়ুতে ভারত যেতে পারতো। এতে অবশ্য আফ্রিকার বন্দর থেকে পানি ও রসদ নেয়া আর হতোনা, কিন্তু গ্রীষ্ম কালের ভেতরেই ভারত পৌঁছানো যেতো, প্রাচ্যের বাণিজ্য সেরে শীতের শুরুতেই ফেরার উল্টো মৌসুমি ধরা সম্ভব হতো। ফেরার পথটি ছিল অপেক্ষাকৃত কম জটিল। ডিসেম্বরের মধ্যে ভারত ছাড়তে পারলে শীতের উত্তর পূর্ব মৌসুমী ধরে পূর্ব আফ্রিকা, এবং তারপর উত্তমাশা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব অনুকূল বায়ুতে পর্তুগাল যেতে বেগ পেতে হতোনা।

জীবন ভর জাহাজে সমুদ্রে কাটিয়ে আমাদের খালাসিরাও এই সব পথের সব জটিলতার নাড়ী নক্ষত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন- কোথায় পুরো পাল তুলে দিতে হয়, কোথায় ঝড়ের মোকাবেলা করতে হয়, কোথায় ট্যাকিং করতে হয়; সব কিছুর ধারণা তাঁরা রাখতেন। শুধু তাই নয় কোন্ বন্দরে কোথায় নোঙ্গর করতে

হবে, বন্দরের ভেতরে যাওয়ার উপায় কী এসবও। পালে চলা ভারী জাহাজের বন্দরে ভেড়াটি সহজ কাজ ছিলনা; এই কাজটিও তাঁদেরকেই করতে হতো– জাহাজের গতি কমানো, ধাক্কা খাওয়া এড়িয়ে একে ঘোরানো, অল্প জায়গাতে সরু সমুদ্রে, জেটিতে সঠিক জায়গায় থামা। দাঁড়টানা অন্য জাহাজ এসে টেনে নিয়ে গিয়ে হয়তো তাদেরকে কোন কোন বন্দরে ঢোকাতে হতো; বাটাভিয়ার বন্দরে ওই কাজে নিযুক্ত জাইন্ত্যের ঘটনাটি থেকে আমরা এটি দেখেছি। চট্টগ্রাম বন্দরেও এসব কাজ করতে গিয়ে হয়তো একদিন তাঁদের সঙ্গে নাওয়ের নৌ-কৌশলের প্রথম পরিচয় হয়েছিলো।

ইস্ট ইন্ডিয়া ম্যানঃ

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে ভারত মহাসাগরে পর্তুগীজ একচেটিয়া বাণিজ্য একেবারে শেষ হয়ে গেলে বিভিন্ন নৌ-শক্তি এখানে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে বাণিজ্য শুরু করে, এবং প্রত্যেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নামে কোম্পানী খুলে এতে নিজ নিজ দেশের ধনীদের থেকে পুঁজি সংগ্রহ করে। শিগ্‌গির নিজ নিজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়, এবং অনেকটা তাদের পক্ষ থেকে, এই কোম্পানীগুলো বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে, কোথাও কোথাও কার্যত রাষ্ট্র ক্ষমতাও দখল করে নেয়। এভাবেই পর্তুগীজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, ডাচ্ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, স্প্যানিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সৃষ্টি হয়। একই রকম নাম, তাতে 'ইস্ট ইন্ডিয়া' কথাটি থাকার কারণ হলো– এসব নৌ-শক্তির প্রত্যেকেই সে সময় উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে উপনিবেশ বিস্তারের ও বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় ছিল, যেটি আমেরিকা আবিষ্কারের পর থেকেই চল্‌ছিলো। ওই শুরুতেই ভুল করে ওরা যে আমেরিকাকে ভারত মনে করে ইন্ডিয়া বলেছিলো, পরে ভুল বুঝতে পারলেও ওই নামটি ছাড়েনি, তাকে বলতো পশ্চিমের ইন্ডিয়া বা ওয়েস্ট ইন্ডিয়া; আর তাই আসল ভারতকে বলতে হয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া। সেই থেকে ভারত মহাসাগরের পুরো অঞ্চলের বাণিজ্যই তাদের কাছে ইস্ট ইন্ডিয়ার বাণিজ্য, এজন্যই সব কোম্পানীর এই নাম।

অন্যদিকে ইউরোপীয়দের, বিশেষ করে ইংরেজদের, একটি রীতি ছিল জাহাজকে 'ম্যান' বলা– যেমন যুদ্ধ জাহাজকে 'ম্যান অব ওয়ার' বলা। সেই রীতি অনুযায়ী ওই কোম্পানীগুলোর নৌবহরে প্রত্যেকটি জাহাজকে বলা হতো ইস্ট ইন্ডিয়া ম্যান। ক্রমে ওসময়ের প্রাচ্য বাণিজ্যে ব্যবহৃত জাহাজের সব ধরণগুলোই ইস্ট

ইন্ডিয়া ম্যান হিসেবে পরিচিত হয়। আমাদের খালাসিদের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিলো এই ইস্ট ইন্ডিয়া ম্যানগুলোতেই, তা সে ডাচ, ইংরেজ যাদের জাহাজেই হোক। পরস্পরের প্রতিযোগিতায় কী ভাবে এক একটি ইউরোপীয় দেশের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সৃষ্টি হলো তা একটি ঘটনা থেকে বোঝা যাবে।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তাদের শক্ত ঘাঁটি গোয়া থেকে পর্তুগালে ফিরছিলো দুটি বড় বড় নাও 'সান্তা ক্রুজ' এবং 'মাদ্রে দে দিয়োস'। পথে ইংরেজদের কয়েকটি জাহাজের আক্রমণে সান্তা ক্রুজ একেবারে পুড়ে ডুবে যায়, আর মাদ্রে দে দিয়োস বন্দী হয়ে ইংরেজ বহরের সঙ্গে ইংল্যান্ডের ডার্টমাউথ বন্দরে যেতে বাধ্য হয়।

সে সময় অন্য নৌ-শক্তির জাহাজ মাত্রই শত্রু জাহাজ, আর সেটি ধ্বংস করা বা লুট করা বৈধ প্রতিযোগিতারই অংশ ছিল। বাণিজ্য এখানে জলদস্যুতার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চল্‌তো। মাদ্রে দে দিয়োসের ভেতরে গিয়ে সব তন্ন তন্ন করে দেখে ইংরেজ বিশেষজ্ঞদের তাক লেগে গেলো। আর এর মালামালগুলো যখন লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে বড় সাহেবদের তো চক্ষু চড়ক গাছ। ডার্টমাউথে জাহাজটির ভেতরে ঢুকে ইংরেজরা দেখেছে ওই নাওয়ের ভেতর একের নিচে এক মোট সাতটি ডেক যার মাঝখানটা পণ্যে বোঝাই– প্রাচ্যের সব আশ্চর্য পণ্য। জানা গেলো গোয়া ছেড়ে যাওয়ার সময় পানির ওপর জেগে ছিল জাহাজটির মাত্র ২৬ ফুট; আর এখন ডার্টমাউথে মাল নামিয়ে ফেলার পর পানির ওপরে জেগে উঠলো ৩১ ফুট, এতই ছিল পণ্যের ওজন। মূলত বহু রকম মশলাই সব চেয়ে আকর্ষণীয়– গোল মরিচ, নাটমেগ, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, আদা আরো কত কি। আর একটি বড় অংশ হলো কার্পাস বস্ত্র এবং রেশমী বস্ত্র, বিশেষ করে সোনালী কাজ করা রেশম। কালিকো, কার্পেট, মুক্তা, রত্ন পাথর, হাতীর দাঁতের তৈরি জিনিস, নানা প্রাণীর পাকা করা চামড়া, প্রাচ্য দেশীয় ওষুধ, বলবর্ধক, চিত্রায়িত চীনা মাটির তৈজস, সুগন্ধি আতর, দামাস্ক, অন্যান্য নানা বিলাস দ্রব্য। এক জাহাজেই এতো বিচিত্র ও অজানা জগতের দ্রব্যাদি; এবং কোনটা অল্পসল্প নয়। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ আরো ভাল করে বুঝলো কেন পর্তুগীজরা এতদিন ধরে বছর বছর ভারত যাত্রা করছে। যে জাহাজে তারা এত পণ্য আনতে পারলো তা একটি পর্তুগীজ ইস্ট ইন্ডিয়া ম্যান। ইংরেজরা তখনো এভাবে ভারত যাত্রার চিন্তা মাথায় স্থান দেয়নি– এবার না দিয়ে পারলোনা। অবশেষে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে রাণী প্রথম এলিজাবেথ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদ দিলে এই অবস্থার পরিবর্তন হলো। এটি সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যার সঙ্গে আমরা

সবাই পরিচিত; কিন্তু আমাদের খালাসিরা সব ক'টি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কারণ তাঁরা এর প্রত্যেকটির জাহাজের চালিকা শক্তি ছিলেন।

পর্তুগীজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শক্ত নিজেদের উপনিবেশ ছিল গোয়াতে, ডাচদেরও ছিল বাটাভিয়াতে। কিন্তু ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানীর তখনো তা ছিলনা। নতুন ইংরেজ কোম্পানী মোগল সম্রাট থেকে চেয়ে নিয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলে সুরাটে তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে এবং তার প্রতিরক্ষার অজুহাতে সেখানে একটি নৌ-শক্তি গড়ে তোলে। আরো পরে মাদ্রাজে ও কলকাতায় তারা আরো দুটি কুঠি স্থাপন করে একই ভাবে। এগুলোই পরে একদিন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি আর বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি হিসেবে ভারতের শাসনভার নিয়ে নিয়েছিলো কোম্পানীর হাতে, বৃটিশ রাজের পক্ষ থেকে। কিন্তু সেটি অনেক পরের কথা। তার বহু আগে থেকেই যাবতীয় ইস্ট ইন্ডিয়া ম্যান চালনার কঠিন দায়িত্ব প্রধানত বর্তিয়েছিলো চট্টগ্রাম-নোয়াখালী-সিলেটের খালাসিদের ওপর। ইংরেজ শাসনে সেটি আরো অনেক বেড়ে গিয়েছিলো।

পর্তুগীজ নাওয়ের দ্রুত কিছু পরিবর্তন ঘটেছিলো সব ইস্ট ইন্ডিয়া ম্যানের মধ্যে– প্রথম দিকে এগুলোর সাধারণ নাম ছিল গ্যালিওন। অনেকটা নাওয়ের মতই কিন্তু চওড়া ঢাউস হবার বদলে এগুলো অনেক ছিমছাম হয়েছে, যাতে চলাচল আরো স্বচ্ছন্দ গতিশীল হয়। পরে আর কামান অত ভারী ছিলনা বলেই তা সম্ভব হয়েছিলো। জাহাজের ভেতর জায়গা অনেকটা সাশ্রয়ী ভাবে ব্যবহার করতে হয়েছে ওভাবে ছিমছাম হবার ফলে। উঁচু হয়ে থাকা বড় সম্মুখ-কুঠি এখানে অনেকটাই ডেকের নিচে চলে গেছে। তাছাড়া তাতে সব নাবিকের আর ঠাঁই হলোনা, অনেকে থাকতো নিচের কামান ডেকে, কামানের ফাঁকে ফাঁকে ঝোলা বিছানায়– যা দিনের বেলায় গুটিয়ে রাখা হতো। সব দিক থেকে আরাম আর বাড়াবাড়ি কমেছে– কিন্তু জাহাজের দক্ষতা বেড়েছে, নাবিকদের কাজের শৃঙ্খলাও বেড়েছে। পরবর্তী ইস্ট ইন্ডিয়া ম্যানগুলো অনেকটা হয়ে ওঠেছে যুদ্ধ জাহাজ ফ্রিগেটের আদলে; তখনো অপেক্ষাকৃত ছোট এবং ছিমছাম, শুধু দুটি ডেক– ওপরের প্রধান ডেক ও নিচে একটি কামান ডেক; তার নিচের খোলে পণ্য। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী এগোবার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে দস্যুতা, অরাজকতা কমে এসেছিলো বলে প্রতিরক্ষার দিকটির প্রয়োজনীয়তা কমেছে, বাণিজ্যের দিকটির গুরুত্ব বেড়েছে; এবং খালাসি ও ইউরোপীয় নাবিকদের নিজের জগতটির জমানো ভাব ও নিজস্ব পরিবেশকে বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। এখন ওদেরকে নিচের ডেকে

কামানের ফাঁকে ফাঁকে ঝোলা বিছানা ব্যবহার করতে হতোনা, বরং সম্মুখ-কুঠিতে একের ওপর আরেক নিজস্ব স্থায়ী বিছানা থাকতো, সেখানে কর্মহীন সময়ে আড্ডা দিতে পারতো; দীর্ঘ সময় সমুদ্রে থাকার জন্য এসব জরুরি ছিল। বাতাসের প্রতিকূলে যাবার সুবিধার জন্য নিরাপদে ট্যাকিং করতে পারার জন্য জাহাজের ওজন কমানো এবং ছিমছাম হওয়া যেমন জরুরি ছিল তেমনি সামনে এবং পেছনে ল্যাটিন পাল রাখাটিও জরুরি ছিল। ঝড়ের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার জন্য ওপরের পালগুলোকে দ্রুত গুটিয়ে ফেলা, ভাঁজ করে ছোট করে ফেলা ইত্যাদিরও ভাল ব্যবস্থা হলো। উনবিংশ শতাব্দীতে নানা রকম গিয়ার, লিভার ইত্যাদি যান্ত্রিক ব্যবস্থা যোগ হতে শুরু করেছিলো, পালের নিয়ন্ত্রণ, নোঙ্গর ফেলা, হুইলের দ্বারা হাল নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির কাজকে কম শ্রমসাধ্য করার জন্য। আর ওই শতাব্দীটি শেষ হবার আগেই জাহাজে বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালু হয়ে গিয়েছিলো, যদিও পালের ব্যবহার পাশাপাশি আরো কিছু দিন বজায় ছিল। অন্য বড় পরিবর্তন হয়েছিলো কাঠের জাহাজের বদলে লোহার খোলের জাহাজ এসে যাওয়া। এসব পরিবর্তনের পরও খালাসিরা ছিল; কিন্তু তাঁদের এতটা গৌরবের দিন আর ছিলনা। তাঁদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ধারাটি ছিল পালকে নিয়েই, যেখানে তাঁদেরকে ছাড়া চলতোনা। এখন তাঁদের অধিকাংশকে চলে যেতে হয়েছিলো খোলের গভীরে ইঞ্জিনের বয়লার রুমে; অসহ্য গরমে, বদ্ধ পরিবেশে, আগুনে কয়লা দেয়া ও অন্যান্য ভিন্ন কাজে। তাঁদের জন্য পালের রোমান্স শেষ হয়ে গিয়েছিলো, আর নিজেরা কার্যত জাহাজ পরিচালনার মুখ্য নায়ক হবার রোমান্সও। কিন্তু আমাদের কাহিনী ওই পালের গৌরবের যুগকে নিয়েই।

গৌরবের যুগ হবার মানে এই নয় যে তখন তাদের ভাগ্যে কর্তৃপক্ষের বঞ্চনা, দুর্ব্যবহার, শাস্তি ইত্যাদি জুটতোনা; ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর খালাসি জাইন্ত্যের কাহিনীতে তার একটি চরম উদাহরণ আমরা দেখেছি। কিন্তু সেখানেই খালাসিদের নেতৃত্বে থাকা সারেং-টেন্ডলদের মর্যাদাটিও আমরা দেখেছি– অফিসার-ক্যাপ্টেন-মালিক সবাই তাঁদের ওপর নির্ভর করতেন; ভারত মহাসগরে এবং তার বাইরেও সমুদ্র যাত্রায় তাঁদেরকে ছাড়া উপায় ছিলনা। যেমন লিভারপুল থেকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া ম্যান যখন ভারতে আসে তখন ওখানকার পাকা ইংরেজ নাবিকদের অনেকেই জাহাজে নাম লেখান জীবিকা ও এ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে। কিন্তু ভারত থেকে তাঁদের অধিকাংশই তক্ষুণি ফিরতে চাননা, কারণ কোম্পানীর রাজত্বে এখানে তাঁদের জন্য অবারিত সুযোগ, জীবনের বড় একটি অংশ এখানে থেকে উপার্জনই তাঁদের আশা থাকতো। কাজেই জাহাজকে

লিভারপুলে ফেরৎ যেতে হলে ফিরতি পথে খালাসিদের হাতেই জাহাজ সমর্পন কতে হতো– মালিকদের ভাষায় লস্করের হাতে। কিন্তু পরের বার ভারত আসার সময় ওদেরকে নিয়ে আসাটা জাহাজের জন্য লাভজনক হতোনা, তাই সে ব্যাপারে বেশি গরজ থাকতোনা, যদিও তা করতেই চুক্তিবদ্ধ থাকতো ক্যাপ্টেন। আর কোন কোন খালাসিও বিলাতের মোহে পড়ে ওখানে থেকে যেতে চাইতেন, যদিও সেটি প্রায়ই হতো বিদেশ বিভূঁইয়ে শীত ও একাকীত্বের এক কঠিন জীবন। ওই সব অভিবাসী 'বেচারা কপর্দকহীন লস্কর'দের নিয়ে বিদেশি সাহিত্যে যত লেখা হয়েছে সমুদ্রে তাদের গৌরব নিয়ে ততটা নয়। কিন্তু ওই সাহিত্যে এবং নথিতেই আমরা সারেং বিদ্রোহ, টেন্ডল বিদ্রোহেরও বর্ণনা পাই, ক্যাপ্টেন-অফিসার ইউরোপীয় নাবিকদের ছাড়াই যখন তারা জাহাজের দখল নিয়ে তার পরিচালনা করেছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না কী দুঃখ থেকে সেই বিদ্রোহ।

ক্যাপ্টেন জাহাজের সর্বময় কর্তা। তিনি এবং তাঁর অফিসারদের সঙ্গে সারেং-টেন্ডলদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও শ্রদ্ধাবোধের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করতো। উদাহরণ স্বরূপ এ সম্পর্কে একটি গবেষণা-পত্রের শিরোনাম দেয়া হয়েছে 'লর্ডস অফ দি ফোর-ক্যাসেল' অর্থাৎ সম্মুখ কুঠির নবাবরা (সারেং-টেন্ডলরা)। খালাসিদের ওপর সারেং-টেন্ডলদের একছত্র ক্ষমতার কারণে তারা স্বেচ্ছাচারী নবাবের মত আচরণ করতো, খালাসিদের ওপর নির্যাতন করতো নিজেদের স্বার্থে– এমনটি ছিল সমসাময়িক ইউরোপীয় লেখকদের অভিযোগ। এসবের বিচার করে সারেং-টেন্ডলদেরকে ন্যায্য শাস্তি দেবার কারণেই বহু সারেং বিদ্রোহের কারণ ঘটেছে এমনটিই ছিল তাঁদের ধারণা। তবে খালাসিদের প্রতি ক্যাপ্টেন ও অফিসারদের জাতি-বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা, অসম্ভব রকম পরিশ্রমে খাটানো ইত্যাদির কাহিনীও কম নেই, এবং সারেংদের রুখে দাঁড়ানোর কাহিনীও। ১৮২১ সালে বোম্বাই থেকে একটি জাহাজ আরব উপকূল আল মুকাল্লায় পৌঁছলে জাহাজের ক্যাপ্টেন হাইল্যান্ডের সঙ্গে সারেঙের বিরোধ কী পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা সমসাময়িক পত্রিকার বর্ণনায় পাওয়া যায়।

> "মুকাল্লায় আসার পর সারেং ক্যাপেটনের কেবিনে গিয়ে খালাসিদের সবাইকে তীরে নিয়ে যাবার অনুমতি চান্, কিন্তু ক্যাপ্টেন একজন একজন করে যেতে বলেন। এ নিয়ে যখন দু'জনের কথা কাটাকাটি হচ্ছিলো তখন কিছু নাবিক ডেকের পেছনে এর কাছাকাছি এসে হাজির হয়েছিলো। সারেং তাদেরকে নৌকা নামিয়ে জাহাজের পাশাপাশি আনতে বল্লে ক্যাপ্টেন বলেন একজন সারেংও যদি নৌকায় ওঠার চেষ্টা করে

তিনি গুলি করবেন।... সারেং একটি ভাঙ্গা দাঁড় অস্ত্রের মত নিজের হাতে তুলে নেন এবং কয়েকটি লাঠি খালাসিদের দিকে ছুঁড়ে দেন, এবং ক্যাপ্টেনকে গালাগাল দিতে শুরু করেন। তারপর সব খালাসিকে নিয়ে তিনি জাহাজ ছেড়ে যান। জাহাজে রইলেন শুধু ক্যাপ্টেন, চীফ অফিসার ও আরো দু'জন।"

ক্যাপ্টেন ও ইউরোপীয় অফিসাররা আল মুকাল্লার আরব শাসকদের কাছে নিজ জাহাজের কর্তৃত্ব নিতে কোন সাহায্য না পাওয়ায়, আরেকটি জাহাজে বোম্বাই চলে যান। সারেং ও তাঁর খালাসিরা নিজেরাই নিজেদের জাহাজ চালিয়ে বোম্বাই ফিরে আসেন। বোম্বাইয়ের বৃটিশ আদালতে অভিযোগ করে ক্যাপ্টেন হাইল্যান্ড বেশি সুবিধা করতে পারেননি, কারণ সারেং জাহাজটি ও তার পণ্যের কোন ক্ষতি হতে দেননি। কিন্তু অধিকাংশ অন্যান্য এরকম বিদ্রোহের ক্ষেত্রে ধরা পড়লে তাঁদেরকে চরম শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। ১৮৫২ সালে বাটাভিয়ার ডাচ্ কর্তৃপক্ষের ইংল্যাণ্ডে পাঠানো রিপোর্ট দেখা যাচ্ছে যে আলী নামের সারেং অস্ট্রেলিয়ার সিডনিগামী বৃটিশ জাহাজে বিদ্রোহ করে ক্যাপ্টেনকে হত্যা করে জাহাজের কর্তৃত্ব নিয়ে নেয়; নিজের খালাসিদের দিয়ে জাহাজ চালিয়ে নতুন পথে ইন্দোনেশিয়ার জাভার কোন জায়গায় গিয়ে নিরুদ্দেশ হবার চেষ্টা করে, কিন্তু বাটাভিয়ার ডাচ্ কর্তৃপক্ষের কাছে ধরা পড়ে যায়। তাকে আদালতে সোপর্দ করা নিয়েই ওই রিপোর্ট। লক্ষ্য করার বিষয় হলো সঠিক ভাবে দিক নির্ণয় করে, নতুন পথে নতুন গন্তব্যে যেতে তাদের কোন অসুবিধা হয়নি। অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন ও চীফ অফিসাররা যেভাবে স্যাক্সটেন্ট, চার্ট ইত্যাদি ব্যবহার করে তারার অবস্থান থেকে জাহাজের দিক, অবস্থান নির্ণয় করেন, সারেংরাও তা করতে পারতেন। আসলে নৌ-বিদ্যার অনেকটাই তখন কার্যকর অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করতো– ইউরোপীয় ক্যাপ্টেনের জন্য যেমন, সারেঙের জন্যও তেমন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে খালাসিদের এরকম বিদ্রোহের ঘটনা কমে আসে– জাহাজে অবিচার কমেছিলো, বিদ্রোহ করে লুকোবার জায়গাও কমেছিলো, পালের বদলে ইঞ্জিনের জাহাজ বেড়েছিলো– যাতে সারেং, সুখানি, খালাসিদের গুরুত্ব অনেক কমে গিয়েছিলো। ইউরোপীয় অফিসাররা ইঞ্জিনের জাহাজের বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষিত ছিল, সারেংরা ছিলনা।

সমুদ্রে খালাসিদের দিন-রাত্রি

চার ঘন্টা ডেকের ওপরে, চার ঘন্টা নিচেঃ

খালাসিদের একটানা অসম্ভব পরিশ্রম, সমুদ্রে ক্ষণে ক্ষণে ডুবে মরার বিপদ, তাদের ওপর অত্যাচার-অবিচার– এর কোন কিছুই তাদেরকে সমুদ্র থেকে দূরে রাখতে পারেনি। চট্টগ্রাম-নোয়াখালী-সিলেট অঞ্চলের অনেক মানুষ বার বার সমুদ্রে গিয়ে সারা জীবন সেখানে কাটিয়েছে সমুদ্র-জীবনের অদ্ভুত রোমান্সের হাতছানি পেয়ে। ওই পরিশ্রম, ওই নিঃসঙ্গতা, ওই আতঙ্কের মধ্যে প্রায়ই এক এক দিন মনে হয়েছে প্রথম সুযোগেই জাহাজ ছেড়ে পালাবে; কিন্তু তারপরেই এ জীবনের নেশাটাই তার কাছে বড় হয়ে ওঠেছে। আসলে এ বোধ হয় মানব প্রজাতির আদিম নেশা– ভ্রমণের নেশা যা তাকে আফ্রিকা ছেড়ে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করেছিলো। তার কাজকে আর তার জীবনকে কাছে থেকে না দেখলে খালাসির এ নেশাটিকে বোঝা যাবেনা।

২৪ ঘন্টার যে দিন তাতে খালাসিসহ সব নাবিকের কাটে চার ঘন্টার এক একটি কাজের অংশে ও বিশ্রামের অংশে। প্রত্যেককে ৪ ঘন্টা কাটাতে হয় ডেকের ওপর একটানা কাজে; কারণ ওই সময়টুকু হচ্ছে তার ও তার মত বেশ কয়েক জনের প্রহরা। পরের ৪ ঘন্টা ডেকের ওপর একটি ঢাকনি দেয়া প্রবেশ পথ দিয়ে ডেকের নিচের সম্মুখ-কুঠিতে গিয়ে সেখানে দোতলা-তিনতলা বিছানা গুলোর নিজেরটিতে ঘুমাতে পারে, বা বিশ্রাম ও আড্ডা দিয়ে কাটাতে পারে। এর পরের ৪ ঘন্টা কিন্তু তাকে আবার ডেকে গিয়ে কাজ করতে হবে, তারপর আবার ৪ ঘন্টার বিশ্রাম। এমনি করেই ৪ ঘন্টা পর পর জাহাজের যে এক একটি প্রহরা তার মধ্যে যার যার কাজ করেন বেশ কয়েক জন খালাসি, তাঁদের তদারকিতে থাকেন অন্তত একজন টেন্ডল ও অফিসার– যাঁদেরও ওটি একটি কাজের প্রহরা। আসলে সব খালাসি দুটি দলে ভাগ করা থাকেন– ডানের দল ও বামের দল, প্রত্যেক দলের এক সঙ্গে প্রহরা পড়ে একই তদারককারীদের অধীনে। একটি ডেকের ওপর কাজে থাকে, তো অন্যটি নিচে বিশ্রামে থাকে।

তদারক করা মানে শুধু দেখা-শুনা নয়; সারেং বলি, টেন্ডল বলি, সুখানি বলি, বা স্বয়ং অফিসারের কথাই বলি, তাঁরা যা খালাসিকে করতে বলেন তা নিজে সবার থেকে ভাল করেন এবং সব সময় করতে প্রস্তুতও থাকেন– দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ও পরিশ্রমের মাধ্যমেই তাঁরা ওই অফিসার বা পেটি অফিসার হয়েছেন, তাই। ক্যাপ্টেন নিজেও প্রত্যেকটি কাজ পারেন, অন্তত এক কালে খুব ভাল পারতেন– একই কারণে। এখন অবশ্য তিনি তাঁর ইচ্ছেমত পশ্চাত-কুঠিতে তাঁর কেবিন

থেকে মাঝে মাঝে দেখা দেন, কোয়ার্টার ডেকে পায়চারি করে সব কিছুর ওপর নজর বুলান, প্রয়োজনে হাঁকডাক করেন, ফার্স্ট মেইটের সঙ্গে কথা বলেন, হুকুমগুলো তাঁকে নিচু গলায় বলেন আর মেইট তা হাঁক দিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেন। তাছাড়া আকাশের অবস্থা বুঝতে তারাগুলোর পরিমাপ নিতেও তিনি যন্ত্রপাতি, টেলিস্কোপ ইত্যাদি নিয়ে মাঝে মাঝে কোয়ার্টার ডেকে দেখা দেন। অন্য সময় তিনি নিজের কেবিনে খানাপিনা করেন, জৈষ্ঠ অফিসারদের সঙ্গে গল্প করেন, পরামর্শ করেন, সমুদ্র স্রোতের চার্ট আর মানচিত্রের ওপর মাপ-জোক করেন।

ক্যাপ্টেনের হুকুমগুলো কাজে পরিণত করার দায়িত্ব মূলত সারেং-টেন্ডলের, যার যখন প্রহরা। এ দায়িত্বের মধ্যে আছে কোন্ কোন্ পাল জাহাজে খাটানো থাকবে, সেগুলোকে তুলে ধরা। বাতাসের ঝটকা বাড়ছে তাই সব মাস্তুলের রাজা পাল গুটিয়ে ফেলতে হবে, সম্মুখ উঁচু-বীর পালও। বাকি সব পাল আপাতত থাকবে, যদিও সব উঁচুবীর ও উঁচুগুলোকে ভাঁজ করে অর্ধেক করে রাখতে হবে; এর পর দরকার হলে আরো ছোট করে। আপাতত রাখলেও শিগ্‌গির হয়তো বড় পাল একটি রেখে বাকিগুলো নামিয়ে ফেলতে হবে। দমকা হাওয়া কমে গেলে সব পাল আবার উঠবে– তখন জাহাজের দিকটি কিছুটা ঘোরাতে হবে, পালগুলোকেও হয়তো ঘোরাতে হবে। সব নির্ভর করে ক্যাপ্টেনেরে ওপরে– তাঁর সিদ্ধান্তটি কী আসে। ক্ষণে ক্ষণেই সিদ্ধান্ত আসছে, একটি মুহূর্তের জন্য কারো কাজে বিরাম নেই।

জাহাজের এই যে এতগুলো কাজের জিনিস, সবই কিন্তু যার যার জায়গায় রয়েছে স্রেফ দড়াদড়ির বাঁধনে। মাস্তুল খাড়া রয়েছে সেই বাঁধনে, মাস্তুলের গায়ে আড়-দণ্ডগুলো যার যার জায়গায় আছে একই রকম বাঁধনে, পালগুলো সঠিক জায়গায় আছে তাও বাঁধনে– সব বাঁধন আবার একে অন্যটির সঙ্গে যুক্ত। আড়-দণ্ড, পাল, মাস্তুল, সব কিছু থেকে নেমে এসেছে অনেকগুলো দড়ি– কোনটি পাল তোলার জন্য, কোনটি পালকে টান টান করার জন্য, কোনটি আড়-দণ্ড ও সেই সঙ্গে পালকে ঘোরাবার জন্য, কোনটি পালের আকৃতি বদলাবার জন্য এমনি কত কি। প্রত্যেক পালের, আড়-দণ্ডের, মাস্তুলের যেমন নাম আছে প্রত্যেকটি দড়ির সে রকম আলাদা নাম আছে– ক্যাপ্টেন থেকে শুরু করে নবীন খালাসি পর্যন্ত প্রত্যেক সেই নামে সেই দড়ির প্রত্যেকটিকে চেনে।

জাহাজের কিছু দড়াদড়িকে বলা হয় স্থির দড়াদড়ি– এগুলো প্রধানত নানা দিকে টানা দিয়ে মাস্তুলগুলোকে শক্তভাবে খাড়া রাখে। বাকিগুলোকে বলা হয় গতিশীল

দড়াদড়ি– এসব দড়াদড়ির বাঁধনের মধ্যে কিছু জিনিস ঘোরে, নামে, ওঠে, আবার আটকেও থাকে শক্ত ভাবে– দড়ির বাঁধনে এত সব হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এটি নির্ভর করে উপযুক্ত গিট্টু দেবার ওপর, সঠিক কাজে সঠিক গিট্টু দিতে পারার ওপর, শত শত বছরে নাবিকরা অভিজ্ঞতা থেকে এগুলো উদ্ভাবন করেছে। এখন আমাদের স্কুলে বয় স্কাউট আর গার্ল গাইডরাই এসব গিট্টু দিতে শেখে, এবং যে নামে তারা এগুলোকে চেনে সেই নাম ওই নাবিকদের থেকেই এসেছে, জাহাজে তাদের ব্যবহার অনুযায়ী, রীফ নট্, শীটব্যান্ড, ক্লোভ হিচ, বো-লাইন ইত্যাদি। খালাসিদের অনেক কাজ ওসব দড়াদড়ি নিয়ে– তাও বেশির ভাগ সময় মাস্তুলের ওপরে উঠে বিভিন্ন আড়-দণ্ডতে দাঁড়িয়ে বা বসে, ওই শ'খানেক ফুট মাস্তুলের নানা উচ্চতায়! পালকে প্রায়ই মাস্তুল থেকে ডেকে নামিয়ে নিতে হয় ঠিকঠাক করার জন্য, যে দড়ি দিয়ে সেটি তার আড়-দণ্ড সহ নামানো উঠানো হয় ডেক থেকে দড়ি টেনে তার নাম হেলিইয়ার্ড, অনেকটা পতাকা তোলা বা নামানোর মত– কিন্তু মাস্তুলে আটকানো থাকে পাল সহ যথেষ্ট ভারী আড়-দণ্ড, কপিকল থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত জোরের দরকার। কাজগুলো কঠিন, অনেক ক্ষেত্রে অন্যের সঙ্গে সমন্বয় করে করতে হয়। মাস্তুলে উঠতে হয় দড়ির তৈরি মইয়ের মত সিড়ি বেয়ে, অনেক ওপরে দড়ির পাদানিতে পা রেখে আড়-দণ্ড ধরে কোন রকমে ওখানে টিকে থেকে। লিফ্ট নামের দড়ি দিয়ে আড়-দণ্ডে পাল ঝোলানো হয়, তারপর পালের নিচের দুই কোনায় আটকানো শীট নামের দুটি দড়ি দিয়ে নিচের আড়-দণ্ডে বাঁধলে পাল খাটানো হলো। ওই যে রাজা পাল কিংবা উঁচু-বীর পাল সেগুলো কিন্তু অনেক ওপরে। ওখানে উঠে ঝড়ো হাওয়ায় নিজেকে ধরে রেখে এসব কাজ করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, হাত-পা ফসকে নিচে ডেকের ওপর পড়ে গেলে মৃত্যু অনিবার্য– সে সময় কোন সেইফটি বেল্ট ছিলনা- সতর্কতা ও অভিজ্ঞতাই ছিল সবকিছু।

পালকে খাটানো যেমন বড় কাজ, ঝড়ের আশঙ্কার সময় বা ঝড়ের মধ্যেই দ্রুত পালকে গুটিয়ে রাখা বা ভাঁজ করে ছোট আর পুরু করে নেয়াটি খুবই জরুরি। প্রচণ্ড বাতাস পালে লাগলে শুধু পাল বা মাস্তুল নয়, জাহাজও বিপন্ন হতে পারে। ওপরে ওভাবে পাল গুটিয়ে রাখার কাজটি যথেষ্ট বিস্তারিত কাজ– নিচের আড়দণ্ডে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তার ঠিক ওপরের পালকে গুটিয়ে আনতে হয় ক্লু নামের আংটার সঙ্গে থাকা দড়ি ক্লু লাইনকে টেনে, তারপর একে আড়-দণ্ডে মুড়িয়ে বান্ডিল করার সময় হাতে চেপে চেপে সাবধানে ভেতরে জমা থাকা বাতাস বের করে দিতে হয়। এরপর অন্য একটি আবরণী ব্যবহার করে

একেবারে আড়-দণ্ডে লেপটে থাকার মত করে আটকে নিতে হয়। সারেঙের সাবধানী চোখ ওখানে মাস্তুলের ওপরেও সক্রিয় থাকে– যাতে নিখুঁত কাজের কোন বিকল্প থাকেনা। পালের বিভিন্ন জায়গায় দুই ভাঁজ তিন ভাঁজ করার জন্য ওখানটায় পালকে পাট করার রীফ নামের ভাঁজের ব্যবস্থা থাকে, তার গায়ে এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত। রীফ বরাবর দুই কিনারায় আটকানো রীফ ট্যাকল্ নামের দুটি দড়ি টেনে ওখানটায় পালকে পাট করে ভাঁজ করা যায়, আর এভাবেই পালের আয়তন অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ করে নেয়া যায়। বিশেষ করে বাতাসের প্রতিকূলে যাওয়ার সময় ল্যাটিন পালের মত আগু-পিছু করা পালের সামনের ও পেছনের কিনারা কী রকম টান টান বা কী রকম ঢিলে থাকবে, বিমানের ডানার মত কী রকম আকৃতি দেবে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ। পালের কিনারায় লাগানো কিছু দড়ি এসে বো-লাইন নামের দড়িতে পরিণত হয়। এটি টেনে টেনে পালকে সঠিক আকৃতি দেয়া যায়। ডেকের ওপর দাঁড়িয়েও পালের কিছু কাজ করা যায়– যেমন পালকে ঘোরানো যায়। প্রয়োজনে একে যে তার স্কোয়ার করা অবস্থান থেকে, অর্থাৎ জাহাজের সঙ্গে সমকোণে থাকা অবস্থা থেকে, আরো ছোট কোণে, এমনকি শূন্য কোণে আনতে যে হয় তা আমরা দেখেছি। এই ঘোরানো সম্ভব হয় আড়-দণ্ডকে ঘুরিয়ে; এ জন্য আড়-দণ্ডের দুই প্রান্ত থেকে ব্রেইস নামের দুটি দড়ি কপিকলের সাহায্যে এমন ভাবে নামিয়ে আনা হয় যেন একটি টান্‌লে ওটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘোরে, আর অন্যটি টান্‌লে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরে। প্রায় ক্ষেত্রেই সব পাল্‌কে এক সঙ্গে একই পরিমাণে ঘোরাতে হয়, তাই ওই সব দড়ি একযোগে অনেককে টানতে হয় প্রচুর শক্তি দিয়ে এবং পরস্পর সমন্বয় করে। এজন্যই স্কোয়ার পালের জাহাজে পালকে ঘোরানো মোটেই ছোট কাজ নয় যে তা ক্ষণে ক্ষণে করা যাবে। রাতে বা দিনে যে কোন সময় এসব কাজ করতে হয় আবহওয়ার এবং জাহাজের পরিস্থিতি অনুযায়ী। তবে চেষ্টা করা হয় যাতে রাতের বেলা মাস্তুলে উঠে কঠিন কাজ বেশি না করতে হয়। তাই আগেভাগে সম্ভব মত ব্যবস্থা নেয়া হয়, যেমন রাতে ঝড় উঠলে ওপরের পাল গুটাতে বা ভাঁজ করতে যেন না হয় সে জন্য সন্ধ্যার আগে আগে রাজা পাল এবং উঁচু-বীর পালগুলো এমনিতেই গুটিয়ে রাখা হয়। তাতে জাহাজের গতি কমলেও, অন্তত রাতের বেলায় মাস্তুলের অনেক ওপরে উঠে কাজ করার ঝুঁকিটা নিতে হয়না। আবহাওয়া ভাল থাকলে সকালে ওখানে উঠে এগুলো আবার মেলে দেয়া হয়।

সাধারণত এই সব কাজ প্রহরার মধ্যে থাকা খালাসিরাই সেরে ফেলে। কিন্তু যদি হঠাৎ বড় ঝড় উঠে, এবং তা একটি জরুরি অবস্থা সৃষ্টি করে, তখন প্রহর ঘোষণার ঘন্টাটি পাগলের মত বাজানো হতে থাকে যার মানে "সবাই এক্ষুণি ডেকের ওপরে"। এটি শুনলে বিশ্রামের, ঘুমের, বা খাওয়ার, যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন সবাইকে দৌড়ে ডেকের ওপর চলে আসতে হবে। শুধু খালাসিরা নয়, জাহাজের অন্য কর্মীরাও- ছুতার, বাবুর্চি, হিসাব রক্ষক, স্টুয়ার্ড কেউ বাদ যায়না; সবাই যার যার নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে যায় হুকুমের অপেক্ষায়। সবারই প্রশিক্ষণ থাকে জরুরি অবস্থা মোকাবেলার।

সুখানির বাহাদুরিঃ

সুখানি হলেন হুইল হাতে ধরে রেখে জাহাজের গতির দিক ঠিক রাখা কাণ্ডারি। খালাসি নেতাদের মধ্যে সারেং ও টেন্ডলের পরেই তাঁর স্থান। অবশ্য ২৪ ঘন্টা তো তিনি হুইল ধরে রেখে হাল ঘোরাতে পারেন না, তাই তাঁর নেতৃত্বে অন্যান্য খালাসিদের অনেকেই এই বিশেষ কাজটি শিখে নিয়েছেন। নিজেদের প্রহরার সময় তাঁদের এক একজন এক টানা দুই ঘন্টার জন্য হুইল ধরে দাঁড়ান তখনকার মতো তিনি সুখানি, অবশ্য আসল সুখানির তত্ত্বাবধানে। কাজটি মোটেই সহজ নয়, অত্যন্ত মনোযোগের দরকার হয়, জাহাজ যেন তার গতিপথ থেকে না সরে ওই সময় প্রতি মুহূর্ত এই বড় দায়িত্বটি তাঁর হাতে। তাছাড়া যখন দিক পরিবর্তন করতে হয় তখনতো কথাই নেই। হাল সোজা অবস্থা থেকে এপাশে বা ওপাশে একটুও যদি ঘোরে গতিশীল জাহাজে হালের ওপর পানির প্রচণ্ড চাপ পড়ে। তাই হুইল ঘোরানো সব সময় সহজ হয়না, অনেক সময় সুখানির অন্য কারো সাহায্য নিতে হয়, জোর শক্তিতে এটি ঘোরাতে। অথচ জাহাজের গতি কম হলে হাল কার্যকরও হয়না ভালমত; স্থির জাহাজে হাল তো মোটেই কাজ করেনা। তবে ঘোরানো কষ্টকর হওয়াটিতো সহজ সমস্যা, বড় সমস্যা হলো জাহাজের বেগ এবং পালের সঙ্গে বায়ু প্রবাহের কোণ ইত্যাদি বিবেচনায় হুইল কতটা ঘোরালে জাহাজ কতটা এদিক ওদিক ঘুরবে সেটি আন্দাজ করা। এটি করতে পারাটি বহুদিনের অভিজ্ঞতায় শুধু সম্ভব হয়। পালের জাহাজে এই কাজটি অনেক কঠিন ছিল।

অন্য সব খালাসির তুলনায় সুখানির অবস্থানটি থাকতো জাহাজের খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে– কোয়ার্টার ডেকে, যেখানে ক্যাপ্টেন ও অফিসাররাই সাধারণত কাজ করেন। প্রধান ডেক থেকে বেশ খানিকটা ওপরে থাকা এই কোয়ার্টার ডেকের

সামনের দিকে হুইল– বলতে গেলে এটিই জাহাজের পরিচালনা কেন্দ্র। যেখানে হুইলটি সুখানির হাতে ধরা থাকে সেখানটি ও জাহাজের সামনের সমুদ্রের মাঝে থাকে শুধু ডেক, যদিও পর পর মাস্তুল ও পাল সুখানির সম্মুখ-দৃষ্টিকে বেশ কিছুটা বাধাগ্রস্থ করতে পারে। তবে সামনে কী আছে তা দেখার থেকে সুখানির জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো হয় কম্পাসের দিকে, নইলে পালের দিকে, নজর রাখা। জাহাজ যখন বাতাসের অনুকূলে যায় তখন তাঁকে কম্পাসের দিকে বেশি নজর রাখতে হয়, আর জাহাজ যখন বাতাসের প্রতিকূলে যায় তখন তাঁকে কম্পাসের বদলে বিশেষ পালের দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়।

বাতাসের অনুকূলে যাওয়ার সময় সুখানির কাজটি অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল, তখন তিনি কম্পাস অনুযায়ী জাহাজ পরিচালনা করেন। জাহাজকে তখন যেদিকে নিতে চান ঠিক সেদিকেই তাকে চালানো যায়, পালের ওপর বাতাসের ঠেলার বলের একটি উপাংশ সেদিকেই কার্যকর হবে। সোজা বাতাসের গতির দিকেই যদি গন্তব্য হয় তা হলে তো কথাই নেই, পুরো বলটি সেদিকেই জাহাজকে নিয়ে যেতে চাইবে, যদিও সব সময় একটি বাধার পিছুটান (ড্রেগ) জাহাজের বেগ বাতাসের বেগের সমান হতে দেবেনা। বাতাসের অনুকূলে বাতাসের দিকের সঙ্গে বেশ কিছু কোণ করে গেলেও, এমনকি বাতাস যদি জাহাজের প্রায় পাশের দিক থেকেও আসে, সুখানির কাজ শুধু তিনি যেদিকে যেতে চান কম্পাসের সেই দিকের সঙ্গেই যেন জাহাজকে মুখ করে রাখেন। শুধু বাতাসের ও পানির স্রোতের ক্ষণে ক্ষণে সামান্য এদিক ওদিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিজের দিক মিলিয়ে রাখবেন।

সুখানির জন্য কাজ খুব কঠিন হয় যখন বাতাস জাহাজের পেছন থেকে নয়, এমনকি পাশ থেকেও নয়, অনেকটা কোণ করে সামনের দিক থেকেও নয়, বরং সোজা সামনের দিক থেকে অথবা সামনের দিকের সঙ্গে অল্প কোণ করে আসে– অর্থাৎ যখন বাতাসের প্রায় সোজা প্রতিকূলে যেতে হয়। সোজা বাতাস যেদিক আসছে সেদিকে যাওয়া যে অসম্ভব তা আমরা দেখেছি। শুধু সেদিকে সোজা যাওয়া নয় বরং তার এক পাশে ৩০ ডিগ্রি আর অন্য পাশে ৩০ ডিগ্রি এই পুরো ৬০ ডিগ্রির মধ্যে তার সঙ্গে কোণ করে যাওয়াও সম্ভব নয়– এগুলো 'যেতে না পারার দিক'। কিন্তু পালকে ল্যাটিন পালের মত জাহাজের আগু-পিছু রেখে বাতাস আসার দিকের সঙ্গে এক পাশে ৩০ ডিগ্রি থেকে ৬০ ডিগ্রি কোণ করে প্রতিকূলে যে যাওয়া যায় তাও দেখেছি– সেক্ষেত্রে পাল আর প্যারাসুটের মত কাজ করেনা, বিমানের ডানার মত কাজ করে জাহাজকে ওই দিকে যেতে দেবার

বল্‌টি সৃষ্টি করে। কাজেই এখন জাহাজকে যে দিকে নিয়ে যেতে চাই ঠিক সেদিক নিয়ে যেতে পারবোনা যদি না সেই দিকটি বিমানের ডানার মতো পালের কাজ করার দিকের মধ্যে পড়ে। তা যদি জাহাজের গন্তব্যের চাহিদা অনুযায়ী দিকের সঙ্গে নাও মিলে তাকে আপাতত ওই দিকেই যেতে হবে– কারণ সেদিকেই বিমানের ডানার মত কাজটি পাল করতে পারবে।

যেহেতু তিনি তাঁর চাহিদা মত দিকে যেতে পারছেননা, সুখানি চাইবেন সেই দিকের যত কাছাকাছি কোণে থেকে চলতে, যেখানে আবার পালটি বিমানের ডানার মত কাজও সর্বোত্তম করবে। সেটি তিনি বুঝবেন কী ভাবে? এজন্য তিনি যা করবেন তা হলো শুরুতে বাতাস আসার দিকের সঙ্গে একটু বেশি কোণ করেই এগুবার চেষ্টা করে সেই কোণটিকে ক্রমাগত বাড়াবেন। একটি পর্যায়ে এসে দেখবেন আগু-পিছু করা পালটির যে কিনারা দিয়ে বাতাস এসে ঢুকছে সেই কিনারাটি আর টান টান থাকছেনা। বরং সেটি আন্দোলিত হচ্ছে আর ওই কিনারাটি পতাকার মত পত্ পত্ করে ওড়ার চেষ্টা করছে। এর অর্থ হলো বিমানের ডানার মত কাজ করার জন্য বাতাস পালের দুই পাশ ঘেঁষে যে ভাবে যাওয়ার কথা সে ভাবে যাচ্ছেনা– পালের যে পাশ বাতাসের দিকে সে পাশে যাচ্ছে, অন্য পাশে যাচ্ছেনা, যদিও আগু-পিছু করা পালই রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে যে জাহাজের কোণ এবার কমাতে হবে যাতে কিনারা আর পত্ পত্ না করে। সামান্য কিছু কোণ কমালেই পত্ পত্ করা যেখানে বন্ধ হবে সেই দিকেই থাকতে হবে। এখানেই এটি বিমানের ডানার মত সর্বোত্তম কাজ করে। কারণ জাহাজের কোণ এর থেকে বেশি কমালে ভিন্ন রকম সমস্যায় পড়তে হবে তখন বিপরীত দিকে আসা বাতাস এমন ভাবে পালের দু'পাশে দিয়ে যাতে যে তা মসৃণ প্রবাহ না হয়ে ঘূর্ণির মত এলোমেলা প্রবাহে পরিণত হবে। অমসৃণ ঘূর্ণির মত বাতাসে যেতে গিয়ে বিমানের ডানা যেমন ভেসে থাকার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, এখানেও পালের ফুলে থাকার দিকে পার্শ্ব বল দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কাজেই সুখানি চেষ্টা হবে ওই পত্ পত্ করা দিকের যত কাছে থাকা যায় তা থাকা, কিন্তু পত্ পত্ করাটি যেন বন্ধ থাকে। এটি করতে হলে তাঁকে পালের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে হুইল ঘোরাতে হবে কখন পত্ পত্ করা শুরু হয়, কখন শেষ হয় তা দেখতে। এটিই হলো পাল দেখে জাহাজ চালানো, কম্পাস দেখে নয়। দিনের বেলা কাজটি সহজ হয়, কিন্তু রাতের বেলা আবছা আলোতে এটি নির্ণয় করা কঠিন কাজ। গন্তব্য দিক যদি এদিকেই হয় তা হলে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু গন্তব্য দিক যদি আরো সরাসরি বিপরীত বায়ুর দিকে হয়, যেটি কিনা

ওই 'না যাওয়ার' ৩০ ডিগ্রির ভেতরে হয়, তা হলে একটানা ওই সর্বোত্তম দিকে গেলে কোণ করে গেলে গন্তব্যের থেকে জাহাজ দূরে চলে যাবে। তখন একবার বাতাসের বাম দিকে সঠিক কোণ করে, আর একবার বাতাসের ডান দিকে সঠিক কোন করে গিয়ে, জিগ-জাগ পথে ট্যাকিং করে করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাতে গন্তব্যের দিকে না গেলেও তার কাছাকাছি থাকা যায়।

দায়িত্বপূর্ণ কাজ করার সময় সুখানি অবশ্য একা নন। প্রয়োজনের সময় কোয়ার্টার ডেকে তাঁর কাছাকাছিই থাকেন কোন পেটি অফিসার (যেমন প্রধান সুখানি, সারেং) অথবা অফিসার। বিশেষ করে বাতাসের বিপরীতে চলার সময় অফিসাররা সামনের সমুদ্রের দিকে, পালের দিকে, সুখানির কাজের দিকে বরাবর নজর রেখে চলেন, সুখানি তা হুইল ধরা অবস্থায় পারেনা। সেই মত তাঁরা সুখানিকে ক্রমাগত নির্দেশ দিয়ে যেতে থাকেন; প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যবস্থাও নেন, যেমন পাল ঘোরানো, কিনারা টান টান করা, ইত্যাদি। তাঁদেরকে আরো একটি ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হতো, মাস্তুলে কোন খালাসি উঁচুতে বেকায়দায় অবস্থানে থেকে কোন কাজ করছেন কিনা, তা হলে সেই সময় বড় ধরণের কোন দিক পরিবর্তন করা থেকে সুখানিকে বিরত রাখবেন, কারণ ওটি করলে হঠাৎ ঝটকা লেগে, ভারসাম্য হারিয়ে মাস্তুল থেকে ওই খালাসি পড়ে যেতে পারেন, যেটি মারাত্মক হতে পারে।

আর ট্যাকিং যদি সত্যি করতে হয় তা হলে তো অনেক সময় স্বয়ং ক্যাপ্টেনই হাজির থাকেন কোয়ার্টার ডেকে– এতই জটিল ও বিপজ্জনক এই প্রক্রিয়া। ট্যাকিঙের সমস্যা হলো সামনের দিক থেকে আসা বাতাসের সঙ্গে এক পাশে কোণ করে যাওয়ার পরিস্থিতি থেকে, অন্য পাশে একই রকম কোণ করে যাওয়ার পরিস্থিতিতে, যেতে হলে মাঝখানে সেই বিপরীত বাতাসে 'না যাওয়ার' দিকের এলাকাটি পার হতে হয়। একটু আগে দেখেছি ওখানে পালের পাশ দিয়ে অমসৃণ ঘূর্ণিময় বাতাস যাওয়ার কারণে ওটি আর বিমানের ডানার মত কাজ করেনা; অর্থাৎ জাহাজ তার গতির জন্য পাল থেকে কোন সাহায্য পায়না, বরং সামনের থেকে আসা বাতাস ও পানির স্রোতে তার সম্মুখ গতি একেবারেই থেমে যাওয়ার যোগাড় হয়। যেহেতু গতিহীন জাহাজে হাল কাজ করেনা, তাই প্রায় গতিহীন জাহাজের পক্ষে এর ভেতর দিয়ে হাল অনেকখানি ঘুরিয়েও ওই বাতাসের এপাশ থেকে ওপাশে যাওয়া অতি কঠিন হয়ে পড়ে।

এ অবস্থায় জাহাজকে ঘুরতে হলে বিপরীত বাতাসের মুখোমুখি আসার আগে ঘোরাটি যে ভাবে শুরু হয় সেই ধারাবাহিকতাতেই, অর্থাৎ সেই মোমেন্টামেই

(ভরবেগে) তাকে অপর পাশে ঘুরে যেতে হবে। এই মোমেন্টামটি বাড়ানোর জন্য পেছনের দিকে একটি ল্যাটিন পাল খাটানো হয় যাতে হালের ওপর পানির চাপ যখন জাহাজের পেছন ভাগটি ঘোরায়, এই ঘুরন্ত ল্যাটিন পালের ওপর বাতাসের চাপ পেছন ভাগকে ঘোরাতে আরো একটু সাহায্য করে, তার ঘোরার মোমেন্টাম বাড়াতে। একই সময় স্কোয়ার পালগুলোর বাঁধনকে একটু ঢিলে করে দেয়া হয়, যাতে ঘোরার সময় তেরচা বাতাসে পাল ফুলে ঘোরার মোমেন্টামটি আরো একটু বাড়ে। এত সব করেও ঘোরাটি যথেষ্ট দ্রুত করতে না পারলে সোজা বিপরীত বাতাস সামনের মাস্তুলে বেশিক্ষণ আঘাত করে সেটিকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে, কারণ সামনের মাস্তুলকে খাড়া রাখতে হয় প্রধানত পেছনে ও পাশের দিকে দড়ির টানা দিয়ে (সামনের দিকে টানা দেবার জায়গা নেই) সেজন্য এমনিতেই সেটি পেছনের দিকে চাপে থাকে- সামনের দিক থেকে আসা বাতাস অতিরিক্ত ঝড়ো হলেই সেটি ভাঙ্গতে পারে। যদি সত্যি সত্যি এসব দুর্ঘটনা এড়িয়ে জাহাজ ঘুরে অন্য পাশে কোণ করতে পারে তখন দ্রুত ব্রেইস দড়ি টেনে স্কোয়ার পালগুলোকে ঘুরিয়ে সেদিকের কোণে যাবার উপযুক্ত করতে হয়। ট্যাকিঙের সময় ক্যাপ্টেন, অফিসার, সারেং, সুখানি সবাই সন্ত্রস্ত থাকার কারণ নিশ্চয়ই এখন বোঝা যাচ্ছে। যার হাতে হুইল ধরা, তার অবস্থাটিও কল্পনা করা যাচ্ছে।

ট্যাকিঙের কঠিন কাজটিকে এড়াবার জন্য এর একটি বিকল্প রয়েছে, ক্যাপ্টেন থেকে শুরু করে সুখানি সবাই এই বিকল্পই বেশি পছন্দ করতেন। এতে বাতাসের বিপরীতে মুখ করে এপাশ থেকে ও পাশে ৬০ ডিগ্রি কোণ অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা আদৌ না করে, বরং পাশ বদলাবার পুরোটা সময় বাতাসের অনুকূলে মুখ রেখে উল্টো দিক থেকে ২৪০ ডিগ্রি কোণ ঘুরে একই ভাবে এপাশ থেকে ও পাশে যাওয়া হয়। অর্থাৎ এতে বাতাসের বিপরীতে গন্তব্যের দিকে না থেকে, বরং আপাতত বাতাসের সঙ্গেই গন্তব্যের উল্টো দিকে গিয়ে পাশ বদলানো হয়। এতে সব সময় বাতাসের অনুকূলে থাকাতে স্কোয়ার পাল সব সময় এই ঘোরাতে গতি বজায় রেখেছে এবং ঘুরতে সাহায্য করছে; কখনো বিপদেরও কোন আশঙ্কা সৃষ্টি হয়না। তবে সমুদ্রে অনেকখানি জায়গা নিয়ে, অনেক সময় নিয়ে এই ঘোরা সম্পন্ন করতে হয়; ক্যাপ্টেন থেকে শুরু করে সুখানি সবাই এ বিকল্প পছন্দ করলেও, অপেক্ষাকৃত সরু চাপা সমুদ্রে তা সম্ভব হয়না। মনে রাখতে হবে ৬০ ডিগ্রি ঘুরেই হোক বা ২৪০ ডিগ্রি ঘুরেই হোক এভাবে এপাশ-ওপাশ শুধু একবার করার ব্যাপার নয়, বাতাসের বিপরীতে চল্‌তে

হলে এটি বার বার করে করে সেদিকে এগুতে হয়। বাতাসের বিপরীতে স্কোয়ার পালের ভারী জাহাজ চালানো কেন অত্যন্ত দুরূহ তা আমাদের এই আলোচনা থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে– সে কারণেই অধিকাংশ যাত্রাকে বাতাসের অনুকূলে রাখতে সবার এত আগ্রহ, সুখানির তো বটেই।

আগেই দেখেছি, বাতাস যখন পাশ থেকে আসে তখনো তাকে অনুকূলে বলা যায়, সুখানি তখনো কম্পাস দেখে জাহাজ চালাতে পারেন। পালকে তখন অবশ্য অনেকটা লম্বালম্বির দিকে ঘুরিয়ে নিতে হয়– যদিও পাল তখনো প্যারাসুটের মতো কাজ করে। মজার ব্যাপার হলো পাশ থেকে না এসে পাশের দিকের সঙ্গে প্রায় ৩০ থেকে ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে বাতাস যদি সামনের দিক থেকেও আসে তখনো একে প্রতিকূল না বলে অনুকূল হিসেবে বিবেচনা করা যায়, কারণ তখনো পালের ওপর বাতাসের বলের একটি উপাংশ জাহাজকে এগিয়ে নিতে পারে, প্যারাসুটের মত কাজ করে। তখনো সুখানি কম্পাস দেখে চলতে পারেন, যদি সেই দিকটিই তাঁর গন্তব্য হয়। সুখানি বুঝবেন কি করে বাতাসের আসার দিকে জাহাজ আর কতখানি ঘুরলে তাকে আর 'অনুকূল' বলা যাবেনা? আর সে জন্য কখন তাঁকে কম্পাস আর পাল দুটিই দেখতে হবে? উপায় হলো যতক্ষণ পালের সামনের কিনারা টান্ টান্ থাকবে ততক্ষণ তিনি কম্পাস দেখে তাঁর গন্তব্যের দিকে চলতে পারবেন। যেই দেখবেন সেখানে পত্ পত্ শুরু হয়েছে তখন আর অনুকূল হাওয়ার নিয়ম চল্‌বেনা, প্যারাসুটের মত কাজ করা পালের পক্ষে আর সম্ভব নয়। তখন উপরে বর্ণিত প্রতিকূল বাতাসের নিয়মেই যেতে হবে; প্রয়োজনে নিজের গন্তব্যের দিকে না গিয়ে, বাতাসের মর্জিতেই চলতে হবে, এবং ক্ষেত্র বিশেষে ট্যাকিং করে গন্তব্যের দিকের কাছে থাকতে হবে, যথাসম্ভব।

প্রচণ্ড ঝড়ে জাহাজ রক্ষাঃ

খালাসিদের সামনে নিত্য যে আতঙ্কের খাঁড়া ঝুলতো তা হলো কোন রকম পূর্বাভাস ছাড়াই সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় ওঠা। দেখতে দেখতে তখন সবকিছু বদলে যায়; যে বাতাস এতক্ষণ জাহাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো, হঠাৎ সেটি জাহাজকে নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় কোথাও নিয়ে আছড়ে ফেলার উপক্রম করে; যেই পানি-স্রোত মসৃণ ভাবে তার গতিতে সাহায্য করছিলো, তার উত্তাল তরঙ্গ জাহাজকে গ্রাস করতে উদ্ধত হয়। প্রায়ই সংগ্রামটি টিকে থাকার সংগ্রামে পরিণত হতো, আর এ সংগ্রামের পদাতিক সৈন্যরা ছিলো খালাসিরা।

জোরালো বাতাস না থাকলে জাহাজে সবার মন খারাপ থাকে, কারণ জোরালো বাতাসই জাহাজকে যথেষ্ট গতি দেয়। কিন্তু সেই জোরালো বাতাস কতটা আরো জোরালো হলে পালে বাতাস লাগানোর বদলে জাহাজ রক্ষার জন্য বরং কিছু পাল গুটিয়ে রাখতে হবে, ওই সীমারেখাটি অনেক সময় স্থির হতো ক্যাপ্টেনের মেজাজের ওপর; দ্রুত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাবার আকাঙ্খার বিপরীতে ঝুঁকি নিতে তাঁর অনীহা পাল্লায় মেপে। এই ঝড়ো হাওয়া শান্ত হয়ে যাবে, নাকি শিগ্‌গির আরো ভয়ানক হয়ে উঠবে– তা আন্দাজ করতে পারার ওপরও এটি নির্ভর করে। মেঘ, বৃষ্টি, বাতাস, ঢেউ– এসব থেকেই আন্দাজটি করতে হতো। সমুদ্র যদি আয়নার মত সমতল ও চক্‌চকে থাকে, বড় জোর খুব ছোট ছোট ঢেউয়ের হিল্লোল, বুঝতে হতো বাতাসের বেগ ঘন্টায় ৫/৬ মাইলের বেশি নয়, সঙ্গে আকাশ পরিস্কার, এবং সব দেখে যদি মনে হতো এমনি ভাবে অনেক্ষণ থাকবে; তা হলে সব পাল খাটাবার হুকুম আসতো– চেষ্টা চলতো এই ধীর মসৃণ বাতাসের থেকে যত বেশি সুবিধা নেয়া যায় নেবার। বাতাস যত বাড়বে, ঢেউ তত বড় হবে, ঢেউয়ের মাথাগুলো ভেঙ্গে ওখানে সাদা ফেনার সৃষ্টি হবে। এ সবের পরিমাণ দেখে বুঝতে হতো ঘটনা কোন্ দিকে এগোচ্ছে। বাতাসের বেগ ঘন্টায় ১০ মাইল ছাড়িয়ে তা যদি ঘন্টায় ১৫ মাইলের দিকে এগোয়, তখন সেটি ঝড়ো হাওয়ার পর্যায়ে; দেখা যেতো ঢেউ তখন জাহাজের পাশে অনেকখানি ওপরে উঠে আসছে, সাদা ফেনা ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছেনা, মাঝে মাঝে পানি স্প্রের মত উঠে পুরো ডেকে সবাইকে বৃষ্টির মত ভেজাচ্ছে। তখনো জাহাজের পালে হাওয়া লাগাবার ইচ্ছা অব্যাহত থাকতো, তবে মুহুর্তের মধ্যে ঝড় বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকায়, কিছু পাল গোটাবার ও কিছু পাল ভাঁজ করে আংশিক খাটানোর জন্য খালাসিরা নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতেন– হুকুম পাওয়া মাত্রই যে যার মাস্তুলে উঠে পড়ে ওই কাজগুলো করতেন।

বাতাসের গতি যখন ৪০/৫০ মাইলে চলে গেছে, তখন ঢেউ ডেকের ওপর আছড়ে পড়ে এক দিকে ঢুকে আরেক দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে। জাহাজ ভীষণ ভাবে দুলছে, কখনো কখনো ঢেউয়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এটি রীতিমত বিপজ্জনক অবস্থা, জরুরি ভাবে সবাইকে ডাকা হতো 'সবাই এক্ষুণি ডেকের ওপর' এই ঘন্টা বাজিয়ে। এ অবস্থায় বজ্র-বিদ্যুৎ ও বর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। সব মিলে ডেকের ওপর দিনের বেলায়ও কেউ কাউকে দেখতে না পাওয়ার যোগাড় হয়। এটি হঠাৎ হুড়মুড় করে এসে পড়লে এর মধ্যেই মাস্তুলের মগডালে উঠে খালাসিদেরকে পাল গুটাতে হতো। সব কিছু শক্ত করে বাঁধতে হতো, ডেকের

ওপরে নিচে সব কিছুকে গড়াগড়ি না খাওয়ার জন্য আটকিয়ে রাখতে হতো। মাস্তুলের ওপর ও সময় ওঠা, ওখানে নিজের ভারসাম্য রাখা, এবং ওই অবস্থায় কাজ করা, অত্যন্ত দুরূহ ও বিপজ্জনক– কিন্তু সেটি তাঁদেরকে করতে হতো, অনেক সময় স্পষ্ট দেখা না যাওয়ায় হাতড়ে বাতড়ে। ডেকের তলার কুঠি ও নিচের ডেক অবশ্য ঝড়, বৃষ্টি, ঢেউ এসব থেকে কিছুটা নিরাপদ, যাঁরা কাজে লাগছেননা তাঁরা ওখানে আশ্রয় নিতে পারেন। তবে ওখানেও খোলের দুপাশে গোলাকার যে জানালাগুলো অথবা কামান বের করার ছিদ্র থাকে সেগুলো ভাল করে বন্ধ করে দিতে হতো। ডেকের ওপর থেকে তলায় খোলা হাওয়া পাঠাবার যে সব বড় নল থাকে সেগুলোও বন্ধ করে দেয়া হতো হাওয়া-পানি যাতে জাহাজের ভেতরে না যেতে পারে। তারপরও ওসময় প্রচুর পানি খোলের তলায় জমে যেতো, ভেতরে থেকে প্রচণ্ড দোলুনিতে আতঙ্কে থাকা তো ছিলই।

ঝড়ের আশঙ্কা দেখা দিলেই আরো একটি কারণে মাস্তুলে উঠতে হতো কাউকে না কাউকে– তা হলো প্রধান মাস্তুল অথবা সামনের মাস্তুলের একেবারে ওপরে থাকা একটি খাঁচার মধ্যে দাঁড়িয়ে দূরে নজর রাখতে। তাকে সমুদ্র ও দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো যাতে দূরের মেঘ, ঝড় কী ভাবে এগিয়ে আসছে তার আগাম সতর্কবাণী চিৎকার করে অফিসারকে জানাতে পারে। মাস্তুলের মগডালে এই খাঁচাটিকে বলা হয় 'কাকের বাসা'। ঝড়ের দিকে নজর রাখা ছাড়াও কাকের বাসার খালাসিটির আরেকটি বড় কাজ ছিল যে কোন সময় ওই সীমাহীন সমুদ্রের মধ্যে স্থলের প্রথম চিহ্নটি দেখতে পাওয়া আর চিৎকার করে বলা 'ল্যান্ড হো', অথবা দূর দিগন্তে অন্য কোন জাহাজের চিহ্নমাত্র দেখতে পেলে চিৎকার করে বলা 'সেইল হো'। সেকালে আরেকটি জাহাজের নমুনা মাত্র দূরে দেখা গেলে সারা জাহাজে সবাই আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে যেতো কারণ ওই জাহাজ জলদস্যুদের হতে পারে, শত্রু দেশেরও হতে পারে– সেই ক্ষেত্রে জীবন-মরণ সংগ্রামের আশঙ্কা থাকতো। অবশ্য পরে যদি দেখা যেতো বন্ধু জাহাজ– তেমনি খুব আনন্দও হতো, হয়তো বহুদিন অকূল সমুদ্রে থাকা দুই জাহাজের মধ্যে আসা যাওয়া, সংবাদ-বিনিময় হতো। বিশেষ করে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে দুই ক্যাপ্টেনের হিসেব ও ধারণাকে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করা হতো। দূরে অন্য জাহাজ দেখলে যেমন আতঙ্কগ্রস্থ হতো তেমনি চাইতো রাতের বেলা অন্য কেউ তাদের নিজেদের উপস্থিতি টের না পাক্, কারণ রাতে অদৃশ্য ভাবে এসে আক্রমণ করে বসলে বিপদটি বেশি। এজন্য রাতে জাহাজের ডেকে কোন

বাতি থাকার নিয়ম ছিলনা। এমনকি ডেকের নিচেও অত্যন্ত মৃদু আলো ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার বারণ– যাতে খোলের জানালা দিয়ে দূরে আলো না যায়।

ঝড় উঠলে অনেক ক'টা পাল, বিশেষ করে ওপরের পালগুলো গুটিয়ে ফেলতে হতো, কারণ ঝড়ের ঝাপটায় পাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে পারে, সেই ঝাপটা ওপরেই বেশি লাগে। তা ছাড়া পালের ওপর ওই ঝাপটায় জাহাজের ভারসাম্য আরো ঝুঁকিতে পড়ে যেতে পারতো। ঝড়ের সামনে যদি এভাবে পাল মেলা থাকে তা হলে পাগলা ঘোড়ার মত গতিতে জাহাজকে কোথায় নিয়ে আছড়ে ফেলবে তাও বা কে জানে। আসলে তো সব পালই গুটিয়ে ফেলা বা নামিয়ে ফেলার কথা এসব কারণে। কিন্তু তা মোটেই করা যাবেনা। তা হলে জাহাজ নিজের দিক থেকে গতিহীন হয়ে পড়তে পারে, আর ঝড়ের মুখে এমন গতিহীন জাহাজ হবে একটি অসহায় খেলনার মতো। কারণ এরকম জাহাজের নিজের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকেনা, ওকে ঘোরানো-ফেরানো, গতি কমানো-বাড়ানো কিছুই আর করার উপায় থাকেনা। তাই নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য কিছু পাল মেলা রাখতেই হতো, সামনের ও ওপরের দিকেরগুলো ভাঁজ করে ছোট ও পুরু করে নেয়ার মাধ্যমে। প্রবল স্রোতের চাপে থাকা হাল প্রয়োজনে ঘোরানো অবস্থায়ও ধরে রাখতে হতো হুইলকে দৃঢ় হাতে সংযত রেখে, যাতে জাহাজকে যথাসাধ্য ঝড়ের দিক থেকে ঘুরিয়ে রাখা যায়, বেশি ক্ষতির বাইরে নিয়ে যাওয়া যায়।

ঝড়ের সময় জাহাজের জন্য সব চেয়ে বড় ভয় হলো বাতাসের কারণে ও পানির স্রোতে, বন্দরে জেটির সঙ্গে, উপকূলের সঙ্গে, কোথাও লুকানো শিলা, বালুচর, বা দ্বীপের সঙ্গে, সজোরে ধাক্কা খেয়ে চূরমার হয়ে যাওয়া। তাই ওই সময় বন্দরের বা উপকূলের কাছে থাকলে যত দ্রুত সম্ভব ওখান থেকে খোলা অবারিত সমুদ্রের দিকে চলে যেতে হবে, আঘাতের সম্ভাবনা এড়াতে। তারপর সব ক্যাপ্টেন যা চেষ্টা করতেন তা হলো সরাসরি ঝড়ের মুখে না থাকতে, অর্থাৎ ঝড়ে বাতাসের অনুকূলে না চলতে, যাতে কোন বেপরোয়া গতিতে না চলে যায় জাহাজটি। আর একই সঙ্গে চেষ্টা করতে হতো জাহাজের বিপজ্জনক দোলুনিকে কমিয়ে একে যথাসম্ভব স্থিতিশীল রাখতে। এজন্য সব চেয়ে ভাল হয় যদি ল্যাটিন পাল ব্যবহার করে ঝড়ের সোজা বিপরীত দিকের সঙ্গে ৬০-৭০ ডিগ্রি কোণ করে বাতাসের প্রতিকূলে যাওয়ার চেষ্টায় থাকে জাহাজ। কিন্তু এতে সমস্যা হলো এভাবে যাবার জন্য হালকে প্রচুর বাঁকাতে হয়, অথচ সে সময় বাতাসের সঙ্গে ধেয়ে আসা পানির প্রবল স্রোত ওই অবস্থায় হালের ওপর প্রচণ্ড চাপ দিয়ে রাখে

বলে হাল ঘোরানো কঠিন। ওভাবে প্রতিকূলে কোনাকুনি যাওয়ার আর একটি উপায় হলো একটি ল্যাটিন পাল আগু-পিছু অথবা তারো থেকে একটু ভেতরের দিকে কোণ করে রাখা, আর অন্য পালগুলো স্কোয়ার হিসেবেই রাখা। এতে ল্যাটিন পাল চেষ্টা করবে ডানার মত কাজ করে জাহাজকে বাতাস আসার দিকে ঘোরাতে, আর স্কোয়ার পাল চাইবে প্যারাসুটের মত কাজ করে ঠেলা দিয়ে বাতাস যাওয়ার দিকে ঘোরাতে। এতে জাহাজ এই দুইয়ের মাঝামাঝি কোনাকুনি যেতে পেরে কিছুটা স্থিতিশীল থাকে, ঝড়ের সোজা মুখে তাকে থাকতে হয়না, অথচ হালকেও বেশি বাঁকাতে হয়না।

শেষ পর্যন্ত এগুলোর কিছুই যদি সম্ভব না হতো, তা হলে ক্যাপ্টেন বরং জাহাজকে ঝড়ের অনুকূলে সবেগে যেতে দিতেন। এতেও একটি সুবিধা আছে, বাতাসের সঙ্গে আসা ঢেউয়ের তোড় তখন পেছনে লাগবে, পাশে নয়– তাই এপাশ ওপাশ বিপজ্জনক দোলুনি কম হবে। অবশ্য এভাবে অবাধ ভাবে ঝড়ের অনুকূলে যাওয়া সম্ভব যদি সামনে অবারিত খোলা সমুদ্র থাকে। ঝড়ের দিকটি যদি সামনে খোলা সমুদ্রের দিকে না হয় তা হলে যেভাবেই হোক কোনাকুনি যেতেই হবে– ঝড়ের প্রতিকূলে। সিদ্ধান্তগুলো ক্যাপ্টেনকে নিতে হলেও ওই দারুণ বিপজ্জনক অবস্থায় সব কিছুকে মাথা ঠান্ডা রেখে কাজে পরিণত করতে হতো খালাসিদেরকে।

এসব অবশ্য বড় ঝড়ের সময়ের বিষয়। সাহসী ক্যাপ্টেন ও সাহসী খালাসিরা অল্প মাত্রার ঝড়ো হাওয়াকে বরং খুবই পছন্দ করতেন। আরো পছন্দ করতেন যদি সেই ঝড়ো বাতাস মোটামুটি একই দিকে একই রকম বেগে অনেক্ষণ ধরে চলতে থাকতো, এবং আবহাওয়ার ভাবসাবে মনে হতো যে খুব শিগ্‌গির এতে তেমন পরিবর্তন আসবেনা। ওই দিকটি যদি মোটামুটি তার গন্তব্যের দিকে থাকতো অনুকূলে তাহলে সিদ্ধান্ত হতো জাহাজের সব পাল পুরাপুরি খাটিয়ে ফেলা এবং বাতাসের এই গতির পূর্ণ সুযোগ নেয়া। এভাবে জাহাজের সকল পালে যখন অবিচল তীব্র বেগে বয়ে যাওয়া বাতাসের চাপ লাগতো তখনই সম্ভব হতো গন্তব্যের দিকে তার সর্বোচ্চ গতি– সব নাবিকের জন্য সব থেকে আনন্দের মুহূর্ত। সব পালে স্বজ্জিত জাহাজ একটি অপূর্ব দৃশ্য সৃষ্টি করতো– বড় পাল, উঁচু পাল, উঁচু-বীর পাল, রাজা পাল প্রত্যেক মাস্তুলে এর সবই; সম্মুখ-দণ্ডের সঙ্গে আরো। কিন্তু ওখানেই শেষ নয়। এরকম অবস্থায় ওই প্রত্যেকটি পালের দুপাশে দুটি বর্ধিত পাল খাটানো হতো; এজন্য প্রত্যেকের আড়-দণ্ডের দু পাশে দুটি বর্ধিত আড়-দণ্ড লাগিয়ে নেয়া হতো যা জাহাজের দু পাশ ছাড়িয়ে অনেকটা

বাইরে চলে যায়। ফলে ওই বর্ধিত আড়-দণ্ডের বর্ধিত পালও জাহাজের বাইরে পাখির মত ডানা বিস্তার করে। জাহাজের ডেকে যারা থাকেন তাঁদের পক্ষে এই পুরো অপরূপ দৃশ্যটি দেখা সম্ভব হয়না, কারণ তাঁরা শুধু এক একটি অংশ দেখতে পান। কিন্তু যে সব খালাসি ওসময় কাজ করতে গিয়ে সম্মুখ-দণ্ডের ওপর গিয়ে বসতেন, তাঁরা এই পুরো দৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। সম্মুখ-দণ্ডটি জাহাজের গলুই থেকে সামনের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত– তাই ওখানে বসে জাহাজের দিকে তাকালে উঁচু থেকে নিচু পুরোটাই দেখা যায়। তাঁদের বর্ণনা মত এ যেন একটি পালের পিরামিড– নিচে অনেক বিস্তৃত, ক্রমশ ধাপে ধাপে ছোট হয়ে যেন আকাশ ফুঁড়ে উঠে গেছে; জাহাজের দুপাশে বাইরে বিস্তৃত বর্ধিত পালগুলো এক একটি পাখির ডানার মত। মনে হতো ওপরে ছোট পাখি ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, নিচের অন্যান্য পাখিরা ক্রমাগত একটু বড়, নিচে উড়েছ। একেবারে নিচেরটি যেন জাহাজ নিজে, দুপাশে বিশাল ডানা বিস্তার করে হাঁসের মত পানি প্রায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে। খালাসি জীবনের অনেক আনন্দের মধ্যে এমন মসৃণ ভাবে, এমন জমকালো ভাবে জাহাজ চালাতে পারাটিও একটি বিরাট আনন্দ।

নাই কাজ ... :

'নাই কাজের' পরের কথাটি 'খই ভাজ', কিন্তু খালাসিদের ক্ষেত্রে এ কথাটি কখনো সত্যি হওয়ার কোন জো ছিলনা– কারণ খালাসিরা প্রহরার সময় কখনো কাজ ছাড়া থাকতেন না, থাকতে দেয়া হতোনা। জাহাজি প্রশাসনের নীতিই ছিল যে কোন খালাসি বা অন্য নাবিককে এক মুহূর্তও কাজ ছাড়া থাকতে দেয়া হবেনা, প্রহরার সময়। কাজের ফাঁকে কিছুক্ষণ ডেক থেকে সমুদ্রের শোভা দেখলাম, সহকর্মীর সঙ্গে দুটি কথা বলে নিলাম– আশপাশে থাকা সারেং-টেন্ডলরা এটি কখনই হতে দিতেননা; এবং কাজগুলোও খই ভাজার মত কখনো হতোনা। সরাসরি জাহাজ চালাবার কাজ যাদের তখন থাকতোনা, তাদের জন্য বহু রকম রক্ষণাবেক্ষণের কাজের ব্যবস্থা করে রাখা হতো। সেগুলোও জরুরি, বিশেষ করে সমুদ্রে জাহাজের নিরাপত্তা ও সঠিক চালনার জন্য সার্বক্ষণিক ভাবে রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে এগুলো ফাঁকে ফাঁকে করলেই চলে। পালের জাহাজকে এবং খালাসি-জীবনকে বুঝতে হলে এই খুচরা কাজগুলোকেও জানা উচিত। যেমন প্রতিদিন ভোরের প্রহরাটিতে যাঁরা থাকতেন, তাদের মধ্যে যাঁদের জরুরি কাজ নেই তাঁরা সবাই পুরো ডেকটিকে ঘষে

পরিস্কারের কাজে লেগে যেতেন। ছোবড়া এবং ঝামা ইট দিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি ঘষে ঘষে এ কাজ করা হতো, এজন্য আগে থেকে প্রচুর পানি তুলে রাখা থাকে– আগের দিনের সব কাজে সৃষ্ট সব ময়লা, সব দাগ পরিস্কার করে ডেককে ঝক্‌ঝকে তকতকে করে তোলা হয়। এটি সবার জন্য খুব কাম্য, কারণ জাহাজের সব কাজ, সব ঘটনা, এখানেই ঘটে। মাস্তুল ও পাল থেকে যে অনেকগুলো দড়ি নিচে ডেকে নেমে আসে পালের উঠা-নামা-ঘোরানো-টানা ইত্যাদি কাজের জন্য, সেগুলোর প্রত্যেকটিকে সঠিক জায়গার গুটিয়ে গুছিয়ে রাখাটিও একটি কাজ। জাহাজে নোঙ্গর ফেলা সহ কিছু কাজের জন্য লোহার লম্বা মোটা চেইন আছে– সব দিন না হলেও প্রায়ই এগুলোকে ঘষে ঘষে মরিচা মুক্ত রাখা চাই। তবে এ ভাবে রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো দড়াদড়ির ওপর কাজ, যেই দড়াদড়ির বাঁধনে জাহাজের সকল কাজের জিনিস কার্যক্ষম থাকে।

দুই রকমের দড়াদড়ি যে জাহাজে রয়েছে তা আমরা দেখেছি– স্থির দড়াদড়ি ও গতিশীল দড়াদড়ি। মাস্তুলগুলো খাড়া রাখার জন্য যে বহু টানাদড়ি মোটামুটি স্থায়ী ভাবে থাকে সেগুলোই স্থির– আবহাওয়া আর বাতাসের ঘষাঘষি থেকে এগুলোর উপরিভাগকে রক্ষার জন্য যখনই সুযোগ হয় প্রত্যেকটি টানাদড়ির ওপর আগাগোড়া আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে দেয়া হতো। মাস্তুলের আগা থেকে ডেক পর্যন্ত কোনাকুনি নানা দিকে বিস্তৃত এসব দড়িতে আলকাতরা লাগানো সহজ কাজ নয়– জটিল ভাবে ছড়ানো এ দড়িগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় চলে গেছে; সেখানে উঠে, ঝুলে থেকে, চিৎকাত হয়ে বেশ ঝুঁকি নিয়েই এটি করতে হয়। দড়িতে লাগাবার সময় নিচে ডেকের ওপর একটু আলকাতরাও ফেলা যাবেনা, তা হলে সারেং টেন্ডলদের বকুনির সীমা থাকবেনা। অন্য যে দড়াদড়ি সেগুলো গতিশীল হওয়াতে এবং সব সময় টানাটানি, গিট্টু দেয়া, মাস্তুলের গা ঘষে ওঠা-নামার মধ্য থাকে বলে, তার গা রক্ষার জন্য আলকাতরা দেবার উপায় নেই। এদের ক্ষয় এত বেশি যে রক্ষণাবেক্ষণ আরো অনেক জটিল। জাহাজে আলকাতরা মাখা কালো রঙের প্রচুর স্থির দড়াদড়ির থেকে দড়ির স্বাভাবিক সোনালী রঙের এই গতিশীল দড়াদড়িকে স্পষ্ট আলাদা করা যেতো।

গতিশীল দড়াদড়ির রক্ষণাবেক্ষণটি খুব ঘন ঘন প্রয়োজন, কারণ কাজ চল্‌তে চল্‌তে বাঁধনগুলো অলগা হয়ে যাচ্ছে, গিট্টুকে নতুন করে টাইট দেবার প্রয়োজন হচ্ছে; দড়ি ক্ষয়ে যাচ্ছে, এর আঁশ খুলে আসছে, বিপজ্জনক হয়ে ওঠার আগেই ওগুলোর আঁশে নতুন পাক দিয়ে বা নতুন দড়ি লাগিয়ে এ সবের মেরামত

প্রয়োজন। তাই সব সময় কোন না কোন খালাসিকে এই সার্বক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজে দেখা যায়– মাস্তুলের ওপরে কিংবা নিচে। জাহাজে প্রচুর নতুন দড়ির মজুদ থাকে, এমন কি নতুন দড়ি পাকাবার চরকাও থাকে। গতিশীল দড়াদড়ির কাজের একটি বড় জটিলতা হলো অনেক ক্ষেত্রেই এর প্রত্যেকটি আলাদা বিচ্ছিন্ন নয়, একটি মাস্তুলের বাঁধন অন্য মাস্তুলের সঙ্গে, একটি পালের দড়ি অন্য পালের সঙ্গে জড়িত থাকে। সেক্ষেত্রে কিছু নতুন করে বাঁধতে গেলে অনেকগুলো জায়গাকে আগে আলগা করে নিতে হয়, পরে সেগুলোকেও টাইট দিতে হয়। স্থির দড়াদড়ির ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য, যদিও সেগুলোতে এত ঘন ঘন হাত দিতে হয়না। জাহাজ যেন এক অতি সংবেদনশীল সেতার, সব সময় একে বাজানো হচ্ছে, বাজাতে বাজাতে তারগুলো ঢিলা হয়ে যাচ্ছে, সুরের টিউনিঙে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে, তাই একদিকে যেমন শিল্পী একে বাজাচ্ছেন, একই সঙ্গে তারগুলোর টিউনিং ঠিক করে চলেছেন; আবার এক তারের টিউনিঙের সঙ্গে আরেক তার জড়িত। রক্ষণাবেক্ষণ মাস্তুল ও আড়-দণ্ডের কাঠের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সমুদ্রের আবহাওয়ায় নোনা পানি সম্পৃক্ত বাতাসে কাঠের গুণ নষ্ট হচ্ছে, ঘূণে-পোকায় ধরছে। এর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে খালাসিদেরকে। ঘূণে ধরা অংশকে ঘষে, মেজে, ওষুধ দিয়ে, এবং এই কাঠকে তেল মেখে, বার্নিশ করে সব সময় সর্বোত্তম কার্যকর অবস্থায় রাখতে হয়। জাহাজে একজন প্রধান ছুতার থাকেন, তাঁর অধীনে কয়েকজন দক্ষ সহকারী ছুতার। সব সময় কিছু না কিছু কাঠের নবায়ন চলছে, মাস্তুল ইত্যাদির তো বটেই জাহাজের খোলে বা অন্য স্থাপনায়ও মেরামত প্রয়োজন হয়। এগুলোর জন্য বন্দরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলেনা। সমুদ্রে ঘটা সব ঘটনা-দুর্ঘটনার প্রতিকারের ব্যবস্থা সমুদ্রে চল্‌তে চল্‌তেই করতে হয়।

খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সার্বক্ষণিক কাজ হলো জাহাজের খোলের পাশাপাশি তক্তাগুলোর মধ্যে ফাঁক বন্ধ করা। ইতোমধ্যে ফাকগুলো আঁশ দিয়ে ভরানো থাকলেও সমুদ্রে চলার সময় নানা টানাপোড়েনের ফলে এসব ফাঁকে নতুন সূক্ষ্ম ছিদ্র দেখা দেয়, কখনো একটু বড় ছিদ্রও। এগুলোর মধ্য দিয়ে সব সময় পানি জাহাজের খোলে ঢুকে, তাতে জমা পানি বাড়তে থাকে। এই পানি বের করে দেবার জন্য হাতে দাবা পাম্পে খালাসিদেরকে সব সময় কাজ করতে হয়। এই পানি ঢোকা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এসব ছিদ্র বন্ধ করা জরুরি। তাই সারাক্ষণই কিছু কিছু খালাসিকে দেখা যায় আলকাতরায় ডোবানো উদ্ভিজ আঁশ ঠুকে ঠুকে তক্তার ফাঁকের মধ্যে ঢোকাচ্ছেন ছিদ্র বন্ধের প্রয়াসে। এ কাজটিতে যে যখন

একটু সুযোগ ও ফুরসত পাচ্ছে সে যেন তখনই চট্ করে লেগে যেতে পারে সে জন্য জাহাজের সর্বত্র খোলের কাছে, কিছু আঁশ কিছু আলকাতরা রাখা থাকে।

কখনো জাহাজ যদি চরায়, শিলায় বা অন্য কিছুতে আঘাত পেয়ে খোলে অপেক্ষাকৃত বড় ছিদ্র বা ফাটল সৃষ্টি হয় তখন ব্যাপারটি রীতিমত গুরুতর হয়ে ওঠে। খোলের ভেতরে কাঠের কাজ করে ছুতার অনেক সময় এসব সারাতে পারেন। কিন্তু বাইরে সমুদ্রের দিক থেকে খুব ছোট ছিদ্র যদি হয়, এবং সূক্ষ্মতার কারণে ঠিক ধরাও না যায় কোন জায়গায় হয়েছে, তখন নানা রকম কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। এরকম একটি কৌশল হলো বড় একটি পালের কাপড়ের চার কোনায় দড়ি বেঁধে দড়িকে এদিক ওদিক টেনে কাপড়টি জাহাজের তলায় মোটামুটি ক্ষতটির কাছাকাছি জায়গায় নিয়ে যাওয়া। এই কাপড়ের ওপর আলকাতরা মাখানো কিছু আঁশ আলগা ভাবে আটকানো থাকে। জাহাজের তলায় যদি ছিদ্র থাকে তা হলে সমুদ্রের পানির প্রচণ্ড চাপে ওই ছিদ্রের দিকে প্রবল একটি সরু স্রোতের সৃষ্টি হবে ঢোকার জন্য– এই স্রোতে পানির সঙ্গে আলকাতরা মাখা আঁশও ছিদ্রের দিকে যাবে ও সেখানে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে এক সময় ছিদ্রটি বন্ধ করে দেবে।

শুধু দড়ি বা কাঠ নয়, জাহাজের সব কিছু ওভাবে মেরামত ও নবায়ন হয়ে চলতো– তার মধ্যে আরেকটি বড় জিনিস হলো পাল। পাল ফাট্‌তো, ছিড়তো, কখনো ঝড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো– তার মেরামত দরকার; কখনো সম্পূর্ণ নতুন পাল। এ জন্য জাহাজের চাকরিতে একটি পদ হলো দক্ষ পাল নির্মাতার ও মেরামতকারীর, অন্যদেরকেও হাত লাগাতে হতো তাঁর সঙ্গে। জাহাজে যথেষ্ট অতিরিক্ত তৈরি পাল থাকতো, তা ছাড়া পালের কাপড় ও সেলাই সামগ্রীও। খালাসিরা যেন ছিল একটি অর্কেস্টার বাদক দল– ক্যাপ্টেন এর কন্ডাক্টর, তাঁর হাতের সঞ্চালন অনুযায়ী তাঁরা সূক্ষ্ম সব বাজনা বাজিয়ে চলেছেন। সবগুলো বাজনা বাজা চাই, কমবেশি প্রায় একই সঙ্গে এবং একই সমন্বয়ে, নইলে সুরের পতন হবে।

জাহাজে অন্তত দু তিনটি বেশ বড়সড় নৌকা থাকতো এর বিভিন্ন অংশে সুবিধাজনক ভাবে আটকানো। দড়ি ও কপিকলের সাহায্যে বেশ দ্রুত এদেরকে নামিয়ে জাহাজের পাশে সাগরে ভাসানো যেতো, যাতে জাহাজ ছেড়ে কিছু মানুষ প্রয়োজনে নৌকা ব্যবহার করে আবার জাহাজে ফেরৎ আসতে পারতো। এ নৌকার বহু ব্যবহার– জরুরি অবস্থার ব্যবহারগুলো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, যেমন জাহাজ থেকে কেউ পানিতে পড়ে গেলে। পালের জাহাজে এরকম পড়ে যাওয়া

মানুষকে উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব হতো, কারণ জাহাজ দ্রুত থামানো বা পানিতে মানুষটির কাছাকাছি বেশিক্ষণ থাকা খুবই কঠিন। সে ক্ষেত্রে নৌকায় দাঁড় বেয়ে গিয়ে উদ্ধারের চেষ্টাটি ছিল একমাত্র উপায়। এছাড়া সমুদ্রে বন্ধু জাহাজের সাক্ষাত পেলে সেখানে যাওয়া-আসা করা; সুযোগ মত মাছ, ডলফিন, শুশুক, হাঙর, কাছিম এমন তাজা খাবারের যোগানের জন্য শিকার করা; বন্দরে দূরে নোঙ্গর করলে তীরে আসা-যাওয়া; এসবের জন্য নৌকার দরকার হতো। জাহাজের প্রত্যেকটি নৌকা থাকতো এক একজন নৌকাধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে– সমুদ্রে জরুরি কাজে বা শিকারে তাঁরাই নেতৃত্ব দেন, হাল ধরেন, কারণ ওগুলোতে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার দরকার। বড় নৌকায় ল্যাটিন পালও থাকতো। খালাসিরা দাঁড় বাইতেন বটে কিন্তু অভিজ্ঞতা তাঁদেরকেও শিগ্‌গির এক একজন নৌকাধ্যক্ষের মতই দক্ষ করে তুলতো।

সম্মুখ-কুঠির পরিবারঃ

পরিবার পরিজন ছেড়ে জীবনের দীর্ঘ সময় সমুদ্রে কাটানো খালাসিদের কাছে তাঁদের ঘনিষ্ঠ জাহাজি পরিবারটিও ছিল খুবই মূল্যবান। চব্বিশ ঘন্টার অর্ধেকটা সময় তাঁরা ডেকে কাটাতেন অসম্ভব পরিশ্রমের মধ্যে। কিন্তু বাকি সময়টি কাটাতে পারতেন নিজস্ব ভূবনে– ডেকের নিচে সম্মুখ-কুঠিতে, নিজেদের এই জাহাজি পরিবারের সান্নিধ্যে। সবার ঘুমাবার জায়গা এখানে হয়তো হয়না, নতুন আসা তরুণদের অনেককে নিচের ডেকে ঝোলা অস্থায়ী বিছানায় ঘুমাতে হতে পারে, তবে তাদেরও ভূবন ওই সম্মুখ-কুঠিতেই। অবশ্য জাহাজের স্বল্প জায়গায় অনেকটা ঘেঁষাঘেষি করে শুয়ে-বসে, আড্ডা দিয়ে, তাস-লুডু খেলে ওই বিশ্রামের সময়টুকু তাঁদের কাটতো। ওই সময়টুকুই তাঁদের জাহাজি জীবনকে কিছুটা সহনীয়, কিছুটা আনন্দময়ও করে তুলতো।

ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারত মহাসাগরীয় নৌ-বাণিজ্যে প্রধান বহরগুলো নিয়ে যতটা তথ্য পাওয়া গেছে তাতে বরাবরই বাংলার চট্টগ্রাম-নোয়াখালীর মানুষের আধিক্য দেখা গেছে, যাতে পরের দিকে এসেছিল সিলেটের মানুষেরও: সারেং-টেন্ডল-সুখানিদের মধ্যেও ওই চট্টগ্রাম-নোয়াখালীর মানুষরাই ছিলেন সংখ্যা গরিষ্ঠ। কাজেই সম্মুখ-কুঠির পরিবারের ওপর তাঁদেরই ছাপ পড়েছে সব চেয়ে বেশি। তাঁদের নিজেদের দিক থেকে এ যেন নিজের ফেলে আসা গ্রামের ও পরিজনের একটি বিকল্প। কিন্তু পরিবার তো শুধু তাঁদের নিয়ে নয়, আর যে প্রধান কয়েকটি গোষ্ঠির মানুষ ধারাবাহিক ভাবে এ পরিবারের অংশ

হয়েছেন তারা হলেন তামিল ও অন্ধ্র দেশীয় ভারতীয়, মালয়ী, এবং ফিলিপিনো। কিছু ফিলিপিনো ক্যাথোলিকদের বাদ দিলে বাকি প্রায় সবাই ধর্মে মুসলিম।

সম্মুখ-কুঠির পরিবারে কিন্তু সব ধর্মের সবাই একাকার হয়ে থাকেন– সবাই কঠিন পরিশ্রমের ও ঝুঁকিপূর্ণ জীবনের সাথী। সুখে-দুঃখে, ফেলে আসা আপনজনের স্মৃতি ধারণে, আগামী রঙীন দিনের স্বপ্নচারী হওয়াতে, তাঁরা এতটাই এক রকমের যে মনেই রাখেননা তাঁরা পরস্পরের অনেক দূর দেশ থেকে এসেছেন। উল্‌টো তাঁরা শিগ্‌গির আবিষ্কার করেন যে তখনকার জাহাজি পরিবেশে তো বটেই, নিজ নিজ মূল গ্রাম ও পরিবারের দিক থেকেও তাঁরা প্রায় একই রকম। এমনকি জাহাজে এসে তাঁদের ভাষাটি পর্যন্ত এক হয়ে গেছে- সবার মুখের ভাষা মিশে গিয়ে সেটি হয়ে পড়েছে একটি মিশ্র ভাষা– তথাকথিত লস্করী ভাষা। যারা শুনবে তারা এর মধ্যে প্রচুর চাটগেঁয়ে-নোয়াখাইল্যা শব্দ ও টান আবিষ্কার করবে, একই সঙ্গে বেশ কিছু হিন্দুস্তানি, এবং মালয়ী (ফিলপিনো ও মালয়ী মুখের ভাষা প্রায় একই রকমের)। তবে সব কিছুর মধ্যে বেশ কিছু ইউরোপীয় কথার দেশি রূপও কানে বাজবে- এগুলো হচ্ছে জাহাজি কথা– যুগে যুগে পালের জাহাজ চালাতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে; বেশির ভাগ এসেছে ক্যাপ্টেন-সারেঙের নির্দেশ দেবার ভাষা থেকে– নোঙ্গর তোল, সামনের রাজা পাল তোল, পাল ঘোরাও, স্কোয়ার করো, 'ল্যান্ড হো', 'এই মুহূর্তে সবাই ডেকে চলে আসো', কম্পাস উত্তর পূর্ব ৩০ ডিগ্রি, এমনি সব পরিভাষার কথা– কিন্তু এখন লস্করী ভাষার ভেতর এমনভাবে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে যে মনেই হয়না এগুলো কখনো পর্তুগীজ, ডাচ, কিংবা ইংরেজি থেকে এসেছিলো।

আসলে লস্করী ভাষার পুরোটাও সৃষ্টি হয়েছিলো জাহাজেই, যুগ যুগ ধরে। ওই যে আমরা দেখেছি মিশ্র ভাষা যেমন ভাবে সৃষ্টি হয় কিছুটা ভিন্ন ভাষার দু'জন মানুষের মধ্যে কথোপোকথনের মাধ্যমে, সেভাবে যে শব্দ যত বেশি ব্যবহৃত হয়, বার বার ব্যবহৃত হয় তার ততই এক রকম স্থায়ীত্বের সৃষ্টি হয় শ্রোতার মধ্যে, এবং তারও সেটি ব্যবহারের মধ্যে। এমনি ভাবেই 'বাজারে' দুনিয়ার মিশ্র ভাষাগুলো গড়ে উঠতে আমরা দেখেছি; এই ক্ষেত্রে বাজারে নয়, ভাষা সৃষ্টি হয়েছে জাহাজে, যেখানে ঘনিষ্ঠতা আরো বেশি। কিন্তু যতক্ষণ না সেই ভাষা ওদের পরিবারে গিয়ে বাবা-মার সঙ্গে শিশুর কথা বলায় না গড়াচ্ছে ততক্ষণ এটি কারো মাতৃভাষা হবার উপায় নেই। লস্করী ভাষার তা হবার সুযোগ একেবারেই ছিলনা– কারণ এটি কখনো শিশুর কাছে আসেনি। কিন্তু এটি জাহাজ থেকে জাহাজে গেছে, ওই খালাসিদের মাধ্যমে; এবং ভারত মহাসগরীয় সব রকম

জাহাজের সাধারণ খালাসিদের জাহাজে ব্যবহারের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এতে বিশ্ব-সমুদ্র পাড়ি দেয়া বিভিন্ন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজ যেমন ছিল, তেমনি একক ব্যক্তিগত মালিকানার বা ছোট কোম্পানীর জাহাজও ছিল, যার কিছু কিছু উপকূলীয় ও স্থানীয় সমুদ্রে যাতায়াত করতো। অনেক ক্যাপ্টেন ও ইউরোপীয় অফিসাররা লস্করী ভাষা শেখার চেষ্টা করতেন ব্যক্তি-খালাসির সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলার সুযোগ নিতে, যাতে সব সময় সারেং-টেন্ডলদের মাধ্যমে কথা বল্‌তে না হয়। অনেক ক্যাপ্টেন চেষ্টা করতেন খালাসিদের সঙ্গে এভাবে সরাসরি সুসম্পর্ক বজায় রাখতে।

ওই দুঃসাহসী মানুষগুলো শুধু জাহাজেই সহকর্মীদের আপন করে নেয়নি, বরং আপন পরিচিত জগতকে ছেড়ে ক্রমাগত যে সব বন্দরে তাঁরা এক এক সময় নোঙ্গর করে বেশ কিছুদিন কাটিয়েছেন সেখানকার মানুষ, ভাষা সংস্কৃতির সঙ্গে কিছু কিছু পরিচিতি কালক্রমে তাঁদের হয়ে গেছে– মাদ্রাজ, কালিকট, কলম্বো, মৌলমিন, রেঙ্গুন, পেনাঙ, বাটাভিয়া, মোম্বাসা, জাঞ্জিবার, উত্তমাশা (কেপটাউন), লিসবন, মার্সাই, লিভারপুল, রটারডাম, সিডনি, পার্থ– সব। এ যেন চট্টগ্রামের, অন্ধ্রের, মালাক্কার, মিন্দানাওয়ের ওই মানুষগুলো আবার চিরায়ত বিশ্ব-প্রবাহের স্বাদ নিতে নিজেদের শিকড়ের মধ্যে ফিরে গিয়েছেন বার বার।

অথচ সম্মুখ-কুঠির একেবারে ঘেঁষাঘেঁষি নিজস্ব পারিবারিক আবহে তারা সবাই একেবারেই দেশি– নিজস্ব বাবুর্চি দেশের মতই খাবার রান্না করে দিচ্ছে প্রচুর ঝাল করে; ফতুয়া পরে, হাঁটুতে লুঙ্গি তুলে আরাম করে প্রতিদিন খাচ্ছে– সেই শুটকি-ভর্তা, ভাত, ডাল, শুটকি-তরকারি। কখনো কখনো নিজেদের জবাই করা মুরগি, এমনকি কালেভদ্রে খাসির মাংসও। এজন্য জ্যান্ত ওসব প্রাণী জাহাজের মধ্যে বেশ কিছু নেয়া রয়েছে। বন্দর ছাড়ার পরও টাটকা শাকসব্‌জি কয়েকদিন পাওয়া যায়, তারপর থেকে শুকনো মটর শুঁটি, শুকনো শিমের বিচি এমনি কিছু ছাড়া সব্‌জি আর কিছু নয়– খাওয়ার সমস্যাটি ওখানেই। টাটকা সব্‌জির অভাবে (ভিটামিন সি'র অভাবে) স্কার্ভি নামের হাড়ের অসুখের ব্যাপারে ক্যাপ্টেন-অফিসাররা খুব চিন্তা করেন– দীর্ঘ যাত্রায়। তখন ইউরোপীয় নাবিকরা এবং খালাসিরাও খুব ভুগেছেন, অসুখে মারাও গেছেন অনেকে। একরকম টক্ আচার করা বাঁধাকপি যে বাধ্যতামূলক ভাবে খেতে দেয়া হতো স্কার্ভি রোগ কমাতে, সেটি খালাসিদের মোটেই মুখে রোচেনা। খাওয়ার মজাটা বেশি হয় যখন মাছ ধরার সুযোগ হয় সমুদ্রে। প্রায় সব মাছই স্ফুর্তি করে সবাই খায়, এমন কি মাঝে মাঝে হাঙরও – তাজা মাছ বলে কথা। তবে শুশুক, কাঁকড়া, কাছিম, ঝিনুক

এগুলো খাওয়াকে জায়েজ মনে করতেননা তাঁরা। তাতে অবশ্য বাকিরা খুশি কারণ এগুলো যখনই ধরা সম্ভব হয়েছে পশ্চাত-কুঠির সাহেব বাবুর্চি ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে ক্যাপ্টেন ও অফিসারদের ভোজনের জন্য; তাঁদের কাছে এর থেকে উচ্চাঙ্গের ভোজন আর হয়না। এমনকি ইউরোপীয় অন্য যাঁরা নাবিক আছেন, তাঁরাও ভাল ভাগ পাননা এসবের, যেমন তাঁরা ভাল মদেরও ভাগ পাননা, যদিও যথেষ্ট বিয়ার আর অত্যন্ত কড়া নাবিকদের প্রিয় মদ 'রাম' রেশন করে তাঁদেরকে দেয়া হতো। খালাসিদের নেতারা এসবকে সম্মুখ-কুঠির কাছেধারে আসাটাই পছন্দ করতেন না, যদিও তরুণ কেউ কেউ ওষুধ হিসেবে, কঠিন পরিশ্রমের বিমর্ষতা কাটাতে, তা জায়েজ করে নিতেন। এই সব ব্যাপারে সারেং-টেন্ডলদের কড়া নজর অবশ্য থাকে- তাঁরাতো শুধু ডেকের ওপরের কাজের নেতা নন্, পরিবারেরও নেতা বটে।

পশ্চাত-কুঠির সাহেবদের খাবার নিয়ে খালাসিদের মধ্যে মোটেই কোন হিংসে নেই। ক্যাপ্টেনের টেবিলে যাঁরা নিত্য খানাপিনা করেন সেই বড় অফিসাররা সব সময় তাজা মাংস পান বটে, কিন্তু বাকিরা খান বিস্বাদ লবন দিয়ে সংরক্ষিত গরুর গোশ্ত, লবন দেয়া বা ধোঁয়া দিয়ে সংরক্ষিত মাছ, শুক্না সব্জী, শক্ত বিস্কুট, রুটি ইত্যাদি। এসবে খালাসিদের কোন রুচি নেই; খালাসিদেরকে যে জিনিসটি থেকে ধর্মীয় কারণে যথাসম্ভব দূরে থাকতে হয় তা হলো ওখানে উপাদেয় খাদ্য টাটকা শুয়োরের মাংস, নিচের খোয়াড় থেকে দু'একটি শুয়োরকে মাঝে মাঝে ডেকের উপর গিয়ে তার বধ্য ভূমিতে নেয়া হয়– তখন খালাসিরা পারলে দল বেঁধে ডেক ছাড়ে। এই একটি কারণে তাঁদের সব বাসন কোসন, হাঁড়িপাতিল একদম আলাদা। পশ্চাত-কুঠির খাদ্য-আয়োজক লোকজনকে ক্যাপ্টেন নির্দেশ দিয়ে রাখতেন এই ব্যাপারে খালাসিদেরকে যেন বিব্রত করা না হয়, কারণ খুবই সংবেদী এসব ব্যাপারে তারা। অতীতে অনেক অসন্তোষের কারণ হয়েছে এখান থেকেই।

তবে পাশাপাশি কাজ করা ইউরোপীয় নাবিক ও কারিগরদের সঙ্গে খালাসিরা একেবারে মেশেননা তা নয়। ওই মেশার কারণেই কিছুটা লস্করী ভাষায়, কিছুটা ইউরোপীয় ভাষায়, কাজের ফাঁকে তাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়– বিশেষ করে যে সব ক্ষেত্রে খালাসির কেউ কেউ ওই কারিগরের বা বিভিন্ন দায়িত্বে থাকা নাবিকদের সহকারী হিসেবে কাজ করেন। কয়েক জন ইউরোপীয় অবশ্য উচ্চ অফিসার পর্যায়ের– যাঁরা ক্যাপ্টেনের টেবিলে খানাপিনা করেন- যেমন জাহাজের সার্জন বা প্রধান চিকিৎসক, জাহাজের সৈন্য ও কামান গোলন্দাজদের কম্যান্ডার, প্রধান

কোয়ার্টার মাস্টার– জাহাজের সব সরঞ্জাম ও পণ্য যাঁর তত্ত্বাবধানে থাকে। তা ছাড়া আরো যাঁরা আছেন তাঁরা পশ্চাত-কুঠির খাস মহলে জায়গা পান্না, তবে জাহাজে বিশিষ্ট ব্যক্তি– যেমন প্রধান ছুতার, প্রধান পাল নির্মাতা, নৌকাধ্যক্ষরা; সার্জন, কম্যান্ডার, কোয়ার্টার মাস্টারের সহকারী; প্রধান স্টুয়ার্ড– ক্যাপ্টেনের খাদ্য ভাঁড়ার ও আরামে আয়েশের দায়িত্ব যাঁর ওপর; ক্যাপ্টেনের বাবুর্চি ও তাঁর সহকারী; সাহেব নাবিকদের বাবুর্চি ও বাবুর্চি খানার সহকারী, কসাই প্রমুখ; ক্যাপ্টেন এবং প্রধান ও দ্বিতীয় মেইটের খানসামারা। তাঁদের সবার মধ্যে স্টুয়ার্ডের দাপটটি সবচেয়ে বেশি, অফিসাররাও তাঁকে সমীহ করে চলেন, কারণ তিনি ক্যাপ্টেনের একেবারে খাস বান্দা।

খালাসিদের সঙ্গে অন্যদের সম্পর্ক কী রকম হবে তা অনেকটা নির্ভর করতো ক্যাপ্টেনের ওপর। অনেক ক্যাপ্টেন খালাসিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার ওপর গুরুত্ব দেন, আবার অনেকে নেহাৎ তেজ দেখিয়ে ও শাস্তি দিয়ে তাঁদেরকে দাবিয়ে রাখতে চান। কাজেই সম্পর্কটি এক এক জাহাজে এক এক রকম হতো; তবে প্রথম প্রকারের ক্যাপ্টেনের সংখ্যা ক্রমে বেড়েছে– অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা বুঝেছেন পালের জাহাজের দীর্ঘ যাত্রায় খালাসিরা কত গুরুত্বপূর্ণ। সুসম্পর্ক রাখার একটি বড় বিষয় হলো খালাসিদের ধর্ম পালনের জন্য তাঁদেরকে কিছু ছাড় দেবার নীতি গ্রহণ করা– কারণ অধিকাংশ খালাসি খুবই ধর্মপ্রাণ। তাই বিচক্ষণ ক্যাপ্টেনরা কাজের কিছুটা অসুবিধা করেও খালাসিদেরকে নিচের ডেকের ওপর জামাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার সুযোগ দেন। সব জাহাজে রোববার সম্পূর্ণ ছুটি থাকে, একেবারে জরুরি কাজটুকু ছাড়া কেউ কোন কাজ করেননা, এটি একদিক থেকে খৃষ্টান ধর্মীয় রীতি ও অন্যদিক থেকে জাহাজি এক রকম সংস্কার– রোববারটি সাবাত দিন কাউকে কাজ করানো পাপ। জাহাজে ক্রীষ্টমাস ইত্যাদি পরব বড় একটি উদযাপিত হবার সুযোগ ছিলনা, প্রার্থনা সভা ও ভাল খাবার দেয়া ছাড়া। কিন্তু খালাসিদের ক্ষেত্রে অনেক ক্যাপ্টেন বেশি উদার থাকতেন, বিশেষ করে দুই ঈদে আংশিক ছুটি দিয়ে এবং রমজানে রোজা রাখতে দিয়ে। অভিজ্ঞতা থেকে ক্যাপ্টেনরা দেখেছেন এতে খালাসিরা তৃপ্ত থাকে; রোজা-রাখা মানুষ মাস্তুলের ওপর কঠিন কাজ করতে পারবেনা এমন ধারণা সত্ত্বেও তাঁরা তাই এই ব্যাপারে সারেংদের অনুরোধ রাখেন সাধারণত। ধর্মীয় পরবের ছুটি ছাড়াও, বন্দরে থাকার সময় পালা করে সব নাবিক ও খালাসিদেরকেও ছুটি দেয়া হতো। ওসময় তাঁরা তীরে গিয়ে বেড়াতে পারতেন, বিশেষ করে বন্দরের

রোববারগুলোতে অল্প কয়েকজন বাদ দিয়ে প্রায় সবাই সারা দিন বাইরে কাটাতে পারতেন।

ইউরোপীয় নাবিকদের, পেটি অফিসারদের, ও অফিসারদের সুনির্দিষ্ট কাজের পোষাক ছিল; কাজের বাইরেও আনুষ্ঠানিক পোষাক ছিল। খালাসিদেরও কাজের বাইরে আনুষ্ঠানিক পোষাক ছিল, কিন্তু সেগুলো অন্য রকমের– অনেকটা প্রাচ্য দেশীয়, কোর্তা, পাজামা, কোমরবন্দ, পাগড়ি এসব নিয়ে। সারেঙের পোষাক তো রীতিমত জমকালো, একটু নবাবী ধরনের। কাজের পোষাকও ইউরোপীয়দের তুলনায় অনেকটা ঢিলে ঢালা। কিছুটা নবাবী পোষাক দিয়ে, সবার ওপরে সর্দারী করতে দিয়ে, সারেং-টেন্ডলদেরকে কর্তৃপক্ষের অংশ হিসেবে রাখার চেষ্টা করা হতো বটে– কিন্তু তাঁরাও সাধারণ খালাসি থেকেই বড় হয়েছেন, নিজেদেরকে তাঁরা খালাসি পরিবারের মুরব্বী হিসেবেই দেখতেন, অন্য কোন ভাবে নয়।

নাবিকের আনন্দ ছিল কাজে, আর কাজের সঙ্গে গানে। প্রহরায় থাকার সময় তাঁরা খোশগল্প করতে পারেননা বটে, কিন্তু গলা ছেড়ে গান গাইতে পারেন; বিশেষ করে ডেকের ওপরে প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে একযোগে পাল ঘুরাবার ব্রেইস দড়ি যখন টানেন তখন সমস্বরে, আবার মাস্তুলের ওপর উঠে পাল সামলাবার কাজের সময় আপন মনে দেশি সুরে, যেন পুরানো স্মৃতি রোমন্থনে। সম্মুখ-কুঠিতে বিশ্রামের কালেও আড্ডার সঙ্গে গানই একমাত্র আনন্দ। ইউরোপীয় নাবিকদের গান অবশ্য আরো উদ্দাম, আরো জাহাজ-কাঁপানো। কিন্তু প্রতিদিন একটি সময়ে এসে জাহাজ হঠাৎ অদ্ভুত নীরব হয়ে যায়, আর সবাই জাহাজের ওপরে চলে আসে; এটি সন্ধ্যার ঠিক পর পর। রাতের সব প্রস্তুতি নিয়ে নেয়া হয়েছে– রাজা পাল, উঁচু-বীর পাল গুটিয়ে রাখা হয়েছে। নিচের ডেকে খালাসিদের মাগরেবের জামাত সদ্য শেষ হয়েছে। এসময় কাজ থেকে এবং কুঠি থেকে সব নাবিকরা ও খালাসিরা ডেকে এসে ছোট ছোট জটলায় স্থির বসে থাকে, অন্ধকার নেমে আসতে দেখে। কোয়ার্টার ডেকে ক্যাপ্টেন ও প্রধান অফিসাররা কিছু সময়ের জন্য এসে দাঁড়ান। সবই মাত্র ১০-১৫ মিনিটের জন্য। এই একটি সময় সারা জাহাজের প্রায় সবাইকে এক সঙ্গে ওপরে দেখা যায়, যদিও নানা জন নানা আনাচে-কানাচে, সবাই প্রায় নীরব, বড়জোর ফিসফিস কথায়। তারপর যে যার জায়গায় চলে যায়– যাদের প্রহরা তারা ডেকে, অন্যরা বিশ্রামে নিচে।

সারা দুনিয়ার সমুদ্রে শুধু চট্টগ্রাম-নোয়াখালী-সিলেট অঞ্চলেরই ১০-১৫ হাজার খালাসি এভাবে এক এক সময়ে সমুদ্রের বিশালতাকে বরণ করে নিয়েছিলেন

ভাসমান ছোট্ট এক একটি আশ্রয়ের আঙ্গিনায় থেকে। অন্যরা যখন নিজ গ্রামের ছোট্ট পরিসরে জীবন কাটাচ্ছেন, তাঁদের মত নাবিকরাই মানুষের চিরন্তন বড় প্রবাহটি বজায় রেখে দিয়েছিলেন যুগ যুগ ধরে।

যার গুই খর্নফুলি

কর্ণফুলির ঢেউ অবিচল

রাজা যায়, রাজা আসেঃ

'ছোড ছোড ঢেউ তুলি, লুসাই পাহারুত্তুন নামিয়েরে যারগুই খর্নফুলি।' লুসাই পাহাড় থেকে নেমে এসে ছোট ছোট ঢেউ তুলে কর্ণফুলির বয়ে যাওয়া চট্টগ্রামের চিরন্তন লোকগীতিতে যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, এর পারের মানুষের মনও সেই ছোট ছোট ঢেউয়ের মতই মৃদু আন্দোলিত থেকেছে বরাবর। অন্যদিকে কর্ণফুলির মোহনায় অবশ্য বরাবর বড় ঢেউয়ের চাঞ্চল্য; অনেক অচেনা মুখ যুগে যুগে দেখা দিয়েছে– কেউ মুসাফির পর্যটক হিসেবে, কেউ সওদাগর হিসেবে, কেউ আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে, কেউ নতুন জাহাজি প্রযুক্তির বার্তাবহ হিসেবে, কেউ দস্যু হিসেবে, কেউ আবার রাজা হিসেবেও। তাদের অনেকে থেকে গেছে, এখানকার জনসংখ্যায় মিশে গেছে; অনেকে বিদায় নিয়েও নানা রেশ, নানা মিশ্রণ রেখে গেছে। সব অভিজ্ঞতা অবিমিশ্র আনন্দের না হলেও চট্টগ্রামের মানুষের মননে সবারই অবদান রয়েছে।

কর্ণফুলির মোহনা সব সময় এই সব আগমন-নির্গমনে সরগরম ছিল। কিন্তু মোহনা ছেড়ে কর্ণফুলির উজানে যতই সাম্পান এগিয়েছে, যতই তার সরু হয়ে আসা মূলস্রোতের এবং উপনদী হালদা, সর্তার পারে পারে ঘাসের ছোঁয়া পেয়েছে, ততই সেখানে সাধারণ মানুষের জীবনের একটানা সুরটিই নদীর বহতার মতো বেজে চলেছে। সেখান থেকে অদূরে পাহাড়ি বন সহজে চোখে পড়ে, তারপর নদী নিজেই হয়েছে পাহাড়ি খরস্রোতা, যাতে অসংখ্য 'ছরা' এসে মিশেছে। একই দৃশ্য দক্ষিণের শঙ্খ নদীর পূর্বমুখী উজানে গেলেও দেখা গেছে, আরো দক্ষিণের মাতামুহুরির উজানেও। সাগর পারের সমতলের অদূরেও গহীন পাহাড় আর বন। এখানকার ওই সব সাধারণ মানুষদের মধ্যেই এসেছিলো সনাতন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের আবেদন, পরে ওদের অনেকেই ধও জাহাজে আসা মানুষদের সঙ্গে মিশে সৃষ্টি করেছিলো মুসলিম জনগোষ্ঠি। সমুদ্রে যাবার হাতছানিও এসেছিলো তাদের মধ্যেই, ওই লাঙ্গলের হাল ধরা, দাঁড় বাওয়া, মাছ ধরা সাধারণ মানুষদের মধ্যেই। অনেক আরাকানের মানুষও এখানে এসে থেকে গিয়েছে– পাহাড়ে আর সমতলে। একদিকে সমতট ও গৌড়ের শাসকরা যেমন

এই সমতলবাসীদের দিকে নজর দিয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে আরাকান রাজও দিয়েছেন– সমতল ও পাহাড় উভয় দিকেই। তাই পাহাড় ও বন দুর্গম হলেও আরাকানের নৈকট্যের কারণে সেখানে আরাকান-বার্মা অঞ্চলের ছোট ছোট জাতিসত্তার মানুষ বহুকাল থেকেই বাস করেছে। সমতল ও পাহাড়ে জীবন সংগ্রামের প্রকৃতি ভিন্ন হলেও উভয়ের সম্পর্ক কিন্তু বহুকালের– রাজা ও প্রজা উভয়ের কারণেই।

পাহাড়ের জীবিকাকে সেখানকার প্রকৃতির সঙ্গে মেলাতে হয়েছে। ওখানকার প্রাকৃতিক সম্পদকে যথা সম্ভব টেকসই ভাবে ব্যবহার করেই সেটি সম্ভব হয়েছে। সীমিত যেটুকু কৃষি সম্ভব ছিল সেই জুম চাষই পাহাড়ি মানুষের চাহিদা মিটিয়েছে– এক একটি ছোট্ট জায়গার বনে আগুন দিয়ে তার ছাইয়ের উর্বরতায় পুষ্ট ওই পরিস্কার জায়গায় এক সঙ্গে নানা ফসলের চাষ– যে ক'টি বছর ওই উর্বরতা বজায় থাকে। তারপর ওখানে আবার বন হতে দিয়ে অন্য জায়গায় জুম করা। কিন্তু ওই সীমিত সমৃদ্ধিও শাসকদের দৃষ্টি থেকে দূরে ছিলনা।

আরাকানী শাসন আমলে আরাকান থেকে অভিবাসী হওয়া বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মাধ্যমে কিছু ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভাব রাখা ছাড়া সত্যিকার শাসন, শৃঙ্খলা-শান্তি স্থাপন, উন্নয়ন- কোনদিক থেকে কোন ইতিবাচক কিছু হয়েছে এমন প্রমাণ নেই; বরং আরাকানী ও পর্তুগীজ দস্যুবৃত্তির সঙ্গে তার সহযোগিতার প্রমাণ আছে। পুরো চট্টগ্রাম ছিল দীর্ঘকাল আরাকান রাজ ও বাংলার শাসকদের নিত্য সংঘর্ষের একটি সীমান্ত অঞ্চল; এতে যে বিপুল ব্যয় তা পুষিয়ে নিতে এবং আরাকান রাজ ভাণ্ডারে ক্রমাগত সম্পদ যোগ করতে আরাকানী প্রশাসনকে কর আদায়, লুটতরাজ সব রকমের পথ অবলম্বন করতে দেখা গেছে। এই কুখ্যাতির সুযোগেই পরবর্তী সময়ে মোগল লেখকরা এই জায়গাকে 'মগের মুলুক' আখ্যা দিয়ে এখানকার বৌদ্ধদের প্রাচীন বৌদ্ধ কেন্দ্র মগধ থেকে প্রাপ্ত উপাধিকে মগ নামের নেতিবাচক আখ্যায় পরিণত করতে পেরেছিলেন। কী পদ্ধতিতে আরাকান রাজ কর আদায় করেছেন, তার বিস্তারিত এখন অনেকটা হারিয়ে গেছে। কিন্তু চট্টগ্রামে মোগল ভূমি ব্যবস্থায় অনেক আরাকানী শব্দ ও রীতি দেখে মনে হয় তাদের কর আদায় পদ্ধতির ওপর ওই আরাকানী নিয়মের কিছু কিছু প্রভাব থেকে গিয়েছিলো। যেহেতু রাজার পক্ষ থেকে শাসন শৃঙ্খলা বলে কিছু ছিলনা তাই সমতলে ও পাহাড়ে উভয় জায়গায় স্থানীয় জনগোষ্ঠি নিজেকেই নিজের আত্মরক্ষা ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার কাজটি করতে হয়েছে– নিজেদের স্থানীয় শাসনকর্তা,

সর্দার ইত্যাদি সৃষ্টি করে, যেটি পাড়া থেকে শুরু করে বৃহত্তর গ্রাম ও সমাজে বিস্তৃত হয়েছে।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মোগলদের চট্টগ্রাম বিজয়ের পর এতে কিছু পরিবর্তন আসে। এই বিজয়ের জন্য প্রায় ৫০ বছরের ক্রমাগত চেষ্টার পেছনে মোগলদের দুটি উদ্দেশ্য কাজ করছিলো। এর একটি হলো চট্টগ্রামকে সংঘর্ষপূর্ণ সীমান্ত এলাকা থেকে শান্তিপূর্ণ জায়গায় পরিণত করে তাকে মোগলের বাংলা সুবার অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে করে সুবার অন্যান্য স্থানের মত একেও মোগল কর আদায়ের আওতায় আনা যায়। দ্বিতীয়টি হলো যেই 'হার্মাদ' ও 'মগ' দস্যুবৃত্তি ও দাস ব্যবসা পূর্ব বাংলার দক্ষিণ উপকূলকে ছারখার ও জনশূন্য করে ফেলার উপক্রম করছিলো, তার অবসান ঘটানো। উভয় উদ্দেশ্য সাধনে মোগলরা শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট সফল হয়েছিলো, তবে বিজয়ের পর পরই নয়।

মোগল শান্তিঃ

যুগে যুগে কোন বড় সাম্রাজ্য-শক্তি যখনই কোন বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে তখনই আধিপত্যের অজুহাত হিসেবে সেই এলাকার সর্বত্র নিশ্ছিদ্র শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবী করেছে। এভাবে আমরা রোমান সাম্রাজ্যের প্যাক্স রোমানা (রোমান শান্তি) এবং প্যাক্স ব্রিটানিয়া (বৃটিশ শান্তি) ঘোষণাগুলো আসতে দেখেছি– যদিও ওখানে শান্তি কখনোই নিশ্ছিদ্র ছিলনা। মোগলরাও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে আরাকানী ও পর্তুগীজ লুটতরাজের পর চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে তারা সে দাবী কিছুটা করতেই পারে। মোগল শাসনের রীতি অনুযায়ী ওরা চট্টগ্রামের সমতলে জনসংখ্যা অধ্যুষিত জায়গাগুলোতে সৈন্য ও পুলিশী খবরদারি কিছুটা হলেও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে ফৌজদার, এবং বিচার করার দায়িত্ব দিয়ে কাজি নিয়োগ করে। অন্যদিকে বিখ্যাত মোগল ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করে কর আদায়ের জন্য দেওয়ানদের নিয়োগ করে। এসব প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে যথেষ্ট সময় লেগেছে, অথচ চট্টগ্রাম জয় করতে ও এটি শাসন করতে মোগল রাজকোষের অনেক ব্যয় হয়ে চলেছিলো। পাহাড় থেকে কর আদায় ওসময় তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল, ভৌগলিক নৈকট্য ও নিজস্ব জনগোষ্ঠির হওয়াতে আরাকান রাজের পক্ষে যেটি হয়তো কঠিন ছিলনা। সমতলেও কৃষিযোগ্য জমিগুলো খুব ছোট ও বিভক্ত ছিল এবং এগুলোর মালিকানা প্রায়ই অনির্দিষ্ট ছিল, তার ফলে কর আদায়ের শৃঙ্খলা স্থাপন কঠিন ছিল।

কিন্তু এই দিকে মোগলরা কিছুটা ভেবে চিন্তে রেখেছিলো মনে হয়, কারণ চট্টগ্রাম জয়ের বহু আগেই তাদেরকে চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনার রূপরেখা রচনা করতে দেখা গেছে। দিল্লীর মোগল সম্রাট আকবরের মন্ত্রী এবং ইতিহাসবিদ আবুল ফজলের লেখা থেকে জানা যায় যে এতো আগে আকবরের সময়েই একদিকে চট্টগ্রামে আরাকানী শাসনকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে তিনি চট্টগ্রামের ভবিষ্যত কর আদায় ব্যবস্থার একটি ছক কেটে রেখেছিলেন। অথচ চট্টগ্রামকে নিজেদের দখলে আনা তখন মোগলদের কাছে সুদূর পরাহত ছিল, পুরো পূর্ব বাংলা অঞ্চলটিই তখন দিল্লীর কাছে একটি দুর্গম, স্যাঁতসেতে, প্লাবিত বনাঞ্চল।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য মোগলরা প্রথমে পূর্ব বাংলার অন্য জায়গায় এবং তার বহুদিন পর চট্টগ্রামে নিজেদের করনীতি প্রয়োগ করতে পেরেছিলো। মনে হয় শুরুতে চট্টগ্রামে তারা আরাকানী শাসনের স্থাপিত কর ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ন রেখেছিলো– অন্তত জমির যেটুকু আরাকানী পরিমাপগত ও দালিলিক রেকর্ড পাওয়া গেছে তাতে কোন পরিবর্তন এনে নতুন বিশৃঙ্খলা আনতে তারা চায়নি। এর একটি প্রমাণ হলো চট্টগ্রামে জমির মাপ হিসেবে আরাকান প্রবর্তিত মগি কানি (মগ্‌দের প্রবর্তিত কানি) বরাবর অক্ষুণ্ন ছিল যা পাশের নোয়াখালী অঞ্চলে প্রচলিত শাহী কানির (মোগল প্রবর্তিত কানি) থেকে যথেষ্ট ভিন্ন আয়তনের ছিল। আর বাংলার অন্যান্য অংশে কানি এককটিই ছিলনা– ছিল বিঘা। জমি সংক্রান্ত সব দলিলে সন-তারিখ চট্টগ্রামে ব্যবহৃত হতো মগি সনে, যেটি আরাকানী বর্ষ গণনার রীতি। এ কারণে চট্টগ্রামের সাধারণ মানুষকে এই সেদিন পর্যন্ত তাদের সময়ের হিসেব মগি সনেই রাখতে দেখা গেছে– যেমন জন্মের বছর, তুফানের বছর, বিয়ের বছর ইত্যাদি মনে রাখতে। এই রীতি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত অনেক গ্রামবাসীর মধ্যে চালু ছিল।

শুরুতে কর আদায় এতো অল্প হতে লাগলো যে মোগল কর্তৃপক্ষ বন কেটে কৃষিযোগ্য জমি সৃষ্টির দিকে মনোযোগী হলো। উদ্দেশ্য একটিই– মানুষের বসত বাড়ানো, কর বাড়ানো, দিল্লীর সম্রাটের কাছে অধিক কর পাঠাতে পারা। এর একটি পার্শ্ব-উপকার হলো ভূ-সম্পত্তির মালিক বেশ কিছু ভূ-স্বামী ও সম্পন্ন গেরস্ত প্রজা সৃষ্টি করা। বিশেষ করে কর্ণফুলি, শঙ্খ, মাতামুহুরি ও বাঘখালি নদী অববাহিকায় বনাচ্ছন্ন ভূমি, নদীর খাঁড়িতে বন-সংকুল চরাঞ্চল, উপকূলের কাছের দ্বীপ- কুতুবদিয়া, মহেশখালি ইত্যাদিতে। এগুলোকে কৃষিযোগ্য আবাদী করে প্রচুর নয়াবাদী জমি সৃষ্টি করতে ভূমিহীন মানুষদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হলো, এবং

তাদেরকে এই জমিগুলো বন্দোবস্ত দেবার মাধ্যমে নতুন করযোগ্য মহাল সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হলো। কাজটি সহজ ছিলনা, তাই ওই ভূমিহীন মানুষদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ছিলেন এবং মোগল ভূমি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন হয়েছে অধিক সংখ্যক মানুষকে এ কাজে উৎসাহ যোগাতে।

১৯০৮ সালে ইংরেজ প্রশাসকদের রচিত চট্টগ্রামের ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়েরে ১৭৬০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে মোগল দেওয়ানি হস্তান্তরের সময় চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থার একটি আলোচনা করা হয়েছে। এটি করতে গিয়ে চট্টগ্রামে মোগলদের ভূমি ব্যবস্থাপনার ইতিহাসটি সেখানে তুলে ধরা হয়েছে। এই লেখকদের মতে প্রধানত মুসলিম ভূমিহীনরা এ কাজে অপরিসীম তৎপরতা দেখিয়েছিলো বলে এই কঠিন কাজটি সম্ভব হয়েছিলো। শুধু তাই নয় এতে নেতৃত্ব গ্রহণকারী অনেকেই একই সঙ্গে ধর্মীয় নেতা হওয়াতে অন্যান্য ধর্মের ভূমিহীনদেরকেও তাঁরা ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মোগল কর্তৃপক্ষ এ সময় ধর্মীয় ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে প্রচুর জমিকে লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমি হিসেবে দান করেছিলো, যাও ওই নয়াবাদী জমির উদ্যোগী নেতৃত্বকে সাহায্য করেছিলো। ভূমি আবাদে নেতৃত্ব দানকারী ওই ধর্মীয় নেতাদের বংশধরদের অনেকে মোগল আমলে জমিদার ও প্রভাবশালী হয়েছিলেন– যা কোম্পানী আমলেও অব্যাহত ছিল। ১৯০৮ সালের ওই গেজেটিয়ারে ১৯০১ সালের আদম শুমারির বরাত দিয়ে জানানো হয় যে তখন চট্টগ্রামের (বৃহত্তর) জনসংখ্যার ৭২% মুসলিম, ২৪% হিন্দু এবং ৪% এর সামান্য কম অংশ বৌদ্ধ হিসেবে পাওয়া গিয়েছিলো। কিন্তু গেজেটিয়ারের লেখকদের মতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন মোগলদের হাত থেকে দেওয়ানি গ্রহণ করে তখন চট্টগ্রামে মুসলিম জনসংখ্যার শতাংশ আরো অনেক বেশি ছিল। কোম্পানীর নানা চাকরি গ্রহণের সুযোগ পাওয়াতে এবং কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতায় এর পর বাংলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে হিন্দু ধর্মীয় অনেক মানুষ শহরের অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি থানাগুলোতে বসত স্থাপন করাতেই জেলার মুসলিম জনসংখ্যা ৭২ শতাংশে নেমে আসে।

প্রচুর জমি আবাদে আনা ও প্রচুর কৃষক ও ভূস্বামীকে যেখানে বন্দোবস্ত দেবার ফলে কর আদায় অনেক বেড়ে চট্টগ্রাম মোগল সুবার একটি অত্যন্ত লাভজনক অংশে পরিণত হয়। তবে এর সবই ছিল সমতলের কারণে, পাহাড় থেকে কর আদায় মোগল সরকারের জন্য তখনো বড় সমস্যা ছিলো। দুর্গমতা ও শাসন

জটিলতার কারণে সেখানে মোগলদের পক্ষে সরাসরি কিছু করা সম্ভব হতোনা। সেখানে অনেক ক'টি জুম চাষকারী জাতিসত্তার সর্দারদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ কয়েকটির প্রতিনিধিত্ব করার দাবীদার ব্যক্তিদের মাধ্যমেই মোগল দেওয়ানি কর্তৃপক্ষ তাদেরকে করের আওতায় আনতে পেরেছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে কিছুটা স্পষ্ট ভাবে জানা যায় যখন পরে কোম্পানী আমলে তাঁদের উত্তরসূরি সর্দাররাও কোম্পানীর কর কর্তৃপক্ষকেও একই ভাবে তাঁদের মাধ্যমে কর সংগ্রহ করতে বাধ্য করেছেন। এর মধ্যে প্রধান ব্যক্তিত্ব চাকমা সর্দার জানবক্স খান চট্টগ্রাম জেলা কালেক্টরের দারুণ মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কালেক্টরের অভিযোগ হলো মোগলদের সময়ে তাঁদের প্রাপ্ত অতিরিক্ত সুযোগগুলোই পাহাড়ের সর্দারদেরকে স্বেচ্ছাচারী করে তুলেছিলো।

মোগল কর্তৃপক্ষ পাহাড়ের এসব সর্দারদের বেশ কয়েকজনকে শুধু পাহাড়ে নয় সমতলেরও ভূস্বামীতে পরিণত করেছিলেন– অনেক জমি বন্দোবস্ত দিয়ে এবং অনেক লাখেরাজ নিষ্কর ভূমিও দিয়ে। আগের দিনের আরাকান রাজদেরকে অনুসরণ করেই হয়তো, মোগলদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের জন্য তাঁরা নিজেদের জন্য মোগল নামও গ্রহণ করতেন। এই নাম যদিও তুর্কি-আফগানি মুসলিমদের নাম, জান বক্স খান এবং তাঁর পূর্বসূরি সর্দাররা কিন্তু ধর্মে প্রধান পাহাড়ি জাতিসত্তাগুলোর মত বৌদ্ধই ছিলেন। তাঁদের মাধ্যমেই মোগলরা ১৭১৩ সাল নাগাদ মোগল কর্তৃপক্ষ পাহাড়ে জুমের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক করের বিনিময়ে পাহাড়ের বাসিন্দাদেরকে সমতলের সঙ্গে পণ্য বেচাকেনার অনুমতি দান করে। এই কর জুমের সব চেয়ে মূল্যবান অর্থকরী পণ্য কার্পাস তুলার মাধ্যমে শোধ করা হতো। বেচাকেনার ব্যাপারটি ছিল পাহাড়ের কাঠ, বাঁশ, কার্পাস ইত্যাদি সমতলের মানুষদের কাছে বিক্রয় করে তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় লবন, কেরোসিন, তৈজস ইত্যাদি কেনা। এই বিনিময় চিরকালই চলে এসেছে, মোগলদের অনুমতি দেয়া না দেয়াতে কারো লাভ-ক্ষতি কিছুই হয়নি। মাঝখান থেকে মোগলদের কর প্রাপ্তিটাই একমাত্র পার্থক্য। পাহাড়ের দুর্গমতা ও পৃথক জাতিসত্তাগুলোর স্বকীয়তা সত্ত্বেও সে সময় সমতল ও পাহাড়ের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কোন সীমারেখা ছিলনা– চট্টগ্রামেরও অনেকটাই ছিল পাহাড়ি, এবং এখানে সমতলবাসীরাও জীবিকার জন্য পাহাড়ের ওপর নির্ভর করতো। সমতল ও পাহাড় উভয়ের মধ্যে আসা যাওয়া, বেচাকেনা সবই চল্‌তো।

পাহাড়ের স্থানীয় শাসন বরাবর চলে এসেছে জাতিসত্তাগুলোর নিজস্ব ব্যবস্থায়, সেখানে যেমন মোগলদের কিছু করার ছিলনা, সমতলের গ্রামেও যে খুব বেশি

কিছু করার ছিল, বা তারা করতে চেয়েছে তা নয়– ফৌজদার, কাজি এসব প্রতিষ্ঠান সত্ত্বেও। অতীতের সব রাজ সরকারের মত মোগল সরকারেরও প্রধান ও প্রায় একমাত্র মনোযোগ ছিল কর সংগ্রহ– এবং তা সমতলেও। বাকি যা করার তা ভূস্বামী জমিদাররা, এখানে মিশে যাওয়া মোগল রাজপুরুষরা, স্থানীয় প্রভাবশালীরা ও স্থানীয় স্বভাব-নেতারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে করেছেন– চট্টগ্রামের বিখ্যাত মোগল মসজিদগুলো, সেতু, কালভার্ট ইত্যাদি স্থাপন থেকে লাখেরাজ ভূমির আয় থেকে জনহিতকর কাজ করা, সবই তাঁরা করেছেন। সাধারণ মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই গড়েছে– হালচাষ করে, সাম্পান বেয়ে, ব্যবসা করে, মাছ ধরে, জাহাজের খালাসি হয়ে; রাজা সেখানে প্রধানত অপ্রাসঙ্গিক ছিলেন।

পাহাড়ে ও সমতলে কোম্পানীর কালেক্টরঃ

১৭০০ শতকের মাঝামাঝি গিয়ে ভারত জুড়ে মোগল কর্তৃত্ব খুবই দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো। ১৭৬১ সালে বাংলার দেওয়ানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবার মাধ্যমে মোগল অবক্ষয়টি ষোল কলায় পরিণত হয়েছিলো। দেওয়ানির সঙ্গে সঙ্গে শাসন কর্তৃত্বও কার্যত কোম্পানীর কাছে চলে গিয়েছিলো– কারণ কর সংগ্রহের জন্যইতো সবকিছু। চট্টগ্রামের মত এক একটি শাসন এককে (জেলা) কোম্পানী বল্‌তে বোঝাতো তার সর্বেসর্বা প্রতিনিধি কালেক্টর বাহাদুরকে, যিনি কোম্পানীর প্রধান কর 'সংগ্রাহক'।

স্বাভাবিক ভাবে ভূমি ব্যবস্থাপনার সব কিছু তাঁকে দেখতে হয়েছে, এবং একই কারণে শাসন ব্যবস্থার প্রায় সব কিছু। দেওয়ানি লাভের পর পরই ১৭৬৫-৬৭ সালে চট্টগ্রামে একটি ভূমি জরিপ করা হয় যাতে ইতোমধ্যে করের আওতায় থাকা সব জমি চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়। এখানে বড় কথা হলো ওই জরিপের পর যে সব জমি আবাদে আনা হয়েছে তার সবই কোম্পানীর আওতায় এনে তার ইচ্ছেমতো বন্দোবস্তি দেবার ক্ষমতা সে নিয়ে নিলো এগুলোকে নয়াবাদী ঘোষণা করে। আর এই সুযোগে পূর্ব-আবাদের বাইরে থাকা টিলা, পাহাড়, বনকেও কোম্পানীর নিজস্ব মালিকানায় নিয়ে আসা হলো। এই জরিপে দেখা গেলো মোগল কর্তৃপক্ষ অর্ধেকেরও বেশি জমি করমুক্ত লাখেরাজ ভূমি হিসেবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে দান করে গেছেন। এটি কালেক্টরের বিশেষ ভাবে অপছন্দের কারণ ঘটলো– কারণ এর ফলে বিশাল পরিমাণ একটি কর থেকে কোম্পানী বঞ্চিত হচ্ছে। বহু লাখেরাজ ভূমি অযোগ্য

উত্তরাধিকারীদের হাতে পড়ে অপব্যবহার হতে থাকায় কোম্পানী পুরো বিষয়টিকে পুনর্বিবেচনার আওতায় এনে অনেক দানপত্র বাতিলের ব্যবস্থা করে।

এই সূত্রেই পাহাড়ে জুম চাষীদের সর্দারদেরকে সমতলে জমিদারী ও লাখেরাজ ভূমি দেবার বিষয়টি কোম্পানীর সামনে আসে। বিশেষ করে এসময়কার চাকমা জাতিসত্তার সর্দার জান বক্স খান এবং তাঁর সহযোগী রামু খান শুধু পাহাড়ে প্রতিপত্তি দাবী করতেন না সমতলে বিরাট জমিদারী ও লাখেরাজ ভূমির মালিক হয়ে বেশ প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠেন। তাঁদের পূর্বপুরুষরা মোগলদের সঙ্গে পাহাড়ের মধ্যস্থতা করে ওই সবের মালিকানা লাভ করেছিলেন। সমতলবাসীদের কাছে তাঁদের পরিচয় ছিল 'মগ জমিদার' হিসেবে। এ সময় জানবক্স খান অবশ্য চাকমা জাতিসত্তার মূল প্রতিনিধির ভূমিকায় কোম্পানীর সঙ্গে দেন দরবার করতেন। চট্টগ্রামের সমসাময়িক কালেক্টর ইরউইনের কাছে মনে হলো জানবক্স প্রমুখরা কার্যত পাহাড়ে কোম্পানীর যে কোন হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে কৌশলে শত্রুতা করতে আরম্ভ করেছেন, কোম্পানীর অনেক বিরাগভাজনকে সেখানে লুকাতে সাহায্য করেছেন, পাহাড়ের কুকী জাতিসত্তার মানুষরা যখন বিদ্রোহ করে কোম্পানীর সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, তখন কুকী বিদ্রোহীদেরকে নানা ভাবে সাহায্যও করেছেন। ১৭৮৭ সালে কালেক্টর ইরউইন এসবে এতই ক্রুদ্ধ হন্ যে তিনি গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে সব কিছু ব্যাখ্যা করে একটি চিঠি লেখেন এবং সমতলে জান বক্স খানের সকল জমি বাজেয়াপ্ত করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। সেই অনুমতি পেয়ে সব জমি বাজেয়াপ্ত করাও হয়েছিলো, কিন্তু জান বক্স পরে সরাসরি কলকাতা গিয়ে কোম্পানীর সঙ্গে সমঝোতা করে এই সব জমি ফেরৎ পেয়েছিলেন।

এই সব 'তিক্ত' অভিজ্ঞতার কারণে পাহাড় সম্পর্কে কোম্পানীর নীতি আর মোগলদের মত রইলোনা। ১৭৮৭ সালে কোম্পানী ওই একই জুম প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই নতুন চুক্তি করলেন। এবার চুক্তিটি হলো পাহাড়ি জাতিসত্তাগুলোকে জুম চাষের অধিকার প্রদানের বিনিময়ে কোম্পানীর নির্দিষ্ট বার্ষিক কর লাভের– এও কার্পাস হিসেবে এলেও তার একটি অর্থমূল্যও বেঁধে দেয়া হলো, যা আগের করের থেকে অনেক বেশি। কোম্পানী পাহাড়ের ওপর তার নীতিগত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলো; স্থানীয় শাসন আগের মত জাতিসত্তাগুলোর নিজস্ব ব্যবস্থায় রাখলেও জুমের কৃষিকে কাপাস মহাল নাম দিয়ে কোম্পানীর ভূমি-ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত করে নিলো। জানবক্স খানের মত জুম্মা সর্দাররা যাতে পাহাড়ে যে কোন ধরনের বিদ্রোহ দমনে কোম্পানীকে লোকবল দিয়ে ও অন্যভাবে সাহায্য করতে

বাধ্য থাকেন তাও কবুল করিয়ে নিলো। কিন্তু কোম্পানী এটুকুতে সন্তুষ্ট থাকলেও পরবর্তী বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তা থাকেনি। ১৮৬০ সালে চট্টগ্রামের ওই পাহাড়ী পুরো অঞ্চল একটি আলাদা বিশেষ জেলা হিসেবে বৃটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে। প্রধান তিনটি জাতিসত্তার জন্য চাকমা, বোমাং এবং মং এই তিনটি 'সার্কেল' গঠন করে সেখানে যার যার রাজাকে এক ধরনের আনুষ্ঠানিক প্রতীকী কর্তৃত্ব দেয়া হলো বটে; স্থানীয় সামাজিক প্রশাসন আগের মত রাজাদের নিজস্ব ব্যবস্থায় রাখা হলো বটে; কিন্তু ভূমি ব্যবস্থা, শান্তি-শৃঙ্খলা এবং বিচার বিভাগীয় রাজার সব ক্ষমতা আসলে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ওপরেই ন্যস্ত হলো।

এভাবে পাহাড় ও সমতলের এতদিনকার বিক্রিয়া, আদান-প্রদান অনেকটা প্রশাসনিক বাধার মধ্যে পড়ে গেলো। এরপর থেকে চট্টগ্রাম বল্‌তে শুধু সমতল চট্টগ্রামকেই বুঝতে হলো, যা দুর্গমতা সত্ত্বেও আগে কখনো হয়নি– না আরাকানী আমলে, না মোগল আমলে, না কোম্পানী আমলে। ওখানকার প্রধান জাতিসত্তাগুলোর সবেরই কোন না কোন ভাবে আরাকানী ঐতিহ্যের ছিল এবং এগুলো সেখানকারই নানা জাতিসত্তার বিরাট বৈচিত্র্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যদিকে আরাকান রাজ সমতল চট্টগ্রামেরও শাসক ছিলেন দীর্ঘদিন। জাতিসত্তাগুলোর সবই মঙ্গোলীয় গোষ্ঠির ও অধিকাংশ সিনোটিবেটান ভাষাগোষ্ঠির হলেও, চাকমাদের ভাষা কিন্তু চাটগেঁয়ের খুব কাছাকাছি এবং ইন্দোইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠির। এদিক থেকে জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে চাকমারা আরাকানী ঐতিহ্যের হয়েও সমতলের সঙ্গে অনেক বেশি সম্পর্ক রেখেছে; তাদের ভূতপূর্ব সর্দারদের অনেকেই যেমন জান বক্স খান, সমতলের তথাকথিত মগ জমিদারও ছিলেন বটে। কিন্তু ১৮৬০ সালের বৃটিশ হস্তক্ষেপের পর প্রশাসনিক কারণে এই সম্পর্ক কমে গিয়েছিলো।

আরাকানী, মোগল, কোম্পানী– সব শাসনই যে প্রধানত কর সংগ্রহ নিয়ে ছিল সেটি আমরা দেখেছি। এই অবস্থায় প্রজাদের ওপর প্রকৃত প্রভাব বিস্তার ও শাসনের অনেকখানিই স্বাভাবিক ভাবেই বর্তিয়েছে জমিদারদের ওপরে। কার্যত তাঁরাই ছিলেন স্থানীয় প্রভু– কৃষক প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কোম্পানী শাসনে চট্টগ্রামে এই কর্তৃত্বের মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র এসে গিয়েছিলো। বেশ কিছু বড় বড় জায়গার ভূস্বামী প্রভু ছিলেন ইউরোপীয়; মোগল আমলে প্রতিষ্ঠিত মিশে যাওয়া তুর্কি-আফগান রাজপুরুষ, এমনকি নয়া আবাদে নেতৃত্ব দেয়া ধর্মীয় নেতাদের উত্তরাধিকারী জমিদাররাতো ছিলেনই। ইউরোপীয় জমিদারদের মধ্যে বেশ ক'জন

প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন পর্তুগীজ। যেই পর্তুগীজরা মোগলদের হাতে পরাজিত হয়ে বিদায় নেবার কথা তাঁদের মধ্যে থেকেই কেউ কেউ জমিদার রূপে আবার আবির্ভূত হলেন ইংরেজ কোম্পানীর শাসনে। এঁরা আসলে মোগলদের শাসন মেনে চট্টগ্রামে থেকে গিয়েছিলেন– তখনো বংশানুক্রমে প্রভাবশালী ছিলেন। ইংরেজ জমিদাররাও কম ছিলেন না। যেমন কুতুবদিয়া পুরো দ্বীপটিই ছিল সাদারল্যান্ড নামের এক ইংরেজ জমিদারের হাতে; আর মহেশখালী দ্বীপটি ছিল ওরলেজ নামের আরেকজন ইংরেজের জমিদারী। তাছাড়া কফি, গোল মরিচ, ও নীল এই তিনটি তখনকার অপেক্ষাকৃত নতুন উদ্ভিদের চাষের জন্য বড় আকারে বাগান করতে বেশ কয়েকজন ইউরোপীয়কে ভূমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছিলো– তাঁরাও সেখানে ভূস্বামীদের মত প্রভুত্বই করেছেন কৃষক প্রজাদের ওপর। কোম্পানীর রাজত্বের আরেকটি বৈশিষ্ট দেখা দিয়েছিলো বার্মার সঙ্গে অন্য ভাবে আবার যোগাযোগ। ভারতের উপনিবেশ যখন জমে ওঠেছে তখন ইংরেজদের লোভের আওতায় আসে বার্মা। কিন্তু ওদিকে এগুনোটি সহজ হয়নি; বৃটিশ-বার্মা সংঘাত দফায় দফায় চল্‌ছিল, আর চট্টগ্রাম পড়ে গিয়েছিলো আবার দুটি বিবাদমান শক্তির মাঝখানে। চট্টগ্রামের ভাগ্যই ছিল বরাবর নানা শক্তির সংঘাতের মাঝখানে পড়া। ১৮২৪ সালে প্রথম বৃটিশ-বার্মা যুদ্ধের সময় বর্মী বাহিনী কক্সবাজার দিয়ে ঢুকে চট্টগ্রামের অনেকখানি জায়গা বেশ কিছুটা সময় দখল করে রেখেছিলো। বৃটিশ শক্তি অবশ্য তখন অপ্রতিরোধ্য ছিল; বর্মী বাহিনীকে শিগ্‌গির চট্টগ্রাম ছাড়তে হয়েছিলো, আর বৃটিশরা পুরো বার্মাই দখল করেছিলো। বৃটিশরা ১৯৪৮ পর্যন্ত একে শাসন করেছে, মাঝখানে সাড়ে তিন বছর (১৯৪২-৪৫) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সাময়িক বিজয়ী জাপানীদের বার্মা দখলের সময়টি ছাড়া। জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধেও চট্টগ্রাম ছিল সীমান্ত– জাপানী বিমান চট্টগ্রাম শহরে বোমা বর্ষণ করেছে, মিত্র বাহিনীর নানা দেশীয় অসংখ্য সৈন্য চট্টগ্রাম হয়ে আরাকান রোড দিয়ে গিয়ে কক্সবাজারে সন্নিবেশিত হয়েছিলো– কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

স্বদেশে বিদেশে

রঙ্গুম রঙ্গিলাঃ

১৯০১ সালে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বাংলার যে আদম শুমারিটি পরিচালনা করে তার আগের শুমারিটি হয়েছিলো ১০ বছর আগে ১৮৮১ সালে। চট্টগ্রাম জেলার (বৃহত্তর) জন্য দুই শুমারির লোকসংখ্যা তুলনা করে দেখা যায় যে এই দশ

বছরের মধ্যে তা খুব সামান্যই বেড়েছে– স্বাভাবিক নিয়মে যা বাড়ার কথা তার থেকে অনেক কম। ১৯০৮ এর চট্টগ্রামের ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে এর জন্য দায়ী করা হয়েছে কয়েকটি বিষয়কে– তার মধ্যে একটি হচ্ছে ১৮৯৭ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস, যাতে অগুণতি মানুষ মারা গিয়েছিলো। চট্টগ্রামের সাধারণ মানুষ একে 'উনষাট মগির তুফান' হিসেবে মনে রেখেছিলো এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও কোন কোন বয়োজৈষ্ঠকে এর আগের বা পরের হিসেবে পুরানো দিনের কথা মনে করতে দেখা গেছে। একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়– ১৮৯৭ সালে ভারতে বৃটিশ শাসন তার তুঙ্গে; কোম্পানী শাসন শেষ হয়ে সরাসরি বৃটিশ শাসন ১৮৫৮ সালে এসেছিলো, তাও বহুদিন আগের কথা। অফিস আদালতে ইংরেজি সন, আর সামাজিক ও ব্যবসায়িক কাজে বাংলা সন, তখন রীতি। কিন্তু আরাকানী রাজত্বের শেষ হবার দু'শ বছরেরও বেশি সময় পরেও চট্টগ্রামবাসীদেরকে দেখা যাচ্ছে আরাকানী মগি সনে সময়ের হিসেব রাখতে, এতই স্থায়ী তার প্রভাব!

গেজেটিয়ারের বিশ্লেষণে জনসংখ্যা স্থবিরতার আরেকটি কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে ১৯০১ এর আদম শুমারিতে চট্টগ্রামে পুরুষ ও নারীর সংখ্যার অপ্রতিসাম্য দেখে– প্রতি ১০০০ পুরুষের বিপরীতে ১১০০ নারী। এর ব্যাখ্যা হলো এখানকার বিপুল সংখ্যক পুরুষের দেশের বাইরে থাকা, যারা শুমারিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এদের একটি অংশ ছিল জাহাজে, খালাসি হিসেবে; কিন্তু তার থেকেও বড় অংশ ছিল বার্মায়, অস্থায়ী অভিবাসী হিসেবে।

বিদেশগামী চট্টগ্রামবাসীর একটি্ বড় গন্তব্য ছিল বার্মার আরাকান (এখন রাখাইন) প্রদেশের রাজধানী আকিয়াব (এখন শিৎওয়ে)। আরাকানের যেই ঐতিহ্যবাহী রাজধানী মারুক উ'র পর রাজধানী কাছেই আকিয়াবে চলে যায়। বার্মা চিরকাল ধান উৎপাদনকারী ও রফতানীকারী দেশ হিসেবে পরিচিত, আর আকিয়াব ছিল চাল রফতানীর বড় কেন্দ্র। চট্টগ্রামের অনেক মানুষ এখানকার ধান উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও রফতানী ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল। আকিয়াবের মুসলিম জনগোষ্ঠির সঙ্গে চাটগেঁয়ে ভাষার প্রায় অভিন্নতা এক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য করেছে। তাছাড়া অনেকে আরাকানী বর্মী ভাষাও আয়ত্ত করেছিলো। অন্যান্য ব্যবসা ও কাজকর্মেও আকিয়াব চট্টগ্রামের মানুষের একটি স্বাভাবিক কর্মস্থল ছিল। বার্মার অন্যান্য শহরে অপেক্ষাকৃত কম হলেও একই ভাবে বেশ কিছু চট্টগ্রামবাসী কাজ করতো– মান্দালয়, মৌলমিন ইত্যাদি শহরে। কিন্তু সবার ওপরে ছিল রেঙ্গুন, বার্মায় চট্টগ্রামবাসীর সব চেয়ে প্রধান গন্তব্য। চট্টগ্রামের

অনেক মানুষ একে জানত 'রঙ্গুম রঙ্গিলা' হিসেবে– রঙ্গুম হলো চাটগেঁয়ে ভাষায় রেঙ্গুনের নাম, আর অনেকেই একে একটি স্বপ্নিল চোখে দেখতো বলেই এটি রঙ্গিলা।

রেঙ্গুন তখন ছিল বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন সঙ্গতির, চট্টগ্রামবাসীর কাছে একটি অবারিত সুযোগের নগরী, ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টার নগরী। উদ্যোগী ধনীরা ওখানে গিয়েছেন বড় ব্যবসা করতে, বিশেষ করে দ্রুত সম্প্রসারণশীল এই নগরীর অনেক রকম স্থাপনার নির্মাণে ঠিকাদারীর ব্যবসা করতে। তাঁরা এসব নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় তদারককারীদেরকেও দেশ থেকেই নিয়ে যেতেন, কিন্তু শ্রমিক সংগ্রহ করতেন স্থানীয় ভাবে। তাছাড়া সেগুন কাঠ, চাল এবং রত্ন পাথরের ব্যবসায় প্রচুর সুযোগ ছিল উদ্যোক্তাদের জন্য। মধ্যবিত্ত এবং কারিগররা সেখানে যেতেন ছোট ব্যবসা করতে– যেমন দর্জির ব্যবসাটি রেঙ্গুনে প্রায় পুরাপুরিই চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং ভারতের কোন কোন জায়গার মানুষের হাতে ছিল। মোটামুটি শিক্ষিতরা ওখানে যেতেন কেরানিগিরি করতে- সেটি সরকারী দফতরে কিছু, কিন্তু বেশির ভাগ সওদাগরি দফতরে, কিংবা ঠিকাদারদের প্রয়োজনে। অল্পবিত্তরা সেখানে যেতেন যে কোন একটি কাজের খোঁজে, বিশেষ করে দেশি ব্যবসায়ী ঠিকাদারদের অধীনে– ফাই ফরমাশ খাটার মতো হলেও; রেঙ্গুনের পরিবেশে অনেকে সেটিকেও সৌভাগ্য মনে করতো। আর অসংখ্য তরুণ যেতেন আত্মীয়স্বজনকে আশ্রয় করে ওখানে ভাগ্যান্বেষণে, প্রায় উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে। অনেকে ভাগ্যের খোঁজ না পেয়ে ক'দিন একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশের এক ফুলেল দেশের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসতেন। এই সব মানুষের প্রায় সবাই এমন একটি বর্মী-বাঙালী সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে কাটাতে অভ্যস্ত হতেন যেটি তাঁরা দেশে আসার সময় স্রেফ ওখানে রেখে আসতে পারতেন না। তাই চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে, বাড়িতে বাড়িতে তার ছাপ পড়তো– পুরুষ ও নারীর পোষাকে, বর্মী আসবাব আর তৈজসে, এবং সব থেকে যেটি গুরুত্বপূর্ণ– বংশানুক্রমে অনেক বর্মী বৌদের ও তাদের ছেলে মেয়েদের মাধ্যমে।

পুরুষদের লুঙ্গি পড়ার ধরনেই বোঝা যেতো এরা 'রঙ্গুইম্যা' ধাঁচের মানুষ– সার্ট বা ফতুয়া লুঙ্গির মধ্যে গুঁজে দেয়া। আর গ্রামের মহিলারা প্রায় এক- চেটিয়া শাড়ির বদলে থামি পরতো– যা বর্মী মেয়েদের ফুলেল লুঙ্গি, সঙ্গে ব্লাউজ এবং গ'রখ'র (গায়ের কাপড়); ওই শেষেরটি অবশ্য চট্টগ্রামের সংযোজন, বর্মী মেয়েরা সেটি পারেনা। থামির চাহিদা এত বেশি ছিল যে জাপানের উদীয়মান প্রিন্ট কাপড় শিল্প তখন শুধু চট্টগ্রামের জন্যই 'গুলবাহার থামি' নামের সুন্দর নানা

ডিজাইনের থামি রফতানি করতো। চট্টগ্রামে গ্রামেগঞ্জে অনেক বর্মী মহিলাদেরকে দেখা গেছে তরুণী বধূ হিসেবে এসে সারা জীবন এখানে চাটগেঁয়ে-বর্মী সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে এখানকার ভাষা, সমাজ ও ধর্মের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছেন। অদ্ভুত বিষয় হলো অল্প কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও খুব বেশি মানুষকে কিন্তু বার্মায় স্থায়ী ভাবে থেকে যেতে দেখা যায়নি।

বার্মায় যাওয়ার ব্যাপারটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত থাকলেও ইতোমধ্যে চট্টগ্রামের মানুষের বিদেশ-গন্তব্যের সংখ্যা আরো বেড়েছিলো। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পুরানো সেই হাতছানিগুলোর সঙ্গে অর্থাৎ জাহাজ, বার্মা ইত্যাদির সঙ্গে যোগ হয়েছিলো আর একটি নতুন হাতছানি– তা হলো তেলের কাজ। খনিজ তেল জিনিসটি তখন সারা দুনিয়ার নেশা, আর নতুন নতুন জায়গায় তার আবিষ্কার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছিলো– বিশেষ করে তেলের শোধনাগারে (রিফাইনারি) কাজ করার সুযোগ। এই কাজেও অনেকে হাত পাকিয়েছিলো অনেকটা বংশগত ভাবে এই কাজের নেশাগ্রস্ত হয়ে। একটি সুযোগ ছিল বেশ কাছে– আসামের ডিগবয়ে। ডিগবয় তাই বেশ পরিচিত জায়গা হয়ে পড়েছিলো। তবে বড় লক্ষ্য দু'টি ছিল অনেক দূরে– পারস্য উপসাগরে; ইরানের আবাদান শহর এবং বাহরায়েন রাজ্যটি। পারস্য উপসাগরের সঙ্গে চট্টগ্রামবাসীর দহরম মহরম তখন থেকেই শুরু; পরে সেটি অনেক দূর গিয়েছে, অনেক কাজে গিয়েছে, আজ অবধি চল্‌ছে। কিন্তু সেদিন সেটা ছিল তেলের রিফাইনারিতে– দাদা, বাবা, নাতি একই রিফাইনারিতে বিভিন্ন কালে কাজ করেছে তার উদাহরণ ভূরি ভূরি। মনে রাখতে হবে ওখানে তেল আবিষ্কারের ওই প্রথম যুগে ইউরোপীয়-আমেরিকান কোম্পানীগুলোর সুবাদে ওই বিশাল কর্মযজ্ঞ গড়ে উঠলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে আবাদান বা বাহরায়েনের মানুষ আমাদের থেকে খুব ভিন্ন ছিলনা– সমকক্ষ, বন্ধুসুলভ পরিবেশেই সেদিন আমাদের আবাদাইন্যা বা বাহরাইন্যা মানুষরা সেখানে বাস করেছেন। বর্মী বৌয়ের তুলনায় কম হলে চট্টগ্রামের পাড়াগাঁয়ে 'ইরানি' বৌয়ের সংখ্যাও নেহাত কম ছিলনা– বিশেষ করে চট্টগ্রামের যে ক'টি বিশেষ এলাকা থেকে বংশানুক্রমে ওখানে যাওয়ার প্রবণতা বেশি ছিল সেখানে। এরকম সুখস্মৃতির সঙ্গে দুঃখের স্মৃতিও মিশে ছিল। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর পর ১৯১৮ সালে যে স্প্যানিশ ফ্লুর বিশ্ব মহামারী দেখা দেয়, ইউরোপ-আমেরিকা সহ বহু দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ তাতে মারা যায়; পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলটি এর দ্বারা অত্যন্ত বেশি সংক্রমিত

হয়। আবাদান ও বাহরায়েনের অনেক চট্টগ্রামবাসী এতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় এবং ওখানেই তাদের কবর হয়েছিলো।

কল্পনা করা যায়– যেমন দুনিয়ার নানান সাগরে নানান জাহাজের সম্মুখ-কুঠিতে, তেমনি বার্মার আনাচে কানাচে, আবাদানে কিংবা বাহরায়েনে রীতিমত আড্ডা জমেছে চাটগেঁয়ে ভাষায়, হাসির হুল্লোড় পড়েছে, অথবা কেউ গান ধরেছে 'কুতুবদিয়ার দক্ষিণ পারে সাম্পান মাঝির ঘর ....'। সেই ঐতিহ্য আজো চলেছে।

সেই সুর, সেই স্বাদঃ

ওই দিনগুলোর বহু বছর পর একুবিংশ শতাব্দীতেও এই সেদিন ভারতীয় একটি টেলিভিশন চ্যানেলে সে দেশের একজন গায়িকার চাটগেঁয়ে গানের একক অনুষ্ঠান চল্‌ছিলো, আর গানের ফাঁকে ফাঁকে টেলিফোনে মন্তব্য ও অনুরোধ আসছিলো। দেখা গেলো টেলিফোন আসছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে, বাংলাদেশ থেকে, মধ্যপ্রাচ্য থেকে, ইউরোপ থেকে, এমনকি সময়ের রাত-দিন পার্থক্য সত্ত্বেও আমেরিকা থেকেও– চাটগেঁয়ে গানের ভক্তদের কাছ থেকে। নতুন নতুন গান সৃষ্টি হয়েছে বটে কিন্তু তার চিরন্তন সুরটি অব্যাহত রয়েছে; আর স্পষ্টত অব্যাহত রয়েছে এই গানের ভক্তদের সারা দুনিয়াজোড়া উপস্থিতি, তা যখন যে কারণেই হোক। এ গানে সাম্পান মাঝির কথা ঘুরে ফিরে এসেছে – উদাসীন, সুদূরের পিয়াসী, বাঁধনের প্রতি বিবাগী; যে কারণে একাকীত্বে ফেলে যাওয়া গ্রাম্য বধূর কণ্ঠে সেই কান্নাভেজা সুর–

দেবাইল্যা বানাইলো আঁরে সাম্পানর মাঝি
(সাম্পানের মাঝি আমাকে দেউলিয়া বানিয়ে গেল)

একই নামে একই আকৃতিতে সাম্পান জিনিসটিই অত্যন্ত আন্তর্জাতিক- বলতে গেলে সারাটি প্রাচ্য জুড়ে ছিল, এখনো আছে কোথাও কোথাও– চট্টগ্রামে কর্ণফুলি-শঙ্খতে যেমন, বার্মায় ইরাবতী-সালুউইনে তেমন, মেকং বদ্বীপগুলোর ফাঁকে ফাঁকে তেমন, হংকং উপকূলেও অবিকল তেমনি। কোথাও এটি নদী ছেড়ে উপকূল থেকে বেশি দূরে যায়নি, সর্বত্রই এর মাঝি বা মাঝিনী (যেমন ভিয়েৎনামে মাঝিনীই বেশি) একজন একাকী উদাসী সুরতোলা মানুষ- ভাষা বদলেছে, ভাব বদলায়নি।

এই শত শত বছরের চাটগেঁয়ে গান কেউ লিখে রেখে যায়নি, গায়কদের গলা থেকে গলায় এগুলো জনপ্রিয় হয়েছে; সাম্পান মাঝির গলায় যেমন, তেমনি বিয়ের উৎসবে অঁলায় (মেয়েলি গান)– যেই পর্দা করা খালা-ফুফুদের গায়িকা হিসেবে কেউ কল্পনা করেনি তারাই যার চপল গায়িকা। এটি এসেছে গায়ক আর তার দোহারদের কাহিনী-গানেও– যেমন চিরকালের 'মাল্‌কা বানুর বার মাস'– 'মাল্‌কা বানুর সাতো ভাই, অভাগ্যা মনু মিয়ার কেহ নাই'। এগুলোই আবার পুরুষের গান, মহিলার গান নির্বিশেষে গলায় উঠেছে সুদূর সমুদ্রের জাহাজে, আকিয়াব-রেঙ্গুনের কিংবা আবাদান-বাহরায়েনের ঘরছাড়া মানুষগুলোর ঘরে, ফেলে আসা দিনগুলোকে কল্পনায় আনার চেষ্টায়।

স্বদেশে-বিদেশে আরো একটি চিরন্তন সুখানুভূতি শত শত বছর ধরে চট্টগ্রামের মানুষের নিত্য সঙ্গী ছিল তা হলো তার রসনার স্বাদ। এই বিশেষ রসনার সৃষ্টি হয়েছে চট্টগ্রামের বিশেষ অবস্থানের কারণে, সমতলের এক পাশে পাহাড় আর অন্য পাশে সমুদ্রের উপস্থিতি। বহুকাল ধরে সমুদ্রে মাছ ধরা অনেকেরই পেশা, সমুদ্রের মাছের প্রতি তাদের প্রীতিটিও সবার জানা– বাংলার অন্যত্র তেমন নয়– লাক্কা, রাঙা চৌক্কা, ছুরি, পোয়া, লটিয়া এগুলো শুধু এখানেই সমাদৃত। বিশেষ করে জেলির মত প্রায় স্বচ্ছ ও নরোম লটিয়া মাছ তার পাতে খুবই প্রিয় হলেও অন্যত্র বেশি মানুষ সেটিকে খাওয়ার জিনিস হিসেবে চিন্তাই করতে পারেনা। কিন্তু সেকালে সংরক্ষণের কোন উপায় ছিলনা বলে সমুদ্রে দূরে গিয়ে ধরা মাছকে মানুষের পাতে আনাটি কঠিন কাজ ছিল। তাই সমুদ্রেই অনেকগুলো দ্বীপ ও চরা শুধু বিপুল পরিমাণ মাছকে রোদে শুকাতে দিয়ে শুটকি করার কাজেই ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন সোনাদিয়া দ্বীপ। শুটকি, বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছের শুটকি– লটিয়া, ছুরি, পোয়া, রূপচান্দা, লাক্কা ইত্যাদি মাছের শুটকির সঙ্গে চট্টগ্রামের রসনা এক হয়ে আছে। শুধু মাছের নয়, চিংড়ির অসংখ্য বৈচিত্রের শুটকি বলতে গেলে এখানকার প্রত্যেকটি সব্‌জি-তরকারির সঙ্গে অবশ্য মিশ্রণীয় ছিল– অনেকটা একটি আবশ্যকীয় মশলার মত। এই পুরো অভ্যাসটি খুব সুবিধাজনক ভাবে জাহাজে কাজে লেগে গিয়েছিল। ওখানে তাজা খাবারের অভাবের মধ্যে শুটকির আমিষটি খাদ্য হিসেবে খুব মূল্যবান, কিন্তু চট্টগ্রামের খালাসির কাছে এর আকর্ষণ আরো বড়। শুটকির সংস্কৃতিটি চট্টগ্রামে আরো একটু অন্তরঙ্গ। সমৃদ্ধ গৃহিনীর সমৃদ্ধিটি বুঝবো কি করে যদি তাঁর বাওসখানায় (রান্না ঘরে) চুলার বরাবর ওপরে একটি আস্ত বিশাল লাক্কা শুটকি শোয়ানো অবস্থায় টাঙ্গানো না থাকে? এটি সেই লাক্কা মাছের শুটকি, যেটিকে বাজারে আনতে দুই জন মানুষকে

বাঁশে ঝুলিয়ে তা বয়ে আনতে হয়েছিলো। এখন দিনের পর দিন চুলার গরম বাতাসে আর ধোঁয়ায় সেটি আরো শুটকি হতে থাকে, পোকা মাকড় থেকে মুক্ত থেকে; যখন ইচ্ছে যে কোন দিন গৃহিনী তাঁর প্রয়োজন মত ওখান থেকে বেশ বড় বড় খণ্ডগুলো কেটে নিয়ে দিনের রান্নাকেও তৃপ্তিকর করে তুল্‌তে পারেন।

বৈশিষ্টময় রসনার সামগ্রী কাছের সমুদ্র থেকে যেমন আসে তেমনি কাছের পাহাড় থেকেও আসে। চট্টগ্রামের অনুচ্চ পাহাড়ে অবাধ ঘাস-ঝোপে চরে বড় হয় যে গরু, আর জলা-কাদায় যে মোষ, পাহাড়ে-সমতলে সমান বিচরণ থাকলেও তাদেরকে জুমের পরিবেশের কথা মনে রেখে বলা হয় জুম্মা গরু, জুম্মা মোষ। এদের দুধ শুধু অতিরিক্ত চর্বিদার নয়, বরং অদ্ভুত রকম স্বাদের– বিশেষ করে মোষের দুধ। তাই পাহাড়ের মাঝে থাকা জমজমাট বাজার রানীর হাটের মোষের দই উপহার হিসেবে নতুন আত্মীয়ের বাড়িতে না নিয়ে গেলে কুটুম্বের মান থাকতোনা। আরেকটি বৈশিষ্ট্যময় অদ্ভুত খাবারের উৎসও কাছের পাহাড়– সেটি বাঁশ খোরল। বিশেষ ধরনের পাহাড়ি বাঁশের কচি ডগা, যেটি সব্‌জি তরকারি হিসেবে অনন্য, বর্তমানে তার দেখা মেলে শুধু চাইনিজ রেস্টুরেন্টের আমদানী করা বাম্বু শুটে, অথচ এটি চট্টগ্রামের চিরন্তন খাবার। চালের পায়েসের ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের আর একটি সনাতন মিস্টান্ন– মধু ভাত। এই ভাতের চাল করতে হয় স্বাভাবিক ধান থেকে নয়, বরং ভিজিয়ে রাখলে ধানের যখন অঙ্কুর গজায় তখনই সেই ধান ভেনে চাল করতে হয়; তখন এর শর্করাটি চিনিতে পরিণত হয়। ভেজা অবস্থায় এটি খানিকটা গাঁজিয়েও ওঠে অনেকটা পান্তা ভাতের ধরণে। এই উভয়ের স্বাদেই গড়ে ওঠে অনন্য পায়েস মধু ভাত। অন্যদিকে চাল থেকেই আরেকটি মিষ্টান্ন বিনি ভাত– যা কিনা আঠালো বিনি চালের ভাত পরস্পর লেগে গিয়ে জড়া বেঁধে থাকে। জাপানের বিখ্যাত স্টিকি রাইসের সঙ্গে এর কোন তফাত নেই, যদিও এখানে এটি মিস্টান্ন হিসেবেই চালু। মানুষের হাজার বছরের পুরানো প্রবাহগুলোর মত রসনার প্রবাহও একদিকে যেমন অবিচল সনাতন, অন্যদিকে নানা গন্তব্যে তার সূক্ষ্ম বৈচিত্রগুলোও চিরকাল লালন করার দাবী রাখে।

পরীর পাহাড়ের দৃষ্টিমঞ্চঃ

চট্টগ্রামের শহরের কেন্দ্রেই রয়েছে অল্প উঁচু একটি পাহাড়– পরীর পাহাড়, একেবারে নেহাত বেরসিক মানুষদেরকেও শত বছরেরও ওপর ধরে ওই পাহাড়ে উঠতে হচ্ছে, কারণ ওখানেই রয়েছে কোর্ট বিল্ডিং; চট্টগ্রামে তাই মামলাবাজরা

অন্যদেরকে কোর্টে নেওয়ার হুমকি দেয়না, বরং 'কোর্ট বাইতে' বাধ্য করার হুমকি দেয়। কোর্ট যতই বেরসিকের জায়গা হোক, এই কোর্ট বিল্ডিংটি কিন্তু একটি অনন্য সৃষ্টি। ১৮৯৮ সালে নির্মাণ শেষ হওয়া বৃটিশ রাজের এই গর্বিত ভবনটি তার বিশাল আকারে ও স্থাপত্যের সৌকর্যের কারণে যথেষ্ট সমীহ উদ্রেক করে। এটি শুধু কোর্ট হিসেবে আসেনি, এসেছে এখানকার বৃটিশ রাজত্বের কেন্দ্রীয় ভবন হিসেবে খোদ কালেক্টর বাহাদুরের অধিষ্ঠান হিসেবে।

কিন্তু পরীর পাহাড়ের ইতিহাস শুধু ওই ভবনটির মধ্যে আট্‌কে থাকার বিষয় নয়। সেটি বোঝা যাবে ভবনটির পেছনের অন্য যে বিশাল প্রবেশ দ্বার, তার সামনে একটু গিয়ে যেখানে পাহাড় খাড়া নামতে শুরু করেছে। ওই কিনারাটির কাছে যে ফাঁকা সমতল জায়গাটুকু আছে সেটি যেন একটি অদ্ভুত দৃষ্টিমঞ্চ– যেখান থেকে শহরের বিস্তীর্ণ অংশ, এর পুরোটা বন্দর পর্যন্ত দেখা যায়, অবশ্য আকাশটি মেঘ-কুয়াশা মুক্ত থাকলে। দেখা যায় কী ভাবে কর্ণফুলি কিছুটা এঁকে বেঁকে চলে গেছে সাগরের দিকে। বন্দরের পারে পারে জেটি; বড় বড় ক্রেন, দেশি বিদেশি সারিবদ্ধ জাহাজ, তারপর দূরে আকাশ-নদী-সাগর একাকার।

আজ যা দেখা যায়, তার থেকে যা দেখা যায়না তার কল্পনা করা যায়। নদী পারের ওই জেটিগুলোতে ভিড়েছে আরব ধও, কিংবা পর্তুগীজ নাও, যার পালগুলো নামানো বলে কিছুটা ন্যাড়া ঠেক্‌ছে বটে, কিন্তু এখনো বেশ রাজকীয়। অথবা কল্পনা করা যায় নদীর ভেতরে আরাকানী ও পর্তুগীজ বহরের দিকে ধেয়ে আসছে বুজর্গ উমেদ খাঁ আর ফরহাদ বেগের নেতৃত্বে মোগল বহর নদীর মোহনার দিকে, আর শহরের পর্তুগীজ দুর্গ থেকে তার ওপর অবিরাম গোলা বর্ষণ চল্‌ছে। এমনি এখানকার ইতিহাসের আরো যে সব ঘটনা।

৭০ হাজার বছরের আফ্রিকান আদি প্রবাহের তুলনায় এই সব নেহাত সাম্প্রতিক ঘটনা। কিন্তু ইতিহাস ছাড়িয়ে উপাখ্যানে চলে গেলে তা পুরাপুরিই কল্পনা হবে– এই পরীর পাহাড়ের নাম রাখা হয়েছে যেই উপাখ্যান থেকে। ওখানে ছিল জ্বিন-পরীদের আনাগোনা, মানুষের শান্তিতে তারা ছিল বাধা। পীর বদর শাহ একটি চাটি জ্বালিয়ে ওদের তাড়িয়েছিলেন– সেই থেকে চাটি গাঁ বা চাটগাঁ। মানব ইতিহাসের আদি ঢেউগুলো এই তীরে যেমন করে আছড়ে পড়েছে তা কিন্তু উপাখ্যান নয়, একেবারে বৈজ্ঞানিক বাস্তব। ধীরে ধীরে কেমন করে জিন, জীবন, আর ভাষার সাক্ষ্য থেকে সে ইতিহাসকে খুঁজে পেয়েছি তা নিয়েই আমাদের এই বই– সে ভাবেই আফ্রিকা থেকে চট্টগ্রাম। কিন্তু সেভাবে আফ্রিকা থেকে ঢেউ গিয়ে পৌছেছে সব তীরেই, সব গন্তব্যেই। প্রতি মহাদেশ থেকে একটি করে

বেছে নিয়ে আমরা ইতস্তত এমনি কয়েকটি গন্তব্যকে এক ঝলক দেখেছিলাম। সেগুলোতেও যদি পরীর পাহাড়ের মত কোন দৃষ্টিমঞ্চ আজ বেছে নিতাম তা হলে কী দেখ্‌তাম?

আজ নীল নদীর অনেক উজানে যাকে উচ্চতর মিশর বলা হয় সেখানে একটি ছোট শহর আছে আবিডোস– তার খুব কাছেই এল্ আম্‌রা প্রত্ন খনন স্থল। প্রত্ন স্থল হিসেবে ওখানে পুরানো ধ্বংসাবশেষগুলোই দৃষ্টিগোচর হবে। তবুও তার মধ্যে একটি দৃষ্টিমঞ্চ বেছে নিয়ে সেখান থেকে তাকিয়ে কল্পনা করতে ক্ষতি কী? দূরে নীল নদীটি ঠিকই চোখে পড়বে। ওই ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই যেন ৫ হাজার বছর আগের পুরানো শিল্প শহর এল্ আম্‌রা উঁকি দিচ্ছে, সেখান থেকে নাকাদা পটারি আর কার্পাস বস্ত্র বড় বড় নৌকায় বোঝাই হচ্ছে; ওই সে রকম নৌকা যার মডেল পরবর্তী কালের মিশরীয় সমাধিতে পাওয়া গেছে– পাল, দাঁড় সব সমেত। ওটা প্রাচীন মিশর, পুরাপুরি আফ্রিকার মিশর; কিন্তু আফ্রিকা থেকে ৭০ হাজার বছর বা তারো পরে মধ্যপ্রাচ্যে যারা গেছে তাদেরই কেউ কেউ আবার ইতোমধ্যে এই আফ্রিকার মিশরে ফেরৎ এসেছে; সঙ্গে এনেছে নতুন ধর্ম, নতুন ভাষা এবং নতুন লিপি। এই সব কিছুর মিশ্রণে সৃষ্ট আজকের যারা, তাদেরকেও দেখা যায় এই দৃষ্টিমঞ্চ থেকে; আজকের কেতাদুরস্ত মিশরীয়দেরকে দেখি পাঁচ হাজার বছর আগের ধ্বংসাবশেষে বেড়াতে আর ওই একই নীল নদীর স্টিমারে উঠতে, এর ভাটির দেশ কায়রোর দিকে যাবে বলে। দৃশ্য প্রায় এক, কালটি ভিন্ন।

চেক রিপাবলিকের ইউনিটিসে কিন্তু এরকম কোন দৃষ্টিমঞ্চ করাই গেলোনা, কারণ এর পুরোটাই এখন ব্যস্ত নগরীর শহরতলীতে বিলীন হয়ে গেছে। তাই যদি এর ৪ হাজার বছর আগের অলঙ্কার-শিল্পীদের জড়োয়া হাঁসুলি দেখতে চাই তবে স্থানীয় জাদুঘরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বোটানি বে'র দৃষ্টিমঞ্চটি হবে পরীর পাহাড়েরটির মতই মনোরম।

এখানে শান্ত উপাসগর তীরের পার্কের বেঞ্চে বসে এক পলকে তাকিয়ে থাকা যায় জলরাশির দিকে। ক্যাপ্টেন কুকের জাহাজ এনডেভার থেকে নৌকায় তাঁরা ক'জন আমাদের দিকে দাঁড় বেয়ে এগিয়ে আসছেন, এমনটি কল্পনা করতে পারি। না, আরো ভালো হয় পুরো বোটানি বে'র এখানে ওখানে এর আদি বাসিন্দারা নৌকা থেকে মাছ ধরছে এমনটি কল্পনা করাটি; আর তীর জুড়ে রয়েছে তাদের ঝুপড়ি। একই সময়ের দৃশ্য, কিন্তু ক্যাপ্টেন কুকের আসার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ-ঘন দৃশ্য, মাত্র আড়াই শ' বছর আগের প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে থাকা উচ্ছল এই মানুষগুলোর জীবনে মহামারী, হতাশা, মদ্যাসক্তি এসব তখনো

প্রবেশ করেনি। বর্তমানে ফিরে এলে আজকের যে সব মানুষ বেড়াতে এসেছে, যাদেরকে বোটানি বে'র পারে সত্যি সত্যি দেখতে পাই, তারা বা তাদের পূর্বপুরুষ অন্য জায়গা থেকে সম্প্রতি এসেছে, ক্যাপ্টেন কুকের পরে। একই দৃশ্য আমরা যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনার কোলিংটনের আটলান্টিক তীরেও দেখি। আজকের মানুষ আছে, কিন্তু সাড়ে তিনশ' বছর আগের যে কৃষি সমৃদ্ধ চেরোকি জাতির কলকাকলিতে গাছের খুঁটির দেয়ালে ঘেরা শহরটি মুখরিত ছিল; নিজেদের ভুট্টা, কুমড়া কৃষি ফসল দিয়ে নতুন আসা ইউরোপীয়দেরকে যারা আতিথ্য দেখিয়েছিলো; তারা আজ এখানে নেই। তবে এই দৃষ্টিমঞ্চে গিয়ে ওই শহরের চিহ্নগুলো দেখে, মাঝখানের উঁচু মাটির পবিত্র ডিবিটি দেখে ওই গর্বিত চেরোকি জাতিকে যে কেউ কল্পনা করতে পারবেন।

কিন্তু আমাদের বাছাই করা অন্য গন্তব্য দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর কুজ্‌কো শহরে এমন দৃষ্টিমঞ্চ আমরা পেয়ে যাবো যেখানে নতুনরা যে পুরানো থেকে এসেছে তা আরো স্পষ্ট দেখতে পাব। সব চেয়ে ভাল হয় যদি দৃষ্টিমঞ্চটিকে মূল কুজকো নগর থেকে একটু দূরে ছোট পিস্‌কা শহরে নিয়ে যাই। কুজ্‌কো, পিস্‌কা সবই উচ্চ আন্ডিজ পর্বতমালার ভেতরের শহর, একটু উপত্যকার মত জায়গায় রয়েছে। পিস্‌কার প্রধান সরু শানবাঁধানো রাস্তাটি চারশ' বছর আগে ইন্‌কারাই মূলত তৈরি করেছিলো। ওখানে রাস্তার কাছেই যে পাথরে তৈরি বিশাল উচ্চ দুর্গটি রয়েছে তার মাথার ওপর দাঁড়ালেই চমৎকার দৃষ্টিমঞ্চ আমরা পেয়ে যাবো। এর সামনের দিকে তাকালে ওই রাস্তায় বসা কেচুয়া আদিবাসীদের বাজারটি চোখে পড়বে। ওদের বেচতে আসা ছোট তাঁতে বোনা কাপড়, নানা রঙের ও প্রকারের ভুট্টা, আলু, কুমড়া কৃষি সামগ্রীগুলো, এবং রঙ বেরঙের ঢিলেঢালা পোষাক ও টুপি, প্রাচীন ইন্‌কা সভ্যতাকে যেন আজকের দিনে তুলে আনে। দুর্গের পেছনের দিকে তাকালে উরুবাম্বা উপত্যকায় ইনকাদের তৈরি পাথর-বাঁধানো ধাপ-চাষের ধাপগুলো চোখে পড়বে, পর্বতের গায়ে ধাপে ধাপে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। বাজারে কেচুয়ারা ছাড়া রয়েছে কুজ্‌কো থেকে আসা মেস্টিজো জনগোষ্ঠিরা– ওই নগরে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ওরা ওই কেচুয়াদের পূর্বপুরুষ আদিবাসীদের সঙ্গে আগন্তক বিজয়ী স্প্যানিশদের জিন সংমিশ্রণে সৃষ্ট। কেচুয়াদের ভাষা প্রাচীন ইন্‌কাদের ভাষার উত্তরসূরি কেচুয়া, মেস্টিজোদের ভাষা স্প্যানিশ। কিন্তু ওরা সবাই কমবেশি একই ঐতিহ্যের মানুষ। সেই ঐতিহ্য আদিতে সৃষ্টি হয়েছিলো ১২ হাজার বছর আগে উত্তর পূর্ব এশিয়া থেকে মানুষ প্রথম আমেরিকায় আসার পর থেকে। আর ওই মানুষ এশিয়ার ওই জায়গায়

পৌঁছেছে প্রায় ৫০ হাজার বছর আগে। এরা সেই মানুষের বংশধর যারা তাদের উৎস আফ্রিকা থেকে ৭০ হাজার বছর আগে যাত্রা শুরু করেছিলো।

এভাবেই দুনিয়ার সব গন্তব্যের ইতিহাস একাকার হয়েছে মূল স্রোতে, সেখান থেকে সবার যাত্রার শুরু। ওই স্রোতেই আছে সব মানুষের ইতিহাস, সব মানুষের শিকড়। পরীর পাহাড়, বোটানি বে', পিস্‌কা দুর্গ, সব দৃষ্টিমঞ্চ থেকেই যখন আমরা এই স্রোতকে অনুভব করতে পারি, তখন এক এক জায়গায় এক এক দৃশ্যের ঝিলিমিলি আমাদেরকে ওই মূল শিহরণেই আপ্লুত করে।

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিজ্ঞান লেখক হিসেবে এবং নানা মাধ্যমে বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণের জন্য সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ষাটের দশকে এদেশের প্রথম বিজ্ঞান মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিষ্ঠা করে আজ অবধি তার সম্পাদনা করছেন। সত্তরের দশকে প্রতিষ্ঠা করেন একটি অনন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সিএমইএস), এখনো তিনি যার নেতৃত্বে। বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার সহ বেশ কিছু সাহিত্য বিষয়ক পুরস্কার প্রাপ্ত এ লেখকের বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা পঞ্চাশের ওপর।
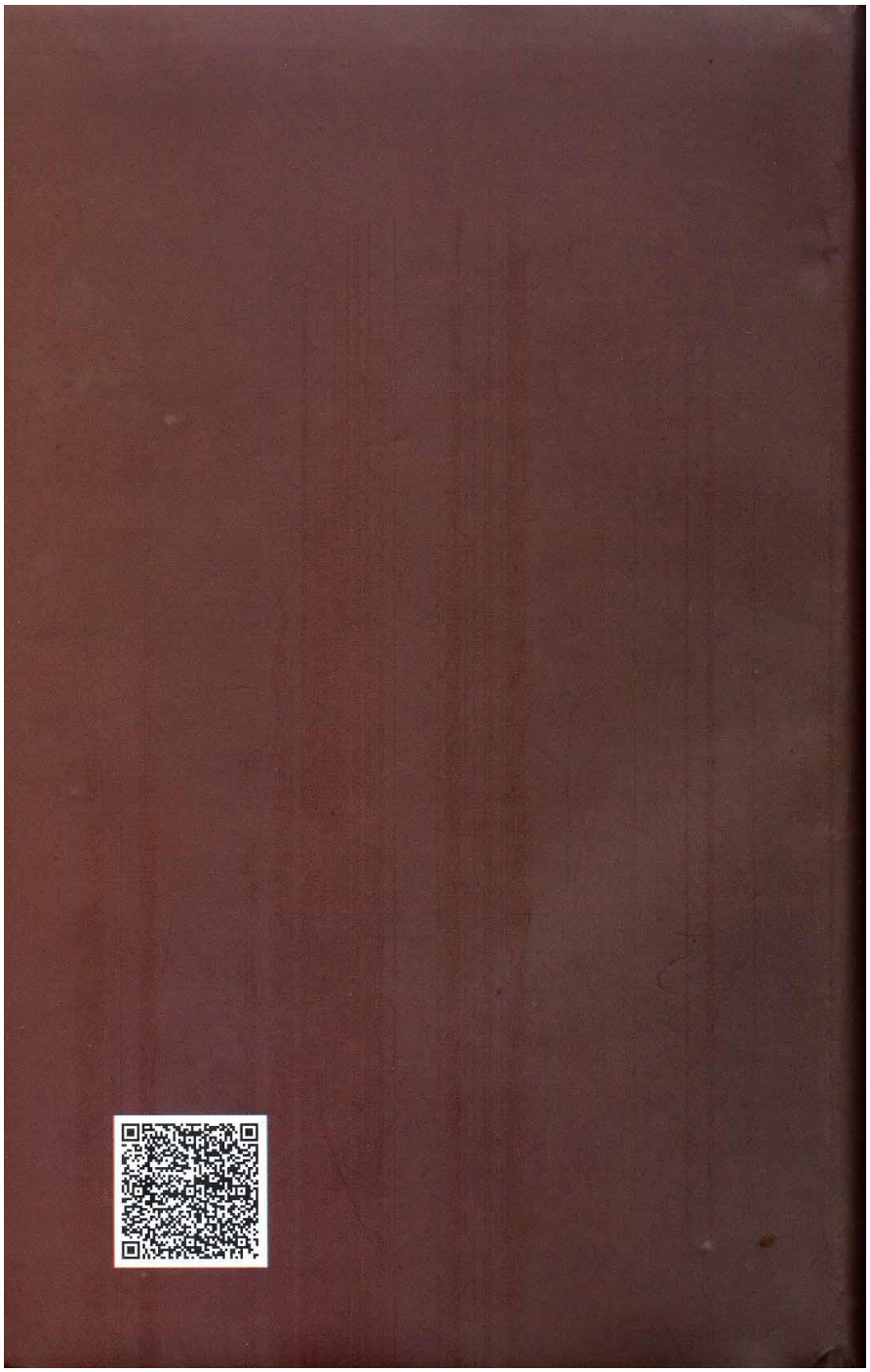
ড. ইব্রাহীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব লিবারাল আর্টস বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা বিভাগের অ্যাডজাঙ্কট প্রফেসর।